পরিচয়
130

গোলাম কুদ্দুস
রাম বসু

লীলা মজুমদার

সোমনাথ হোর

বিনয় মজুমদার

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

দেবকুমার বসু

জি. গোবিন্দন কুট্টি

ধীরেন বসু

নতুন বাংলার দুই স্তম্ভ

কৃষি আর শিল্প

আমরা বিশ্বাস করি কৃষি আমাদের ভিত্তি। শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ।
আনতে হবে নতুন প্রযুক্তি যাতে কৃষির মান হবে আরও উন্নত। নতুন শিল্প মানে আরও বেশি কর্মসংস্থান আরও বেশি আর্থিক স্বনির্ভরতা। কৃষি আর শিল্পের সংমিশ্রণে গড়ে উঠবে নতুন সোনার বাংলা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং ৯৯৮/২০০৭/তথ্য ও সংস্কৃতি

আমাদের অঙ্গীকার

- বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ
- বড়, মাঝারি ও ছোট শিল্পে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুতের যোগান
- কৃষির অগ্রগতি ও সেচ ব্যবস্থার সার্বিক রূপায়ণে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদার সুষ্ঠু যোগান

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জনজীবনে অগ্রগতির রূপকার

বামফ্রন্ট সরকার
গৌরবময়
৩০ বছর

আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ খুলে দিয়েছে কর্মসংস্থানের দরজা।
আত্মসম্মান ও আত্মমর্যদার সঙ্গে নিজের গর্বিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং ৯৯৮/২০০৭/তথ্য ও সংস্কৃতি

পরিচয়

নভেম্বর ২০০৬-এপ্রিল ২০০৭
কার্তিক-চৈত্র ১৪১৩
৪-৯ সংখ্যা ৭৬ বর্ষ

প্রসঙ্গ : গোলাম কুদ্দুস

প্রসঙ্গ : রাম বসু

উপন্যাস

সম্পাদক
অমিতাভ দাশগুপ্ত

যুগ্ম সম্পাদক
বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

কর্মাধ্যক্ষ
পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

সম্পাদকমণ্ডলী
কার্তিক লাহিড়ী
শুভ বসু অমিয় ধর

সম্পাদনা সহায়তা
অজয় চট্টোপাধ্যায়

দপ্তর সচিব
দুলাল ঘোষ

উপদেশকমণ্ডলী
রাম বসু সিদ্ধেশ্বর সেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় শঙ্খ ঘোষ

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯/এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদকীয়

পরিচয়-এর আলোচ্য সংখ্যাটি বের হতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হল। এর জন্য সম্পাদকমণ্ডলী দুঃখিত। কৈফিয়তে ত্রুটি ঢাকা যায় না তথাপি এই প্রসঙ্গে দু-একটি তথ্য না জানালেই নয়। পরিচয়-এর প্রাক্তন সম্পাদক এবং অন্যতম উপদেশক গোলাম কুদ্দুস এবং বর্তমান উপদেশক রাম বসু-র প্রয়াণের সংবাদ সকলেরই জানা। এই দুজনই পরিচয়-এর সঙ্গে সুখে-দুঃখে দীর্ঘকাল জড়িত ছিলেন। এদের কথা স্মরণ না করে পরিচয়-এর প্রকাশ সম্ভব ছিল না। অতএব শারদীয়-র পরবর্তী সংখ্যাটির পরিকল্পনা সম্পূর্ণ পাল্টাতে হল। এটিকে করতে হল গোলাম কুদ্দুস-রাম বসু স্মরণ সংখ্যা। লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে লেখা সংগ্রহ করতে স্বাভাবিক ভাবেই দেরি হয়ে গেল। খুব অল্প সময়ের অনুরোধে সাড়া দেওয়ার জন্য 'পরিচয়' লেখকদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ১৪১১-র শারদীয় কালান্তর-এ গোলাম কুদ্দুসের 'এক হিন্দুস্থানী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটি নানা দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ হলেও তেমন প্রচার পায়নি। এর প্রাসঙ্গিকতার কথা ভেবে উপন্যাসটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হল।

এই বিলম্বিত-সংখ্যাটিকে কার্তিক-চৈত্র যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে ধরতে হবে।

বিনীত
সম্পাদকমণ্ডলী

ঔপন্যাসিক গোলাম কুদ্দুস

সুমিতা চক্রবর্তী

একাধিক সাহিত্য-সংরূপের ক্ষেত্রে ফসল ফলিয়েছেন এমন লেখক সাহিত্যে অত্যন্ত বিরল নন। কিন্তু অধিকাংশ লেখকের পরিচয়ের ব্যাপ্তি বিশেষ কোনো একটি সংরূপকে অবলম্বন করেই প্রতিভাত হয়। পরিস্থিতি গড়ে ওঠে এমনভাবে যার ফলে কবিতা লিখলেও কথাসাহিত্যিক রূপে পরিচিত হন কোনো লেখক; আবার কথাসাহিত্যে বিরল প্রতিভার পরিচয় দিলেও কোনো সাহিত্যিকের প্রথম স্থানটি নির্দিষ্ট হয় কবির শ্রেণিতে। রচনাকর্মের মান, পরিমাণ ও গুরুত্ব অবশ্যই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কিছু কিছু কবিতা লিখলেও তাঁরা নিঃসংশয়েই কথাসাহিত্যিক। আবার সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস লিখলেও তাঁদের প্রধান পরিচয় সঙ্গতভাবেই কবি।

কোনো কোনো সাহিত্যিক একাধিক লিখন-প্রকরণে সমান সফল হয়েছেন এবং সেই ভাবেই পরিচিতিও পেয়েছেন—বাংলা সাহিত্যে তেমন ঘটনাও আছে যথেষ্টই। বিশ্ব-বিশ্রুত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত সরিয়ে রেখেও প্রেমেন্দ্র মিত্র আর বুদ্ধদেব বসুকে মনে করতে পারি সহজেই। এবং পরবর্তীকালের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু এমন কোনো কোনো লেখকও আছেন যাঁরা দুটি সাহিত্য-রূপবন্ধেই এমন সৃষ্টি-সম্ভার রেখে গেছেন যা পরিমাণে এবং গুণমানেও প্রায় সমান। কিন্তু তাঁদের খ্যাতি ও পরিচিতি এক ধরনের রচনা প্রসঙ্গেই বিস্তৃত হয়েছে—ভিন্ন রূপবন্ধে তাঁদের লেখনি-চালনার বিবরণটুকুও থেকে গেছে সাধারণ পাঠকের জানার বাইরে। অনেক সময়ে ভাসা ভাসা জানলেও কবি বলে যাঁকে পাঠক চেনেন—তাঁর অন্য ধরনের লেখার সম্পর্কে আগ্রহও জাগে না। পঠিতও হয় না সে-সব লেখা। কাজী নজরুল ইসলাম যে তিনটি উপন্যাস এবং অনেক ছোটোগল্পেরও লেখক তা তাঁর জন্মশতবর্ষের আয়োজনের আগে অনেক পাঠকই তেমনভাবে জানতেন না। জানলেও তাঁর গল্প-উপন্যাস আজও পঠিত হয় না সেভাবে। জসিমউদ্‌দিন প্রচুর গদ্য লিখেছেন কিন্তু আমরা তাঁকে গাথা-কবিতার রচয়িতা বলেই জেনে রেখেছি। তা-ও তাঁর দুটি মাত্র কাব্যই সেভাবে পঠিত হয়। এই পরিস্থিতির জন্য সর্বদা পাঠককে দায়ী করাও যায় না। কাজী নজরুল ইসলাম ও জসিমউদ্‌দিন-এর গদ্য রচনা সহজে পাওয়া যায় না, এমনকি অনেক গ্রন্থাগারেও পাওয়া যায় না। এর কারণ নিহিত আছে রচয়িতাদের লেখার জনপ্রিয়তার মধ্যেই। কাজী নজরুল ইসলাম ও জসিমউদ্‌দিন—উভয়েই তাঁদের প্রথম জীবনেই কবি রূপে যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন—তারই ফলে তাঁদের ভিন্ন ধরনের লেখা পাঠকদের আর আকৃষ্ট করেনি। আজও যেন নজরুল মানেই 'বিদ্রোহী' কবিতার কবি; সেই সঙ্গে কিছু গানের স্রষ্টা। জসিমউদ্‌দিন 'নক্সীকাঁথার মাঠ' লিখেছেন। তার বাইরে লিখেছেন 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'। তার অতিরিক্ত আর প্রায় কারোরই কিছু পড়া নেই।

ঠিক এমনই ঘটেছে গোলাম কুদ্দুস-এর ক্ষেত্রেও। সেই উত্তাল চল্লিশের দশকের প্রথম বছরগুলিতে—একই সঙ্গে চলেছিল তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষা, রাজনৈতিক আদর্শে দীক্ষা ও সক্রিয়তা, সেই সঙ্গে কবিতার চর্চা ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সঙ্গে একাত্ম হওয়া।

জন্ম আজকের বাংলাদেশ-এর কুষ্টিয়ার ধলনগর গ্রামে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি। পিতা গোলাম দরবেশ জোয়ারদার ছিলেন আইনজীবী। সন্তানদের (নয় ভাইবোন) সুশিক্ষিত করবার প্রয়াসে ঔদাসীন্য ছিল না তাঁর। গ্রামের পাঠশালার পর কুষ্টিয়া হাইস্কুল থেকে ১৯৩৮-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় এসে রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ভর্তি হলেন। মেধাবী ছাত্র গোলাম কুদ্দুস আই.এ. পাস করবার পর ১৯৪০-এ বৃত্তি অর্জন করে সাম্মানিক ইতিহাস নিয়ে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানে তখন ইতিহাসের অধ্যাপক সুশোভন সরকার। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পড়াতেন ছাত্রদের।

কলকাতার তরুণ ছাত্র এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রীর মনেও তখন সমাজতন্ত্রবাদী আদর্শের প্রতি আকর্ষণ সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাঁরা। সাম্যবাদের ভাবধারা স্নাত নতুন সাহিত্য বাংলা কবিতা ও ছোটোগল্পের বিষয়মুখ ও রচনারীতিকে বেশ কিছুটা বদলেও দিতে পেরেছে। তরুণ সাহিত্যিকরা লিখতে চেষ্টা করছেন অন্যভাবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' (১৯৪০) সংকলনটি বাংলা কবিতার গতিপথে এক ক্রোশ-চিহ্ন। 'কমিউনিস্ট পার্টি' নিষিদ্ধ হয়েছে ১৯৩৪-এ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে—১৯৩৯ সালে।

বিধিবদ্ধ লেখাপড়ায় আগ্রহ কমে যেতে লাগল গোলাম কুদ্দুস-এর। জড়িয়ে পড়তে লাগলেন রাজনৈতিক আদর্শ-জনিত কার্যক্রমে। তখন ১৯৪২-এ সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডের পর গঠিত হয়েছে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সহযোগী হয়ে কাজ করতে লাগলেন গোলাম কুদ্দুস। বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা লেখার শুরু তখন থেকেই। তখন থেকেই কবিতার আসরে পরিচিত নাম তিনি। সেই সময়ের প্রগতি আন্দোলনের আর এক সমুজ্জ্বল কবি ও কর্মী সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে একত্রে গোলাম কুদ্দুস সম্পাদনা করলেন 'একসূত্রে' নামের কবিতা-সংকলন। পরের বছর সুকান্ত ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত দুর্ভিক্ষ-সংক্রান্ত কবিতা-সংকলন 'আকাল'-এও আছে তাঁর কবিতা। কবি রূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন গোলাম কুদ্দুস।

কাজের শেষ ছিল না তাঁর। ছিলেন ছাত্র-ফেডারেশন-এর কর্মী। কাজ করেছেন, কবিতা লিখেছেন।

প্রথম কবিতা-সংকলন 'বিদীর্ণ' প্রকাশিত হল দেশ স্বাধীন হবার পর, ১৯৫০ সালে। কুষ্টিয়ার-র মানুষ হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান-এ যাবার কথা ভাবেননি গোলাম কুদ্দুস। কেন তা ভাবতে গেলে মনে হয়—সমাজতন্ত্রবাদের যে-আদর্শকে মনেপ্রাণে তিনি গ্রহণ করেছিলেন—যেভাবে কাজ করতে চেয়েছিলেন মানুষের মধ্যে—নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান তার পক্ষে অনুকূল হবে না—এ-কথা মনে করেই এই সিদ্ধান্ত তাঁর। হৃদয়ের

গভীরতম তলদেশ থেকে অসম্প্রদায়িক ছিলেন গোলাম কুদ্দুস। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ঘোষিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতই তাঁর যথার্থ স্বদেশ।

এই সময় থেকেই গদ্য লেখায় মনোনিবেশ করেন গোলাম কুদ্দুস। ছোটোগল্প নয়, সরাসরি লিখে ফেললেন এক উপন্যাস—'বাঁদী' প্রকাশিত হল ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। উপন্যাসটির বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব ছিল। সম্পন্ন মুসলিম পরিবারে এক বাঁদি-র জীবন নিয়ে লেখা এই উপন্যাস সেইসব বিরল রচনাগুলির একটি যেখানে পাঠকের সামনে উন্মোচিত হয়েছে মুসলমান সমাজ, পরিবার ও অন্তঃপুরের ইতিকথা। উপন্যাসটি কিছুটা পরিচিতিও পেয়েছিল। এখনও গোলাম কুদ্দুস-এর উপন্যাস বললে প্রবীণ পাঠকেরা তাঁর 'বাঁদী' আর 'মরিয়ম'—এই দুটি আখ্যানের নাম মনে করতে পারেন। দুঃখের সঙ্গে মনে হয় এই উপন্যাসদুটি কিনতে পাওয়া দূরে থাকুক, গ্রন্থাগারে অতি জীর্ণ অবস্থার কপিও সহজে পাওয়া যায় না।

হয়তো ঔপন্যাসিক রূপে গোলাম কুদ্দুস সহজেই পরিচিত হতে পারতেন; কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল আর একটি ঘটনা। কমিউনিস্ট কর্মী ইলা মিত্র পাকিস্তান-এ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন এবং অমানুবিকভাবে নিগৃহীত হলেন কারাগারে। 'অমানুবিক' বললাম—কিন্তু তথাকথিত 'সভ্য' সমাজের পুরুষেরাই সেই অত্যাচার নারীর প্রতি করতে পারে। আজ পর্যন্তও তার বিরাম নেই। সেই ইলা মিত্র-কে নিয়ে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখলেন গোলাম কুদ্দুস। ওই নামেরই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কবিতাটি প্রকাশ পেল ১৯৫৪-তে (মাঘ ১৩৬০)। গোলাম কুদ্দুস চিহ্নিত হয়ে গেলেন 'ইলা মিত্র' কবিতার কবি হিসেবে। এই কবিতা মানুষের মুখে হয়ে উঠল স্লোগান; প্রতি দেড়মাসে প্রকাশিত হত নতুন সংস্করণ। কিন্তু এরপর দীর্ঘকাল গোলাম কুদ্দুস-এর কবিতার বই আর প্রকাশিতও হয়নি। তৃতীয় সংকলন 'স্বেচ্ছাবন্দী' প্রকাশ পেল ১৯৭৪-এ; চতুর্থ সংকলন 'নাচে মনময়ূর' ১৯৮৩ সালে, 'নব রামায়ণ' ১৯৮৬ সালে এবং সাম্প্রতিক কবিতা-সংকলন 'জগৎ জয়ের যাত্রী' ১৪০৫ সালে।

এই সময়কাল—১৯৫৪ থেকে ১৯৭৪-এর মধ্যবর্তী সময়ে দেখা যায় তিনটি উপন্যাসই লিখেছেন গোলাম কুদ্দুস। উপন্যাসগুলির নাম—'মরিয়ম' (১৯৫৬), 'যুদ্ধের আগুন' (১৯৬৩), লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে' (১৯৭৪)। এর অল্প পরেই ১৯৭৬-এ প্রকাশিত হয় আর একটি উপন্যাস 'উজানীয়া'। এই চারটির মধ্যে আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি দুটি উপন্যাস—'মরিয়ম' এবং 'লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে'। এর থেকেই বোঝবার চেষ্টা করব ঔপন্যাসিক গোলাম কুদ্দুস-কে।

'মরিয়ম' উপন্যাসটির উৎসর্গলিপি—''বাঙালী অবাঙালী মিলনের প্রতীক কবি পরভেজ শাহেদীকে''। গোলাম কুদ্দুস-এর উপন্যাসে হৃদয়ের এই আকাঙ্ক্ষাই সর্বদা ব্যক্ত হয়—মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হোক—ধর্ম, জাতি, বিত্তভেদ সেখানে বাধা হয়ে না উঠুক।

উপন্যাসের পটভূমি সদ্য-স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান। প্রধান পুরুষ চরিত্র আনিস—ইঞ্জিন-ড্রাইভার। রেল-শ্রমিক ইউনিয়ন-এর সক্রিয় কর্মী—নেতৃত্ব গুণের অধিকারী। মরিয়ম ও

তার সংসারে নিবিড় ভালোবাসার প্রসন্নতা। তিন সন্তানের জননী মরিয়ম আনিস-এর চোখে সর্বোত্তম সুন্দরী।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে আনিস-এর বাড়িতে এক সকালে। মরিয়ম-এর বাবা তমিজ বিশ্বাস ও আনিস-এর বাবা দানেশ খাঁ-র আগমনে বাড়িতে চলে বিভিন্ন কথোপকথন-চা-নাশ্‌তা ইত্যাদি। অভাব সত্ত্বেও প্রীতির সংসার। যুগের বদলটা লেখক ধরিয়ে দেন একটি উক্তিতে যেখানে তমিজ-এর সঙ্গে আনিস-এর চরিত্রের মূলগত পার্থক্যটি নির্দেশ করেন তিনি—

"ভক্তি দেখলে তমিজ বিশ্বাসের বড় ভালো লাগে। গ্যাংম্যানদের সর্দারির কাজে যতটুকু তার সাফল্য হয়েছিল সেও নিজের ভক্তির জোরে। সাহেব সুবো থেকে সুরু করে তাদের আর্দালি পর্যন্ত যথাযোগ্য ভাগ পেয়ে পরিতুষ্ট ছিল তার উপর।" —এই ছিল ইংরেজ রাজত্বের যুগ। দেশীয় শ্রমিকদের ভক্তির উপর তার ভিত। কিন্তু ইংরেজ আমলেই শ্রমিক অসন্তোষ ও ধর্মঘট তীব্র হয়ে উঠেছিল। স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রনায়কেরাও যদি সেই আনুগত্য দাবি করে তাহলে তা অর্পণ করবার মতো বশংবদ শ্রমিক আর দলে দলে তৈরি হবে না। আনিস এবং তার সঙ্গীরা তাই আন্দোলন করে। দাবি আদায়ের স্লোগান দেয়, পুলিশের লাঠির ঘায়ে আহত হয়, জেলে যায়; আবার আন্দোলনের চাপে কিছু কিছু দাবি আদায়ও করে নেয়। উপন্যাসটির মূল প্রতিপাদ্য এই সত্য। তমিজ ও আনিস-এর চরিত্রের তফাতটুকু সুন্দর ধরিয়ে দিয়েছেন লেখক।

আনিস-এর আন্দোলনের সঙ্গী প্রসন্ন আর সুলতান তাদের বাড়িতে আসে। থাকবে কয়েকদিন। তাদের দেখাশোনার জন্য ইদ-এর সময়েও বাপের বাড়ি যায় না মরিয়ম। আনিস-এর কাজে তার সমর্থন ও শ্রদ্ধা আছে। আনিস-এর বাড়িতে বসে গোপন বৈঠক, মিটিং। বস্তির লোকেরা আসে অল্পই। ভয় তাদের বাধা। প্রসন্ন বলে—"দমননীতির মধ্যে সংগঠন বাঁচাতে এখনো আমরা শিখিনি।" এই আলোচনাসূত্রগুলিতে দেশ-কাল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবিভক্ত ভারতে রেল-শ্রমিক সংগঠন যে শক্তি অর্জন করেছিল তা দেশবিভাগের পর কেমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল তার বিবরণ আমাদের সামনে পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিক-আন্দোলনের পরিস্থিতি স্পষ্ট করে দেয়।

'মরিয়ম' উপন্যাসের অসাধারণ একটি অংশ নির্মিত হয়েছে—দেশ-বিভাগ-উত্তর-কালে বিহার থেকে বিহারি মুসলমান সম্প্রদায়ের পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাবার বিবরণে। সর্বাধিক বিপন্ন ছিল তারাই। পূর্ব বাংলা থেকে আগত শরণার্থী পশ্চিমবাংলায় এসে পেয়েছিল নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষজনকে। কিন্তু বিহারি দরিদ্র মুসলমানেরা পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে কোনো দিক থেকেই মিলতে পারেনি। তাদের থাকার ব্যবস্থার হয়েছিল রেলের পরিত্যক্ত ওয়াগনে। এই ওয়াগন-বস্তির অনুপুঙ্খ বর্ণনা আমাদের আঘাত করে তীব্র ভাবে। জানলা নেই। আলো হাওয়া ঢোকে না, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর উপায় নেই; নেই শৌচাগার—এমন এক একটি ওয়াগনে একটি দুটি করে পরিবার। এই পশু-প্রতিম জীবনযাপনে মেয়েদের অকথনীয় লাঞ্ছনা-র চিত্র গোলাম কুদ্দুস অতি বিশ্বস্ত রেখায়

এঁকেছেন। এর মধ্যেই জন্ম, মৃত্যু, কিশোরীর বয়ঃসন্ধি; একটি মাত্র কাপড় সম্বল করে নারীর জীবনযাপন। এই ছবি বেশি বাংলা উপন্যাসে পাওয়া যাবে না।

উপন্যাসের নামকরণ 'মরিয়ম'-এর নামে। আনিস সংগঠনের কাজে চলে যায়। অত্যাচারিত শ্রমিকদের সভায় বক্তৃতা দেয়—"পাকিস্তান গড়তে চাও! বেশ তাতেই রাজি! যারা গড়তে দেওয়ার মালিক তারা তোমাকে গড়তে দিতে রাজি কিনা দেখে নাও।" নবগঠিত পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রনীতি, প্রশাসন, কারা-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে-সব উক্তি এখানে লেখক করেছেন—বলাবাহুল্য তা প্রশংসা সূচক নয়। গোলাম কুদ্দুস সম্ভবত এই দেশ ভাগ হওয়া মানতে পারেননি।

কাজের জন্য ঘর ছাড়ে আনিস। স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে বাধা দেয় মরিয়ম। মেনে নেয় তার পর। শুরু হয় তার একার লড়াই। বস্তির মেয়েদের মধ্যে ধীরে ধীরে তার একটা সম্মানের জায়গা হয়। অনেকেরই স্বামী-পুত্র জেলে, কিংবা আনিস-এর মতোই ঘরছাড়া। যারা আছে তারা অসুস্থ, বৃদ্ধ, পঙ্গু। মেয়েদের সাহস জোগায়—একে অপরকে সাহায্য করে তারা—মরিয়ম তাদের নেত্রী। তার তিন সন্তানের একটি মারা যায়। কিন্তু সে অন্তঃসত্ত্বা। আন্দোলন মৃত্যু হয়েছে প্রসন্নর। আনিস একসময়ে ফিরে আসে। মৃত সন্তানের কবরের পাশে গিয়ে বসে তারা। শেষ অংশটি আদর্শের বাণী ঘোষণায় সামান্য কৃত্রিম—"হ্যাঁ ভাই মানুষকে বোলো, আমরা আছি। কেউ আমাদের মুছে দিতে পারবে না। দুনিয়ার মানুষ না দেখেও নিশ্চয়ই আমাদের দেখছে। তারা আমাদের ভুলবে না। তারা আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে। আমাদের ছেলে মরবে, ভাই মরবে, সঙ্গী মরবে, কিন্তু আমরা আছি।"

উপন্যাসটিতে সরল সেন্টিমেন্ট-এর ছাপ একটু আছে। কিন্তু তা উপন্যাসটির বাস্তবতাগুণ ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। অবশ্য উপন্যাসের মানুষগুলির চরিত্রায়ন সরল, সমালোচনার ভাষায় বলা যায় একমাত্রিক। কিন্তু গোলাম কুদ্দুস-কে যাঁরা চিনতেন তাঁরা জানেন—জটিল কুটিল মানব-মনস্তত্ত্বে আগ্রহই ছিল না এই সরল মানবতাবাদী মানুষটির। তাঁর অন্তরের শক্তি এবং যদি চিন্তার কিছু ভ্রান্তি থেকে থাকে—উভয়েরই উৎসে ওই সরল স্বচ্ছতায় মানুষকে পাবার ঐকান্তিক অভিলাষ।

গোলাম কুদ্দুস-এর তৃতীয় উপন্যাস 'যুদ্ধের আগুন' (১৯৬৩) সংগ্রহ করতে না পারায় ঔপন্যাসিক রূপে তাঁর মানস-বিবর্তনের কোনো সময়ে গদ্যশিল্পী গোলাম কুদ্দুস-এর পরিচয় বিস্তৃততরভাবে লিপিবদ্ধ করবার অভিপ্রায় মনে রেখে তাঁর চতুর্থ উপন্যাস 'লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে' (১৯৭৪) সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যায়।

বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব প্রথমেই পাঠককে আগ্রহী করে তুলতে পারে। এটি স্পষ্টতই ঐতিহাসিক উপন্যাস। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি অধ্যায় এখানে মূর্ত হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের বাতাবরণ যথার্থ রাখবার জন্য লেখক প্রথম অধ্যায়েই গান্ধীজি-র লবণ-আইন-অমান্য আন্দোলনের সময়টি চিহ্নিত করেছেন।

এই আখ্যান বাঙালি জীবনের নয়। মজঃফরপুর জেলার ছোটো একটি গঞ্জ—নাম 'শ্যাওলি'—তার অখ্যাত একটি বাজারে হাটের দিন। অঞ্চলটি গরিব—আখ এবং গম ফলিয়ে

কোনোমতে দিন গুজরান করে কৃষক। সেই হাটে নুন তৈরি হচ্ছে—সুদূর ডাণ্ডি-তে গান্ধীজির অভিযানের প্রতিধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছে আবহাওয়া। হঠাৎ আসে পুলিশ। জনতা প্রথমে তাদের দিকে ঢিল ছোঁড়ে, তারপর লাঠি খেয়ে পালায়। এই হাটের কিষাণ খরিদ্দার সুদর্শন সিং আর তার নাতি ষোলো-সতেরোর কিশোর অর্জুন সিং-কে নিয়ে গল্প। সময় ১৯৩০।

সুদর্শন সিং-এর বাবা সিপাই বিদ্রোহে 'আংরেজ'-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে মরেছিল। বিদ্রোহে বড়ো ভয় সুদর্শন সিং-এর। নিজের ছেলে রঙ্গলালকে সে ফৌজে পাঠিয়েছে—তাকে উপদেশও দিয়েছে—সর্বদা সাহেবদের হুকুম মেনে চলবার। 'মরিয়ম' উপন্যাসের তমিজ বিশ্বাসকে মনে পড়ে। নাতি অর্জুন স্কুলে যায়। সেই অপরাহ্নে নুন তৈরি-র ছবিটি, পুলিশের আগমন ও তাদের বিরুদ্ধে ছোটো লড়াই-এর ছবিটি গেঁথে যায় অর্জুনের মনে।

আমরা একটু অবাকই হই এই দেখে—কত স্বচ্ছন্দে অ-বাঙালি কৃষক পরিবার, উত্তর বিহারের গ্রামীণ পটভূমি আত্মবিশ্বাস ও যথার্থ্যের সঙ্গে গড়ে তুলেছেন গোলাম কুদ্দুস। কোথাও তাঁর সঙ্গে উত্তর বিহারের মানুষের একটা যোগ ছিল। সেই গ্রাম, গ্রামের হাট, মহাজন, জোতদার চন্দ্রভান, চন্দ্রভানের গরু চরাবার কাজে বহাল কৃপাল, গুরুজি-র পাঠশালা—সবই চমৎকার সজীব। তবে ভাষার ব্যবহারে গোলাম কুদ্দুস সতীনাথ ভাদুড়ী নন—বলাবাহুল্য। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বা বনফুলও নন। সেই আমেজটা সেজন্য আসেনি। ভাষার কারণেই অর্জুন সিং-কে একটু পরেই নিখাদ বাঙালি মনে হতে থাকে। আর, মনের মধ্যে, শ্বাস-প্রশ্বাসে, রক্তধারায়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে মানুষ কখনও আলাদা নয়—এই দৃষ্টিকোণ গোলাম কুদ্দুস-এর প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির অন্যতম—তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কর্মে।

গ্রামে লেখাপড়া হয় না বলে বাবা রঙ্গলাল ছেলেকে নিয়ে গেল নিজের কাছে। অর্জুন হয়ে গেল ফৌজ-এর 'ব্যারাক-বয়'। নিচের তলার মিলিটারি ব্যারাক-এর কুৎসিত জীবন—ঈর্ষা, অত্যাচার, নিয়ম-কানুন, ওপরওয়ালার ক্ষমতা প্রদর্শন, নারী-বর্জিত জীবনের বিকার—সবই কিশোর অর্জুনের চোখ দিয়ে দেখিয়েছেন গোলাম কুদ্দুস। এই অংশটি পাঠকদের কাছে বেশ অভিনব মনে হবে। সেই সঙ্গে অর্জুন দেখল শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের প্রতি পদমর্যাদায় নিচু ভারতীয়দের নির্লজ্জ তোষণের মনোভাব—নিজের মেয়েকে সাহেবের ভোগ্য হতে দেওয়ার ঘটনা। সাহেব-বিরাগকে ফেনিয়ে উঠতে লাগল অর্জুনের মনে।

কিন্তু স্কুলেও গিয়েছিল অর্জুন। মেধাবী ছাত্র। ভালোভাবে পাস করে বেনারস-এ পড়তে গেল কলেজে। সেই কলেজ-জীবন, ছাত্রাবাস ও সহপাঠিনী দুলারী-র সঙ্গে তার প্রেম—ঝরঝরে আস্বাদ্য ভাষায় লেখা। প্রেমের বৃত্তান্তে এলে গোলাম কুদ্দুস-এর দৃষ্টিকোণ হয়ে যায় নবীন কিশোরের আদর্শ ভালোবাসার স্বপ্নের মতো। একে অপরকে তারা ভালোবাসে প্রাণ দিয়ে। অর্জুন ক্ষত্রিয়, দুলারী ব্রাহ্মণ—তার ওপর উচ্চপদস্থ পিতার সন্তান। এই জায়গায় সামাজিক উপন্যাসের চেহারা নিতে পারত লেখাটি, কিন্তু তা নেয়নি। লেখকের উদ্দেশ্য ছিল আলাদা।

অর্জুনও মিলিটারিতে নাম লেখায়। কিন্তু সে গ্র্যাজুয়েট। শুরু করল বাবার তুলনায় উঁচুপদ থেকে। যেখান থেকে সহজেই হবে অফিসার। মাঝে এসে বিয়েও করে গেল দুলারীকে।

উপন্যাসটির আসল জায়গা এসেছে এর পর। তখন শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ভারতের রাজনৈতিক বাতাবরণ বহু তরঙ্গ-আবর্তে সংক্ষুব্ধ। একদিকে ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতা ; জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতভেদ; ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা, সুভাষচন্দ্রের উত্থান, ভারত ছাড়ো আন্দোলন। এই সবের মধ্যে আর্মি ক্যাম্প্-এ শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় অফিসারদের জীবনযাপন। দেবেশ দাশের 'রক্তরাগ' উপন্যাসেও এই পরিমণ্ডল আছে। কিন্তু অর্জুনকে প্রধান চরিত্রের স্থানটি দিয়ে—তার ভাবনাসূত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভারতীয় সেনা-অফিসারদের মানসিকতাটি বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন গোলাম কুদ্দুস। পাশাপাশি আছে বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতির বিবরণ।

গোলাম কুদ্দুস দেখিয়েছেন—সেনাবাহিনীর ভারতীয় অফিসারেরা নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে এক গোপন সংগঠন। যারা কর্তব্য হিসেবে যুদ্ধ করছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে—শ্বেতাঙ্গ ওপরওয়ালা আর সহকর্মীদের প্রভুত্বমূলক মনোভাব, ভারতীয়দের প্রতি অপমানসূচক আচরণের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ শেষ হলেই এই ভারতীয়রা দেশের স্বাধীনতার জন্য শুরু করবে নিজেদের প্রয়াস।

পরিকল্পনাটি মুন্সিয়ানার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করেছেন লেখক। যদি এই ঘটনাবর্তের ঐতিহাসিক ভিত্তি সংশয়াতীত নয়।

যুদ্ধ শেষ হয়। কিন্তু সংগঠনের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় না। সাম্প্রদায়িক বিভেদ সংগঠনের প্রাণ-পাত্রটিকে বিষাক্ত করে। দেশ ভাগ হয়। অর্জুনের অনেক বন্ধু পাকিস্তানে চলে যায়। অর্জুন ধরা পড়ে পাকিস্তানে। তখন ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বর। তখনও ব্রিটিশ প্রশাসন অনেকটাই বহাল। তাকে গোপনে সাহায্য করে তার বন্ধু মজিদ। যে সংগঠনের অন্যতম সদস্য ছিল—এখন পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সদস্য। অর্জুনকে লেখা মজিদ-এর চিঠি পড়ে নরম হয়ে যায় পাকিস্তানের কারারক্ষী। অর্জুন জেল থেকে পালাতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুলারী তখন নেই, মৃত্যু হয়েছে মজিদ-এর পত্নীরও। কাশ্মীর-সমস্যা জ্বলন্ত। সাম্প্রদায়িক সংকট লেলিহান।

তবু এর মধ্যেই নিজেদের আদর্শ সামনে রেখে এগিয়ে যাবে অর্জুনেরা। যদিও ইতিহাসের পাতায় তাদের এই মানবীয় সংগ্রামের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে না।

গোলাম কুদ্দুস কবি ছিলেন। সেই সঙ্গে এমন একজন ঔপন্যাসিকও ছিলেন যাঁকে ভুলে থাকা ঠিক হবে না। কবিতা, কথাসাহিত্য এবং নিবন্ধজাতীয় গদ্য—সব মিলিয়েই তাঁকে মনে রাখতে হবে। গোলাম কুদ্দুস কোনো চাকরি করেননি। সর্বক্ষণের দলীয় কর্মীর বিলাসবিহীন জীবন বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর ভাবনা—তাঁর আদর্শই তাঁর সাফল্য। সেই ভাবনা তাঁর লেখার মধ্যেই ধরা আছে। তাঁর লেখার একটি বাক্যও হারিয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

'যুগসন্ধিক্ষণ'-এর গোলাম কুদ্দুস

শুভঙ্কর ঘোষ

কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী সম্প্রতি প্রয়াত কবি-কথাকার-প্রাবন্ধিক-সাংবাদিক, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূর্ত প্রতিভূ, বামগণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগঠক, স্বাধীনতাযোদ্ধা গোলাম কুদ্দুস [১৯২০-২০০৬] 'ইলা মিত্র' কাব্যগ্রন্থে লিখেছিলেন, 'ইশারা আজ হাতছানি দেয় স্থির ধ্রুব নক্ষত্রের মতো,/হাতের মুঠোয় চেপে ধরো দিগ্‌নির্ণয়ের যন্ত্র;/আর অটল বিশ্বাসে বন্ধুকে বন্ধু বলে ডাকো।/যদিও অন্তহীন বেদনার ঢেউ উঠছে সংসার সমুদ্রে,/যদিও সমস্যার অন্ধকারে দিক-চিহ্নহীন বিক্ষুব্ধ অকূল পারাবার, যদিও আকাশে-বাতাসে পাক দিয়ে দিয়ে কাঁপছে সংঘর্ষের ঝড়ো হাওয়া,/তবু নাবিকের সামনে আছে কম্পাসের কাঁটা/আর বুকে আছে ঘা-খাওয়া জীবনের প্রচণ্ড পীড়ন,/এ মহাসন্ধিক্ষণে হে মহাযৌবন আশীর্বাদ করো তুমি/ভারতের বন্দরে বন্দরে যত আছে কলম্বাস/ক্ষুব্ধ সমুদ্র দিয়ে যাবে আজ নতুন দিগন্ত আবিষ্কারে।' [নতুন দিগন্ত]। প্রবল বিশ্বাসের কবি কিংবদন্তি-প্রতিম কবিতায় ঘোষণা করেছিলেন, 'ইলা মিত্র কৃষকের প্রাণ।/ইলা মিত্র মুচিকের বোন।/ইলা মিত্র স্তালিন নন্দিনী।/ইলা মিত্র তোমার আমার/সংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ বিবেক।/ইলা মিত্র দলাদলি, আর/ক্ষুদ্রতার রূঢ় ভর্ৎসনা।/ইলা মিত্র নারীর মহিমা।/ইলা মিত্র বাঙালীর মেয়ে।' [ইলা মিত্র]। অর্ধশতাব্দীর অধিককাল আগেই এই কবিতায় ব্যক্তিনারীর স্তুতিতে স্থিত থাকেননি কুদ্দুস ; বরং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্রান্তিকালীন প্রতিভূকে উপস্থাপিত ক'রে সময়-স্বপ্ন-জীবনের যাথার্থে ইঙ্গিত করেছেন। কবি গোলাম কুদ্দুস যখন 'বাঁদী' উপন্যাস লেখেন, তখন কোনো মামুলি আখ্যান ফাঁদতে চাননি, 'মনীষা'-সংস্করণের পিছন মলাটে তাই যথাযথ বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, 'বাঁদী কোনো মধ্যযুগীয় হারেমের কাহিনী নয়, সমকালীন সমাজই এর পটভূমি। এ এক আধুনিক বাঙালী মুসলিম পরিবারের সামন্তযুগীয় ধ্বংসাবশেষের অন্তরঙ্গ আলেখ্য, অথচ তার তা সংকীর্ণ পারিবারিক বাস্তবতার গণ্ডি পেরিয়ে ধনতান্ত্রিক যুগের নরনারীর দাসত্বের নিগূঢ় আবরণ উন্মোচন দ্বারা সমাজসত্যের সমগ্রতা বিধৃত করেছে। সমাজের অবজ্ঞাত অংশের পাত্রপাত্রীদের জীবনসমস্যা থেকে উদ্ভূত হয়েছে গোটা সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। বাঁদী সাহিত্যের আসরে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পংক্তিভুক্ত।' আমরা বোঝাতে চাইছি, গোলাম কুদ্দুস প্রকৃত অর্থে সমাজ চৈতন্যের কবি-কথাকার, তাঁর অপর আখ্যান 'মরিয়ম' কিংবা 'স্বেচ্ছাবন্দী' 'নাচে মনময়ূর' কাব্যসমূহ একই সত্য উন্মোচিত করে, শুধু তাই নয় ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের রিপোর্টাজ কিংবা পরবর্তীকালের 'যুগসন্ধিক্ষণ' প্রবন্ধ সংকলন তাঁর সৃজন প্রতিভাকে ভিন্ন মাত্রায় ঋদ্ধ করেছে। সাংবাদিক জীবনেই নয়, মতাদর্শগত ক্ষেত্রে, জীবনচর্যা ও মননচর্চাতেও তিনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধসমূহও একধরনের সৃজন। তত্ত্বগত প্রস্থানভূমি থেকে প্রাণিত তাঁর মনন-মেধা-হৃদয় কোনো কল্পচারী সমাজবাদে আবদ্ধ ছিল

না, বরং মার্কসীয় বীক্ষায় সজীব ও গভীর ছিল। তাঁর চিন্তাজগতের ইনটিগ্রিটিই তাঁকে স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত করেছে। কোনো বিতর্কেই তিনি দিশাহারা হননি, পিছুপা হননি, স্পষ্টবাদিতা হারাননি।

প্রাবন্ধিক গোলাম কুদ্দুসের 'যুগসন্ধিক্ষণ' [দীপায়ন, ২য় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৬] দেশকাল নিবিষ্ট সমাজ-সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্যের তত্ত্বগত ও জীবনগত ভাব্যের আশ্চর্য শিল্পিত দলিল। 'যুগসন্ধিক্ষণ' নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই সত্য যে, সমস্যা-সংগ্রাম-সংস্কৃতি-র সময়বিবিক্ত আলোচনা তাঁর অভিষ্ট নয়, বরং সময়-প্রেক্ষাপট, তাঁর যাবতীয় আলোচনার অবলম্বন। নিছক আবেগতাড়িত কথা বলা নয়, ১৯টি রচনাতেই মার্কসীয় মতাদর্শগত বিশ্লেষণই প্রকট হয়েছে। গোলাম কুদ্দুসের কবিমন প্রবন্ধের নৈয়ায়িকতাকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করেনি। বরং তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধ-আলোচনায় মৌলিকত্ব টের পাওয়া যায় অনায়াসে।

গোলাম কুদ্দুস কোনো কেতাবী আলোচনায় স্বস্তি বোধ করেন না। অ্যাকাডেমিক পণ্ডিতদের মতনও তাঁর রচনার প্যাটার্ন নয়। প্রত্যেকটি রচনার ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতাই তাঁর বিশিষ্টতা। ফলে কোনো বিষয়কে নিয়ে তাঁর বলার কথা গতানুগতিক নয়, পুস্তিকানির্ভর নয়, তত্ত্বে ও প্রয়োগে তা তাৎপর্য লাভ করে। বিভিন্ন সময়ে লেখা হলেও তাঁর চিন্তনে অনুচিন্তনে ঐক্যের অভাব ঘটে না। তাঁর বরাবরের মূল ভাবনা সময়ান্তরে নানাদিকে ডানা মেলে, পরিণতি পায়। তিনি রবীন্দ্রনাথ-গোর্কি-নজরুল-সুকান্ত-সোমেন চন্দকে যে বীক্ষাগত উৎস থেকে দেখে থাকেন, তা থেকে অবশ্যই দূরবর্তী নয় রামের বিপ্লবী চরিত্র অনুধাবন, তেভাগা সংগ্রাম, ধনতন্ত্র ও গ্রন্থাগার আন্দোলন। এমনকী ব্যক্তিগত আভা থাকা সত্ত্বেও সুধী প্রধান-গোপাল হালদার-সুশোভন সরকার-মুজফ্ফর আহমদ-বিনয় চৌধুরী নিয়ে কথা বলতে বলতে, স্মৃতিচারণা করতে করতে মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির অন্তঃস্থিত সমাজমুখিনতাও ফুটে ওঠে। এমনকী 'নৈতিক মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্য' সন্ধানে তাঁর পঠনপাঠনের গভীরতা ও দেখার জগতের স্বাতন্ত্র্যকে পরিচিত করায় তাঁর অসামান্যতাই ধরা পড়ে। 'সংবাদপত্রের দুই জগৎ'-ও এমনই একটি বলিষ্ঠ অর্থবহ আলোচনা।

গোলাম কুদ্দুস ১৯৯০ ও ২০০২-এ যথাক্রমে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে দুটি নতুন স্বাদের লেখায় কীভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, তা বলতে চেয়েছেন। 'যুগসন্ধিক্ষণ' গ্রন্থের প্রথম লেখাটিতেই ২০০২-এর, নাম : প্রসন্ন ও বিষণ্ণ রবীন্দ্রনাথ। প্রবন্ধের প্রচলিত ফর্মে নয়, ভাবনার উপযোগী প্রকরণে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রসন্ন ও বিষণ্ণ রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। স্মৃতিচারণার আদলে রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা' পড়ে শুনিয়েছিলেন বিচিত্রাভবনে। 'ঝর্ণাস্রোতের মত তরঙ্গমুখর বাণী' তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত হওয়ায় ধরা পড়ছিল কবির প্রসন্নতা। কুদ্দুসের মনে হয়েছে 'বাল্যস্মৃতি সেদিন যেন তাঁকে দ্বিতীয় শৈশবের সুষমা দান করেছিল।' কিন্তু শান্তিনিকেতনে ৮০ বছর বয়সপূর্তি অনুষ্ঠানে, চিন্মোহন সেহানবীশ গিয়েছিলেন, উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে; কুদ্দুস জেনেছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশের কাছে, বিষম বিষণ্ণতায় ভারাক্রান্ত কবি সেদিন ক্ষোভে দুঃখে বেদনায়, পাঠ করেছিলেন 'সভ্যতার সংকট।' সেই সময়কালে

ঘটে গেছে 'কবির প্রিয় সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান এবং লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ।' দুটি ঘটনায়, বিশেষত শেষোক্তটিতে কবি মর্মান্তিক আঘাত পান। বেদনাবিধুর চিত্তে জানান, 'আমার জীবনের এবং সমগ্র দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেছে, সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।' কুদ্দুস মনে করেছেন, 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে কবি 'ধনতন্ত্রের সংকট' বলেননি, 'ভারতের সংকট'কেই 'সভ্যতার সংকটে'র মধ্যমণি করেছিলেন'; তবে 'সাম্রাজ্যবাদে'র উল্লেখ লক্ষ করা যায়। 'ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ' হেতু সম্ভাব্য বিপন্নতা অনুভব করেছিলেন কবি। কুদ্দুসের বিশেষত্ব এই যে, এই সূত্রে তিনি লেখাটি শেষ করেছেন এভাবে—'রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর অন্তর্ভেদী দিব্যদৃষ্টিতে কি দেখতে পেয়েছিলেন ভারত তার খণ্ডিত চেতনার ফলে দ্বিখণ্ডিত হবে? ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তিন-তিনটি বড় ধরনের যুদ্ধ হবে? বাংলাদেশ ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে ৩০ লক্ষ বাঙালীকে প্রাণ দিতে হবে? লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর মর্মান্তিক কান্নায় ভারতমাতার বক্ষ বিদীর্ণ হবে? আর দুই দেশের স্ফীতকায় মিলিটারী বাজেটের চাপে অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্যের সমস্যা পিছনের সারিতে গিয়ে দাঁড়াবে? কবি তো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তাই রবীন্দ্রনাথকে সেদিন অত বিষণ্ণ করে তুলেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে-বিষবৃক্ষ সেদিন রোপণ করেছিল, আজ তা ভয়ংকর সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের পত্র-পল্লব ফুলফল নিয়ে অক্সিজেনের বদলে বিষবাষ্প উদ্গীরণ করে চলেছে।'

গোলাম কুদ্দুস 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অন্তত পনেরোটি কবিতা-গানের প্রথম ছত্রে প্রথম শব্দটি 'হৃদয়' লক্ষ করেছেন। যদুনাথ সরকার বিস্মিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে 'কী করে একজন মানুষ সারাটা জীবন নিজের হৃদয় নিয়ে এমনভাবে ব্যাপৃত থাকতে পারেন।' এই আলোচনায় কুদ্দুস যেমন জানিয়েছেন শলোকভের কথা, যিনি হৃদয়ের নির্দেশে লেখেন; তেমনি পশ্চিম ইউরোপের 'অবক্ষয়ী বিকারগ্রস্ত শিল্পসাহিত্য' এদেশে প্রভাব সৃষ্টি করলেও রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, 'সায়েন্সেই বল আর আর্টসে বল নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন; ইউরোপে সায়েন্সে সেটা পেয়েছে, সাহিত্যে পায় নি।' 'মোহমুক্ত অথচ আবেগযুক্ত হৃদয়' চাইলেও কুদ্দুস বোঝান, 'হৃদয়ের উপর দিয়ে তোলপাড় ঝড় বয়ে গেলে আশ্রয় খুঁজতে হয় নিরাসক্ত মনের কাছে।' রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন—'তরী এলো তীরে/পাখী এলো নীড়ে/শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় না কো'। এক্ষেত্রে কুদ্দুস বোঝাতে চান, রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই, 'লেখক আর পাঠকের হৃদয় যেখানে এসে মিলে যায়, সেখানেই বুঝি হৃদয় ক্ষণিক বিরাম পায়।'

'নজরুলের বিদ্রোহের স্বরূপ' সন্ধানে গোলাম কুদ্দুস যে সবটাই প্রচলিত কথা বলেছেন, তা নয়; নজরুল যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সামন্তবাদবিরোধী সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কবি ছিলেন, আর পাঁচজনের মতন তিনিও একমত। ভারতীয় বাস্তবতায় কবির বিদ্রোহ শুধু লিখনশিল্পে নয়, জীবনশিল্পেও প্রতিফলিত। 'ধূমকেতু' পত্রিকা সম্পাদনা ও রচনাসমূহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে আপত্তিকর ছিল। নজরুলের জীবনবীক্ষা সাম্রাজ্যবাদ-অনুমোদিত হতে পারে না। তাঁর বিদ্রোহী কবিমানস ও বিদ্রোহী সৃজনকর্মের মাশুল হিসাবে তাঁকে

জেলে যেতে হয়েছে। তাঁর ৩৯ দিনের অনশন ঐতিহাসিক ঘটনা। 'লাঙল' পরিচালনাতেও নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা প্রকাশ পেয়েছে। কবিতায় বারাঙ্গনাকে মা সম্বোধনেও কবির স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত। এসবই আমাদের অজানা নয়। কিন্তু কুদ্দুস প্রশ্ন তুলে বোঝাতে চেয়েছেন অন্য কথা, কোনো গবেষকের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন, 'সুভাষচন্দ্রের বিশ্ববীক্ষায় (World outlook) কিছু ত্রুটি ছিল এবং কমিউনিস্টদের জাতীয় বীক্ষায় (National outlook) কিছু অভাব ছিল, অন্যথায় ভারতের ইতিহাস অন্যরকম হত। এই ইঙ্গিত মারাত্মক। কিন্তু মিথ্যা কি? কমিউনিস্টদের সংখ্যা তখন ছিল মুষ্টিমেয়, নজরুলের পাশে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে অগ্রসর হলে কি তাঁরা পথের সাথীর সংখ্যা যথেষ্ট বাড়াতে পারতেন না? নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনায় উদ্দীপ্ত জনগণের পুরোভাগে এসে দাঁড়ানো কি একেবারেই অসম্ভব ছিল?' নজরুল নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর আপত্তি ছিল। তাঁর কাব্যে ফাঁকা আওয়াজ, স্থূল উচ্চারণকেই বুদ্ধদেব গুরুত্ব দিয়েছেন। কুদ্দুস তাঁর নাম বলেননি, বুদ্ধদেবের মতন এরকম অনেকেরই ধারণা ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে তাঁকে বুদ্ধদেব মৌলিক কবি বলতেও দ্বিধা বোধ করেননি। নজরুল-বিরোধী কবি ও সমালোচকদের বিরুদ্ধে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। কুদ্দুস এসব জানতেন। কিন্তু নজরুল যে তাঁর বিদ্রোহী সত্তা থেকে 'ন্যাচারাল ডায়ালেক্‌টিসিয়ান' হয়ে উঠেছিলেন এ ব্যাপারে কুদ্দুস দৃঢ়চিত্ত—তাঁর মৌলিক অভিমত এরকম—'এই ন্যাচারাল ডায়ালেকটিসিয়ানের হাতে যদি মার্কস-এঙ্গেলসের ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম এসে পৌঁছত, তাহলে যে কী যাদু মিলে যেত কল্পনা করা দুরূহ। লেনিনের ভাষায়, Dialectics is Algebra of Revolution অর্থাৎ ডায়ালেকটিস বিপ্লবের বীজগণিত। সেটা হাতের কাছে চিরবিপ্লবী নজরুল যে সহজেই আয়ত্ব করতে পারতেন এবং 'বিদ্রোহী'র চেয়ে মহত্তর কবিতাবলির জন্ম দিতে পারতেন সে সম্বন্ধে বর্তমান লেখকের সন্দেহ নেই।' শুধু তাই নয়, কুদ্দুস এও বুঝিয়েছেন, 'নজরুল যথাসময়ে বৈজ্ঞানিক ডায়ালেকটিক্সের সন্ধান পেলে আধ্যাত্মিকতার করাল গ্রাস থেকে ছাড়া পেয়ে স্থিতধী থাকতে পারতেন এবং চিরবিদ্রোহী পেতেন চিরমুক্তি।' তবে 'চেতন ও অর্ধচেতন মনে নজরুল' স্মৃতিময়তায় মেদুর সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী জনচেতনামুখী রচনা।

কুদ্দুস 'সোমেন চন্দ ও শ্রমিকশ্রেণী' আলোচনায় ব্যক্তিগত প্যাটার্নে নতুন ভাবনায় আমাদের আলোকিত করেছেন। সোমেন চন্দের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। কিন্তু তাঁর পরিচয় বারেবারে অন্য রেফারেন্সে ঘটেছে। লেনিন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-নির্মাতা শ্রমিকের ঐতিহাসিক ভূমিকাই মার্কসের তত্ত্বের মূল কথা ভেবেছিলেন, তা মেনে নিয়ে, মনে রেখে, কুদ্দুস যুগনায়ক শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ সোমেন চন্দকে বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন। রেল শ্রমিকদের সংগঠক সোমেনের রাজনৈতিক ফ্যাসিস্ট বিরোধী মিছিল পরিচালনাসূত্রে যে প্রাণ হারিয়েছিলেন, তা মনে রেখেছেন কুদ্দুস। এত অল্প বয়সে মৃত্যু যে-কোনো সংগ্রামী চিত্তকে আলোড়িত করবেই। কুদ্দুস জানিয়েছেন, ছত্রিশ বয়সে প্রয়াত পুশকিন সম্বন্ধে বৃদ্ধ টলস্টয় বলেছিলেন, 'তিনি

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ। এবং বিজ্ঞ।' এই সূত্রে কুদ্দুসের মন্তব্য, 'সোমেন চন্দ সম্বন্ধেও সে-কথা খাটে। টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথ শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা অনুধাবন করতে পারেননি, যুবক সোমেন চন্দ যদি তা পেরে থাকেন তাঁকে তাঁদের চেয়েও এক হিসাবে টলস্টয় কথিত 'বয়োবৃদ্ধ' বলা যায়।' এই সোমেন চন্দের সঙ্গে কুদ্দুসের প্রথম পরিচয় তাঁর মৃত্যুর পরে 'সমগ্র অন্তর দিয়ে, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে।' দ্বিতীয়বার তাঁর সঙ্গে প্রয়াত সোমেনের দেখা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘের সম্পাদক হওয়ার সূত্রে। এই পরিচয় ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটের সঙ্ঘের অফিসে সোমেনের নামাঙ্কিত লাইব্রেরি পরিপুষ্ট করে তোলার মধ্য দিয়ে, শুধু নাম দেখে নয়। তৃতীয়বার দেখা হয়েছে, 'বি টি রণদিভের হঠকারিতার শিকার হয়ে' ঢাকা রেল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে; তখনো তিনি সোমেনের ছবি দেখেননি। ভাষা-আন্দোলনের দু'বছর আগে ওই ঢাকাতেই, চতুর্থবার, নবীন লেখক শিল্পীদের সঙ্গে সভা করায়; সেখানেও লক্ষ করেছেন, কারও কারও মনে সোমেনের স্মৃতি অম্লান। একসময়, কুদ্দুসের ভাষায়, 'অসুস্থ রবীন্দ্র বিতর্কে তিনি জড়িয়ে পড়তে চাননি, কিন্তু সোমেনের আহ্বান তিনি শুনতে পেয়েছেন, 'শ্রমিকশ্রেণীর আত্মার আত্মীয়' নিয়ে লেখার কথা, ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' রচনার কথা। এ হল পঞ্চমবার পরিচয়। কুদ্দুস অকপট হয়েছেন এইভাবে রেলশ্রমিকদের অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ 'মরিয়ম' উপন্যাস লেখার কালে 'সোমেন চন্দের সঙ্গে দেখা হল ষষ্ঠ বার।' ১৯৯১-এর ডিসেম্বরে লেখা এই নিবন্ধে তিনি জানিয়েছেন, 'বর্তমানেও তাঁর শ্রমিক-দুর্গ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সপ্তম পর্বে তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ চলছে। সোমেন চন্দের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার এটাই বোধ হয় কঠিন পর্ব।' আদর্শগত কর্মকেন্দ্রিক জগতে, সোমেন ভাবাদর্শগত প্রেরণাই নয়, তাঁকে চেনার চেষ্টা তত্ত্বের ক্ষেত্রেই নয়, কাজের মধ্য দিয়েও, কুদ্দুসের সোমেন জিজ্ঞাসা এক্ষেত্রে ভিন্নমাত্রা পায়। সেইজন্য তিনি প্রথাভাঙা ব্যতিক্রমী এই লেখায় বলতে দ্বিধা করেননি, 'সোমেন চন্দ আমাদের প্রগতি লেখকদের কাছে রক্ত, অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস এবং প্রতিজ্ঞা। সেই সঙ্গে তিনি আমাদের কাছে শহীদের ডাকও—সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দৃঢ় থেকো, কমরেড। আশা করি, একদিন শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বজয়ের পর অষ্টমবার সোমেন চন্দের সঙ্গে দেখা হবে।' প্রবল প্রত্যয় থেকে উত্থিত এই উচ্চারণ কুদ্দুসের সফল হয়নি, তিনিও প্রয়াত হয়েছেন, তবে আমাদের আশা করতে ক্ষতি কী।

'সুকান্ত ও লেনিন'—দুজন ব্যক্তিত্বের তুলনামূলক আলোচনা নয়। সুকান্ত লিখেছিলেন, 'বিপ্লব-স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন।' কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের সুগভীর উপলব্ধি অর্জনের মধ্য দিয়ে, নিয়ত অনুশীলনে, মানবিক সমস্যা নিয়ে সাংগঠনিক কর্মপ্রবাহে নিয়োজিত থেকে ক্ষয়রোগাক্রান্ত সুকান্ত উজ্জীবনের গান গেয়েছেন, তেভাগা আন্দোলনে যুক্ত না থেকে মানসিক সাযুজ্যবোধ থেকেই লিখতে পেরেছেন—'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি।' লিখেছেন 'আঠারো বছর বয়স'। এ প্রবন্ধের বক্তব্য অভিনব না হলেও কুদ্দুস লেনিনের বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়ার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন, পুলিশ অফিসার লেনিনকে বলেছিল, 'What is the use of rebelling.

Youngman? Don't you see there is a wall before you?' লেনিনের উত্তর ছিল, 'Yes, but the wall is thoroughly rotten. Give it a good push and it will topple over.' কুদ্দুস মন্তব্য করেছেন, 'গোড়া থেকেই সুকান্তের কর্ম এবং সৃষ্টি এই প্রত্যয়সিদ্ধ জীবনদর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। আজ সুকান্ত বেঁচে থাকলে দ্বন্দ্ব-দীর্ণ পুঁজিবাদের দেওয়ালকে প্রচণ্ড ধাক্কা দেওয়ার কাজেই লিপ্ত থাকত।' নজরুল ইসলাম 'বিশ্বাসের শেষ কবি'—জীবনানন্দের এ কথা কুদ্দুস মানতে পারেননি। কেননা সুকান্ত আরও এক দীপ্যমান প্রত্যয়ের কবি। কুদ্দুসকে এক্ষেত্রে গোঁড়া বলা যাবে না। কেননা প্রবল বিশ্বাস থেকেই তাঁর উচ্চারণ ও প্রশ্ন—'রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের মহত্তর মানব-উত্তরণের বিশ্বাসের ধারা আজ বাংলা কাব্যের মূলস্রোতে প্রবাহিত। আজ মতাদর্শগত সংগ্রামের নিরন্তর প্রয়োজনে কি জনগণের সামনে সুকান্তের 'লেনিন' কবিতাটিকে পতাকার মতো তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য নয়?'

'যুগসন্ধিক্ষণ'-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'গোর্কির 'মা' ও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব'। ১৯০৭ সালে উপন্যাসটি প্রথম ইংরেজি ভাষায় আমেরিকায় প্রকাশিত হয়। গোর্কির জীবনকালেই ১২৭টি ভাষায় 'মা' অনূদিত হয়েছে। রুশ ভাষায় পূর্ণাঙ্গ পাঠ মেলে অক্টোবর বিপ্লবের পরে। 'মা' শতবর্ষের পূর্তিকালে গোর্কির মূল্যায়ন, 'মা'-এর মূল্যায়ন চলেছে। কুদ্দুস এর আগেই 'মা'কে নিজের মতন দেখেছেন, মার্ক্সীয় আলোকে। বিপ্লবী সাহিত্যের ইতিহাসেই নয়, বিশ্বসাহিত্যের নিরিখেই 'মা'-এর স্থান স্বতন্ত্র। জালোমভ ও তাঁর মা-ই আসলে প্যাভেল ও তাঁর মা। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্যাভেলের ক্রমান্বয়ে বিপ্লবী হয়ে ওঠা দেখতে দেখতে আন্দোলনের তাপ নিতে নিতে 'মা'-এর রূপান্তর ও উত্তরণও এই উপন্যাসের অন্যতম আধার। কুদ্দুস দেখিয়েছেন, এই উপন্যাসে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সম্পর্কিত স্তরপরম্পরা। বোঝাতে চেয়েছেন 'মা' জোলার 'জার্মিনাল' নয়। সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা অনুপস্থিত। 'গোর্কির মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণী বিশ্বসাহিত্যে এসে উপস্থিত হল।' ১৯০২-এর ঐতিহাসিক মিছিল, ১৯০৫-এর বিপ্লব গোর্কির অভিজ্ঞতায় ছিল। লেনিন কথিত 'A very timely book' 'মা' আখ্যানের স্বরূপসন্ধানে কুদ্দুস সরাসরি তত্ত্বগত প্রেক্ষিত বজায় রেখে বাস্তবতায় নিষিক্ত করে যা যা বলতে চেয়েছেন, তা সূত্রাকারে এরকম—১. 'মা' আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর হাতে শক্তিশালী অস্ত্র হয়েছে। 'মা' পড়ে হাজার হাজার মজুর বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়েছে। ২. গোর্কি যে লেনিনের শিক্ষা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন তার সব চাইতে বড় প্রমাণ 'মা'-র মধ্যেকার কৃষক চরিত্রগুলি ৩. যে আদর্শের জন্য 'মা'র চরিত্রগুলো লড়াই শুরু করেছিল তা 'মা' লেখার দশ বৎসর পরে সোভিয়েত বিপ্লবের মধ্যে বাস্তবে পরিণত হয়। ৪. 'মা' বইখানার মধ্যে বারেবারে বই পড়া, কাগজ পড়া এবং সত্যকে জানার চেষ্টার উল্লেখ আছে। বারেবারে প্যাভেল এবং অন্যান্য মজুররা বই পড়ছে, শিখছে এবং তর্ক করছে। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ফলে সাম্যবাদী চিন্তা যে আসে না সেটা বুঝতে হলে যে বই থেকে পড়ে বা শুনে শুনে থিয়োরি আয়ত্ত করতে হয়, মা'র মধ্যে বারে বারে সেটা চোখে আঙুল

দিয়ে গোর্কি দেখিয়েছেন। প্যাভেল সেই শ্রেণীর মজুর যাদের বলা হয় অগ্রগামী মজুর। ৫. প্যাভেল এবং তার কমরেডদের সংস্পর্শে এসে মা'ও পরিবর্তিত হতে শুরু করে। ৬. শহরের মজুরদের শ্রেণীসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ রাইবিন-এর মতো মজুর গ্রামে ছুটে গেছে। অতঃপর দেখানো হয়েছে কীভাবে এই স্বতঃস্ফূর্ততা মজুর শ্রেণীর নেতৃত্বে সাংগঠনিক রূপ নিতে থাকে। ৭. ছাত্রদের উপর মজুর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথাও গোর্কি কয়েক জায়গায় পরিষ্কার দেখিয়েছেন, শুধু আদর্শগত ভাবে নয়, শারীরিক ভাবেও। ৮. মধ্যবিত্ত মেয়েদের উপর মজুর শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্নও এসেছে। ৯. গোর্কি দেখিয়েছেন, মজুরের গণ আন্দোলনের পথ। ১০. গোর্কির 'মা'তেই আমরা পজিটিভ হিরোর মৃত্যুহীন চরিত্রের সন্ধান পাই। ...প্যাভেলের মা-ই বোধ হয় রুশিয়ার সর্বপ্রথম শ্রমিক জননী যে সন্তানের সাম্যবাদী পথে অগ্রসর হয়েছিল।

কুদ্দুস জানিয়েছেন, সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠাতা গোর্কি এবং স্তালিন। এই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার দৃষ্টান্ত 'মা'। গোর্কির প্রবন্ধটি লেখার পরে কিছুকাল অতিক্রান্ত। এখন 'মা'-শতবর্ষে যা বুঝি তা অনেক আগেই কুদ্দুস বুঝিয়েছিলেন, গোর্কি চর্চার প্রয়োজনীয়তা কতখানি।

গোলাম কুদ্দুস বিচিত্র বিষয়ের প্রতি মনোযোগী; সমাজ-সংস্কৃতি জিজ্ঞাসার বৈচিত্র্য তাঁর 'যুগসন্ধিক্ষণ'-এর বিশিষ্টতা। 'রামের বিপ্লবী চরিত্র পুনরুদ্ধার' প্রসঙ্গে রামভক্তদের উপদ্রবকে ধিক্কার জানিয়েই তিনি বলেছেন, 'রামচন্দ্রই ভারতেতিহাসের প্রথম পুরুষ যিনি ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, আর্য-অনার্যের মিলন ঘটিয়ে সমগ্র ভারতকে ঐক্যসূত্রে বেঁধেছিলেন। আর আজ রামের নামেই সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-ব্যবচ্ছেদের বিষ ছড়ানো হচ্ছে। একে রামের অপমান ছাড়া কি বলব?' রামের অত্যুজ্জ্বল বিপ্লবী চরিত্র তুলে ধরতে কুদ্দুস আশ্রয় নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস ধারা' প্রবন্ধটির। শেষত পৌঁছেছেন রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যমন্ত্র উচ্চারণে, যা অনেকের পছন্দ নয়; বিশেষত, কুদ্দুসের মতে, 'রাম-ঐতিহ্যগত ভারতের ঐক্যের প্রকৃতির যারা বিরুদ্ধবাদী তাদের এটা পছন্দ নয়। তারা পুরাতন সমাজের ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে সাবেকী স্বার্থ, বিধিবিধান এবং পুরোহিতদের গোঁড়ামি টিকিয়ে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের পরিহাস এই যে, মুখে তাদের রামনাম। কিন্তু এ রাম রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' নন। তারা হিন্দুত্বের আওয়াজও তুলছে। সেটা বশিষ্ট-ভৃগু-পরশুরামের হিন্দুত্ব, না, জনক-বিশ্বামিত্র-রামের হিন্দুত্ব?' পৌরাণিক প্রমাণের আলোকে, বিশ্লেষণের নিক্তিতে, কুদ্দুস সমকালীন সংকটকে মূল্যায়ণের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন।

'নৈতিক মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্য' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে কুদ্দুসের অধ্যয়ন-বিশ্লেষণ শক্তি-অনুধাবন ক্ষমতা সুস্পষ্ট হয়েছে। তিনি 'মূল্যবোধের শ্রেণী-উৎস', 'মূল্যবোধের মুখোস', 'মুখোস-উন্মোচন' 'মূল্যবোধের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি', 'সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল্য ও সীমাবদ্ধতা' 'যে গুলি অম্লান ঐতিহ্য'—৬টি উপশিরোনামে চিহ্নিত করেছেন। কোনো কেতাবী প্রকরণে এ আলোচনাকে কুদ্দুস এগিয়ে নিয়ে যাননি। কিন্তু মজবুত তত্ত্বগত ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তাঁর

বক্তব্য—'নৈতিক মূল্যবোধের পরাকাষ্ঠা রূপে দেখা দিল—বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, যার ভিত্তি হচ্ছে উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব দেখিয়ে দিল মনগড়া পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই, উদ্বৃত্ত মূল্যের সঙ্গেই ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে তার বজ্রমুষ্ঠি থেকে নিষ্কৃতির উপায়। সেই উপায় শ্রেণীসংগ্রাম, যা উদ্বৃত্তমূল্য থেকেই উত্থিত, বাইরে থেকে আমদানি করা কোনো বস্তু নয়। যতক্ষণ উদ্বৃত্ত মূল্য থাকবে ততক্ষণ থাকবে শ্রেণীসংগ্রাম। ঠিক কায়ার সঙ্গে ছায়ার মত। তবে এ ছায়া একদিন কায়াকে পরাস্ত করবে।' কুদ্দুস অপরিসীম প্রত্যাশা নিয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন, 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও মুক্ত-শ্রমের জন্য চাই উদ্বৃত্ত মূল্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামই পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেষ্ঠ নৈতিক মূল্যবোধের পরিচায়ক। আর উদ্বৃত্ত মূল্যের পূর্ণ অবলুপ্তি দ্বারা সমাজতন্ত্রে উত্তরণ নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা।'

শ্রেণী সমাজে 'সংবাদপত্রের দুই জগৎ' অনিবার্য ঘটনা। একই ভাবে 'ধনতন্ত্র ও গ্রন্থাগার আন্দোলন'-এ সম্বন্ধ ও দূরত্ব, আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সমাজমুক্তির যোদ্ধাদের কাছে, এই বিশেষ পর্যায়ে, অনস্বীকার্য। কিংবা 'বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তেভাগা সংগ্রাম'-এর তাৎপর্য অনুধাবনও জরুরি। গোলাম কুদ্দুস ব্যাপক গভীর আলোচনার কেন্দ্রে রেখেই 'যুগসন্ধিক্ষণ'-এ উপস্থাপিত করেন 'আমার গোপালদা' 'সুধীদা'র সঙ্গে 'একত্রবাস' 'সেই দূরদর্শী ঐতিহাসিকের কথা' 'হৃদয়বান মুজফ্ফর আহমদ' 'সাংবাদিকের সঙ্গী' 'বিনয় চৌধুরীর 'সমাজচিন্তা' 'বরণীয় পরাজয়' ইত্যাদি। এসবই তাঁর ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ-স্মৃতিচারণা-অভিজ্ঞতার বিবরণ। বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দেননি, অপরিমেয় শ্রদ্ধা বজায় রেখেই আপন মতামতে স্থিত থেকেছেন। এই লেখাগুলি শুধু ব্যক্তির কথা বলে না, সময়ের কথা বলে, ব্যক্তি স্বভাব ও সমাজ সম্পর্ক নিয়েও কথা বলে।

কবি কিংবা কথাকার গোলাম কুদ্দুস বক্তব্যকে গদ্যশৈলীতে যুক্তি-শৃঙ্খলা ও বোধের প্রত্যক্ষ উদ্ভাস নিয়েই মুজফ্ফর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত 'যুগসন্ধিক্ষণ'-এ চিন্তাজীবী মননজীবী সত্তাকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। এমন হতে পারে, তিনি যেসব স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা এখন আপাত অর্থে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু সমগ্র কুদ্দুসচর্চায় এও অতীব সত্য যে, সমাজ-রাজনীতি-সমস্যা-সংগ্রাম-সংস্কৃতি তথা দেশকালের নিরিখে যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তার মৃত্যু হয়নি। বিশ্বায়নশাসিত সময়কালে সেই অপরিপূরিত বহু স্বপ্নের পূরণে চারপাশে লড়াই চলছে।

আমার মেসোমশাই গোলাম কুদ্দুস

শীতাংশু সান্যাল

আজ ৩১-এ জানুয়ারি, ২০০৭, সুদূর লন্ডন থেকে এল দূরভাষ-সম্ভাষণ—''বাবা মিটিং থেকে বেরিয়ে এসে বলছি—তুমি যেমন করে হোক ছোড় দাদুর বিষয়ে কিছু লেখো''। আমার পুত্র শ্রীমান প্রেমাংশুর ফোন। ওর বড়ই সময়াভাব।

ইতোমধ্যে দুদিন কেটে গেল। ভাবছি, যে মানুষটিকে দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনে নিত্য দেখেছি ঘনিষ্ঠভাবে আজ তাঁরই ব্যক্তিত্ব এত বিশাল হয়ে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছে যে, এত কাছ থেকে অত বড় মানুষের সমগ্রটা দেখাই অসম্ভব। তাই খণ্ড-বিচ্ছিন্নভাবে যেটুকু সাধ্য বলার চেষ্টা করছি। গোটা ব্যক্তিত্বের কিছুটা আভাস হয়তো মিলবে এতে। তবে মূলে যাবার আগে গৌরচন্দ্রিকার কিছুটা প্রয়োজন আছে।

আমাদের অতি রক্ষণশীল পরিবারে আমার দাদামশাই ছিলেন একমাত্র উদারচেতা। তিনি ছিলেন গভর্নরের পি-এ, তাই বাড়িতে হোম সেক্রেটারি আইরিশ সাহেব ডায়াস-এর ঘনঘন যাতায়াত ছিল, এবং তাঁর মেমসাহেব এবং মেয়েরাও একবার এসেছিল বাড়িতে। ডায়াস সাহেব আসতেন দাদুর কাছে চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিখতে। কিন্তু দিদা ছিলেন অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী। মেমসাহেবরা অন্তঃপুরে যাওয়ায় তাদের প্রস্থানের পর জায়গাটা গঙ্গাজলে ধৌত হয়।

যাই হোক্, কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসের উপরতলায় ছিল National Van Guard-এর অফিস। সেখানে আমি আর আমার বাল্যবন্ধু গুটি (পরবর্তীকালে ড. রবীন্দ্র গুপ্ত প্রয়াত), শিবনারায়ণ রায় মহাশয়ের সঙ্গে তৎকালীন ঘটমান রাজনৈতিক বিষয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক করে নীচে নেমে কফি হাউসে ঢুকতেই দূরে দেখি একদল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তার মধ্যে চিনতে পারি হেনা মৈত্র, আমার ছোটো মাসিমা, গোলাম কুদ্দুস আর শোভা সেনকে। তখন কফি হাউসের উল্টোদিকে প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিং-এর গায়ে ছিল বহু পুরনো বইপত্রের দোকান। ওখানে দাঁড়িয়ে বই ঘাটাঘাটি করছি এমন সময় পিঠে কার স্পর্শ। দেখি গোলাম কুদ্দুস মশাই। উনি বললেন ''বাবু, দেখো তো এটা চিনতে পারো কিনা?'' দেখলাম একখণ্ড ভাঁজ করা কাগজ, খুলে দেখি মাস সাতেক আগে ছোটোমাসির সঙ্গে বাজী ধরে লেখা আমারই একটা ইংরেজি কবিতা। বললেন তোমার 'ছোটো' এটা আমাকে দিয়েছে। মাসি আমার থেকে ছয় বছরের মতো বড় ছিলেন। আমি কোনোদিন তাকে ছোটোমাসি বলে ডাকিনি। বলতাম 'ছোটো'।

এই রক্ষণশীল পরিবারে ২০/১০ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিটের বাড়িতে গোলাম কুদ্দুসকে প্রথম দেখি এর চার বছর পর ১৯৪৯-এ রোগাক্রান্তা সহপাঠিনীর রোগশয্যাপার্শ্বে। ছোটো তখন রিউম্যাটিক আর্থ্রাইটিসে ভুগছিল। আগে থেকেই ঘরে জনাতিনেক সতীর্থ উপস্থিত ছিলেন—শেষে এলেন দুজন, একজন গোলাম কুদ্দুস ও অন্যজন বোধহয় শোভাদি (শোভা

সেন)। এরপর কুদ্দুস সাহেব আর কোনোদিন এ বাড়িতে আসবেন না বলে স্থির করেন; কারণ ওঁকে যে জায়গায় জলযোগ করতে দেওয়া হয়েছিল সেইসব জায়গা আমার দিদা গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ করেন ওর প্রস্থানের পর।

এই সময় 'ছোটো'র বিয়ে দেবার জন্যে দিদা ও পরিবারের লোকজন ব্যস্ত হয়ে উঠে আমার মেজো মাসিমার দেবরের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করেন। তিনি দিল্লির সেক্রেটারিয়েটে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু ছোট গোপনে হবু পাত্রের সঙ্গে দেখা করে গোলাম কুদ্দুস-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা জানাতে পরের দিনই তিনি দিল্লি ফিরে যান।

ইতোমধ্যে গঙ্গা দিয়ে বহু জল বয়ে গেছে। ডেকার্স লেনে স্বাধীনতা পত্রিকার বাড়িতে ভাঙাচোরা গ্যালির কম্পোজিং ঘরে অনধিকার প্রবেশ করে এক সকালে পুলিশ অফিসারের জেরার মুখে পড়তে হয়। গোলাম কুদ্দুস, সোমনাথ লাহিড়ী ও অন্যান্য সকলেই তখন আত্মগোপন করেছেন। আশ্রয়ের কোনো ঠিক নেই। ঘনঘন স্থান পরিবর্তন করে কোনোক্রমে টিকে থাকা। অবশেষে বেশ কিছুদিন পর দেশভাগের সময়ে উচ্চপদস্থ ব্যাঙ্ক কর্মচারী ওর বন্ধু স্থায়ীভাবে পাকিস্তানে চলে যাওয়ার সময় ২৭/১ আহিরীপুকুর ফার্স্ট লেনের সম্পূর্ণ দোতলাটা গোলাম কুদ্দুসের জিম্মায় ছেড়ে দেন। এইবার একটা আশ্রয় মিলল।

এর মধ্যে River Steam Nanigation-এর বাংলা-আসাম জোড়া একচেটিয়া কারবার ও নৌ-কর্মীদের উপর অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদে মাঝরাত্রে সারাদেশ জোড়া হরতাল, গোলাম কুদ্দুসের ঢাকার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিকে একত্রিত করার জন্যে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে পার্টির নির্দেশে ঢাকা গমন ও অকস্মাৎ পার্টির ফরমানেই আবার কলকাতা আগমন ও পরিচয় পত্রিকার ভার নেওয়া। বলতে ভুলেছি এর বেশ কয়েক বছর আগে অসুস্থ নজরুলের হঠাৎ মৃত্যুর গুজবে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের দোতলায় পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী প্রমীলাদেবী ও খাটের উপর সম্পূর্ণ কারারুদ্ধ নজরুলের দর্শন ও গোলাম কুদ্দুস ও আমার তরফে তাঁদের যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা ইত্যাদি ঘটনাগুলি ঘটে গেছে।

আবার হঠাৎ দেখা হল ১৯৬৪ সালে দাঙ্গার সময়। তখন আমরা শ্যামবাজারে থাকি। বাবা গত হয়েছেন ১৯৬২ সালে। বাড়ি ফিরে দেখি ছোটো নেই। উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলরাম ঘোষ স্ট্রিট ও কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিটের মোড়ে ঘুরছি। হঠাৎ একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। তার থেকে গোলাম কুদ্দুস ও ছোটো বেরিয়ে এল; ছোটো সোজা বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল আমার সঙ্গে। তখন সন্ধে। পরে শুনেছি সেই রাত্রে শ্যামবাজার থেকে সুদূর দক্ষিণে পদব্রজে বহু গলিঘুঁজি অতিক্রম করে গোলাম কুদ্দুস সেদিন তাঁর কার্ফু-কবলিত বাসস্থানে যেতে পারেননি। কিছুক্ষণ মিন্টোপার্কের বেঞ্চিতে কাটিয়ে মাইল তিনেক দূরে পাঠভবনের প্রতিষ্ঠাত্রী 'উমাদি'র স্বামীগৃহে উপস্থিত হয়ে রাত্রিযাপন করেন। ওখানেই পরের দিন শান্তিমিছিল করা স্থির হয়; তার আগেই অবশ্য দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে ও রাত্রের মধ্যেই সম্পূর্ণ কলাবাগান বস্তি ভস্ম হয়ে যায়।

একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেছি। বিধান রায়ের পুলিশের নোংরা নজর থেকে বাঁচার জন্য ছোটো কলকাতা ছেড়ে মফস্‌সলের এক কলেজে চাকরি নিয়ে চলে

গেছে। অধ্যাপিকারা একত্রে মেসে থাকেন। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন শান্তিসুধা ঘোষ। বিধান রায়ের পুলিশ হঠাৎ প্রিন্সিপালের ঘরে গিয়ে গোলাম কুদ্দুসের লেখা একটি সেন্সারড্ চিঠি দেখিয়ে সেই মুহূর্তেই অধ্যাপিকা হেনা মৈত্রকে বরখাস্তের দাবি জানায়। কিন্তু বরিশালের সতীন সেনের শিষ্যা সেই ঋজু মহিলার প্রচণ্ড দাপটে হতোদ্যম হয়ে ফিরে যায়। তিনি বিধান রায়কে ফোন করে বলেন এসব না করে বরং পূর্ব পাকিস্তানের জেলে বন্দি অনশনরত সতীন সেনের অনশনভঙ্গের সনির্বন্ধ অনুরোধের চিঠি লিখে যেন কিছুটা বন্ধুকৃত্য করেন। এই ঘটনার সুদূরপ্রসারী ফল হল বেশ কিছু বিদ্বিষ্ট অধ্যাপিকার মেস পরিত্যাগ এবং বাড়িতে দিদার উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা। ছোটোকে দিদা বলেন ঘর বাঁধতে। সংসার ত্যাগ করে দিদা কাশী যাওয়া মনস্থ করেন ও সংসার থেকে এক কপর্দকও নিতে অস্বীকার করেন। ফলে সব ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যায়।

এরপর ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার দিদা ও জুলাই মাসে আমার মা গত হন। পারিবারিকভাবে স্থির হল আমি, বড়দি ও আমার পুত্রকন্যা শ্যামবাজারের বাড়ি ছেড়ে বরাহনগরে বাসা বাঁধব, আর ছোটো ও গোলাম কুদ্দুস আহিরীপুকুরে বিবাহিত জীবন কাটাবেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৭০—এই দীর্ঘ ২৭ বছরের প্রতীক্ষার অবসান হল এইভাবে। এই উপলক্ষ্যে এখন মেসোমশাই গোলাম কুদ্দুস ও ছোটোর সঙ্গে আমরা শ্যামবাজারের মোড়ে ব্যারণ রেস্টুরেন্টে খাওয়াদাওয়া করি।

আহিরীপুকুরের বাসায় গিয়ে ছোটোমাসিমা ও মেসোমশাই প্রতিদিন ওখানকার বস্তি অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের সপ্তাহে তিনদিন করে পড়াতে যেতেন। আমার ছেলে ও মেয়ে প্রতি সপ্তাহে শনি ও রবিবার ওদের বাড়িতে থাকত ও লেখাপড়া করত। ছোটো তখন বাসন্তী দেবী কলেজের অ্যাক্টিং প্রিন্সিপালের পদ ত্যাগ করে উইমেন্স কলেজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। এই সময় কলেজ ও হেড এগজামিনারশিপের সব দায়িত্ব পালন করেও বাসায় ও বস্তিতে লেখাপড়া শেখানোয় কোনো ছেদ পড়েনি ওঁদের।

ওঁদের যুগল জীবনের প্রারম্ভে কিছুদিন উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই একটু দূরত্ব বজায় রেখে ওঁদের যাচাই করত, কিন্তু সহজ-সরলভাবে মিশে যাওয়ায় সে দূরত্ব অচিরেই লোপ পায়। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই ওঁদের নিজের লোক হিসেবেই গ্রহণ করে।

এই যুগলযাত্রা শুরুর ২৫ বছর পর ১৯৯৬ সালে এল চিরবিচ্ছেদ। হেনা মৈত্রর দেহাবসান হল ৪ঠা মার্চ। ধর্মনিরপেক্ষ গোলাম কুদ্দুস স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর মুখাগ্নি ও হিন্দুমতে শ্মশানে সৎকারের চেষ্টায় অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হন। কিন্তু বহু চেষ্টার পর নিজে কেওড়াতলা শ্মশানে উপস্থিত থেকে তাঁর নাতিকে দিয়ে মুখাগ্নি ও সৎকার কার্য সম্পন্ন করেন।

এবার শুরু হয় তাঁর একাকী পথচলা। বাসস্থানটিকে উনি স্মৃতিমন্দির হিসেবে দেখতে শুরু করেন। ওঁর একাকীত্ব ও বিষণ্ণতায় কাতর হৃদয়কে সকলের কাছ থেকে আড়াল করে রেখে পার্টির ক্রিয়াকলাপ, সভা-সমিতি ও দৈনন্দিন লেখালেখির কাজ সমানে চালিয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি ওঁর প্রিয় নাতি প্রেমাংশুর বাড়িতে নিয়ে এলেও সকাল থেকে সন্ধ্যার

বেশি থাকতেন না। এইসময় ড. বিমল বাগচীর দেহান্তরের পরে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। ওনার বাড়ির বিপরীতের লাল বাড়িতে থাকতেন ড. ভট্টাচার্য, যাঁর ডিসপেন্সারি ছিল আহিরীপুকুর গলির মোড়ে। উনি ব্লাডপেশার দেখাতে ওনার চেম্বারে যাওয়ায় ওঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়, ডাক্তারের ঘোর কমিউনিস্ট চিন্তাধারা-বিরোধী মন্তব্যের জবাবে মেসোমশাই ধীরস্থিরভাবে যুক্তি ও উদাহরণ সহযোগে সুনিপুণভাবে ওঁর মতামত খণ্ডন করতেন। অদ্ভুত পরিবর্তন হয় ডাক্তারের, এবং মেসোমশাই অসুস্থ হলেই উনি দেখতে ছুটে আসতেন আর একটা চুক্তি করে নিয়েছিলেন, যতদিন ডাক্তার বাঁচবেন ততদিন মেসোমশাইয়ের চিকিৎসা উনিই করবেন বন্ধুর মতো, কোনো পারিশ্রমিক না নিয়ে।

এরপর ২০০০ সাল পর্যন্ত আমার নাতিকে সাউথপয়েন্ট স্কুলে দিয়ে সারা দ্বিপ্রহর আমার কাটত ওঁরই সঙ্গে ওঁর বাসায়। এই ঘনিষ্ঠ আলাপেই উনি আমার সঙ্গে ওর ফেলে আসা দিনগুলির বহু ঘটনা উন্মোচিত করে দিতেন। এই ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের আলাপেই জানতে পারি কুষ্ঠিয়ার কালীগঙ্গা নদী, ওঁর ছোটোবেলার স্কুল হরিনারায়ণপুর বিদ্যালয়, পদ্মাপারে সাজাদপুরের পিসের বাড়ির কথা, যা আমাদের পাবনার চলনবিলের কাছেই ছিল। ছাত্রবন্ধু মুজিবর রহমানের (পরবর্তী বঙ্গবন্ধু) নতুন পূর্ব পাকিস্তান গঠনের জন্য ওপারে যাওয়ার ডাক, পূর্ব পাকিস্তানের ডাইরেক্টর অব এডুকেশন পদে যোগদানের আহ্বান, মুজফ্ফর সাহেবের নেতৃত্বে গোবরা কবরস্থানে আব্দুল হালিম সাহেবের শবানুগমন, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের বাগবাজারগামী নতুন রাস্তার দাপটে গিরিশ ঘোষের বাড়ি ভাঙার উদ্যোগের প্রতিবাদে 'স্বাধীনতা' পত্রিকা অফিসে গিয়ে জাভেদ আলী সাহেবের উচ্চণ্ড প্রতিবাদ, তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের (যিনি ওঁর মেসোমশাই ছিলেন) অধ্যাপক পদে যোগদানের আহ্বান ইত্যাদি আরও নানাবিধ বিষয়।

আমার চিরকাল এই আক্ষেপ থেকে যাবে এই বৃদ্ধ বয়সে সুদূর দিল্লিতে থাকার কারণে আমি তাঁর শেষ সময়ে উপস্থিত থাকতে পারিনি, তবুও সান্ত্বনা এই আমার পুত্র শ্রীমান প্রেমাংশু শত কাজ সত্ত্বেও তার দাদুর শেষ সময়ের কাজ করতে পেরেছিল।

অনুলেখিকা—নাতবৌ রুমা সান্যাল

'লাখে না মিলয়ে এক' কবি গোলাম কুদ্দুস

নন্দগোপাল ভট্টাচার্য

কবি গোলাম কুদ্দুস আমাদের মধ্যে নেই। গোলাম কুদ্দুসকে কবি বললেও শুধু কবি মাত্রই তিনি ছিলেন না, তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক সাংবাদিক এবং একজন একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট পার্টি সদস্য। নিঃসন্দেহে বাংলার সংস্কৃতি জগৎ একজন অত্যন্ত সচেতন প্রাজ্ঞ ও হৃদয়বান অভিভাবক হারালো।

কুদ্দুসদার স্ত্রী হেনাদি, অধ্যাপিকা হেনা মৈত্রের মৃত্যুর পর কুদ্দুসদা একাই হয়ে গিয়েছিলেন। একা থাকতেন এবং সর্বদাই গভীর জ্ঞানচর্চায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন। শরীর বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে অশক্ত হয়ে পড়ছিল, কিন্তু এক তীব্র সচেতন মনস্কতা, ধীশক্তি ও দেশীয় কি বিদেশীয় পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে গভীর অনুধ্যান—এসবে বয়স কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি।

সোভিয়েতের বিপর্যয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, বিশ্বায়ন প্রভৃতি নিয়ে নিজের নির্জনতার মধ্যেই সর্বদা নজর রাখা, পড়াশুনা করা এবং অশক্ত দেহ হলেও একজন সৈনিকের মতো সংগ্রাম করার মনোভাবে কুদ্দুসদা থাকতেন। তিনি মনে করতেন না তিনি কখনো যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়েছেন।

কুদ্দুসদার মৃত্যুতে আমার মনে পড়ছে কডওয়েলের ঝাঁঝরা হওয়া বুকে স্পেনের গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় 'নো পাসারনের' চালচিত্রে যে মৃত্যু ঘটেছিল তার কথা। রক্তাক্ত তেভাগার খাঁপুর, চিত্তরঞ্জনের দীপ্ত শ্রমিকের পদযাত্রা, তারপর অসংখ্য সংগ্রাম যে শ্রেণীসচেতনতার যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করেছিল তার একজন যোগ্য অংশীদার রূপে কুদ্দুসদারও সেইরকম যেন মৃত্যু হল।

কডওয়েলের 'The Art of Dying' মনে পড়ছে—

> Is it not time to study how to die
> Against the time Deaths mystry we ply.

সত্যই প্রায় নিঃশব্দে কুদ্দুসদা চলে গেলেন। 'স্মরণীয় শতক'-এর আগমনী বা 'অনির্বচনীয় স্বপ্ন' দেখতে দেখতেই 'লাখো না মিলয়ে এক' সাহিত্যের ভিক্ষু খাঁপুরের ভিক্ষুর সঙ্গে পুনরায় মোলাকাতটা ঝালিয়ে নিতেই চলে গেলেন।

কুদ্দুসদা কি সাহিত্য সমালোচকদের আনুকূল্য পেয়েছিলেন? মোটেও পাননি। অজস্র পাঠকদের, সাহিত্য অনুরাগীদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে যে মানুষেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে—তাদের ভালোবাসা পেয়েছিলেন। অবশ্য যে সাহিত্য সমালোচকদের গোর্কি বলেছেন—'ফুলবপুদের সঙ্গীত' ছড়াতে চায় চিন্তা চেতনায়, তাদের আনুকূল্য কুদ্দুসদা কখনো পাননি।

গোলাম কুদ্দুস সম্বন্ধে এক লাইন লিখতে গেলেও জর্জ টমসনের মতোই লিখতে হবে—He lived and died a communist। আর এজন্যই কুদ্দুসদা আমার এত প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন। আমি জানি, বেকবাগানের ভাবা যায় না এমন অনাড়ম্বর পরিবেশে

একদম একা (কারণ পূর্বেই হেনাদি মারা গেছেন) কুদ্দুসদা থাকতেন। এলাকার মানুষজনের সঙ্গে ছিল কুদ্দুসদার আত্মীয়তার সম্পর্ক ও বন্ধন। সকাল ও বিকাল কেউ তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেই দেখতে পেতেন—ঘরে টেবিলের উপর একটা থালায় মুড়ি, পেঁয়াজ ও লঙ্কা আর ঘিরে বসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বই নিয়ে মুড়ি খাচ্ছে আর কুদ্দুসদার কাছে পড়া দিচ্ছে বা পড়া বুঝে নিচ্ছে। হাত বাড়িয়ে কুদ্দুসদা ও সবাই থালা থেকে মুড়ি, পেঁয়াজ খাচ্ছে। সত্যই চিরদিনই সেই সবার সাথে পদযাত্রা ছিল কুদ্দুসদার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যার শুরু দিনাজপুরের কৃষকদের বা চিত্তরঞ্জনের শ্রমিকদের সঙ্গে।

বিষাদগ্রস্ত দিনগুলোও আছে। যখন মনে হয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্য সব লোপ পেতে চলেছে। সেরকম একটি দিনের কথা মনে পড়েছে। বেনারস গিয়েছি বহু বছর আগে। পথ চলতে চলতেই হঠাৎ কুদ্দুসদাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠি—'কুদ্দুসদা', 'কুদ্দুসদা'। তারপর কাছে যেতেই মুখে আঙুল দিয়ে ইশারা করে কুদ্দুসদা আমাকে একদম চুপ করে যেতে বললেন। বললেন হিন্দু ছদ্মনামে রয়েছেন। ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতি রয়েছে।

শুনে জগৎ যেন আমার মাথার উপর ভেঙে পড়ল। কুদ্দুসদা কীরকম অসাম্প্রদায়িক, সম্প্রীতির জন্য নিবেদিত প্রাণ আমরা সবাই জানি। তাঁর এই অবস্থা। দেশটা কি এক মর্মান্তিক পথে হাঁটছে। হায়রে। আমরা জানি পৃথিবীর সব মূল ধর্মগুলোই মানুষজনের ক্ষোভ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভিতর থেকেই জন্মগ্রহণ করেছে। মানুষ যে লড়বে, ধর্মই অসহায় মানুষকে সাহস দিয়েছে। ধর্ম কি জীবনবোধের কথা বলেনি, বলেনি আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা? কিন্তু ধর্মকে হননের, বিভেদের, রাজনীতির, ক্ষমতার রাজধর্ম করে মানুষের চরিত্র যে পাশবিকতা অর্জন করেছে তার হিংস্র মুখ শত লড়াইয়ের মানুষটিকেও বারেক হলেও থমকে দিয়েছে।

ছাত্র হিসাবে কুদ্দুস খুবই ভাল ছাত্র ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাস নিয়ে ভর্তি হন। স্নাতক হওয়ার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ ইতিহাসে খুবই উঁচু ধরনের মান নিয়ে পাশ করেন। মুজিবর রহমান ছিলেন তাঁর সহপাঠী। সেই কুষ্টিয়া জেলার ধলনগর গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল যে বালক, ছিল চারভাই চারবোনের মধ্যে বড়, আইনজীবী বাবার ছেলে—সেই ছেলেই কলকাতার পরিবেশে, দেশের পরিস্থিতিতে নিজের ইতিহাস চেতনায় আদ্যোপান্ত এক সাচ্চা কমিউনিস্ট পার্টির খোদ সদস্যই হয়ে গেল। এবং শুধু এই নয়, এম.এ পাশের দিনই পার্টি নেতাদের বললেন 'আমাকে হোলটাইমার করে নিন'।

পার্টি কুদ্দুসদাকে পূর্ব পাকিস্তানে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনের জন্য পাঠালেও, পুনরায় কলকাতায় নিয়ে এসে সরোজ দত্তের সাথে পরিচয় পত্রিকায় কাজ করতে বলে। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা স্বাধীনতায় সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন। সেদিনের স্বাধীনতায় গ্রাম ও শহরের, কৃষি ও শিল্পাঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষের জীবনকথা, তাদের সংগ্রামের কথা লেখা হত। অন্যদের মতো তিনিও সংবাদ লেখা ও 'রিপোর্তাজ'এ এই

কাজই করতেন। তাঁর লেখা 'একসঙ্গে' এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'রিপোর্টাজ'। চিত্তরঞ্জন থেকে শ্রমিকরা তাঁদের সংগ্রামের অন্যতম রূপ পদযাত্রায় অংশ নেন। কুদ্দুসদা এই দীর্ঘ পদযাত্রায় তাঁদের সঙ্গে হাঁটেন। এর ফলে সংগ্রামী মানুষেরা পান কুদ্দুসদার কলম থেকে বের হয়ে আসা এক জীবন্ত মর্মস্পর্শী রিপোর্টার্জ 'একসঙ্গে'।

১৯৪৭ সালের ২৭ মার্চ 'পার্টি সংগঠক'-এ 'পার্টির সাহিত্যিকদের প্রতি আবেদন' শিরোনামে একটি ঘোষণা প্রকাশিত হয়। এই আবেদনে পার্টির সাহিত্যিক ও শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশ্যে ডাক দেওয়া হয় যে তাঁরা যেন গ্রামে গঞ্জে ঘুরে মানুষের লড়াই-সংগ্রাম ও জীবনযাপনের বাস্তব চিত্র সাহিত্যে তুলে ধরেন। এই ডাকের ফলে আমরা দেখি সোমনাথ হোড়ের মতো চিত্রশিল্পী, পূর্ণেন্দু পত্রী সুভাষ মুখোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুসেরা ঘুরে বেড়িয়েছেন গোটা বাংলা। তাঁদের চিত্রে কাব্যে রিপোর্টাজে ফুটে উঠেছে তেভাগার দাবিতে বাংলার ভাগচাষিদের সংগ্রাম ও আন্দোলনের ধারা।

বাংলার সাহিত্য ও সংগ্রামের অঙ্গনে যুক্ত হয়েছে পূর্ণেন্দুশেখর পত্রীর রিপোর্টাজ 'অন্যগ্রাম-অন্যপ্রাণ', কবি-সাংবাদিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'আমার বাংলা', এবং সোমনাথ হোড়-এর 'দিনলিপি'। খুলনা জেলার মৌভোগ অঞ্চলে প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্মেলনে তেভাগা আন্দোলন করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ উপলক্ষ্যে কবি বিষ্ণু দের কবিতা 'মৌভাগ'—

> 'নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে
> তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তলোয়ার
> লাল তিলকে ললাট রাঙা উষার রক্তরাগে
> —কার এসেছে কাল।'

বা কবি রাম বসুর লেখা—

> 'আজ আমি আবার একবুক শস্যের ভিতর দিয়ে যাই।
> এই খেত এই গ্রাম
> আমার পাঁজরের মতো আপনার।'

বা কবি মণীন্দ্র রায়ের 'সুনন্দপুরের কাব্য'—

> 'মানে না দুর্ভিক্ষ তারা, জানে নাকো মড়কের ভীতি
> চুরাশী চাষীর ঘরে কৃষাণ সমিতি
> দিয়ে গেল ডাক।'

এই সংগ্রামের বুক থেকে উঠে এসেছে সলিল চৌধুরীর 'হেই সামালো' কিংবা বিনয় রায়ের 'অহল্যা মা' নামে গান বা চন্দনপিড়ির বুক থেকে উঠে আসা সলিল চৌধুরীর 'শপথ'। এছাড়া আবু ইসহাক, সৌরি ঘটক, সুশীল জানা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির সেন, সমরেশ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আব্দুল্লাহ রসুল, সাবিত্রী রায়, শিশির দাস প্রমুখকে তেভাগার সংগ্রাম জারিত করেছে।

কবি সাংবাদিক গোলাম কুদ্দুস লিখেছিলেন—'লাখো না মিলয়ে এক'। তেভাগা

আন্দোলনের স্থানগুলি একাধিকবার ঘুরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জারিত কয়েকটি অসাধারণ সংবাদ বা রিপোর্তাজ কুদ্দুসদা লেখেন, তার মধ্যে সর্বোত্তম এই 'লাখো না মিলয়ে এক'। এই লেখা রসোত্তীর্ণ এক ছোটগল্পের খ্যাতি অর্জন করেছে। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত রচনাটির নানা স্থানে অসংখ্য পুনর্মুদ্রণ হয়েছে এর অসাধারণত্বের জন্য। আসলে এটিকে দিনাজপুরের রক্তে রাঙা মাটি থেকে উঠে আসা কৃষক সংগ্রামের এক জীবন্ত দলিলও বলা চলে।

কুদ্দুসদা লিখছেন এইভাবে—'লাখো না মিলয়ে এক। আমি যাট লাখে পেয়েছিলাম তোমাকে। ভিখু, কত বছর আগে কৃষকদের মধ্যে এসেছিল সেই আলোড়ন, যাকে বলা হয় তেভাগা আন্দোলন?......বাংলাদেশের এক অতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আন্দোলন যে ছড়িয়ে পড়েছিল, সে আমি নিজের চোখেই দেখেছি। এর খবরাখবর জোগাড়ের জন্য আমাকে তখন বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল। আজ এতকাল পরে অবাক হয়ে ভাবছি, এত লোকের মধ্যে শুধু তোমার কথাই কেন এমন করে মনে আসছে।'

এই কৃষক-বালক ভিখুকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কে টান টান তেভাগার রক্তাক্ত কাহিনীটা। দিনাজপুরের খাঁপুরে তখন গুলি চলেছে, চলছে পুলিশ মিলিটারীর যৌথ সন্ত্রাস। গোটা গ্রামাঞ্চল পুরুষ শূন্য। বহিরাগত প্রবেশ নিষেধ। এই অবস্থায় সাংবাদিক গোলাম কুদ্দুস রওনা হয়েছেন খাঁপুরের দিকে। উদ্দেশ্য সংবাদ সংগ্রহ। কেউই সেই মৃত্যুপুরীতে যেতে সাহস না করায় তিনি একাই এসেছেন। কিন্তু পথে মিলে গেল বীর কৃষক-বালক ভিখু। সাতচল্লিশ সালের অভিমন্যু যে চক্রব্যূহ ভেদ করে পথ দেখাচ্ছে বহু যুদ্ধে, অভিজ্ঞ এক সেনানীকে।

গোলাম কুদ্দুসকে খ্যাতির শীর্ষে এবং জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয় তাঁর কবিতা 'ইলা মিত্র'। তেভাগা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, নাচোলের লড়াই কাছে থেকে দেখার সঙ্গে মানবিক অনুভূতি ও দায়বদ্ধতা মিলেমিশে একাকার এখানে। সে সময়ে 'ইলা মিত্র' মানুষের মুখে মুখে ঘুরত। শম্ভু মিত্র 'ইলা মিত্র' আবৃত্তি করতেন—

> ইলা মিত্র রাজসাহী জেলে।
> স্বামী তাঁর শান্ত বজ্র দৃঢ়
> ফেরারী এখনো পাকিস্তানে।
> উত্তরের শিশুপুত্র কোথা
> মাতাপিতা সঙ্গহীন বাড়ে।

সত্যাই কুদ্দুসদা ছিলেন একজন বর্ণবৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্ব। আপাত শান্ত, গম্ভীর, চাপা ধরনের। তলে তলে ছিল শত চিন্তার তীব্র স্রোত। যে গভীর মনীষা বা যে প্রখর লোকচরিত্র পাঠের দক্ষতা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন সেই অনুপাতে তার পুস্তকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। গুটিকয়েক মাত্র উপন্যাস। কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ এবং স্বাধীনতা কালান্তর পরিচয় প্রভৃতি ইত্যাকার পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত অনেক প্রবন্ধ।

তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন যে বইয়ের জন্য, উপন্যাসটির নাম 'লেখা নেই

স্বর্ণাক্ষরে'। অভিনব বিষয়বস্তু উপজীব্য উপন্যাসটির। মূলত নূতন নূতন ক্ষেত্র যাঁরা বাংলা উপন্যাসের ভৌগলিক ও চারিত্রিক জগতে যুক্ত করেছিলেন কুদ্দুসদা তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

কুদ্দুসদার রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত 'লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে'-র বিষয়বস্তু খুবই অভিনব ও বলিষ্ঠ। আমরা জানি ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে ইতিহাস চেতনা কুদ্দুসদার খুবই গভীর ও প্রখর ছিল। স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে নৌবিদ্রোহ কি তারও পূর্বে ব্রিটিশ অধীনস্থ ভারতীয় সৈনিকদের বিদ্রোহ ঘোষণার গুরুত্ব আমরা জানি। এরকম বহু কাহিনী আমরা জানি এবং যতটা জানি তারও বেশি বোধহয় রয়ে গেছে জানার বাইরে। এগুলো কোনোদিনই কালির আঁচড় পাবে না। 'লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে' এইরকম ব্রিটিশদের অধীনস্থ সেনানীর পরাধীন দেশের ও দশের প্রতি প্রেম, মমত্ব ও দেশপ্রেমের এক চরম পরাকাষ্ঠার নিদর্শন চিত্রিত হয়েছে। হেমিংওয়ের 'Farewell to the Arms' বা রেমার্কের 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' প্রমুখ গুটিকয়েক উপন্যাসের সমগোত্রীয় বলা যায়।

কুদ্দুসদা তাঁর বাঁদী উপন্যাসে গ্রামীণ মুসলমান সমাজের প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ সমাজ, চরিত্রের দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, মুসলমান নারীদের উপর আরোপিত অজস্র বন্ধনে ও গ্রাম্যছেলে রফিকের চোখে শহরে পরিবেশের টানাপোড়েন আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে কুদ্দুসদার কলম থেকে তুলে এনেছে। এ এক অন্য পুতুল নাচের ইতিকথা।

মরিয়ম উপন্যাসে কুদ্দুসদা দেখিয়েছেন শ্রমিক জীবন এবং তাদের সেই জীবনের সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব। পরবর্তী উপন্যাস 'এক হিন্দুস্থানী' কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগ্রামরত শ্রমিকদের পটভূমিকায় বিধৃত হয়েছে।

এই উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন বাংলার সংস্কৃতি জগৎকে গোলাম কুদ্দুসের মতো একজন সুসন্তানকে উপহার দিয়েছিল। এই সুসন্তান কিন্তু সহজে আসেনি। এসেছে বহু শিক্ষা, অনুশীলন, সংগ্রাম ও খেটেখাওয়া মানুষজনের জীবন ও জীবিকার সম্পর্কে সম্যক ধারণা হতে। এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন এরকম বহু কবি সাহিত্যিক মনীষীকে দেশের হাতে তুলে দিয়েছে যাঁরা সত্যই গর্বের বিষয়বস্তু এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে গেছেন।

গোলাম কুদ্দুস : অন্য এক কোণ থেকে

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

গোলাম কুদ্দুস পুরোনো দিনের কথা বলতে বলতে, যখন বলতেন, প্রায়ই মেহর আলি রোডের একটি বাড়ির কথা বলতেন। ছিমছাম বাড়ি। সাজানো গোছানো আসবাবপত্র। নানারকম আলো। রঙিন পর্দা। স্বপ্নের বাড়িই যেন। বলা যায় তাঁরই বাড়ি। সেখানে তিনি ছিলেনও কিছুকাল। তারপর আর থাকা হয়নি।

দেশভাগের পর পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস (১৯৪৮) থেকে বিপ্লবের পথ ঘোষণার পর পার্টির বহু নেতা ও কর্মী আত্মগোপন করে কাজ করতে থাকেন, কুদ্দুসসাহেবও। তখন তাঁর নতুন নাম হয় ('টেক নেম') 'কিরণ'। কিরণকে আরও কিছু সংগঠকের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পূর্ব পাকিস্তানের পার্টিকে সাহায্য করতে। সেই সময়ই ওদেশে যান মহম্মদ আমিন ও আরও কিছু সংগঠক।

যাওয়ার আগে সেই বাড়িটিতেই থাকতেন কুদ্দুসসাহেব। ফিরে এসে আর থাকা হয়নি। যেন ফেরা হয়নি স্বপ্নের বাড়িতে। স্বপ্নে। কিন্তু স্বপ্ন তাঁকে ছাড়েনি কোনওদিন, তিনিও বেঁচে থেকেছেন স্বপ্ন অবলম্বন করেই।

।। এক।।

আর একটি বাড়ির কথা তিনি বলতেন, কখনও মজা করে, কখনও খুব মায়ায়। বাড়িটির ঠিকানা ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট। আদতে বাড়িটি ছিল এক মারোয়াড়ি ভদ্রলোকের। তিনি এতই বড়লোক এবং কলকাতাতে তাঁর এত বাড়ি, ও-বাড়িটির কথা খেয়ালই থাকত না। ও-বাড়িতে বাস করতেন বিশিষ্ট আইনবিদ রশিদুল হাসান। তিনি ছিলেন কলকাতা সিটি সিভিল কোর্টের বিচারক। দেশভাগের পর সপরিবারে তিনি পাকিস্তানে চলে যান এবং কালে পূর্ব পাকিস্তানের চিফ জাস্টিস হন।

রশিদুল হাসানের শ্বশুরমশাই নবাব শামসুল হুদা (বলার সময় কুদ্দুস সাহেব খেয়াল করিয়ে দিতে ভুলতেন না 'নবাব' উপাধিটি মুঘল আমলের নয়, ওটি তিনি পেয়েছিলেন ইংরেজদের কাছ থেকে) ছিলেন তখনকার কলকাতার এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বেগবাগান-সার্কুলার রোডের মোড়ে মস্ত লন আর বাগানওয়ালা বাড়ি ছিল তাঁর। তিনি শুধু সমাজের উঁচুতলার মানুষ ও ধনীই ছিলেন না। কুদ্দুসসাহেব বলতেন তিনি ছিলেন উদার মানবিকতার মানুষ। সত্যিকারের সেকুলারিজম কাকে বলে তাঁকে দেখে উপলব্ধি করা যেত।

গল্পের এখানে এসে পড়তেন দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড: রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন আইন পড়তেন। শামসুল হুদা সেখানে মাঝে মাঝেই ক্লাস নিতে যেতেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিখ্যাত ও কৃতী ছাত্র। কিন্তু খুবই দরিদ্র। শামসুল হুদা তাঁকে ডেকে সব কথা জানার পর তাঁকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিশ্চিন্তে সেখানে

থেকে, খেয়ে পড়াশোনা করতে লাগলেন। এর মধ্যে এসে পড়ল বকরীদ। কুরবানি হবে। গোরুও কাটা হবে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিষ্ঠাবান হিন্দু। তিনি নিঃশব্দে পালালেন ও বাড়ি থেকে। দিনচারেক পরে তিনি ফিরে এলে শামসুল হুদা তাঁকে ডেকে কথা বললেন। প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে উঠে রাজেন্দ্রপ্রসাদ সব কথা খুলে বললেন। শুনে নবাব হুদা হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, কী কাণ্ড দেখো, এদিকে তুমি আছ বলে আমি এবার হুকুম দিয়েছিলাম গোরু যেন কাটা না হয়, শুধু খাসি! ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজেও তাঁর আত্মজীবনীতে ঘটনাটি লিখে নবাব হুদার প্রতি কীভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সেকথা বলে এ কাহিনী শেষ করতেন কুদ্দুসসাহেব।

৩৩ নম্বর আলিমুদ্দিন স্ট্রীটের বাসিন্দা নবাব হুদার জামাতা রশিদুল হাসানের ভাই সইদুল ইসলাম ছিলেন কমিউনিস্টদের সমধর্মী। তিনি ছিলেন পার্টির বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শাহেদুল্লাহ্ সাহেবের এবং কুদ্দুসসাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সইদুলের ছিল ট্রাংক ট্রাংক বই। তার ভেতর থেকেই বেছে তিনি কুদ্দুসের হাতে তুলে দেন 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো।' সেই তাঁর মার্কসবাদী সাহিত্যপাঠের শুরু। এ পাঠ বজায় ছিল আমৃত্যু। কুদ্দুস সাহেব শুধু কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিকই ছিলেন না। বড় মাপের চিন্তাবিদ ছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, রমেন মিত্র, ইলা মিত্র তো বটেই, ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ি, নৃপেন চক্রবর্তী, প্রমোদ দাশগুপ্ত, মুজাফ্ফর আহমেদ, রণেন সেন, বিশ্বনাথ মুখার্জি, গোপাল ব্যানার্জির সঙ্গে নানা রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক ও বিনিময় চলত তাঁর। অনেক সময় নিজের ভাবনা তিনি ইংরেজিতেও লিখতেন। দিল্লিতে পার্টি কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতেন। দেশের ও বিশ্বের সমস্ত ঘটনাই তাঁর মনে সাড়া জাগাত। সেসব ভাবনা তিনি লিখে ফেলতেন। অল্পই সঙ্গতি ছিল তাঁর। তবু তাই দিয়েই সেসব লেখা তিনি টাইপ করাতেন, কপি করাতেন এবং কাউকে কাউকে দিতেন। আমিও তার দু-একটি পেয়েছি। সবসময় যে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া যেত তা হয়ত নয়। কিন্তু সেসব লেখায় তাঁর পড়াশোনার ব্যাপ্তি, ভাবনার গভীরতা এবং পরিশ্রমের পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধা না করে পারা যেত না। তিনি ছিলেন, হাল আমলের ভাষায়, 'সাবেকী ঘরানার কড়া ধাতের কমিউনিস্ট।'

তিনি এবং তখনকার তাঁরা কতটা কমিউনিস্ট ছিলেন তা এই বাড়িটির কাহিনী দিয়েই বোঝা যায়। আইনবিদ রশিদুল হাসন ও তাঁর ভাই সইদুল হাসান যখন পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান, বাড়িটি তাঁরা শাহেদুল্লা সাহেব ও কুদ্দুসসাহেবের হাতে তুলে দিয়ে যান। কুদ্দুসসাহেব প্রথম যখন কলকাতায় পড়তে আসেন, রিপন কলেজে পড়তেন (এখনকার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ), তখন দুটি বাড়িতে তাঁর বাস ছিল। পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপোর উল্টোদিকে আমীর আলি অ্যাভিনিউয়ে একটি বাড়িতে এবং ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে। সেসব দেশভাগের অনেক আগের কথা। দেশভাগের পর অতবড় বাড়ির পুরোটাই তাঁদের হাতে। পার্টির প্রয়োজনের কথা জেনে বাড়িটি তাঁরা পার্টির হাতে তুলে দেন। কালে ওই বাড়িতে পার্টির রাজ্যদপ্তর এবং 'স্বাধীনতা' উঠে আসে।

তার আগে থেকেই বাড়িটি ব্যবহার করত পার্টি। কুদ্দুসসাহেব বলেছিলেন, পার্টির

দ্বিতীয় কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন বার্মার (এখনকার মায়ানমার) গোপন পার্টির নেতা থান তুন। তাঁকে ওই বাড়িতেই রাখা হয়। সুশোভন সরকার তাঁর কথাই লিখেছেন ভবানী সেন গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে (বস্তুত তাঁর এই লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় পার্টির অর্ধশতক পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত স্মারকপত্র 'কমিউনিস্ট'-এ), "ঘোষাল এসেছিলেন বর্মার গল্প করতে—তাঁর বর্মী নামটাও বলেছিলেন, এখন মনে পড়ছে না।" থান তুন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক জেনে-ডি-ওভারস্ট্রীট এবং মার্শাল উইন্ডমিলারের লেখা 'কমিউনিজম ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থটি দেখতে পারেন।

।। দুই।।

কুদ্দুসসাহেবের আদি নিবাস ছিল কুষ্টিয়ায়। সে কথাটি তিনি এইভাবে বলতে ভালবাসতেন : রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি থেকে আড়াই মাইল আর লালন ফকিরের বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে ছিল আমাদের বাড়ি।

সেখান থেকেই কলকাতায় পড়তে আসেন তিনি। প্রথম পড়তে যান রিপন কলেজে। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে তিনি প্রেসিডেন্সিতে যান ইতিহাসে অনার্স পড়তে (১৯৪০)। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে যাঁরা তাঁর সহপাঠি বা সমসাময়িক ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ডাকসাইটে ছাত্রনেতা ও পরবর্তী কালের কমিউনিস্ট নেতা। তাঁদের একজন সুনীল মুন্সী। তিনি আবার খেলাধুলাতেও প্রবল উৎসাহী ছিলেন। তখনই কলেজ স্পোর্টস-এ জ্যাভেলিনের আঘাত লেগে তাঁর একটি চোখ যায়। আর একজন রণজিৎ গুহ। সুনীল মুন্সীর ভাষায় রণজিৎ তখন দাপুটে নেতা। আগস্ট আন্দোলনে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে কলেজময় বক্তৃতা করে বেড়ায়।

অল্প কিছুদিন আগেই শুরু হয়েছে হিটলারের সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, 'অপারেশন বারবারোসা' (২১ জুন ১৯৪১)। বিশ্বময় কমিউনিস্টদের কাছে উনিশ মাস আগে (১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) শুরু হওয়া বিশ্বযুদ্ধ পরিণত হয়েছে 'জনযুদ্ধে'। তখন সোভিয়েতকে রক্ষা করা এবং ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করাই সর্বোচ্চ কর্তব্য। কাজেই মিত্রশক্তির কোনও পক্ষ দুর্বল হয়, যুদ্ধপ্রয়াসে বাধা পড়ে, এমন সমস্ত কাজ ও আন্দোলনই ভয়ংকর ক্ষতিকর।

কুদ্দুসসাহেবের ওপর নিশ্চয়ই এই সময় ও এই সহযোদ্ধাদের কিছু প্রভাব পড়ে থাকবে। তবে তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই পার্টিতে আসেন। এ ব্যাপারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ননী ভৌমিকদের মতো সাহিত্য-ব্যক্তিত্বের ছিল একটা বিশেষ ভূমিকা।

ইতিহাসে অনার্সে খুব ভালো রেজাল্ট করেন কুদ্দুসসাহেব। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান বাংলা (১৯৪২)। তখন এমন পড়া সম্ভব ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন ছিল অনেক নমনীয়, উদার ও ছাত্রবন্ধুসুলভ। এবং ভাগ্যিস কুদ্দুসসাহেব বাংলা পড়তে গিয়েছিলেন, নইলে তাঁর সঙ্গে কি হেনা মৈত্রের সাক্ষাৎ, পরিচয় ও প্রণয় ঘটতে পারত? তাঁরা ছিলেন সহপাঠি। এ পরিচয় না ঘটলে আমরা এক অসাধারণ প্রণয়-কাহিনী থেকে

বঞ্চিত হতাম। তাঁদের সময়, তাঁদের প্রেম, তা নিয়ে সংগ্রাম, শেষ পর্যন্ত অধিক বয়সে পরিণয় ও অল্প কিছুদিনই একসঙ্গে জীবনযাপন করার পর হেনাদির মৃত্যু, তাঁর শেষকৃত্য নিয়ে ধর্মীয় জটিলতা—এসব নিয়ে মস্ত এক উপন্যাস লেখা যায়। কুদ্দুসসাহেব তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আহিরিপুকুর লেনে 'হেনাদির ঘরটি' মন্দিরের মতো সযত্নে আগলে রাখতেন। ঠিক যেমন ছিল হেনাদি থাকতে। যেন তিনি আছেন তখনও।

তাঁর সময়ে (১৯৪২-৪৪) বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা পড়তেন, ছাত্র ফেডারেশন এবং কমিউনিস্ট পার্টি করতেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন রীতিমতো তারকা। পরবর্তী জীবনেও নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁরা হয়ে ওঠেন উজ্জ্বলতর। তাঁদের কয়েকজনের নাম বললেই কথাটা স্পষ্ট হবে। সন্তোষ ভট্টাচার্য, কল্যাণ দত্ত, রাম বসু, রণজিৎ গুহ, সুনীল মুন্সী, নির্মল চ্যাটার্জি, মীরা চ্যাটার্জি, অবন্তী সান্যাল, সুরেশ মৈত্র, সুধাংশু মুখার্জি, অমলেন্দু চ্যাটার্জি প্রমুখ। অমলেন্দু ছিলেন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র এবং এঁদের সকলের 'দাদা'।

এঁদের সঙ্গ, সাহচর্য, এঁদের সঙ্গে আন্দোলনে-প্রচারে অংশগ্রহণ কুদ্দুসসাহেবকে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু তাঁর মন তখন বাঁধা পড়ে গেছে মূলত সাহিত্যচর্চায়। কলকাতায় বাঙালি মুসলমান সমাজে যাঁরা শিল্পসাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাতেন, লিখতেন, আঁকতেন তাঁদের মধ্যে আগেই গোলাম কুদ্দুসের একটি নিজস্ব স্থান তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪০-এর অক্টোবরে 'দৈনিক নবযুগ' প্রকাশিত হয় নবপর্যায়ে। কবি নজরুল ইসলাম তার সম্পাদক হন। পত্রিকার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল কবিতায় লেখা নজরুলের সম্পাদকীয়। কুদ্দুসসাহেব সে সময় ছিলেন তাঁর নিত্যসঙ্গী।

।। তিন ।।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে (১৯২২) ইতালিতে ফ্যাসিবাদ উদ্ধত মাথা তুলে দাঁড়ায় 'ইল দুচে' মুসোলিনির নেতৃত্বে। তৃতীয় দশকে জার্মানিতে 'ফুয়েরার' হিটলারের নেতৃত্বে (১৯৩৩) এবং স্পেনে ডিকটেটর জেনারেল ফ্র্যাংকোর নেতৃত্বে (১৯৩৬)। ফ্যাসিবাদের বিপদ আর নিছক তত্ত্ব বা সেমিনারে বিতর্কের বিষয় থাকে না। জীবনের সত্য এবং ভয়ঙ্কর বিপদ হয়ে ওঠে। 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' দিমিত্রভের তত্ত্ব অনুসারে ব্যাপক ফ্যাসিবিরোধী মঞ্চ গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। সবচেয়ে আগে এগিয়ে আসেন ইওরোপের শিল্পী-সাহিত্যিকরা।

ইওরোপ থেকে ফিরে সাজ্জাদ জাহির প্রমুখ উদ্যোগ গ্রহণ করেন এদেশেও সাহিত্যিকদের নিয়ে অনুরূপ মঞ্চ গড়ে তোলার। এই উদ্যোগের ফলস্বরূপ গড়ে ওঠে প্রগতি লেখক সংঘ (PWA)। ১৯৩৬ সালে সংঘের প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় লখনৌতে। সেখানে সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন মুন্সী প্রেমচাঁদ (তাঁর সভাপতিত্বেই অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনও) এবং সাধারণ সম্পাদক হন সাজ্জাদ জাহির। দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন আয়োজিত হয় ১৯৩৮ সালে কলকাতায়। সম্মেলনে নির্ধারিত সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শারীরিক অসুস্থতার কারণে উপস্থিত হতে পারেননি, কিন্তু তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করা হয়।

বাংলার সাহিত্যিকরা ব্যাপক সমাবেশের আয়োজন করেন সংঘের মঞ্চে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসুর মতো সাহিত্যিকরাও যোগ দেন। গড়ে ওঠে প্র-লে-সং-এর বাংলা শাখা।

বাঙালি মুসলমান লেখকরা গড়ে তোলেন 'মুসলিম প্রগতি লেখক সংঘ।' তাঁদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও একই। সঙ্গে ছিল মুসলিম লেখকদের সংঘবদ্ধ ও প্রগতির আদর্শে উদ্দীপিত করা। গোলাম কুদ্দুস ছিলেন এর এক প্রধান, যদিও বয়সে তিনি ছিলেন তরুণ। তাঁর উদ্যোগেই এই সংঘ সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ জানায় সুশোভন সরকারকে। এর দ্বারা নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও এই সংঘের মেজাজ ও চরিত্রের খানিকটা আঁচ পাওয়া যাবে।

কিন্তু অনেকেই এই ঘটনায় অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। মুসলমান লেখকদের প্র-লে-সং-এ সমবেত করার উদ্যোগ শুরু হয়। সে উদ্যোগে বড় ভূমিকা পালন করেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। শেষ পর্যন্ত দুই সংঘ মিলিত হয়ে যায়। যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্ব পড়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোলাম কুদ্দুসের ওপর।

কুদ্দুসসাহেবের সঙ্গে প্রগতি লেখক সংঘের এই আত্মীয়তা বজায় ছিল আমৃত্যু। সংঘ সবসময় সমান সচল থাকেনি। তিনিও সর্বদা নেতা বা অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে উঠতে পারেননি। কখনও বিব্রত, কখনও বিরক্ত বোধ করেছেন। কিন্তু আত্মীয়তাবোধ কখনও ভাঁটা পড়েনি। মৃত্যুকালেও তিনি ছিলেন সংঘের রাজ্য কমিটির সভাপতি। সংঘের ৭০ বর্ষ উদ্‌যাপন ও রাজ্য সম্মেলনে (১৪ জানুয়ারি ২০০৭) মূল সভাকক্ষটি তাঁর নামই ধারণ করেছিল।

।। চার ।।

সময় যেন মহাকাশযান। কেমন হুশ করে চলে যায়।

ভাবতে গেলে অবাক লাগে, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের বয়স দেখতে দেখতে হয়ে গেছে চুয়ান্ন বছর। অন্যভাবেও বলা যায়, সেইভাবে বলাই হয়ত সঠিক, তাঁকে আমি প্রথম দেখেছিলাম ১৯৫৩ সালে। ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে, 'স্বাধীনতা' অফিসে। আমি তখন মাঝে মাঝেই আসতাম সেখানে, অশোকনগর থেকে। 'কিশোরসভার' পাতায় লেখা দিতে। 'স্বাধীনতায়' সভাসমিতি-মিছিলের খবর আর ফটো পৌঁছে দিতে (আমার খেলনা ক্যামেরায় তোলা ফটোও থাকত তার মধ্যে কখনও কখনও)। আর আসতাম 'কিশোরসভা' পাতার পরিচালক হুদা ভাই (আবদুল হুদা)-এর উদ্যোগে 'কিশোরসভার আড্ডায়' যোগ দিতে। অনেকেই আসত। তাদের কেউ কেউ 'পরিচয়'-এর পাঠকদের বিলক্ষণ পরিচিত। যেমন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, (এখন বাংলাদেশের) এখলাসউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

'স্বাধীনতায়' খুব আড্ডা হত। হাসি-মজা-ঠাট্টাও চলত। তার মধ্যে যাঁরা ঘাড় গুঁজে প্রায় নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যেতেন তাঁদের একজন গোলাম কুদ্দুস। তার মধ্যেও খবরটবর যখন তাঁর হাতে তুলে দিতে হত, জেলা থেকে আসা কিশোরটির দিকে তাকিয়ে তিনি অল্প হাসতেন। কাজ বুঝে নিতেন। কিন্তু বাড়তি কথা বলতেন না প্রায় একটাও।

তখন তো আমরা সবাই তাঁকে চিনতাম। তাঁর লেখা 'ইলা মিত্র' কবিতাটি তখন কাঁপাচ্ছে বাংলার আকাশবাতাস। তাঁর হাতে খবর তুলে দিয়ে এসেছি, ফিরে গিয়ে এটাই হয়ে যেত খবর। আমাদের পুলকিত সংবাদ। তখন আমাদের হাতে হাতে ঘুরত এন-বি-এ, প্রকাশিত 'ইলা মিত্র' (মূল্য : বারো আনা)। কিন্তু তখন কি তিনি জানতেন, গুনে গুনে ঠিক তেরো বছর পরে (১৯৬৬) সেই কিশোরটি যুবক হয়ে তাঁর পাশের টেবিলে বসে ঘাড় গুঁজে কাজ করবে? পার্টিরই কাগজে, যদিও নামটা নতুন, 'কালান্তর'। জায়গাটা অন্য, সুন্দরী অ্যাভিনিউ-এর পদ্মপুকুর মোড়। তাঁর পাশে বসে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম এটা আমারই সৌভাগ্য।

কুদ্দুসসাহেব পার্টি পত্রিকার একেবারে গোড়া থেকে পত্রিকার হোলটাইমার। বস্তুত পার্টির হোলটাইমারি এবং হোলটাইম সাংবাদিকতাই তিনি করেছেন প্রায় সারাজীবন। 'স্বাধীনতা'র সব ক'জন সম্পাদকের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি, সোমনাথ লাহিড়ি, জ্যোতি বসু, ভূপেশ গুপ্ত, সরোজ মুখোপাধ্যায় এবং পার্টি ভেঙে যাওয়ার মুখে শেষ পর্যায়ের স্বল্পায়ু 'স্বাধীনতায়', আবার সেই পুরোনো সম্পাদক সোমনাথ লাহিড়ির সঙ্গে। তারপর 'কালান্তর'-এ। ভবানী সেন, জ্যোতি দাশগুপ্ত প্রমুখের সম্পাদনায়। বস্তুতঃ 'স্বাধীনতা'র মতো কালান্তর-ই ছিল তাঁর লেখালিখির প্রধান জায়গা। এবং অবশ্যই পরিচয়। প্রবন্ধ, সাংবাদিক লেখা, কবিতা, উপন্যাস, সবকিছু। তাঁর শেষ উপন্যাস 'এক হিন্দুস্থানী' প্রকাশিত হয় শারদীয় 'কালান্তরে'ই (১৪১১)। তার জীবিতকালে তাঁর শেষ কবিতাটিও। 'খুশী' প্রকাশিত হয় ১৪১৩ সনের শারদ কালান্তরেই।

বাংলা ভাষায় সংবাদসাহিত্য ব্যাপারটাই, বলা যায়, কমিউনিস্টদের অবদান। মার্কিন দেশে 'নিউ ম্যাসেস'-অথবা 'হার্লেম'-এর যে-ভূমিকা ছিল, নিপীড়িত মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও তা থেকে মুক্তির সংগ্রামের কাহিনীকে শিল্পরূপ দিয়ে প্রকাশ করা, তাই করেছিল এখানে 'স্বাধীনতা'। এটাকে যদি আন্দোলন বলা যায় তবে তার নেতা ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ি যিনি নিজেই অনবদ্য গদ্য লিখতেন। আর সৃষ্টির এ আন্দোলনে চার সাংবাদিক ছিলেন তাঁর প্রধান তরবারি, গোলাম কুদ্দুস, ননী ভৌমিক, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। কষ্ট ও সুখের সৃষ্টিশীল সেই সময় 'স্বাধীনতা'-র দপ্তর ছিল ডেকার্স লেনে, পার্টি অফিসের সঙ্গেই।

ডেকার্স লেনের অফিসে একবার হো চি মিন এলেন। প্যারিসে শান্তি আলোচনায় যাওয়ার পথে। তাঁকে ডেকার্স লেনে নিয়ে এসেছিলেন সুধী প্রধান। কুদ্দুসসাহেব গল্পটা খুব চমৎকার করে বলতেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, প্যারিসে যে যাচ্ছ, যদি ওরা তোমাকে ধ'রে রেখে দেয়। হো হাসলেন। বললেন, সে সাহস ওদের হবে না। ওরা জানে, আমার বন্ধুরা ছড়িয়ে আছে সমস্ত ভিয়েতনামে। তারা ওদের ছাড়বে না।

তারপরেই হো-র পাল্টা প্রশ্ন। তোমরা একটা বিপ্লবী পার্টি—এ কী রকম জায়গায় অফিস করেছ? এ রাস্তার দুটো মুখ আটকে দিলেই তো তোমরা ফাঁদে পড়ে যাবে!

এদেশের পার্টি তার কিছুদিন পরেই বিপ্লবের পথে যাত্রার ঘোষণা জারি করেছিল।

।। পাঁচ ।।

দেশ ভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পার্টি ভাগ হয়নি। যুক্ত পার্টির শেষ রাজ্য সম্মেলন হয়েছিল ১৯৪৭-এর অক্টোবরে ডেকার্স লেনে ছাদের ওপর প্যান্ডাল বেঁধে। সেখানে যে রাজ্য নেতৃত্ব নির্বাচিত হয় তাতে দু'পারের নেতারাই ছিলেন। সেখানে রাজ্য কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন ডঃ রণেন সেন। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন সরোজ মুখার্জি, নিরঞ্জন সেন, মুজাফ্ফর আহমেদ, সোমনাথ লাহিড়ি, নৃপেন চক্রবর্তী, ভবানী সেন এবং পাঁচুগোপাল ভাদুড়ি। রাজ্য কমিটিতে নির্বাচিত হন রেজ্জাক খাঁ, আবদুল্লা রসুল, মহম্মদ হালিম, মণি সিং, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, জলি কল, মণিকুন্তলা সেন, স্নেহাংশু আচার্য, হীরেন মুখার্জি প্রমুখ।

কিছুকাল পরে দু-পারের পার্টি পৃথক করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলে পূর্ববঙ্গের কমরেডদের, মণি সিং, খোকা রায়, নেপাল নাগ, কৃষ্ণবিনোদ রায় প্রমুখকে কমিটি থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পার্টি তাদের নেতৃত্বে কাজ করতে থাকে।

আলাদা হয়ে গেলেও দুই পার্টির মধ্যে আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলই। সেই যোগাযোগের সূত্রেই ভারতের পার্টি নানাভাবে সাহায্য করত পাক পার্টিকে। পাকিস্তান হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে দেয় পাক সরকার। শুরু হয় ধরপাকড়, নানা রকম অত্যাচার ও নিপীড়ন। কমিউনিস্টরা এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন। পশ্চিম পাকিস্তানের পার্টি সাজ্জাদ জাহিরকে সেখানে পাঠাবার আবেদন করেন। আবেদনকারীদের মধ্যে কবি ফৈয়জ আহমেদ ফৈজ-ও ছিলেন। সাজ্জাদ জাহির গেলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে আত্মগোপন করে কাজ করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু পারলেন না। ধরা পড়ে গেলেন এবং তাঁকে ভারতে ফিরে আসতে হল।

কুদ্দুসসাহেবের অভিজ্ঞতা একটু অন্যরকম। তিনি তখন এদেশেও আত্মগোপনে। পার্টির পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে কোনও পত্রপত্রিকা প্রকাশ অসম্ভব হয়ে পড়ে। কুদ্দুসসাহেব তখন মেহের আলি রোডের বাড়িতে থাকেন। তখন রণদিভে যুগ। জ্যোতি দাশগুপ্ত এসে হাজির তার বাসায়। পার্টির নির্দেশ, পূর্ব পাকিস্তান পার্টির জন্যে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতে হবে। সেটা গোপনে যাবে ওপারে। পত্রিকার দায়িত্বে থাকবেন বিভূতি গুহ, জ্যোতি দাশগুপ্ত এবং গোলাম কুদ্দুস। সম্পাদক মুসলমান হলে ভালো হয়। অতএব কুদ্দুসই সম্পাদক।

শুরু হল কাজ। এপারে কাগজ ছাপা হয়। গোপন পথে ওপারে যায়। গোপন পথে ওপারে কাগজ ছাপা হয়। গোপন পথে ওপারে যায়। কিছুদিন পরেই ধরা পড়ে গেল। পাক আইনসভায় হৈচৈ। 'ভারতের চক্রান্ত।' 'কমিনিস্ট মাত্রেই ভারতের চর' ইত্যাদি।

এমনিতেই ওপারের পার্টি কাগজটি সম্বন্ধে নানারকম নালিশ করছিল। পরিচালকরা রণদিভের বিপ্লবী লাইনকে ছোট করে দেখাচ্ছেন। সব মিলিয়ে সে কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হল এবং পরিচালকদের শাস্তি দিল পার্টি। কুদ্দুসসাহেবের শাস্তি হল : পূর্ব পাকিস্তানে যাও। সেখানে রেলশ্রমিকদের মধ্যে কাজ করো। বিপ্লবী চেতনা অর্জন করো। নেপাল নাগ থাকবেন তোমার দায়িত্বে। তাঁর কথা অনুযায়ী চলবে তুমি।

তিনি গেলেন। ঈশ্বরদি-পোড়াদহ জংশনে রেল শ্রমিকদের মধ্যে মিশে গিয়ে কাজ শুরু করলেন। নেপাল নাগ তাঁর নেতা।

কুদ্দুসসাহেবের মুশকিল হল কলকাতা থেকে যাওয়া মুসলমান মধ্যবিত্তদের মধ্যে তিনি সুপরিচিত। বিখ্যাতই বলা যায়। ফলে কিছুদিন পরেই তাঁর গোপনতার জাল ছিঁড়ে গেল। পূর্ব পাকিস্তানের কবি-সাহিত্যিকক-সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে রটে গেল গোলাম কুদ্দুস কলকাতা ছেড়ে পাকিস্তানে চলে এসেছেন। অমন একজন নজরুলসঙ্গী কবি-সাহিত্যিককে পেয়ে তাঁরা খুব খুশী। শুরু হল ডাকাডাকি। দাওয়াত। সম্বর্ধনা। ঢাকার বুদ্ধিজীবীরা রীতিমতো সভা ডেকে বসল তাঁর সম্মানে। সেখানে গোলাম মোস্তাফা ও জসীমউদ্দিন ছাড়া প্রায় সব কবি-সাহিত্যিক এসে হাজির। তিনি পার্টির কাছে আশ্রয় চেয়ে পাঠালেন। পার্টি তখন নিদারুণ বিপন্ন অবস্থায়। ফলে তাঁকে নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হয়।

তখন তাঁর কাছে শামসুর রহমানসহ সব কবি আসতেন। প্রায় সকলেই আবেদন করতেন, আপনি থেকে যান। কলকাতায় তো আপনি আমাদের পথ দেখাতেন। এখানে তেমন একজন পথ দেখাবার মানুষ খুব প্রয়োজন। আপনার চেয়ে ভালো আর কাকে পাবো আমরা? আপনি থেকে যান। কুদ্দুসসাহেবের যে আত্মীয়স্বজন ওদেশে ছিলেন, তাঁরাও বলতে লাগলেন। ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে তাঁর 'প্যাট্রন' রশিদুল হাসান এখন ওখানে মস্ত মানুষ। তিনি বললেন, হিন্দু অধ্যাপকদের অনেকেই চলে গেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে যোগ দাও তুমি। তোমার তো যথেষ্ট কোয়ালিফিকেশন আছে। ডিপার্টমেন্টটাকে নতুন চেহারা দাও।

কুদ্দুসসাহেবের শুধু মনে হয়, কী করতে এসেছিলাম আর কোথায় এসে পড়লাম! কী করে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাই? পার্টিই তাঁকে মুক্তির পথ দেখাল।

।। ছয় ।।

কলকাতা থেকে 'গৌর' এবং 'নিতাই'-এর নির্দেশ এল, এক্ষুনি ফিরে এসো। জরুরি দায়িত্ব নিতে হবে। গৌর এবং নিতাই হলেন সোমনাথ লাহিড়ি এবং নৃপেন চক্রবর্তী, আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির দুই প্রধান নেতা। কুদ্দুস ফিরে এলেন। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল, 'পরিচয়' সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে। যুগ্ম দায়িত্বে থাকবেন সরোজ দত্ত।

তখন পার্টির ও পার্টির কাছাকাছি বুদ্ধিজীবী মহলে তুমুল আলোড়ন চলছে রবীন্দ্র গুপ্তের লেখা নিয়ে। ভবানী সেন ওই নামে একটার পর একটা লেখা প্রকাশ করছেন 'মার্কসবাদী' পত্রিকায়। হৈচৈ পড়ে যাচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। পঞ্চম লেখাটিতে তিনি তাঁর মতবাদ একেবারে স্পষ্ট করে দিলেন। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, যাঁরা বাংলার মনীষী বলে পরিচিত, তাঁরা আসলে ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বললেন অত্যাচারী জমিদার। রবীন্দ্রনাথকে তিনি চিহ্নিত করলেন সাভারকারের দীক্ষাগুরু হিসাবে।

শুধু শিল্প-সাহিত্য নয়, ইতিহাসকেও নতুনভাবে চিত্রিত করলেন তিনি। লিখলেন,

আন্দোলনের তথাকথিত মূল ধারাটি আসলে প্রতিক্রিয়াশীল। তার পাল্টা একটি প্রগতিশীল ধারাও ছিল। সে ধারার মুখ্য প্রতীক সিপাহিদের বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল কৃষক বুর্জোয়ারা।

পার্টির লেখক-কবি-বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই এই মতবাদ হজম করতে পারলেন না। তার মধ্যে যেমন ছিলেন প্রগতি লেখক সংঘের পার্টি সেলের সদস্যরা, তেমনি ন্যাশনাল বুক এজেন্সির পার্টি সেলের সুশীল জানা, অনিল সিংহ শিক্ষা সেলের সম্পাদক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। প্র. লে. সংঘের সেলে তখন ছিলেন নরহরি কবিরাজ, নীরেন রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী মণি রায়, অমরেন্দ্রনাথ মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

পার্টি নেতৃত্ব নেমে পড়ল তাঁদের বোঝাতে। প্র. লে. সংঘের সেলের গোপন সভা ডাকা হল মঙ্গলাচরণের বাড়িতে। ছদ্মবেশে এলেন তিন নেতা, প্রমোদ দাশগুপ্ত, নৃপেন চক্রবর্তী এবং নিরঞ্জন সেন। বহুক্ষণ ধরে তাঁরা অনেক কথা বললেন। আবেদন করলেন, এইটেই এখন পার্টি লাইন, আপনারা মেনে নিন এবং সেই অনুসারে কাজ করুন। সেল-সদস্যরা ভাবার জন্যে সময় চাইলেন। তাঁরা আলাদা করে বসলেন এবং একদমই সময় নিলেন না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই সর্বসম্মতভাবে নেতাদের জানিয়ে দিলেন, এ মত মানা যাবে না।

স্থির হল, লেখকরা যে-যার মত, ভিন্ন মত হলেও, পরিচয়-এ লিখতে পারবেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরেন রায়, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ লিখলেনও। নরহরি কবিরাজ তাঁর মত পার্টি দলিলের আকারে ইংরেজিতে লিখে দিল্লিতে পলিটব্যুরোতে পাঠিয়ে দিলেন।

নরহরি কবিরাজ আমাকে বলেন, পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে দু'জন পার্টির এই লাইন মেনে নিলেন। গোলাম কুদ্দুস এবং সরোজ দত্ত। তাঁর মতে সরোজ মেনেছিলেন বিশ্বাস থেকে। তাঁর ভাবনা বরাবরই অতিবাম (ultraleft)। কিন্তু গোলাম কুদ্দুসের ব্যাপারটা অন্যরকম। তাঁর ভেতরে, নরহরি কবিরাজের ভাষায় একটা 'পার্টি-প্যাট্রিয়াটিজম' কাজ করত। এই মত গ্রহণের মূলে ছিল সেটাই। পরে তিনি যেন অনুতপ্ত হন এবং সংশোধন করে নেন। মতপার্থক্য সত্ত্বেও নরহরি কবিরাজ কোনওদিনই গোলাম কুদ্দুসের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা হারাননি। আজও তাঁর সে অনুভূতি অক্ষুণ্ণ আছে। সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে দেখেছি, গোলাম কুদ্দুসেরও একই অনুভূতি ছিল নরহরি কবিরাজের প্রতি।

এইরকম একটা পরিস্থিতিতে কুদ্দুসসাহেবকে সরোজ দত্তের সঙ্গে পরিচয় সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে হয়।

ফিরে আসার আগে পূর্ব পাকিস্তানে কুদ্দুসসাহেব ঢাকায় রেল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছিলেন। সে ইউনিয়নটি সোমেন চন্দ সংগঠিত করেছিলেন। নেপাল নাগ কুদ্দুসের অভিভাবক। তিনি তাঁকে এক হিন্দু জমিদারের ভাঙাচোরা বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। কয়েকদিন পরেই পুলিশ এসে সে বাড়ির দখল নেয়। কুদ্দুস সরে পড়েন। আশ্রয় নেন তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে। তারপর তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ।

কলকাতায় ফিরে এসে পরিচয়-এর দায়িত্ব নেওয়ার আগে পার্টিকে তাঁর দুটি শর্ত দেন। এক, প্রবন্ধ ছাপার আগে পার্টিকে দেখে দিতে হবে, তাঁরা কোনও দায়িত্ব নিতে পারবেন না। দুই, তাঁরা পরিচয় দপ্তরে যাবেন না। সেখানে যাতায়াত ও যোগাযোগ রাখার কাজটা করবেন অন্য কেউ। শর্ত মেনে নিল পার্টি। পরিচয় দপ্তরে যাতায়াত করতেন চিত্ত বিশ্বাস।

এইভাবে কিছুদিন চলল। দু-তিনটি সংখ্যাও বেরোল। তারপরেই কুদ্দুসসাহেব কেটে পড়লেন। পার্টিও বুঝল, এভাবে চালানো যাবে না। সুশীল জানাকে ডেকে সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হল। কুদ্দুসসাহেব যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন।

পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন তিনি নানাভাবে পরিচয়-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লিখতেনও প্রায় নিয়মিতই। পরিচয়-এর প্রতি তাঁর ভালবাসার টান চিরকালই অক্ষুণ্ণ ছিল। তবু তিনি শেষ জীবনে চিঠি লিখে উপদেষ্টার পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। কেন; কোন অভিমানে কে জানে? এ জগতে কেউ কি কারও অভিমানের তল মাপে? মাপার সময় আছে কারও?

।। সাত ।।

অভিমান তো কবিরই হয়। লেখকের, শিল্পীরও হয়। তাঁদের মনের গড়নটাই অভিমানী। কেউ কখনও সে অভিমান প্রকাশ করেন মজা করে। কারও বা মন ভার হয়ে যায়। সে ভার তিনি বয়ে চলেন অনেকদিন। কুদ্দুসসাহেবের দু'রকমই হত।

তাঁর সেরা উপন্যাসের একটি 'মরিয়ম'। রেল শ্রমিকদের জীবনের আখ্যান। বইটি প্রকাশের পর সাড়া পড়ে। পাঠকের সমাদরও পায়। সমালোচকরাও দৃষ্টি দেন। বলতে বলতে কুদ্দুসসাহেব মজা করে বললেন, একজন প্রগতিশীল সমালোচক তো আমার কল্পনাশক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যে-লেখক রেলবস্তিতে একটি দিনও কাটান্ নি, তিনি শুধুমাত্র কল্পনাশক্তি দিয়ে সে বস্তির কেমন বাস্তব ছবি অংকন করতে পারেন গোলাম কুদ্দুসের গ্রন্থটি তার দৃষ্টান্ত।

সমালোচক একটু খোঁজ করলেই জানতে পারতেন, পূর্ব পাকিস্তানে বাসকালে কুদ্দুসসাহেব আসলে কী করতেন, অধিকাংশ দিন এবং রাত্রি কোথায় কাটাতেন, কোথায় কোন চরিত্র কীভাবে তাঁর ভেতরে ঢুকে গিয়ে তাঁকে দিয়ে 'মরিয়ম' লিখিয়ে ছেড়ে ছিল।

কুদ্দুসসাহেবের দ্বিতীয় অভিমানের কথা জানলাম, হঠাৎ যেদিন বললেন, আপনি কি কখনও খেয়াল করেছেন, 'ইলা মিত্র' লেখার পর পাঁচ বছর আমি কবিতা লিখিনি। 'ইলা মিত্র' তিনি লিখেছিলেন ১৯৫১ সালের বর্ধমানে তাঁর বন্ধু সাহেদুল্লাহ সাহেবের বাড়িতে বসে। সে কবিতার বই যতদিন ধরে যত বিক্রি হয় তা বোধহয় আর কোনও একটি মাত্র কবিতার ক্ষেত্রে ঘটেনি। পথেঘাটে সে কবিতা লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। শম্ভু মিত্র থেকে গ্রামগঞ্জের আবৃত্তিকারের গলায় শত শত উপলক্ষে বহু সহস্রবার আবৃত্তি হয়েছে। তেভাগা আন্দোলনের কিংবদন্তী নেত্রী ইলা মিত্র, পুলিশ-মিলিটারীর অত্যাচারে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর কাহিনী নিয়ে এই কবিতা। তাঁর মৃত্যুর পরদিন (১৫

ডিসেম্বর ২০০৬) পার্টির পত্রিকা 'কালান্তর'-এ লেখা হয়, 'তিনি যদি সারাজীবন আর কোনও কবিতা না-ও লিখতেন, তিনি তাঁর ইলা মিত্র কবিতার জন্য চিরস্মর হয়ে থাকবেন।' অথচ 'ইলা মিত্র'-র পর পাঁচ বছর তিনি কোনও কবিতা লেখেননি। পাঠক যখন কবিতাটি মুখস্থ বলে যাচ্ছে তখন কিছু সমালোচক, তাদের মধ্যে 'আপনারা শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন এমন কিছু কমিউনিস্টও আছেন' মত প্রকাশ করলেন, ওটি আর যাই হোক, কবিতা নয়। ওতে প্রবন্ধ আছে, উত্তেজিত ভাষণ আছে, কিন্তু কবিতার শিল্প কোথায়?

এসব কথা কবির ওপর ভার হয়ে চেপে বসে ছিল। সে ভারের চাপ থেকে বেরিয়ে আসতে তাঁর পাঁচ বছর লেগেছিল। 'ইলা মিত্র' প্রকাশের পাঁচ বছর পর তাঁর কলম থেকে প্রথম কবিতাটি বেরিয়েছিল।

বস্তুত গোলাম কুদ্দুস সম্পর্কে এমন একটা মত, খুব চাপা, খুব অস্ফুট, চলে আসছে। উনি খুব বলিষ্ঠ লেখক, মাটির কাছের লেখক, মাঠঘাটের মানুষের লেখক, ভুল হোক, ঠিক হোক নিজের আদর্শে দৃঢ় লেখক, কিন্তু কতটা লেখক উনি? লেখায় সাহিত্যের সেই শিল্প-সুষমা কোথায়?

নেই? শিল্প, কল্পনা, বাস্তব থেকে স্বপ্নে, স্বপ্ন থেকে স্বপ্নে, মিছিল থেকে রূপকথায়, রূপকথা থেকে তেভাগার মায়ের পর্ণকুটিরে চলে যাওয়া এবং উপকথার হাত ধরে ফিরে আসা...

তেভাগার লড়াই-এর এলাকায় মাঠে মাঠে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন গোলাম কুদ্দুস। ফিরে এসে স্বাধীনতায় রিপোর্টাজ লিখছেন, একাই চলেছি কিন্তু বাচ্চা ছেলেটি সঙ্গ ছাড়ছে না। তাকে সম্বোধন করেই লেখা :

'হঠাৎ তুমি বললে, আপনার তেষ্টা পায় নি?

—পেয়েছে। সামনের গ্রামে গিয়ে জল খাব।

—না, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি দৌড়ে জল নিয়ে আসছি।

পাশেই একটা মরিচের ক্ষেত। চারপাশে উঁচু মাটির বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে কয়েকটি বাবলা গাছ যেন আমার জন্যই এতকাল অপেক্ষা করছিল। তাদের ছায়ায় গিয়ে বসলাম। বসে বসে তোমার ক্ষুদ্র মূর্তিটি ক্ষুদ্রতর হতে হতে হঠাৎ আমার মনে হলো এই-রকম এক একটি বালকই কি প্রাচীন কবিদের কখনো ধ্রুব, কখনো নচিকেতা, কখনো প্রহ্লাদ চরিত্র সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে? হয়ত নিষাদপুত্র একলব্য এইরকম কোনও গ্রাম থেকেই দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল!

একটু পরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে আবার তেমনি করে দৌড়ে আমার দিকে এলে, তোমার গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। ...কোঁচড়ভর্তি মুড়ি আর আখের গুড় এনেছ। হাতে পিতলের ঝকঝকে মাজা বদনায় শীতল জল। ...বিদায় নিতে গিয়ে আমি বললাম, আচ্ছা, এবার যাই, কেমন?

তুমি বললে, আবার আসবেন।

—আসব।

তোমার মুখে হাসি ফুটে উঠল। কারণ তুমি আমার কথা সরল অন্তঃকরণে বিশ্বাস করেছিলে। ...ইতিপূর্বে কত জায়গায় কতজনকে বলেছি, আবার দেখা হবে। কিন্তু তাদের ক'জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। অথচ এমনি করেই সারাজীবন বলতে হয়। তোমাকেও বললাম। আর মনে মনে এও জানি, কোন দিন দেখা হলে এই-তুমি তো সেই-তুমি থাকবে না।

আমি কিছু দূর এসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, তুমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছ। আমি যতই হাঁটছি ততই বুঝতে পারছি আমার পিঠের ওপর তোমার দৃষ্টি আছড়ে পড়ছে। আমি আর তাকাতে সাহস করলাম-না'।

আর এক জায়গায় :

'বুড়ি হাত নেড়ে আমায় কাছে ডাকল। কাছে যেতেই ফিসফিস করে বলল, তুমি কার ঘরের ছেলে বাবা। কেন এই 'রাক্ষসপুরীতে এসেছ, পালাও শিগগির। নইলে এরা মেরে ফেলবে।

এতক্ষণে আমার গা শিউরে উঠল। বাল্যকালের কোনো রূপকথা শুনতে শুনতে যেন এইরকম এক বুড়ির কল্পনা করেছিলাম, আর তার মুখের ভাবও যেন এই রকমই ছিল। আজ বাস্তবে তার নমুনা দেখে ভয়ে বিস্ময়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বুড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হলো রূপকথার গল্পকারেরাও বোধহয় এমনি করে অবরুদ্ধ জনপদের অভিজ্ঞতাই কল্পনার রঙ চড়িয়ে প্রকাশ করেছিল। তাতে থাকত রাজকন্যা রাজকুমার তেপান্তরের মাঠ, জীয়ন কাঠি মরণকাঠি। বুড়ি উঁচু দাওয়ার ওপর বসে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, আমাদের তুমি দেখতে এসেছ। আহা মায়ের বুকে ফিরে যাও বাবা। নইলে এরা তোমাকে খুন করবে বাবা।

বুড়ি ফিসফিস করে আরো কত কি বলতে লাগল আর মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি করে বলল—পালাও।'

এ-ও যদি সাহিত্য না হয়, কাকে বলে সাহিত্য?

উদ্ধৃতি দুটি গোলাম কুদ্দুসের রিপোর্টাজসংগ্রহ 'সম্বোধন' থেকে নেওয়া। অন্যান্য তথ্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে এবং গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও নবহবি কবিরাজ, সুনীল মুন্সী প্রমুখের কাছ থেকে পাওয়া। বিনীতভাবে এঁদের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি।

গোলাম কুদ্দুসের সাহিত্যে তেভাগার লড়াই

সুস্নাত দাশ

তেভাগা-আন্দোলনের ইতিকথা অনেকের জানা হলেও নতুন প্রজন্মের কাছে হয়তো তা অজানা। সার কথায় ঘটনাটি এই রকম : প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে পরাধীন ভারতবর্ষের বঙ্গদেশের গ্রামে-গঞ্জে এই আন্দোলন-লড়াই সংঘটিত হয়েছিল উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের দাবিতে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার ডাকা কমবেশি উনিশটি জেলায় প্রায় ষাট লক্ষ মানুষের এই সংগ্রামটি ছিল কৃষক, ভাগচাষি ও কৃষি-শ্রমিকের আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস ও স্বাধিকারের সংগ্রাম। আন্দোলনের এক পক্ষে প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ সরকার, প্রবলশক্তির জমিদার ও প্রভাবশালী জোতদার-মহাজনের দল আর অপর পক্ষে সাধারণ চাষি, নিপীড়িত খেত-মজুর ও প্রবঞ্চিত বর্গাদার। ফসলের ভাগ কতটা পাওয়ার অধিকার কার—তা নিয়ে স্বাধীনতার আগে ও পরে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রামের পর শেষ পর্যন্ত এ-লড়াইতে বিজয়ী হয়েছিল দ্বিতীয় পক্ষের গরিব-ভাগচাষি ও কৃষি-শ্রমিকগণ এবং পরাজিত হয়েছিল প্রথম পক্ষের সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তি।

ঐতিহাসিক এই ঘটনাপুঞ্জকে অবলম্বন করে সেকালের সাহিত্যিক-শিল্পী-সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত বস্তুনিষ্ঠ ছোটগল্প, রিপোর্তাজ ও স্মৃতিচারণগুলি তাৎপর্যময়, কল্যাণময়ী। দেশবাসীর কাছে এর প্রাসঙ্গিকতা আজও অনেক, নানা কারণে। প্রথম কারণ : তেভাগার আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। হিন্দু-মুসলমান-সাঁওতাল (অবিভক্ত ঔপনিবেশিক বাংলার) সকল ধর্মের কৃষি-উৎপাদক ও খেত-মজুর এতে সমবেতভাবে যুক্ত ছিল ; যোগদানকারীদের মধ্যে জাতি-শ্রেণি-বর্ণের বিভেদ ছিল না। দ্বিতীয় কারণ : তেভাগার আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। কৃষিজীবীদের ঘরের মেয়ে-বৌরা এই সংগ্রামে বিরাট সহযোগী ছিলেন ; অনেক ক্ষেত্রে প্রধান শক্তি। তাঁরা লেখাপড়া জানতেন না, দুবেলা খাবার জুটত না, কতশত ধর্মীয় সংস্কার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলেন, কিন্তু এ-সবের উর্ধ্বে উঠে তখন তাঁরা যে সাহস সচেতনতা ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন তা অসাধারণ ও বিস্ময়কর। তেভাগা কৃষক সংগ্রাম বা উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবার ন্যায্য দাবিতে সংগঠিত বাংলার ভাগচাষি-বর্গাদার আন্দোলন সংগ্রাম ছিল এমনই একটি জ্বলন্ত বিষয় যার সঙ্গে জনগণের বেঁচে থাকা ও জীবনধারণের প্রশ্নটি ছিল সম্পৃক্ত। তাই এই কৃষক-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে রচিত শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-নাটক ও অন্যবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আজও শাশ্বত হয়ে রয়েছে।

কবি ও সাংবাদিক গোলাম কুদ্দুসের যে রচনাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা একাধারে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গল্প ও রিপোর্তাজ। এর মধ্যে সর্বোত্তম, যেটি একটি রসোত্তীর্ণ ছোটগল্পের খ্যাতি অর্জন করেছে তা হল—'লাখে না মিলয়ে এক'। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত রচনাটির নানাস্থানে অসংখ্য পুনর্মুদ্রণ হয়েছে, এর অসাধারণত্বের জন্য। আসলে এটিকে

দিনাজপুরের রক্তে রাঙা মাটি থেকে উঠে আসা কৃষক সংগ্রামের এক জীবন্ত দলিলও বলা চলে। কুদ্দুস সাহেব শুরু করেছেন এইভাবে : 'লাখে না মিলয়ে এক। আমি যাট লাখে পেয়েছিলাম তোমাকে ভিখু, কত বছর আগে কৃষকদের মধ্যে এসেছিল সেই আলোড়ন, যাকে বলা হয় তেভাগা আন্দোলন? ...বাংলাদেশের এক অতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আন্দোলন যে ছড়িয়ে পড়েছিল, সে আমি নিজের চোখেই দেখেছি। এর খবরাখবর জোগাড়ের জন্য আমাকে তখন বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল। আজ এতকাল পরে অবাক হয়ে ভাবছি, এত লোকের মধ্যে শুধু তোমার কথাই কেন এমন করে মনে আসছে।'

এই কৃষক-বালক ভিখুকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কে টানটান তেভাগার রক্তাক্ত কাহিনী। দিনাজপুরের খাঁপুরে তখন গুলি চলছে, চলছে পুলিশ-মিলিটারির যৌথ সন্ত্রাস। গোটা গ্রামাঞ্চল পুরুষ শূন্য। বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধ। এই অবস্থায় সাংবাদিক গোলাম কুদ্দুস রওনা হয়েছেন খাঁপুর। উদ্দেশ্য সংবাদ সংগ্রহ। কেউ সেই মৃত্যুপুরীতে যেতে সাহস না করায় তিনি একাই এসেছেন। কিন্তু পথে মিলে গেল বীর কৃষক বালক ভিখু। উনিশশো সাতচল্লিশ সালের অভিমন্যু যে চক্রব্যূহ ভেদ করে পথ দেখাচ্ছে বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ এক সেনানীকে। গোলাম কুদ্দুস লিখেছেন, 'আমি এখন বুঝতে পারছি, কেন সব ছাড়িয়ে তোমার স্মৃতি আমার কাছে এমন উজ্জ্বল হয়ে আছে। ...তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার মাসখানেক আগে আমি সেইরকম একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। রূপনারায়ণ রায়ের নামটা হয়ত শুনে থাকবে। তোমাদের এলাকার এম.এল.এ। আমি তাঁর ঘরের দাওয়ায় বসে কেরোসিনের ডিবের আলোয় খবর লিখতাম, আর মাঝে মাঝে কান পেতে শুনতাম গ্রামের রাস্তায় পাহারারত ভলান্টিয়ারদের মাতোয়ারা কন্ঠের আওয়াজ—'জান দেব তবু ধান দেব না।' ...মাটির সানকিতে ডাল-ভাত খেয়ে আমি ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে গরম খড়ের বিছানায় শুয়ে শীতে কাঁপতাম, আর পাহারারত ভলান্টিয়ারদের নৈশ বিচরণের জামা-কাপড়ের অবস্থার কথা ভেবে লজ্জা পেতাম। সকালে তারা অনেকে এসে সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে বলত, কমরেট, এটা গায়ে দিলে শীত লাগে না, —না?

'মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়া কি সোজা কথা?'

তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট সাংবাদিক গোলাম কুদ্দুসের কোনো অসুবিধাই হয়নি তেভাগার দাবিতে সংগ্রামরত কৃষকজীবনের শরিক হতে। এমনকী সাংবাদিকতা করতে গিয়ে কখনো কখনো অবস্থাগতিকে তাঁকে রণক্ষেত্রে কৃষকনেতার দায়িত্ব পর্যন্ত অবিচলিতভাবে পালন করতে হয়েছিল। তার বিবরণও রয়েছে 'লাখে না মিলয়ে এক'-এর মূল্যবান বিবরণ-মালায়।

গোলাম কুদ্দুসের 'লাখে না মিলয়ে এক' শুরু হচ্ছে এক মহান গণআন্দোলনের কাহিনী-কথনের মধ্য দিয়ে। তিনি লিখেছেন :

"সব অন্দোলনে যুবকরাই থাকে সকলের পুরোভাগে। কৃষক আন্দোলনেও সেদিন তার ব্যতিক্রম হয়নি। 'এক ভাই, এক টাকা, এক লাঠি'—আওয়াজটা তাদেরই সব থেকে আকৃষ্ট করেছিল। তারাই দলে দলে ভলান্টিয়ার হয়েছে, তারাই গাথা বেঁধে ধান কেটেছে; তারাই লাঠির ডগায় নিশান বেঁধে মিছিল করছে, আর তারাই রাত জেগে পুলিশের হামলা ঠেকাতে

পাহারা দিয়েছে। কিন্তু কৃষক মেয়েরা তাদেরও হার মানিয়ে দিয়েছে। আমি এখনো চোখের সামনে দেখতে পারছি রাণী-শঙ্কাইলের মেয়েদের। তারা পুলিশের হাত থেকে চারটে বন্দুক কেড়ে এনেছে। পুরুষদের মধ্যে হুলুস্থুল কাণ্ড! কি করে বন্দুক ফেরৎ দেওয়া যায়, সে এক ভাবনা। আর এই সময় মেয়েদের মারধর করার সনাতন রীতিটা হঠাৎ যুক্তি বহির্ভূত বলে মনে হতে লাগলো। এখন এ নিয়ে অনেক গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল। কৃষক সমিতির কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে অভিযোগ করার দৃশ্য আমিও দু-একটা দেখেছি।"

তেভাগা কৃষক আন্দোলনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রমজীবী নারী-চেতনার জাগরণ এবং নারীশক্তির মুক্তি। বাংলা তথা ভারতের গণআন্দোলনের ইতিহাসে নারীদের বিশেষত শ্রমজীবী নারীসমাজের এত ব্যাপক অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগ অন্য কোনো গণআন্দোলনে ঘটেনি। গ্রাম বাংলার কৃষক-রমণী হাজার বছরের অপমান, লাঞ্ছনা, অত্যাচার, অবিচার ও কালিমার পঙ্ক থেকে এই আন্দোলনে উঠে এলো মহাশক্তিময়ী রূপ নিয়ে। তেভাগা কৃষক আন্দোলনে এদের তুলনাহীন সাহসিকতা দীপ্ত আদর্শবোধ, সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের ক্ষমতা ও উন্নততর সাংস্কৃতিক চেতনা নতুন দীপ্তিতে ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছে।

সাধারণত কৃষক সমাজের উপর যে পর্বত সমান সামাজিক সংস্কার ও অর্থনৈতিক শোষণের ভার চাপান থাকে তদাপেক্ষা অধিক শোষণ, নিপীড়ন, অবিচার ও সংস্কারের বোঝা সামাজিক অর্থনৈতিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে বইতে হয় কৃষক মেয়েদের। একদিকে শ্রেণী-বৈষম্যজনিত অত্যাচার, অপরদিকে লিঙ্গ বৈষম্যজনিত নির্যাতন এবং সর্বোপরি জীবন ও জীবিকার নানা ক্ষেত্রে সামাজিক দলন এই ত্রিমুখী আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় কৃষক রমণীদের। এতটা দুর্ভাগ্যের শিকার কৃষক-পুরুষদের হওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। সহস্র বছরের নানাবিধ পশ্চাদ্‌পদ ধ্যানধারণা, কুসংস্কার বা পরিবর্তন বিরোধী চিন্তাচেতনা গ্রামাঞ্চলের কৃষক-মেয়েদের উপর বিশাল এক বোঝার মতন চাপান থাকে—যার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ বিষয় নয়। ফলে এই যুগ যুগ লাঞ্ছিত কৃষক মেয়েরা যখন নানাভাবে (রাষ্ট্রিক, সামাজিক, পারিবারিক) সর্বস্ব পণ করে সংগ্রামে নামেন, তখন বোঝা যায় যে অবগুণ্ঠিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামাঞ্চলে কৃষক সমাজের মূল স্তম্ভটি নড়ে উঠেছে আর এই সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া হবে গভীর ও সুদূরপ্রসারী। গ্রামীণ সমাজ জীবনে মূল জীবনধারাকেই বদলে দেবে এই নারী জাগরণ। তেভাগা কৃষক সংগ্রামের সময় বহুযুগ ধরে চাপা পড়ে থাকা এই নারী শক্তিরই একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল।

এর পশ্চাতে নিঃসন্দেহে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র একটি ভূমিকা রয়েছে। শহরাঞ্চলে কমিউনিস্ট নারী সংগঠনের ১৯৩০-এর দশকের শেষ থেকেই কিছু কিছু শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন 'জনযুদ্ধে'র পর্যায়ে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'-র নামে তখন সারা বাংলার বিভিন্ন মফস্বল শহরে এবং বৃহৎ নগরগুলিতে নারী-সমাজকে সুসংগঠিত করার পরিকল্পিত উদ্যোগ শুরু হয়েছিল। বিশেষ করে ১৯৪৩-এ মন্বন্তরের সময় এই সংগঠনের কাজ বিশেষ, প্রশংসা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই সময় থেকেই বাংলার গ্রামাঞ্চলেও কৃষক-রমণীদের সংঘবদ্ধ করা, তাদের

মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করার কাজ কমিউনিস্ট পার্টির নারীসংগঠনের নেতৃত্বে দ্রুত অগ্রসর হয়। ইতোপূর্বে ১৯৩৭-৩৮ সাল থেকেই কৃষকসভার নেতৃত্বে বাংলার গ্রামাঞ্চলে কৃষক সংগঠনের বিস্তার ঘটলেও তা ছিল প্রধানত পুরুষকেন্দ্রিক। কৃষক রমণীদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা তাতে ছিল না। কার্যত তেভাগা কৃষক আন্দোলনের সময়েই কৃষক-মেয়েদের মধ্যে মহিলা সমিতি বা সংগ্রামী শ্রমজীবী নারীসংগঠন গড়ে ওঠে এবং তা দ্রুত বাংলার তেভাগা আন্দোলন অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় পর্যায় দেখা যায় শুধুমাত্র মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করা নয় আন্দোলনকারী পুরুষ কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন কৃষক রমণীরা। লড়াইয়ে বেশ কিছু কৃষক গ্রেপ্তার হয়ে জেলহাজতে যান এবং তাদের বিচারের জন্য আদালতে পেশ করা হয়। মহিলা সমিতির নেতৃত্বে হাজার হাজার কৃষক রমণী মিছিল করে শহরে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া কৃষকদের জামিনের দাবিতে মহকুমা হাকিমের বাংলো ঘেরাও করে। দিনাজপুর ও রংপুরে জমিদার, জোতদারদের লাঠিয়াল বাহিনীর হাত থেকে আন্দোলনের প্রথম দিকে কৃষক রমণীরা পুরুষদের আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করতেন-ও তাদের খাদ্য-রসদ প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করতেন। কৃষক রমণীরাই সমস্ত শাসানি ও ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করে তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কৃষক রমণীদের সেই বীরত্ব নিয়ে আজ তেভাগা সংগ্রামের দেশি-বিদেশি বহু গবেষক গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন। এঁদের এই আত্মদান অনুপ্রাণিত করেছিল বাংলার সাহিত্যিক-গল্পকারদেরও। তেভাগা কৃষক সংগ্রামে নানাভাবে ও ভঙ্গিতে কৃষকরমণীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এঁরা অমর করে রেখেছেন তাঁদের রচিত ছোটগল্পগুলিতে। গোলাম কুদ্দুস রয়েছেন তাদের অগ্রভাগে।

দিনাজপুরের চিরির বন্দরই হোক, কিংবা খাঁপুর, হুগলির ডুবিরভেরী হোক কিংবা সুন্দরবনের কাকদ্বীপ সর্বত্রই তেভাগা আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের গুলি বা জোতদারের লাঠিতে পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রাণ দিয়েছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন কৃষক রমণীরা। ময়মনসিংহের হাজং রমণী রাসমণি থেকে কাকদ্বীপের চন্দনপিঁড়ির অহল্যা, বাতাসী, সরোজিনী, উত্তমী—আজ পর্যন্ত বাংলার কোনো আন্দোলন সংগ্রামে এত নারী জীবন বিসর্জন দিয়েছেন বলে জানা যায় না। দিনাজপুর জেলার রাণীশঙ্কাইল অঞ্চলের কৃষক বধূ জয়মণি সামান্য লেখাপড়াও জানতেন, তাঁর প্রতাপ ছিল দোর্দণ্ড। তাঁর দলের আক্রমণে পুলিশ অনেক সময়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। দিনাজপুরের অপর একজন সাহসী কৃষক রমণী ও নেত্রী ছিলেন দীপেশ্বরী। লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে তিনি অন্যান্য ভলান্টিয়ারের সঙ্গে পুলিশদের আক্রমণ করেন পুলিশ পিছু হঠে পলায়ন করে। দিনাজপুরে এমন আরো অনেক সাহসী কৃষক রমণী ছিলেন যেমন—শিখা বর্মণ, মাতি বর্মণী, জয় বর্মণী—যারা তেভাগা আন্দোলনের সময় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। দিনাজপুরের খাঁপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ (৭ ফাল্গুন, ১৩৫৩)। পুলিশ সর্বমোট গুলি চালায় ১২১ রাউন্ড। পার্শ্ববর্তী সিংহবাহিনী কাছারি থেকে জমিদার অসিতমোহন সিংহের

লোকেরাও গুলি চালালো। চিয়ার সাই শেখ সহ ১৪ জন কৃষক যশোদারাণী ও কৌশল্যা কামারণী এই দুই কৃষক-রমণী সহ ঘটনাস্থলেই নিহত হলেন। বালুরঘাটে সদর হাসপাতালে মারা গেলেন আরও ৮ জন। তেভাগা আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বৃহত্তম হত্যাকাণ্ড এইভাবে খাঁপুরে ঘটেছিল যার প্রথম বলি কৃষক-রমণী যশোদারাণী।

১৯৪৮ সালের ৬ই নভেম্বর, কাকদ্বীপ থানার চন্দনপিঁড়ি গ্রামে—যেখানে কৃষক নেতা গজেন মালী, গজেন ভুইয়াঁ প্রমুখের নেতৃত্বে স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই জমিদার, জোতদারদের জমি দখল অভিযান শুরু হয়—সেখানে পুলিশ ও গোর্খা সৈন্যের সমবেত আক্রমণ শুরু হয় হৃত জমি পুনরুদ্ধারের জন্য। এই আক্রমণের মুখে রুখে দাঁড়িয়েছিল শত শত কৃষক রমণী। পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন অশ্বিনী দাস (সরোজিনীর ভাই) উত্তম দাসী, বাতাসী, সরোজিনী এবং অন্তঃসত্ত্বা মা অহল্যা দাসী। এরা সকলে ছিলেন নিতান্তই তরুণী। পুলিশ ও সেনাবাহিনী যেভাবে সেদিন পাশবিক কায়দায় নিহত নারীদের মৃতদেহগুলিকে অসম্মান করেছিল, গর্ভবতী অহল্যার পেট বেয়নেট দিয়ে চিরে গর্ভস্থ ভ্রূণকে হত্যা করেছিল, সেই বিবরণ (এই ঘটনা নিয়ে সলিল চৌধুরী সহ বিশিষ্ট কবিরা শোকগাথা, কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেন) যখন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয় তা তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের ভাবমূর্তি নিঃসন্দেহে কালিমালিপ্ত করেছিল।

একই ধরনের ঘটনা ঘটে তিনমাসের মধ্যেই ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ সালে হুগলি জেলার ডুবিরভেরী অঞ্চলে। ১৯ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৯) সন্ধ্যেবেলা আকস্মিকভাবে পুলিশি হামলা হয়। বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে এই হামলার মোকাবিলা করছিলেন ওই অঞ্চলের কৃষক রমণীরা। পাঁচজন তরুণী ও দুজন বয়স্ক গৃহবধূসহ মোট ৭ জন কৃষক-রমণী পুলিশের গুলি চালনায় নিহত হন। এঁরা ছিলেন পাঁচুবালা ভৌমিক, দাসীবালা মাল, পুষ্পবালা মাঝি (দাসী), চণ্ডী (কালী) বালা পাখিরা, মুক্তকেশী মাঝি। এঁরা সকলেই 'ডুবিরভেরীর পঞ্চকন্যা' নামে স্থানীয় ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। হাওড়া জেলায় মাসিলা অঞ্চলে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯-এ পুলিশের গুলিতে নিহত হন কৃষক-রমণীসহ ৮ জন কৃষক। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ তারিখে একজন বালিকাসহ ৮ জন কৃষক-রমণী মৃত্যুবরণ করেন। শহীদ হন গর্ভবতী সুধা সাঁতরা, বৃদ্ধা মাখনময়ী পণ্ডিত, পারুলবালা সাঁতরা, সিন্ধুবালা দলুই, বালিকা পাত্র, আর ৯ বছরের মেয়ে যশোদা সাঁতরা। এছাড়া আরও যে দুজন শহীদ হয়েছিলেন তাঁরা হলেন অষ্টবালা পণ্ডিত ও ননীবালা পাত্র।

এই 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' আকস্মিকভাবে হয়নি। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্ব কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক সমর্থন নিয়েই বাংলার কৃষক সমাজের মধ্যে তেভাগা সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে এবং অবশ্যই তার আগে ও পরবর্তীকালেও এক ধরনের 'আন্দোলনের মধ্যে আন্দোলন' (Movement Within) গড়ে তুলেছিলেন। কমিউনিস্ট মহিলা নেতৃত্ব গ্রামীণ কৃষক রমণীদের উপর দ্বি-মুখী শোষণের চরিত্রটিকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

প্রথমত, চাষি পরিবারের একজনরূপে কৃষক রমণী একই ধরনের অর্থনৈতিক শোষণের ভাগীদার ছিল।

দ্বিতীয়ত, পুরুষদের যা সহ্য করতে হত না একজন নারীরূপে গ্রামের জোতদার-জমিদার ও তাদের কর্মচারীদের কাছ থেকে অন্য একধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, লাঞ্ছনা ও অত্যাচার কৃষক-রমণী সহ্য করতে বাধ্য হত। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিবেশে গ্রামীণ সমাজের ওই শোষক সম্প্রদায় দ্বারা নিরন্তর আক্রান্ত হত কৃষক-রমণীর নারীত্ব ও সম্মান।

তৃতীয়ত, একদিকে কৃষক রমণী যেমন সামন্ত প্রভুদের কাছে ছিল সম্পত্তির মতো বেচাকেনার সামগ্রী ও তাদের বিকৃত লালসা চরিতার্থ করার উপাদান বিশেষ; অপরদিকে তার নিজের পরিবারেও স্বামী, পুত্র বা অন্য পুরুষের কাছেও সে ছিল পণ্য বা যন্ত্র মাত্রভারবাহী পশুর মতোই তাকে মার খেতে হত ও নির্যাতিত হতে হত। কার্যত মহিলা সমিতির দ্বারা সংগঠিত হওয়ার ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন হওয়ার পূর্বে কৃষক নারীরা কোনো অর্থেই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য, আত্মপরিচিতি ও অস্তিত্ব সম্পর্কে তেমনভাবে সচেতন ছিলে না। তেভাগা আন্দোলন শুরু হওয়ার সূচনাপর্বেও কৃষক সমিতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ নিয়ে পুরুষদের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠেছিল। ময়মনসিংহে এই সংক্রান্ত একটি হাজং সভায় প্রবীণতর পুরুষদের এই ধরনের আপত্তির জবাব মেয়েরাই দিয়েছিলেন, 'আমরা যখন তোমাদের সঙ্গে একত্রে মাঠে ধান বুনতে বা ফসল তুলতে যাই তখন তা তোমাদের শোভনতায় বাধে না, তাহলে আমরা যখন কৃষক সমিতির সভায় আসতে চাই তখন তা আপত্তিকর হয় কিরূপে।' রংপুরেও, পুলিশকে কীভাবে প্রতিরোধ করা হবে এ বিষয়ক সভাতে মেয়েদের অংশগ্রহণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল অনেক বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর নির্ভর করত না, নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াই যথেষ্ট ছিল। এর বিবরণ দিয়েছেন শিল্পী সোমনাথ হোড় তাঁর বিখ্যাত তেভাগার ডায়েরিতে ২৬-১২-১৯৪৬ তারিখে।

এইভাবে প্রাথমিক স্তরে ছোট ছোট সংঘাতের মধ্য দিয়ে কৃষক নারীরা তেভাগার সংগ্রামে নিজেদের অবস্থান দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। ক্রমশ পুরুষরাও উপলব্ধি করেন যে নারীসমাজের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ ছাড়া কোন শ্রেণী সংগ্রামই চলতে পারে না। সে সক্রিয়তার বিবরণ ইতোপূর্বে এই রচনায় দেওয়া হয়েছে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির রাজনৈতিক সভায় হিন্দু, মুসলমান, নিম্নবর্ণীয় আদিবাসী নারীদের একত্রে উপস্থিত হওয়াই ছিল গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন। পরে তা ক্রমশ পারিবারিক ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয়। প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে গোলাম কুদ্দুসের কিংবদন্তীপ্রতিম কবিতা 'ইলা মিত্র'-র কথা।

পূর্ব-পাকিস্তানে নাচোলের তেভাগা-নেত্রী ইলা মিত্র ৭.১.৫০ তারিখে রোহনপুরে গ্রেফতার হন। ইলা মিত্রকে হাতে পেয়ে লীগশাহীর পুলিশ কী করতে পারে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য নয়। কিন্তু না, পুলিশের অত্যাচার সম্পর্কে আমাদের কল্পনা যতদূর যায়,

তার সব কিছু যোজন যোজন পশ্চাতে ফেলে লীগশাহীর পোষা পুলিশ ইলা মিত্র-র উপর চালিয়েছিল মানব-ইতিহাসের বর্বরতম ঘৃণ্যতম এবং কল্পনাতীত এক নারকীয় অত্যাচার। কমরেড ইলা মিত্র তাঁর উপর অনুষ্ঠিত বর্বর পাশবিকতার যে ঘৃণ্যতম বিবরণ রাজশাহী-কোর্টের মামলা পরিচালনার সময় পেশ করেছিলেন, সেই ঐতিহাসিক জবানবন্দী থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তেভাগা কৃষক-সংগ্রামে নারীর অবদান :

"বিগত ৭.১.৫০ তারিখে আমি রোহনপুরে গ্রেফতার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোলে নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে মারধোর করে এবং তারপর আমাকে একটা সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সবকিছু স্বীকার না করলে আমার উলঙ্গ করে দেওয়া হবে এই বলে এস. আই. আমাকে হুমকি দেখায়। আমার যেহেতু বলার মতো কিছু ছিলো না, কাজেই তারা আমার সমস্ত কাপড় চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দী করে রাখে।

আমাকে কোনো খাবার দেওয়া হয় নি, একবিন্দু জল পর্যন্ত না। সেদিন সন্ধ্যেবেলাতে এস. আই-এর উপস্থিতিতে সেপাইরা তাদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমায় মাথায় আঘাত শুরু করে। সে সময়ে আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে। এর পর আমার কাপড়-চোপড় আমাকে ফেরত দেওয়া হয় এবং রাত্রি প্রায় বারোটার সময় সেল থেকে আমাকে বের করে সম্ভবতঃ এস. আই-এর কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে এ ব্যাপারে আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম না। যে কামরাটিতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তারা নানারকম অমানুষিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালালো। দুটো লাঠির মধ্যে আমার পা দুটি ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিলো এবং সে সময় চারিধারে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা বলছিল যে আমাকে 'পাকিস্তানী ইনজেকশন' দেওয়া হচ্ছে। এই নির্যাতন চলার সময় তারা একটা রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে দিয়েছিলো। জোর করে আমাকে কিছু বলাতে না পেরে তারা আমার চুলও উপড়ে তুলে ফেলছিলো। সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করে সেলে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো কারণ সেই নির্যাতনের পর আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব ছিলো না। সেলের মধ্যে আবার এস. আই. সেপাইদেরকে চারটে গরম সেদ্ধ ডিম আনার হুকুম দিলো এবং বললো, 'এবার সে কথা বলবে।' তারপর চার-পাঁচজন সেই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চিৎকরে শুইয়ে রাখলো এবং একজন আমার যৌনঅঙ্গের মধ্যে একটা গরম সিদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিলো। আমার মনে হচ্ছিলো আমি যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছিলাম। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।"

কমরেড ইলা মিত্র সমস্ত লজ্জা-সংকোচ দূরে ঠেলে ফেলে তাঁর ঐ জবানবন্দীতে পাক-সরকারের ঘৃণ্য বর্বরতার যে-চিত্র সেদিন উদ্ঘাটিত করেছিলেন পৃথিবীর যে-কোনো সভ্য দেশের ভিত্তিমূল তাতে কেঁপে উঠতে পারত, যে-কোনো বিবেকবান মানুষের মনেও জ্বলতে পারত দাউ দাউ ঘৃণার আগুন। কিন্তু লীগ-সরকারের এই কলঙ্কিত কাহিনী সেদিন পূর্ববাংলার মানুষ ভালো করে জানতেই পারেনি। লীগ সরকারের আজ্ঞাবহ 'আজাদ' কিংবা 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকা এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব ছিল। কলকাতার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'

ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এই বর্বরতম অত্যাচারের এক আংশিক বিবরণ। আর, ১৯৫০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলার আইন-সভায় কংগ্রেস-নেতা প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী এ-সম্পর্কে আলোচনার জন্য মুলতবী প্রস্তাবের নোটিশ পাঠিয়েছিলেন। আর কবি গোলাম কুদ্দুস রচনা করেছিলেন কবিতা। কবিতাটির কিছু পংক্তি উদ্ধৃত করা চলে :

'ইলা মিত্র রাজসাহী জেলে।
স্বামী তাঁর শান্ত ঋজু দৃঢ়
ফেরারী এখনো পাকিস্তানে,
উভয়ের শিশুপুত্র কোথা
মাতাপিতা সঙ্গহীন বাড়ে!

"এ বেদনা কবিচিত্তে যদি
মাঝে মাঝে আনে ব্যাকুলতা,
তবু জেনো প্রকাশের মত
ভাষা নেই বিদ্যুৎসঞ্চারী।...

"পূর্ববঙ্গে লোক দেশত্যাগী,
তুমি গেলে দেশের গভীরে—
কৃষকের হৃদয়ের কাছে।
"ওঠ, জাগো, নাচোলের চাষী!"
ঘরে ঘরে দিলে তুমি ডাক।
"জাগো, লালঝাণ্ডা নিয়ে, জাগো!"
শঙ্কাহীন জানালে আহ্বান।
ক্ষুধাতুর ব্যথাতুর যারা
সাড়া তারা দেয় ধীরে ধীরে।

"যত জাগে মানুষের প্রাণ,
নিদ্রা তত ঘোচে পশুদের।
ক্রুদ্ধ তারা দিবারাত্রি খোঁজে
ইলা মিত্র—ইলা মিত্র কোথা?

ইলা মিত্র কৃষকের ঘরে
মিশে যায় কৃষকের মেয়ে।
ইলা মিত্র ঘোরে গ্রামে গ্রামে

কৃষকের খুদকুঁড়ো খেয়ে।
ইলা মিত্র খালি পায়ে চলে
মেঠো পথে রোদ-বৃষ্টি-জলে।"

"ইলা মিত্র ইস্পাতের গড়া।
ইলা মিত্র সংগঠন গড়ে।
পুলিশ ঘেরাও করে বাড়ি
দুঃসাহসী মেয়ে অকাতরে
ঝাঁপ দিল কুয়োর ভিতরে।
ক্ষিপ্ত বোকা শিকারীর দল
ফিরে যায় আরো ক্রুদ্ধ হয়ে।
তারপর ছুটে এল তারা,
ধান কাটা নাচোলের মাঠে,..."

'ইলা মিত্র স্টালিন-নন্দিনী' আর 'ইলা মিত্র মর্মে মর্মে জানে যৌন নয়, সমস্যা জমির।'—কবি গোলাম কুদ্দুসের এই কাব্য পঙ্ক্তিতে তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকল কৃষকনারীর রাজনৈতিক চেতনাই যেন ভাষা পেয়েছিল।

কৃষকরমণীদের আত্মচেতনার এই উদ্বোধন ক্রমশ পরিচালিত হয় পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। দিনাজপুরের পশ্চিম ঠাকুরগাঁয়ের আটোয়ারীতে কমিউনিস্ট পার্টির একটি সভায় জনৈক নেতৃস্থানীয় কৃষক কর্মীর স্ত্রী (সেও একজন কৃষক সভার কর্মী) নির্ভীকভাবে পার্টির জেলা সম্পাদককে প্রশ্ন করেছিলেন—'কোমরেড, ঘরের লোকটাকে মারাবার রাইন (আইন) আছে কি পার্টিতে? হামার ঘরের কোমরেডটা হামাকে মারিবে ক্যান? বিচার চাই' স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা কমিউনিস্ট আইনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তখনই প্রস্তাব পাস হয়ে গেল। মহিলা নেত্রী ফুলেশ্বরীর বাড়িতে সভা করে কৃষক সমিতির জনৈক সদস্যের বিচার হয়—স্ত্রীকে মারার অভিযোগ। স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে ও জরিমানা দিয়ে ওই কৃষক মুক্তি পান।'

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তেভাগা আন্দোলন যখন কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রাদেশিক কৃষক সভার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, তখন বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্পাদক ভবানী সেন এই আন্দোলনের একটি তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ এর দ্বারা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কৃষক-নারীদের প্রতি কমিউনিস্ট নেতৃত্বের অনুভব ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত :

'সবচেয়ে অবদমিত, পদদলিত, পশ্চাদপদ ও নিরক্ষর কৃষকরমণী ধানরক্ষায়, তাদের ঘরবাড়ীর সম্মানরক্ষায় আর রক্তপতাকা রক্ষায় এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করে।

রামমোহন রায় যখন রেনেসাঁসের শিখা প্রজ্জ্বলিত করেন, তারপর থেকে নারীমুক্তি মহানগরীগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাঙলার গ্রামের নারীসমাজকে এই প্রথম জাগিয়ে তুলেছে তেভাগা আন্দোলন। কৃষক বীরাঙ্গনা, মহিলা বক্তা ও প্রচারাভিযানকারীরা এবং গ্রামের মহিলারা, যারা এই তেভাগা সংগ্রামে প্রায়শঃই পুরুষদের নেতৃত্ব দিত, যা বাঙলার সমাজজীবনে এক নতুন রেনেসাঁসের ইঙ্গিতবহ।'

'লাখে না মিলয়ে এক' স্মৃতিকথনে গোলাম কুদ্দুস তেভাগা কৃষক সংগ্রামে ডুয়ার্সের রেল শ্রমিকদের ভূমিকা স্মরণ করে লিখেছেন :

"দিনাজপুরে এসে ফুলবাড়ির মাঠে প্রথম তেভাগার ধান কাটা দেখলাম। একটা লাল নিশান পুঁতে রেল লাইনের ধারে ধান-কাটা হচ্ছিল। মাঝে মাঝে গানও গাওয়া হচ্ছে। একজন তামাক সাজছে সারাক্ষণ। কয়েকজন লোক ভাত-রাঁধার আয়োজন করছে। আজ মাঠেই বনভোজনের ব্যবস্থা। আমার পক্ষে খুশি এবং উত্তেজনা চেপে রাখা মুশকিল। আমি কয়েকজন সাঁওতাল কৃষকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম।

এই সময় দার্জিলিং মেল পাশ করে। হঠাৎ সেই দুরন্ত গাড়িটা মাঠের মধ্যে আমাদের কাছাকাছি এসে থেকে গেল। ড্রাইভার এবং ফায়ারম্যানেরা হাসছে, আর হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বলছে। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলতে বলতে কাস্তে হাতে একদল কৃষক ইঞ্জিনের দিকে দৌড়ে গেল। ড্রাইভার এবং ফায়ারম্যানেরা হাসছে, আর হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বলছে। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলতে বলতে কাস্তে হাতে একদল কৃষক ইঞ্জিনের দিকে দৌড়ে গেল। ওদিকে ওরাও গাড়ী থেকে পাল্টা ধ্বনি দিচ্ছে। গাড়ীর যাত্রীরা হতবাক হয়ে এই কাণ্ড দেখছে। হঠাৎ শুনলাম ধ্বনির ভাবটা বদলে দিয়ে কে যেন বলে উঠল— কৃষক-মজুর এক হও। ......ওদিকে গাড়ীর পিছন থেকে গার্ড ক্রমাগত তাঁর ফ্লাগ নেড়ে বাঁশী বাজিয়ে ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করছে। কিন্তু গাড়ীটার নড়ার লক্ষণ নেই। কারণ তখন কৃষকদের হাত থেকে একটা লাল নিশান নিয়ে ইঞ্জিনের মাথায় বাঁধা হচ্ছিল। তখন মনে হচ্ছিল দার্জিলিং মেলের মতোই আন্দোলন বাঁধা লাইন দিয়ে দ্রুত সম্মুখে ধাবিত হবে।"

রেল শ্রমিকরা, বিশেষত বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ের, তেভাগা কৃষক সংগ্রামের লড়াকু কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তা ঐতিহাসিক সত্য যার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে বিমল দাশগুপ্ত, অবনী লাহিড়ী, সুনীল সেন থেকে জ্যোতি বসুর স্মৃতিকথনে এবং সমসাময়িক পুলিশ ফাইল ও সরকারি রেকর্ডে। কুদ্দুস সাহেব লিখেছেন :

"কদিন পরে জেলা শহরে গিয়ে দেখি, সেখানে খুব উত্তেজনা। কোর্ট-কাছারিতে ঐ একমাত্র আলোচ্য বস্তু। আর ট্রেন যেতে যেতে তেভাগা আন্দোলনের নেতাদের সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত রোমাঞ্চ-কর ধারণা ব্যক্ত হতে শুনলাম। কেউ তাদের রাক্ষসের মতো নৃশংস কেউ বা তাদের অতি-মানব-বলে বর্ণনা করছে।"

'লাখে না মিলয়ে এক' এভাবেই শুধু তেভাগা আন্দোলনের অতিকথা, কথকতা নিয়ে শুধুমাত্র কোনো এক গ্রামের ছেলে ভিখুর কাহিনী মাত্র হয়নি, তা হয়ে উঠেছিল এক ঐতিহাসিক দলিল।

কথোপকথন : গোলাম কুদ্দুস

শ্রীলা বসু

'পরিচয়' নিয়ে গবেষণার সূত্রে মাঝেমাঝেই হাজির হয়েছি চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে 'পরিচয়'-এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর কাছে। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নরহরি কবিরাজ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুশীল জানা, রাম বসু প্রমুখরা স্মৃতির ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করেছেন সহজ উৎসাহেই। সংশয় ছিল গোলাম কুদ্দুস সম্পর্কে। স্পষ্টতা এবং তীব্রতা যাঁর লেখনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য, চল্লিশের শেষ দিকে রণদিভে-লাইন সমর্থনের জন্য পার্টির বন্ধুদের কাছেও যিনি চিহ্নিত হয়েছিলেন 'এগ্রেসিভ' হিসেবে,—তিনি সহজে অতীতের কথা বলবেন, এমন ভরসা দেননি কেউই।

ফোনে কথোপকথনের জন্য সময় চাইতে গিয়েও ধাক্কা খেতে হয়। 'আমার বাড়ি? এতটা কষ্ট করে আসবেন? —কেন?' —কণ্ঠস্বরে চাপা থাকে না ক্ষোভ। সহজ হয়নি গ্রীষ্মের দুপুরে বেকবাগানের রাস্তায়-গলিতে কয়েকবার ভুল ঠিকানায় হাজির হয়ে, চারপাশের এলোমেলো ঘরবাড়ির মধ্যে খুঁজে, তারপর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে কবির আস্তানাটির সন্ধান।

কিন্তু চৌকাঠ পেরোতেই সহজ হয়ে গেল পুরো পরিবেশটা। সহাস্য অভ্যর্থনা করে বসালেন ভিতরের ঘরে কারণ বসবার ঘরের পাখাটি খারাপ হয়ে রয়েছে। আরামকেদারাটিও ছেড়ে দিলেন—'এত গরমে এসেছ, ভালো করে বোসো'—বলে। তারপর সমস্ত আশঙ্কা, সংশয় কাটিয়ে একের পর এক নানা প্রশ্নের উত্তরে উঠে এল নানা কথা। সহজ, আন্তরিক ভাবে কেটে গেল ঘণ্টা তিনেক।

গো : হ্যাঁ, বলো।

শ্রী : আপনার ছাত্রজীবন তো কেটেছে কুষ্টিয়ায়—।

গো : হ্যাঁ। সে সব কথা পরে হবে। আগে বলো 'পরিচয়' নিয়ে তোমার গবেষণায় কী লিখেছ?

শ্রী : আমার গবেষণার বিষয় 'পরিচয়' পত্রিকার রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ—১৯৩১-১৯৬১।

গো : তা এই সময়ের মধ্যে তো আমরাও এসে যাচ্ছি।

শ্রী : হ্যাঁ।

গো : তুমি লিখেছ আমাদের সম্পাদনার কথা? কী তোমার বক্তব্য সেখানে?

শ্রী : আলোচনা করেছি কীভাবে আন্ডারগ্রাউন্ড পিরিয়ডে নানারকম বিপর্যয় অস্থিরতার মধ্যে পরিচয়-এর ঘনঘন সম্পাদক বদল হয়েছে। আপনি আর সরোজ দত্ত সম্পাদক হ'ন এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে—

গো : আরে, আমি তো কোনোদিনই 'পরিচয়'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম না। হঠাৎ

সম্পাদক হলাম। তুমি জানো, সতীন চক্রবর্তী বলেছিল যে আমরা নাকি 'পরিচয়' দখল করে নিচ্ছি—।

শ্রী : জানি।

গো : আদপেই কিন্তু তা নয়। এ সবের উত্তর দিতে গেলে বিরাট গলা করে বলতে হয়। তোমার হয়তো মনে হবে, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি। অত ধৈর্য থাকবে কি?

শ্রী : আপনি বলুন। আপনার কথা শুনতেই তো আসা।

গো : আমি ছিলাম পার্টির হোলটাইমার। চাকরি করিনি। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার কাজ করতাম। কোথায় পরিচয়—ইন্টেলেকচুয়ালদের কাগজ—আমার সঙ্গে কোনো যোগ ছিল না। 'স্বাধীনতা' ছিল পার্টির মুখপত্র। এমন সময় পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হল। 'স্বাধীনতা' বন্ধ। পার্টির নেতারা কর্মীরা অনেকে গ্রেপ্তার। সে এক ভীষণ স্বৈরাচার। 'স্বাধীনতা' বন্ধ হলেও কাগজ তো চাই—পার্টির কথা বলতে হবে—নতুন নাম—'নয়া দুনিয়া' নাম দিয়ে শুরু হল কাগজ—'স্বাধীনতা'র মতো অবশ্য দৈনিক নয়। বিভূতি গুহ, জ্যোতি দাশগুপ্ত আর আমি হলাম সম্পাদক। সম্পাদক হিসেবে একজন মুসলমানের নাম চাই। নাকি মিডল ক্লাস মুসলমান ইয়ুথকে টানতে হবে—তাই আমার নাম বড় বড় হরফে রইল। আর সে পত্রিকা তখন বর্ডারের ওপারেও যেত। মারওয়াড়িদের—ওরা তো চিরকালের ব্যাবসায়ী ওদের কাপড়ের গাঁটরি, কী অন্য মালপত্তরের পেটির মধ্যে—

শ্রী : এটা কবেকার ঘটনা?

গো : মোটামুটি ফেব্রুয়ারির শেষ—

শ্রী : আটচল্লিশ?

গো : হ্যাঁ, আটচল্লিশ। 'নয়া দুনিয়া' চলছে। এমন সময় একটা মজার ঘটনা ঘটল। তুমি আর কোত্থেকে জানবে, তুমি তো ছোট। পুরোনো লোকেরা সে কথা ভাবলে এখনও হাসাহাসি করে। দুই বাংলার—তখন পূর্ব পাকিস্তান আর ভারত—দুই বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা মিলে ঠিক করলেন—অল ইন্ডিয়া আর পাকিস্তান মিলিয়ে—রেলওয়ে স্ট্রাইক হবে। একেবারে এদিকে চিটাগাঙ থেকে ওদিকে করাচি-টরাচি ছাড়িয়ে আর আমাদের কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত—সব অচল হয়ে যাবে—৯ই মার্চ ১৯৪৯। পার্টি নেতারা চাইলেন কাগজে আমরা বেশ বড় করে এই নিয়ে লিখি সবাইকে আহ্বান জানিয়ে—ধর্মঘটের ডাক—এইসব। কিন্তু আমরা তো বুঝেছি যে এ হয় না—এত বড় কাণ্ড হবে না—শুধু লোকে হাসবে আর এ নিয়ে লিখে আমাদের নিয়েও হাসবে সবাই। আমরা দিলাম খবরটা—যে অমুক দিন স্ট্রাইক—কিন্তু ছোট হরফে, একপাশে। ব্যস্, পার্টি নেতারা বিরক্ত হলেন—তখন ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, নৃপেন চক্রবর্তী, রণদিভে—সব নেতৃস্থানে। আমাদের

তিনজনকে পাঠিয়ে দিলেন তিন জায়গায়। বাকি দুজনকে কোথায় পাঠানো হল জানি না, আমাকে বলা হল সাতদিনের মধ্যে ঢাকায় চলে যেতে। আমার এক বন্ধু পার্টিশানের সময় ওদিকে চলে গিয়েছিল—তার ফ্ল্যাটটা আমায় দিয়ে গিয়েছিল—ভালো রাস্তার উপরে সুন্দর বাড়ি—একেবারে সাজানো—সোফা-টোফা সব। আমি এখনও দেখি আর ভাবি—। তো আমি বললাম যাবো কোথায় এসব ছেড়ে—থাকব কোথায়? ওঁরা বললেন, ও, হবে। পার্টি বলেছে—যেতেই হবে। আমি কেউ নয়, পার্টির দাসানুসাস। দেশভাগের সময় ওদিকে যাওয়ার কথা বলেছিল অনেকে, যাইনি। কেন যাবো, কুষ্টিয়া থেকে কলকাতা ছিল সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ। কলকাতা আমাদের অনেক কাছের, কলকাতাতেই রয়ে গেলাম। হ্যাঁ, তারপর, এবার তো যেতেই হবে।

শ্রী : এটা কোন্ সময়?

গো : ঢাকায় পাঠাল ১৯৪৯-এর জুনে। ঢাকার নিবেদিতা নাগ ছিলেন নারায়ণগঞ্জ গার্লস কলেজের প্রিন্সিপাল। তাঁর স্বামী-নেপাল নাগ ট্রেড ইউনিয়ন লিডার—তিনি আমার ভার নিলেন। উঠলাম তাঁর বাড়িতে। ইতিমধ্যে কদিন যেতে না যেতেই খবর ছড়িয়ে গেছে। একদিন পুলিস এল—'আপনার পরিচয়'? আমি খুব বললাম—'আমরা হিন্দুরা তো ভারতে মুসলমান অতিথি এলে এমন ব্যবহার করি না।' মানে আমি হলাম হিন্দু, বুঝলে তো। খুব ভেঁটে বললাম। তা যাই হোক্ সেবারের মতো তো কাঁচুমাচু করে বিদায় নিল। কিন্তু নেপাল নাগ বললেন 'আপনার তো বেশিদিন এখানে থাকা নিরাপদ নয়'। তখন ঢাকায় আমার অনেক আত্মীয় বন্ধু। আমি তো মনে মনে তাদের তালিকা করছি। পরদিন ভোরে বেরোলাম রিক্সা নিয়ে। রিক্সাওয়ালাকে বললাম 'বড় জজ সাহেবের বাড়ি চেনো'? সে বলল—'ওই যে সবচেয়ে বড় জজ' মানে তিনি তখন ঢাকার চিফ জজ—ওই যে যান, ওই সাদা বাড়ি'—'এখন সকালবেলা, ওরা সব উঠে গেছে, অনেক সকালে ওঠে ওরা—যান'—। গেলাম। তারা তো আমাকে দেখে খুব খুশি 'আরে কবে এলেন ভারত থেকে—এখন কিন্তু থেকে যেতে হবে কয়েকদিন'—আমি মনে মনে ভাবছি থাকতেই তো এসেছি। এইভাবে সাতদিন করে করে কত লোকের বাড়ি। তার বেশি থাকা যায়—আমি তো বেড়াতে এসেছি। ওয়ালীউল্লাহর বাড়িতে থেকেছি কিছুদিন—ওই যে লালসালু লিখেছে। একদিন একজনের বাড়িতে আছি—ওয়ালীউল্লাহর চাকরের সঙ্গে দেখা। সে চলে গেল, কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এল—হাতে ওয়ালীউল্লাহর চিরকুট—'আপনি আমার বাড়ি চলে আসুন'। আমি লিখে পাঠালাম—'যাব একদিন'। আবার চিরকুট 'না একদিন নয়, এক্ষুণি।' তা গেলাম তার কাছে। এইভাবেই চলছে ঢাকায়। একদিন দুপুরবেলা তাস খেলছি ওয়ালীউল্লাহর বাড়িতে—তখন তো আমাদের কাজ

নেই তেমন—আর ও খুব বলত সংসারে জড়াবে না—পরে অবশ্য—এক ফরাসি মহিলার খপ্পরে পড়েছিল, বিয়েও করেছিল তাকে। তাই যাই হোক, তাস খেলছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক এলেন ওয়ালীউল্লাহর কাছে, আলাপ করিয়ে দিল—'ইনি ভারত থেকে এসেছেন, গোলাম কুদ্দুস' ইত্যাদি। ভদ্রলোক বললেন 'তাস খেলছেন, আপনারা, বেশ বেশ, খেলুন।' বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমি ওয়ালীউল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম 'কে ইনি'? বললে—'এখানকার গোয়েন্দা বিভাগের সাব অফিসার, খুব ভালো লোক, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।' আমি তৎক্ষণে উঠে জামাকাপড় পরতে লেগেছি। ওয়ালীউল্লাহ বলল 'আরে, চললেন কোথায়? ও কাউকে কিছু বলবে না, নিশ্চিন্তে বসুন।' আমি বললাম—'ও হয়তো বলবে না। কিন্তু ওর উপরে আমার যাঁরা কর্তা, আমার নেতারা, তাঁরা যদি জানতে পারেন যে ওঁকে দেখেও আমি নিশ্চিন্তে বসে তাস খেলেছি, তা হলে আর দেখতে হবে না'। বেরিয়ে পড়লাম দুপুরবেলা। পরদিন ওয়ালীউল্লাহর সঙ্গে দেখা হতে, আমাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল একেবারে—'আপনি বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই আর্মড পুলিশ। একেবারে সারা বাড়ি ঘিরে ফেলল—অফিসার আপনার কথা জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় গোলাম কুদ্দুস—আমি বললাম—উনি তো চলে গেছেন। কোথায় গেলেন? আর আসবেন না? —আমি বললাম তা তো জানি না—আসতেও পারেন তিন চারদিন পর নাও পারেন'। তো এই অবস্থায় থেকেছি ঢাকায়। ইতিমধ্যে ঢাকায় কিন্তু জানাজানি হয়ে গেছে—'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে মৈত্র মহাশয় যাবেন সাগরসংগমে'—ভারত থেকে নেতা এসেছেন। আর ঢাকায় তখন আস্তে আস্তে একটা ফিলিং তৈরি হচ্ছে। ঢাকার পাটের বাজার মন্দা। দেশভাগের পর পাটকলগুলো সব রয়ে গেল এপারে—গঙ্গার দু-ধারে। ওদিকে পাঞ্জাবে মানে পশ্চিম পাকিস্তানে তুলোচাষের রমরমা—ওদিকের বাজার ভালো। পূর্ব পাকিস্তানে ওই দেড় বছরেই একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে ওরা করাচি লাহোরের কলোনি মাত্র। এইসব নিয়ে শুনতে চায় আমার কাছে—ভারতের কথা জানতে চায়—জিজ্ঞেস করে কলকাতার কথা, যারা এদিক থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে গেছে। আর ঢাকার তখন যা অবস্থা—একমাত্র রমনায় যা একটু রমরমা। তা আমাকে নিয়ে মিটিং করতে চায়, কিন্তু মিটিঙে তো ধরা পড়বার সম্ভাবনা। শেষে সবাই বলল, 'যান মিটিঙে। প্রকাশ্যে গ্রেপ্তার করলে সেটা অ্যান্টি পাকিস্তান ফিলিং আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে, ভেবে হয়তো গ্রেপ্তার করবে না। গেলাম মিটিঙে। বললাম। যা ওরা শুনতে চায় বাঙালির জাতিসত্তার কথা, ভাষার কথা। গোলাম মোস্তাফা, জসীমউদ্দীন-সিনিয়রদের মধ্যে এঁরা সব ছিলেন। এ সব ১৯৪৯-এর মাঝামাঝির কথা। ভাষা আন্দোলন তো আর আকাশ থেকে

পড়েনি, তখন থেকেই তার বীজ বোনা হচ্ছিল। যা হোক শেষ অবধি গ্রেপ্তার করল না আমায় যে-কোনো কারণেই হোক। অনিশ্চিত অবস্থায় কাটিয়েছি জীবন। ঢাকায় আমার আপন মেসোমশাই তখন ভি.সি.। বলতেন একটা অধ্যাপনা-টধ্যাপনা করো। তারপর চাকরি করে রাজনীতি করো। এইরকম অবস্থায় হঠাৎ আবার পার্টির তলব—সাতদিনের মধ্যে কলকাতায় যেতে হবে—গোপাল হালদার আর সব নেতারা তখন বক্সায়, আমাকে 'পরিচয়'-এর ভার নিতে হবে।

শ্রী : তখন আবার কলকাতায়—?

গো : হ্যাঁ, আবার কলকাতায়—'পরিচয়' সম্পাদনা করতে হবে।

শ্রী : কে আপনাকে দায়িত্ব দিলেন?

গো : পার্টির নির্দেশ ছিল। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ডেকে বলেন নৃপেন চক্রবর্তী। তখন কলকাতায় আমার থাকার জায়গা নেই। খাব কী তার নেই ঠিক। নেতারা বললেন 'পরিচয় সম্পাদনা করো কিন্তু খবরদার 'পরিচয়' অফিসে ঢুকো না, ওখানে পুলিশ ওৎ পেতে আছে, গেলেই ধরবে। তবেই বোঝো, সম্পাদনা করব কিন্তু অফিসে ঢুকতে পারব না। বলা হল 'আর একজন কাউকে সম্পাদক হিসেবে নিয়ে নাও'। তখন সরোজ দত্তকে ওরাই ঠিক করে দিল। তখন এইই হল (পাঞ্জাবির দু-পকেট থাবড়ে) পরিচয় অফিস। এখানেই লেখা জমা হয়, পড়া হয়—সব। পার্টি বলেছে করতেই হবে। না বললে মুণ্ডু চলে যাবে। ভূপতি-সুরপতি নন্দী ছিল দুই ভাই। তাদের বাড়ির চিলেকোঠায় ঘরে থাকতাম।

শ্রী : কোথায় সেই বাড়ি?

গো : জিমিস কিচেন চেনো? তার উল্টোদিকে একটা বাড়ি। এখন সে বাড়ি নেই। ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে তিন মাসের মধ্যে হইহই ব্যাপার। পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভায় তুমুল কাণ্ড। বাবা লিখে পাঠালেন যে আমাদের কুষ্ঠিয়ায় বাড়ি তিনবার Search হয়ে গেছে, তুমি আপাতত আর বাড়ি এসো না।

শ্রী : আর আপনাদের 'নয়া দুনিয়া'?

গো : সে ততদিনে বন্ধ হয়ে গেছে। 'নয়া রোশনি' বেরোচ্ছিল তার বদলে—তাও বন্ধ হয়ে গেল। আমি হয়ে গেলাম একেবারে ব্ল্যাক লিস্টেড। আর তখন কলকাতায় মারাত্মক অবস্থা। পায়ে পায়ে পুলিশ। ধরা পড়লে মিনিমাম দমদম না হয় বক্সা। তা এই তো অবস্থা। এই নিয়ে আবার সতীন চক্রবর্তীরা বলে যে আমরা 'পরিচয়' যখন ছাড়লাম—তখন যা পেয়েছি। কত রাত্তির খাওয়া নেই, থাকবার জায়গা নেই ঠিকমতো।

শ্রী : 'পরিচয়' সম্পাদনার কথা কিছু বলুন—।

গো : তখন তো চারদিকে বিতর্ক। তা প্রথম সংখ্যায় ম্যাক্সিম গোর্কির উপরে

লিখলাম—সবাই যা অ্যাকসেপ্ট করবে। সরোজ দত্ত করেছিল ইলিয়া এরেনবুর্গের আলোচনা।

শ্রী : 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত রচনার উপর তখন পার্টির সেন্সরশিপ কাজ করত না?

গো : হ্যাঁ, প্রথমে সব লেখাই পাঠাতাম, গল্প কবিতা প্রবন্ধ। পরে আর কবিতা-টবিতা দেখতে চাইত না। গদ্য সেন্সর করা হত। এই কিছুদিন আগে ম্যাক্সিম গোর্কির উপর আমার লেখা বলে কয়েকটা লাইন তুলে, এখনকার 'পরিচয়'-এ খুব আক্রমণ করে। আসলে ও সব আমার লেখা নয়। আমার লেখার কিছুটা কেটে পার্টি থেকে ওইসব বাজে কথা লেখা হয়েছিল।

শ্রী : ভবানী সেনের থিসিস আপনারা সমর্থন করেছিলেন?

গো : না, ভবানী সেন কন্ট্রোভার্সিতে আমি যাইনি। আমি ওর মধ্যে ছিলাম না। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আমরা, আমাদের সময়কার 'পরিচয়'-এ একটা কথাও উচ্চারণ করিনি। আমরা তো পার্টি লাইনের বিরুদ্ধে লিখিয়েছিলাম পরিচয়-এ। মানিকবাবুর কাছে গেলাম। উনি তখন লিখলেন প্রবন্ধ।

শ্রী : প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা।

গো : আমি বিতর্কের মধ্যে ছিলাম না। আর সরোজ দত্তের মতামত কী ছিল পুরোটা বলতে পারব না। একসঙ্গে যখন কাজ করেছি তখন কিন্তু কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও কোনো হঠকারী লাইনের কথা বলেনি।

চার মাস তো ছিলাম সম্পাদক একটা প্রবন্ধ, কয়েকটা বুক রিভিউ, কবিতা—এইসব লিখেছিলাম আর কি। মানিকবাবুর লেখা বেরোত তখন 'পরিচয়'-এ। মানিকবাবু খুব তেভাগা নিয়ে গল্প লিখেছিলেন বলে সবাই—, তো 'হারানের নাতজামাই' তো যে-কোনো গণ আন্দোলনকে সামনে রেখে লেখা যায়, বলো।

শ্রী : শিল্পসাহিত্য বিষয়ে ১৯৪৮-৫০ এর বিতর্কের সময় আপনার নিজের অবস্থান কীরকম ছিল?

গো : আমি ব্যক্তিগতভাবে সোশালিস্ট রিয়ালিজমে বিশ্বাসী। আমার 'মরিয়ম' উপন্যাসের নায়িকা ড্রাইভারের স্ত্রী। রেল ওয়ার্কারদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে ওদের জীবনের কথা দেখেছি—তাই নিয়ে লেখা। তা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতো নকশালবাড়ি আমাকে বলল যে 'দেখুন তর্কে কোনো কাজ হয় না। এই যে আপনি লিখলেন—এই প্রথম কেউ লিখে দেখাল—কীভাবে লিখতে হয়'। নীরেন রায় 'মরিয়ম' পড়ে আমাকে দু'পাতা চিঠি লিখেছিলেন—খুব খুশি—লিখেছিলেন 'তুমি কী করে গোর্কির মেথড আয়ত্ত করে ফেললে?'—আসলে আমি তো দেখেছি এসব ক্লাশের জীবন। সিলেট অঞ্চলে দেখেছি কৃষকদের ভিতর মেয়ে কেনাবেচা হয়। এই নিয়ে লিখলাম 'বাঁদী'। আমার

এক আত্মীয়কে দেখেছি—আমার মামার শ্বশুর বাড়িতে দাসীকে মারধোর করতেন। অথচ মুখে বলতেন 'আমরা সাম্য চাই'। বুঝতাম এসব সহজে মিটবে না।

শ্রী : শিল্পসাহিত্য বিষয়ে পরবর্তীকালে পার্টি লাইন নিয়ে আপনারা কী ভেবেছেন?

গো : সব এলোমেলো হয়ে গেল। আমার মনে হচ্ছে পার্টিভাগের ঠিক আগে, বর্ধমানের শেষ ইউনাইটেড পার্টি কংগ্রেসে আমাকে কালচারাল ফ্রন্টের কনভেনর করে সোমনাথ লাহিড়ী, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, গোপাল হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এদের সব ফ্রন্টে ঢুকিয়ে দিল—আসলে পার্টি বুঝতে পারছে না তখন এদের কোথায় ঢোকাবে। তাই এই ব্যবস্থা। তা সোমনাথ লাহিড়ী, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত এরা তো সব রাগে পদত্যাগ করল। আমি তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম এদের যে শিল্পসাহিত্য নিয়ে পার্টি লাইন কী হবে। তা এঁরা বললেন—সব বড় বড় পার্টি নেতারা—বললেন 'যার যা খুশি লিখবেন'। আমি তো অবাক। আবার বললাম যে 'তাও একটা স্পষ্ট নীতি ঠিক করলে হয় না'। তখন সবাই বললেন 'আপনি বরং লিখুন একটা কিছু। আমরা পরে আলোচনা করে দেখব।' ভাবগতিক দেখে আমি চুপ মেরে গেলাম। আর লিখলাম-টিখলাম না কিছু।

শ্রী : তার মানে চল্লিশের দশকের স্পিরিট পুরোটাই ধামাচাপা পড়ে গেল?

গো : না, ধামাচাপা নয়। লিখল যে যার মতো। যার ইচ্ছে সে লিখল সোশালিস্ট রিয়ালিজম মেনে।

শ্রী : চল্লিশের দশকে আপনাদের উপর পার্টির নির্দেশ কতটা কার্যকর ছিল।

গো : না আমাদের লেখার উপর কোনো নির্দেশ ছিল না। 'পরিচয়'-এর গল্প কবিতা ওঁরা দেখতে চাইতেন না, প্রবন্ধ একটু চোখ বুলিয়ে ছেড়ে দিতেন। আর তখন নেতাদেরই যা অবস্থা—একেবারে ছন্নছাড়া—কে অত দেখে।

শ্রী : আপনারা কত ভাতা পেতেন মাসে?

গো : তিরিশ টাকা। থাকা খাওয়ায় বেরিয়ে যেত কুড়ি টাকা। বাকি দশ টাকায় আর সব। ওই তিরিশ টাকা থেকে নৃপেন চক্রবর্তী আবার পাঁচ টাকা বাঁচিয়ে আমাদের মাংস খাওয়াতেন। নৃপেনদা ভালোবাসতেন খুব, ভাইয়ের মতো দেখতেন। একদিন নৃপেনদাকে বললাম 'নৃপেনদা আমি একটা ঘড়ি কিনব। অনেক কমরেডেরই তো দেখি হাতে ঘড়ি।' তখন আমি মাসে একশো টাকা রোজগার করি রেডিও থেকে। রেডিও থেকে মাসে চারবার আমাকে ডাকত 'টক' দিতে। ওদের লোক নেই বলেই হোক, কী আমাকে প্রেফার করত বলেই হোক ডাকত। প্রত্যেক 'টক'-এ পঁচিশ টাকা পেতাম। চারবারে একশো। সেই একশো টাকা পার্টিকে দিয়ে দিতাম। নৃপেনদাকে বললাম যে 'এ মাসে টাকাটা দেব না, ঘড়ি কিনব একখানা।' নৃপেনদা বললেন 'কী! তুমি পার্টির

প্রাপ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করবে? জানো এখনো কত কমরেড খেতে পায় না দু-বেলা'। আমি বললাম 'তা আপনারও তো হাতে ঘড়ি'। উনি বললেন 'আমি তো আর নিজে কিনিনি। আমাকে দিয়েছে একজনা। রিফিউজ করতে পারিনি, তাই পরেছি।' ব্যস্ হয়ে গেল ঘড়ি কেনা। রয়ে গেলাম ঘড়িশূন্য। অনেক পরে সত্তরের দশকে একবার রাশিয়া গিয়ে কিছু রুবল রোজগার করেছিলাম, তাই দিয়ে কিনেছিলাম একটা সোনার ঘড়ি। সে ঘড়িও আমার ভেঙে গেছে, সোভিয়েত ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে—আছে ও ঘরে সে ভাঙা ঘড়ি—দেখাতে পারি তোমায়।

শ্রী : আপনার ছোটবেলায় কুষ্ঠিয়ায়—।

গো : কুষ্ঠিয়ায় বাবা পোস্টেড ছিলেন। আমরা থাকতাম দেশে। বাবা শনি রবি বাড়ি আসতেন—ওই তোমার স্বামীর মতো—বাড়িতে এ সবের কোনো পাট ছিল না। আমার খুব শখ ছিল ফুলের বাগানের। আমাদের গ্রামে একজনদের বাড়ি খুব সুন্দর ফুল গাছ ছিল নানারকম—তারা আমাকে ফুলের গাছ, বীজ সব সরবরাহ করত। বাড়িতে সবাই বলত কী হবে ফুলগাছ করে। তার চেয়ে লঙ্কা, বেগুন এসব লাগালে উপকার হয়'। আমি ফুল গাছই করতাম—বেলি, জুঁই নানারকম। আর বই পড়তাম। যা বই পেতাম পড়তাম। পরে কুষ্ঠিয়া ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরির বই অনেক পড়েছি।

শ্রী : আপনি কলেজ জীবনে সুশোভন সরকারের ছাত্র ছিলেন। মার্কসবাদে আপনার আকর্ষণের সূত্রপাত কি তাঁরই প্রভাবে?

গো : একেবারেই না। সুশোভন সরকারের ক্লাশে দেখতাম ভদ্রলোক কীরকম মার্কস-এঙ্গেলসের নাম না করে ওঁদের কথাগুলো বলছেন। খুব মজা লাগত। তখন রিপন কলেজটা ছিল একটা গোয়াল। তিনশো চারশো জন করে এক একটা ক্লাশে। অত বড় ক্লাশে হীরেন মুখার্জির গলাও লাস্ট বেঞ্চ অবধি শোনা যেত না। আর বিষ্ণু দে কী যে বলতেন ইনিয়ে বিনিয়ে ওই প্রথম চার পাঁচটা বেঞ্চ শোনা যেত। বুদ্ধদেবের কথা আমরা বুঝতামও না—পাতলা গলা আর অত ইংরেজি তখন বুঝতে পারতাম না। ওই লাস্ট বেঞ্চিতে বসেই আমার দিব্যজ্ঞান জন্মাল। আমার পাশে বসত একটা ছেলে—একদিন দেখি কী যেন একটা বই পড়ছে—আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি খাতার তলায় লুকোচ্ছে। ওদিকে ক্লাশ চলছে। আমি বললাম 'দেখি দেখি কী বই'! বলল 'না, না ও দেখতে হবে না।' আমি ভাবলাম নিশ্চয় যৌন বিষয়ে কিছু হবে। আমি ওর হাত থেকে নিয়ে দেখি অপরিচিত লেখকের বই—নাম এঙ্গেলস। আর আমাকে এঙ্গেলস বলতে শুনে ও খুব হাসছে—'এ, উচ্চারণটাও জানে না'। আমার তো রোখ চেপে গেল। দাঁড়াও, আমাকেও পড়তে হবে ওই লেখকের বই। গেলাম লাইব্রেরিতে। বললাম 'এঙ্গেলসের কোনো বই আছে?' ভদ্রলোক

আমাকে একবালক দেখে লিস্ট দেখে একটা বই দিলেন—'মার্কস-এঙ্গেলস করেসপন্ডেনস'। পড়লাম। শক্ত ইংরেজি। কিছু বুঝলাম না। বইয়ের শেষে দেখলাম এই লেখকদেরই অন্যান্য বইয়ের তালিকা। ব্যস্ সেই শুরু। জোগাড় করতে শুরু করলাম মার্কস এঙ্গেলসের বই। একটু একটু করে পড়া এগোয় আর নতুন দিগন্ত খুলে যায় সামনে। কাজেই সুশোভন সরকারের ক্লাশ আমি যখন করেছি তখন আমি ম্যাচিওরড কম্যুনিস্ট। ক্লাশ করি আর ভাবি—'ভদ্রলোক বলছেন ভালোই। এই একখানটায় আর একটু এইটে বললে হত। এইখানটায় আর একটু কম বললে মন্দ হ'ত না'—এইরকম একটা পণ্ডিতি ভাব। দেখলাম ক্লাশে যা পড়াচ্ছেন তা আমি বুঝছি আর উনি বুঝছেন—আর কেউ বুঝছে না।

শ্রী : আপনার পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ হ'ল কীভাবে?

গো : আমি কবিতা লিখলাম। ছাপা হত 'কবিতা' 'শনিবারের চিঠি'তে। তারপর একদিন আমার কবিতা ছাপা হল 'অরণি'তে। এতদিনে মনে হল একটা ঠিকমতো জায়গা পেলাম। তারপর আর 'কবিতা' 'শনিবারের চিঠি'তে লেখা দিইনি। সেই সময় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল। আমাকে করে দেওয়া হল অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট আর্টিস্ট অ্যান্ড রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক। তার কাজ করি। একদিন তিনটি ছেলে এল আমার কাছে—'আপনাকে আমরা মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের কাজে পেতে চাই'। আমি বললাম 'আমাকে দিয়ে ওসব হবে-টবে না। বরঞ্চ এখানে কোথায় যেন কম্যুনিস্ট পার্টি আছে। তার খোঁজ করো'। তিনদিন পরে তারা এসে জানাল যে তারাই কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে আসছে, আমাকে যাচাই করতে এসেছিল। তারপর তারা প্রায়ই আসে। তখন সোমনাথ লাহিড়ী নেতা। তিনি বলেছেন 'গোলাম কুদ্দুসকে পার্টি অফিসে নিয়ে এসো। মেম্বার করো।' সেই ছেলেগুলো দেড় বছর ধরে ঘোরাঘুরি করল—তাও আমি যাইনি পার্টি অফিসে। একদিন আমাকে এসে বলল—'এবার যদি আপনাকে অফিসে না নিয়ে যেতে পারি তাহলে আমাদের মুখ দেখানো ভার হবে।' তা কী আর করা। গেলাম তাদের ধরাধরিতে। ভেতরের ঘরে দেখি একটা শুঁটকো লোক কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। আমাকে সবাই বলল 'একটু বসুন, এরপরেই আপনি ভিতরে যাবেন'। ওদেরই জিজ্ঞেস করলাম—'ওই শুঁটকো লোকটা কে?' ওরা বলল—'চুপ, চুপ। উনিই তো সোমনাথ লাহিড়ী'। ওখানেই দেখলাম লালমিঞাকে—সুন্দর চেহারা। তা সেই যে কম্যুনিস্ট পার্টিতে ঢুকলাম—হয়ে গেল। আর অনেক ডাকাডাকি করে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যই হোক বা যে-কোনো কারণেই হোক—এটা আমার দোষই বলো। আর গুণই বলো—সি পি আই-এর কোনো লোককে আর যেন লিডার বলে মানতে পারিনি। একটা সমকক্ষতার দাবি

তৈরি হয়েছিল মনে মনে। আমি মুজফ্ফর সাহেবের সঙ্গেও দু-বছর কাটিয়েছি। তাঁকেও নেতা বলে ভাবতে পারিনি।

শ্রী : রবীন্দ্রনাথকে কম্যুনিস্ট পার্টির একাংশ প্রায় বর্জন করেছিলেন একসময়, বুর্জোয়া কবি বলে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আপনার বক্তব্য যদি কিছু বলেন—

গো : দেখো রবীন্দ্রনাথ, 'রাশিয়ার চিঠি' লিখলেন। বললেন যে রাশিয়ায় মহাতীর্থ দেখলেন। সবই হল কিন্তু ওই মহাতীর্থ তো আর আকাশ থেকে পড়েনি। তার পিছনে ফোর্সটা যে কী, কী করে মহাতীর্থ সম্ভব হল—সে সম্পর্কে উনি কিছু লিখলেন না। রবীন্দ্রনাথ তো আর শিশু নন, যথেষ্ট, ম্যাচিওরড— উনি সবই বুঝলেন, কিন্তু লিখলেন না কিছু। শেষ জীবনে কবিতা লিখলেন যে সত্তাকে প্রশ্ন করলেন কে তুমি পেল না উত্তর। তো আমি কবিতা লিখলাম আপনি আর জানবেন কী করে, আপনি যে ব্রহ্মজ্ঞানী। আপনিও যখন ব্রহ্মার কাছ থেকে উত্তর পাননি, তাহলে আমরা তো আরোই পাবো না। তাই আমি আর ও পথেই গেলাম না। আমার নিম্নবর্গের জগৎ, আমার ওয়ার্কিং ক্লাশ বলে দেবে—কে আমি। আর আমাকে যদি জিজ্ঞেস করতেন আমি বলতাম 'আপনি তো আমাদের লোক—আপনি রবীন্দ্রনাথ'। বিরাট মহৎ আর্টিস্ট— এ নিয়ে তো বলার কিছু নেই। আর বহু কম্যুনিস্ট যা পারেননি উনি কিন্তু তা করতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল হচ্ছেন সাম্রাজ্যবাদের পথে, আমাদের দেশের মানুষের মনে সবচেয়ে বড় কাঁটা। মানুষ অন্তর থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এঁদের জন্যে। তো এত বড় শক্তির সামনে মাথা না নুইয়ে কোনো উপায় আছে। কোনোদিন মাথায় আসেনি রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কবি।

শ্রী : এখনকার কমরেডদের সম্পর্কে আপনার মনোভাব কীরকম?

গো : দেখো, সবাই ভালো। কিন্তু আমাদের পার্টির নেতারা কমরেডরা (মুচকি হেসে) একটু মূর্খ আছে। এরা পড়াশোনা কেউ করে না। তবে এ জিনিস আগেও ছিল। একটা গল্প বলি তোমায়। মুজফ্ফর সাহেব অরুণ মিত্রকে অনুবাদ করতে বলেন লেনিনের 'গ্রামের গরীবদের প্রতি' বইটি। তা একদিন অরুণ মিত্রকে জিজ্ঞেস করলাম 'বলুন তো, চট্ করে বলুন। বইটার গোড়ায় কী লেখা আছে?' উনি বললেন 'কেন গ্রামের গরীব কৃষকদের দুর্দশার কথা'। আমি আর কিছু বললাম না। মুজফ্ফর সাহেবকে বললাম উনিও এক কথা বললেন। অথচ বইটার গোড়ায় স্পষ্ট করে লেখা যে গ্রামের গরিব কৃষকদের প্রতি শহরের শ্রমিকরা জানাচ্ছে সোশালিজমের মাধ্যমে তাদের দুরবস্থা কীভাবে দূর হতে পারে—তার কথা। যিনি অনুবাদ করছেন আর যিনি করাচ্ছেন তাঁরাই যদি খুটিয়ে না পড়েন—তাহলে আর বাকিদের কী বলব বলো!

কত কথাই বলা হয়ে গেল তোমাকে। একটা শেষ কথা বলে আজ শেষ করি।

১৯৫৬র ঘটনা। তখন খিদিরপুর ডকে যে সব স্টিমার আসত বেশির ভাগেরই মালিক ছিল IGRSN.

শ্রী : পুরো নামটা—?

গো : পুরোটা হচ্ছে Indian General River-'S'টা কী যেন—ও Service & Navigation Company। ব্রিটিশ কোম্পানি। আমরা তখন খিদিরপুরে ট্রেড ইউনিয়ন করি। ডকের কাছাকাছি অঞ্চলে ছিল বেশ্যাপল্লি। সব সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকত, হাতছানি দিয়ে ডাকত। মিছিল যখন যেত সে সব অঞ্চলে আদ্ধেক মিছিল ফাঁকা হয়ে যেত। আমরা যারা নতুন কাজ করছি ওসব অঞ্চলে আমরা তো খুব হতাশ। অভিজ্ঞ কমরেডরা বলত 'আরে এখন তো তবু কিছু থাকে। আগে তো একদম ফাঁকা হয়ে যেত।' এইসব—বেশ্যাসক্ত, লম্পট, মদ্যপায়ী তথাকথিত মূল্যবোধহীন ওয়ার্কাররা করল বিরাট বিদ্রোহ। সে গল্প বলি। IGRSN-এর শর্ত তারা মানবে না। সব নৌকো সাজাল পরপর একেবারে বঙ্গোপসাগর অবধি। রাত বারোটায় শুরু হবে স্ট্রাইক। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'পুলিশের ফোর্স এলে কী হবে'। ওরা বলল—'দেখবেন না মজা। সব জ্বলন্ত কয়লা ছুঁড়ে ভাগিয়ে দেবো'। তারপর রাত বারোটায়—সারা কলকাতা যখন ঘুমোচ্ছে—তখন সে এক কাণ্ড। প্রথম নৌকো থেকে ডাক দিল 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' অমনি পরের নৌকোও বলল 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' এইভাবে ডাক পৌঁছে গেল একেবারে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। আবার খিদিরপুরে ফিরেও এল পাঁচ মিনিট পর 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ডাক। মানে যেতে আড়াই মিনিট আসতে আড়াই মিনিট। কোনো নৌকো আর নড়বে চড়বে না। সব মাছ তরি-তরকারি পচবে। ওদিকে বিধান রায় ফোর্স পাঠালেন। সাত আটটা পুলিশ বোট। ওরা ওপর থেকে জ্বলন্ত কয়লা—গনগনে অঙ্গার ফেলতে লাগল। সে এক দৃশ্য। কোথায় লাগে মার্কিন ছবি—অন্ধকারের মধ্যে কয়লার ফুলঝুরি—সব ফোর্স হয়ে গেল ভোঁ ভাঁ। তো এইভাবে দুদিনের মধ্যে IGRSN ওয়ার্কারদের সব দাবি মেনে পাততাড়ি গোটাল। আমি স্ট্রাইকের আগে মানিকবাবুকে বলেছিলেন যে আপনি তো লিখেছেন 'পদ্মনদীর মাঝি'। এবার লিখুন না নদীর শ্রমিকদের বিদ্রোহ নিয়ে—পদ্মানদীর মাঝি ভল্যুম টু। আসুন, দেখুন তাদের স্ট্রাইক।' উনি বলেছিলেন যাবো। কিন্তু শেষপর্যন্ত এলেন না। কী আর করব। শেষে এই গরিবকেই লিখতে হল—।

শ্রী : 'উজানীয়া'—?

গো : হ্যাঁ, 'উজানীয়া' উপন্যাসখানা।

কতো কথা বলা হয়ে গেল তোমায়। তুমি বেশ আকর্ষণ করে নিলে কথাগুলো। নাও তুমি আর একটা মিষ্টি খাও।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ · ২৮.৫.২০০৫

[অধ্যাপিকা শ্রীলা বসু তাঁর গবেষণার কাজে এই সাক্ষাৎকারটি নিলেও এটি একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল হয়ে উঠেছে। এখানে কেবল প্রয়াত গোলাম কুদ্দুসের ব্যক্তিজীবন বা রাজনৈতিক সাহিত্যিক জীবনই নয়, সমসাময়িক প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও চিত্রিত হয়েছে। এই সাক্ষাৎকার পরিচয়ের সঙ্গে গোলাম কুদ্দুসের সম্পর্কের বর্ণনাও রয়েছে। কুদ্দুস একদা পরিচয়-এর অন্যতম সম্পাদক এবং পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন এর অন্যতম উপদেশকও ছিলেন। তাই এই সাক্ষাৎকারটির জন্য শ্রীলা পরিচয় -এর কৃতজ্ঞতা ভাজন। সম্ভবত জীবিতকালে এটিই কুদ্দুসের দেওয়া শেষ সাক্ষাৎকার। সেদিক থেকেও এর একটি আলাদা তাৎপর্য আছে।]

কুসুমের কথা, কাঁটার কথা

মলয় দাশগুপ্ত

সম্ভবত গোলাম কুদ্দুসের শেষ কবিতার বই 'কুসুমিকা ও বহ্নিশিখা'। এই গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলিকে কবি নিজেই দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি অংশ 'কুসুমিকা' অপরটি 'বহ্নিশিখা', একত্রে গ্রথিত এই বই-এর উপ-শিরোনাম—প্রেম ও রাজনীতির কবিতা। অর্থাৎ কবি কুসুমিকা অংশকে প্রেমের কবিতা এবং বহ্নিশিখা অংশকে রাজনীতির কবিতা বলে চিহ্নিত করেছেন। অথচ পাঠক গ্রন্থটি পড়লেই বুঝতে পারবেন যে এই বিভাজনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবে, কুসুমিকা অংশের রচনা-পরম্পরায় কবি গোলাম কুদ্দুস তাঁর ব্যক্তি-জীবনের প্রেম বা ভালবাসার কথাই গেঁথেছেন বলে 'কুসুমিকা' অংশটিকে নিভৃত একান্ততায় চিহ্নিত করার ইচ্ছাকে মূল্য না দিয়ে পারা যায় না। বিশেষত কবিতাগুলি সবই তাঁর প্রিয়তমা পত্নী হেনা মৈত্রর মৃত্যুর প্রায় অব্যবহিত পরে লিখিত হওয়ায় স্মৃতি-মেদুরতা বা স্মরণ-বিধুরতার সত্য পাঠকের মনকে স্পর্শ না করে পারে না। আর মৃদুল ভালবাসার আন্তরিক প্রকাশ পাঠককে এমন একটা জীবন-প্রকৃতি কিংবা বৃহত্তর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায় যার একটা পৃথক মূল্য আছে। কবি নিজেও অত্যন্ত যত্নে 'কুসুমিকা' অংশের কবিতাগুলি সাজিয়েছেন। হেনা মৈত্র মারা যান ১৯৯৫ সালে, আর 'কুসুমিকা ও বহ্নিশিখা' প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে। অর্থাৎ পত্নী বিয়োগের পরে প্রায় সাত বছর ধরে তিলে তিলে একটি মরমী মনের ভালবাসার গাথাকাব্য সাজানো হয়েছে যাতে কুসুমের ঘ্রাণ তো আছেই, আছে সমকালীন রাজনীতিবোধ, ঘটনাপ্রবাহ, ধর্মীয় চিন্তা এবং সর্বোপরি মানুষের মানবিক সম্পর্কের বিদ্যুৎপ্রভা।

ফলে কুসুমিকা অংশে কুদ্দুস কেবল এক মহিয়সী বাঙালি মেয়ের গুণমুগ্ধতাই ফুটিয়ে তোলেননি, একই সঙ্গে সমকালীন জীবন ও জীবনবোধের অমলিন চিত্রও স্পষ্ট করেছেন। আর তা করতে গিয়ে কত না ছোট-বড় মানুষের উপস্থিতি, কত না ছোট-বড় ঘটনার সাক্ষ্য। গাথা-কবিতার ধরনে লেখা মোট চল্লিশটি ছোট-বড় কবিতার সমাহারে দুটি মানুষের বন্ধুর জীবনপথকে চিনিয়েছেন কবি। পৃথক শিরোনাম থাকলেও পারম্পর্যযুক্ত একটি অ-সাধারণ প্রেমকথার পরিপূর্ণতা এতে আছে। আছে দুটি মানুষের ব্যতিক্রমী জীবন ও তাদের ঘিরে গড়ে ওঠা সমাজ-সংসারের বাস্তবতা। কাব্যকৃতির জটিলতাহীন, অতি সহজ—প্রায় একরৈখিক সারল্যে লেখা জীবনালেখ্য যে পাঠককে মুগ্ধ করতে পারে তার কারণ হয়তো কোনো-না-কোনো জায়গায় রাখা সত্যানুভবের বীজ, কোনো-না-কোনো ভাবে বর্ণিত অন্তর্গত সত্যাশ্রয়ের দৃঢ়তা।

কুসুমিকা-র কবিতাগুলি নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করলে উপযুক্ত কথার যাথার্থ্য পাওয়া যেতে পারে। অনেকেরই হয়তো জানা আছে গোলাম কুদ্দুস আর হেনা মৈত্রর প্রেমজীবনের অনন্য দৃষ্টান্ত বাস্তবতার কথা। যদি নাও জানা থাকে তবে এই চল্লিশটি

কবিতা পড়লেই প্রায় আচ্ছন্ন করা অভিজ্ঞতা পাওয়া যাবে। সেই আচ্ছন্নতার কারণেই হয়তো বালিকা, কিশোরী একটি মেয়ের গড়ে ওঠার পশ্চাৎপদটির প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন মিটিয়েছে 'কুসুমিকা' অংশের গোড়ার দিকের কিছু কবিতা। বিদ্যালয় জীবনের ঘেরাটোপ পেরিয়ে মেয়েটি মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর আঙিনায় এলে তার জীবন ও জীবনানুভবেরও নানাবিধ পরিবর্তন হতে থাকে। সেই পরিবর্তিত জীবনানুভবের মধ্যে থেকেই কীভাবে যে অন্য ধর্মাবলম্বী এক সহপাঠীর অপেক্ষমান দুটি চোখের প্রার্থনার মূল্য দিতে গিয়ে এক জটিল ভালবাসার বৃক্ষ রোপিত হয়।

কবি গোলাম কুদ্দুস এই ভালবাসার উপ্তিকাল নিয়ে খুব বিশদে যাননি, যাওয়ার কোনো প্রয়োজনও ছিল না। যা প্রয়োজন ছিল তা তিনি দেখিয়েছেন স্থির একাগ্রতায়। সেই মেয়ের মায়ের ধর্মভীরুতা কুদ্দুস-মৈত্রের প্রেমের স্বাভাবিক এবং সাধারণ পরিণতির পথ আটকে দাঁড়ায়। স্নেহময়ী মায়ের প্রতি মেয়ের গভীর ভালবাসাকে কী উপায়ে লঙ্ঘন করবেন হেনা? কুসুমিকার কবিতায় দুই ভালবাসার টানাপোড়েনের যাতনা থাকলেও শ্যাম ও কুল দুইই রাখার তপস্যায় মগ্ন হতে হয় দুজনকেই। মা-এর জীবিতকালে ভিন্নধর্মীর ঘরবাঁধা সম্ভবই হয় না। বাসনা বা কামনার প্রবাহ কি ছিল না, কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকা দুজনেই নিষ্ঠায় অবিচল থেকে তাকে প্রায় হত্যাই করেছেন। কুদ্দুসের কবিতায় সমকালের যন্ত্রণা বহ্নিশিখা হয়ে দেখা দেয়নি, চাপা অভিমান থাকলেও তাকে ছাপিয়ে গিয়েছে মানুষ-মানুষীর হৃদয়ের অন্যতর অনুভবের আদর্শবোধ। যুবক-যুবতীর নিরন্তর মুগ্ধ-ভালবাসার মতোই ওঁদের প্রেম, বিদেহী-প্রেম বয়ে চলে। এবং তার স্বীকৃতির শিকড় এতই দৃঢ় যে কোনো কিছুই ওঁদের টলাতে পারে না, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষায় থাকতে হলেও একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না ওঁরা। সময় তো নদীর স্রোতের মতোই বয়ে যায়, দুজনেরই চুল রুপোলি হতে হতে শুভ্রতা পায়, দুজনে কলকাতার দুই প্রান্তে থাকেন, কিন্তু আশ্চর্য। মুগ্ধতাবোধে কোনো চিড় ধরে না।

অবশেষে, প্রৌঢ়ত্বের বলি যখন দ্রুত আঁকিবুকি দিতে শুরু করেছেন শরীরে তেমনই এক সময়ে হেনার মাতৃবিয়োগ, স্বাভাবিক মৃত্যু। ওঁরা, পরিণত দুই বুদ্ধিজীবী ঘর বাঁধেন, সংসার শুরু করেন। সেই সংসার, সেই ঘরের চেহারাও আর পাঁচটা মানুষের মতো না। কলকাতার একটি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা হেনা মৈত্র দরিদ্র, খেটে-খাওয়া মানুষের বসতির মধ্যে, বস্তির আবেষ্টনে জীর্ণ কোঠার দু-খুপরি ঘরে আনন্দে জীবন কাটান গোলাম কুদ্দুসের ঘরণী হয়ে। বস্তির গরিব ছেলেমেয়েদের মা হেনা কলেজের কাজ শেষ করে এসে ওই বস্তির পুত্র-কন্যাদের পড়াতে মগ্ন হন। আর গোলাম কুদ্দুস তাঁর কবিতা, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, রাজনৈতিক আদর্শ ও দর্শন-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ওই বস্তির ছেলেমেয়েদের পড়ানোর কাজেও লেগে যান। ভালবাসার এ রূপান্তর, এই রূপ জানার জন্যও কুসুমিকা পড়া দরকার। বাস্তবিকই 'কুসুমিকা' কাব্যাংশে ধৃত এই প্রেমগাথা একটা যুগলক্ষণ যুক্ত জীবনের মহাকাব্য হয়েই দেখা দেয়। কবিতার উৎকর্ষ নয়, মানবিক ঔদার্য, নিষ্ঠা ও আদর্শের প্রসার একে একটা অন্য মাত্রা এনে দেয়।

যদিও এই কাব্যংশের মূল আধার একটি প্রেম-উপাখ্যান তবু কেবল তার মধ্যেও সীমিত নয় এর আবেদন। কুদ্দুস ও হেনা উভয়ের জবানীতে লেখা খণ্ড-কবিতাগুলি মিলে যেমন দুটি মনের কথা বলে তেমনই দুজনের চোখে দেখা সমকালও প্রায় সমান গুরুত্বে উঠে আসে, আর এই সমকালের ঘটনা, বিশিষ্ট চরিত্রের মানুষ ও ঘটনার অভিঘাত মিলে মিশে সামগ্রিকতার রূপ পাওয়া যায়।

দুই

আবারও স্মরণ করা যাক—কুসুমিকা ও বহ্নিশিখা পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে ২০০২ সালের জানুয়ারিতে, হেনা মৈত্রের মৃত্যুর (১৯৯৫, মার্চ) প্রায় সাত বছর পরে। এ থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনার ফলেই প্রেমিক পুরুষের স্মৃতি-মন্থন এই গ্রন্থের কবিতাগুলি। কবিতাগুলিতে কবি তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকেই 'কুসুমিকা' নামে চিহ্নিত করেছেন, শুধু 'কুসুমিকা' বলেই উল্লেখিত হয়েছেন হেনা মৈত্র অসংখ্য বার। কেন কুসুমিকা, এ কথার উত্তর পেতে হলে ভূমিকা সদৃশ প্রথম কবিতাটির উল্লেখ করতে হয়, কবি লিখছেন :

> 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান...
> একটি যদি হয় কুসুমিকা? ঝঙ্কারিতে পারে দীর্ঘ বেদনার গান।
> বসন্তের দিনগুলি ম্লান মুখে চলে যেতে পারে মিলনের ক্লান্ত তপস্যায়,
> ষড়ঋতু উচ্চারিতে পারে যন্ত্রণায়—
> মাড়াব না তোমাদের দ্বার,
> অসহ্য এ বিরহের ভার।
>
> ....
>
> মরেও মরে না তবু কেন প্রেম-শতদল?
> কুসুম ও কুসুমিকা কোথা থেকে পেল এত আলো বায়ু মাটি জল?'

(কুসুমিকা)

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ, গ্রন্থের মূল সুরটি বোঝাবার জন্যই এ দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন। ধর্মের খড়্গে দ্বিধাবিভক্ত এই ঔপনিবেশিক সমাজে মাঝে মাঝে এবং বারে বারেই মিলনের পুষ্প যে প্রস্ফুটিত হয় সে অভিব্যক্তি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ভাবনায় ধরা পড়ে। আর এক কবি সেই ধর্ম-ব্যতিরিক্ত মানবতার বার্তা জানাতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই পূর্বসূরির কাছ থেকে ভাষা ও ভাব আহরণ করেন। ব্যক্তিজীবনে ধর্ম-নিরপেক্ষ অবস্থানের ক্ষেত্রে নজরুল-প্রমীলা আর কুদ্দুস-হেনার দৃষ্টান্তের মধ্যে একটা মিল আছে। সেই মিল 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম' ফোটানোর সাধনা ও বাস্তবতায়। আবার অমিলও তো কম নয়। 'প্রেম-শতদল'-এর বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে নজরুলরা যত বাধার সম্মুখীন কুদ্দুসদের বাধা তার থেকে অনেক গুণই বেশি। 'কুসুমিকা'-র দীর্ঘশ্বাস তাই অর্থবহ।

যাঁরা তাঁদের জীবনযাপন ও মননের কাছাকাছি আসতে পেরেছেন তাঁরাই জানেন যে এই দম্পতি কতটা যথার্থ অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। কেবল প্রেম সাধনার শুদ্ধতাই ধর্ম-গোঁড়ামীর ওপরে তুলতে পারে না, বিশেষ করে প্রবল বিরুদ্ধ স্রোতের মধ্যে থেকে এক

সময় না এক সময় ক্লান্তি আসতেই পারে, কিন্তু কুসুম ও কুসুমিকার এই ক্লান্তি আসেনি। গোলাম কুদ্দুসও তাঁদের দৃঢ়তার মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রশ্নকে প্রশ্ন আকারেই রেখে গিয়েছেন, 'কুসুম ও কুসুমিকা কোথা থেকে পেল এত আলো বায়ু মাটি জল?'

প্রথম কবিতার এই প্রশ্নের জবাব যেন গ্রন্থের পরবর্তী উনচল্লিশটি কবিতায় ইতস্তত ছড়ানো পাওয়া যায়। গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'সকালের ফুল' হেনা মৈত্রর জবানীতে লেখা, তাঁর বাল্য-কৈশোরের হয়ে ওঠার পরিচয় পাওয়া যায় এতে। ভাগলপুরে-শিল্পী বাবার স্নেহ-লালিত হেনা গঙ্গার ঘাটে বসে শরৎচন্দ্রের বই পড়তে পড়তে 'হঠাৎ পিছন থেকে এক বৃদ্ধ বলে উঠলেন, কী পড়ছ মা?/চমকে উঠে আমি তাঁর হাতে তুলে দিলাম বইটি।' কিশোরী হেনা বৃদ্ধকে চিনতে পারেনি,

> 'পরদিন বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন বৈঠকখানার,
> গিয়ে দেখি তাঁর পাশে উপবিষ্ট গতকালের সেই বৃদ্ধ।
> বাবা বললেন, প্রণাম করো, ইনি শরৎচন্দ্র,...'

একদিকে শরৎচন্দ্রকে প্রথম দেখার সুখস্মৃতি বর্ণিত এ কবিতায়, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ উপদেশও বলা আছে এতে। হেনা পড়তেন বীণাপানি পর্দা গার্লস স্কুলে, কনক দাস ছিলেন তাঁর শিক্ষিকা। সেবার স্কুলের পুরস্কার বিতরণীতে কনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এনেছিলেন।

> 'সে বছর অনেক বছরের জমানো পাচ্ছিলাম
> আমি ও আমরা
>
> ....
> আমি পেয়েছিলাম বিশেষ পুরস্কার
> সেটি আমার হাতে তুলে দিয়ে গুরুদেব সহাস্যে বলেছিলেন,
> তোমার মত এত পুরস্কার আমিও পাইনি।
> আমাকে লজ্জায় নত হতে দেখে উপদেশ দিয়েছিলেন—
> সারাজীবন জীবন ছাইপাঁশ লিখে যেয়ো, কেমন?'

এই কিশোরীকেই কবি আবিষ্কার করলেন 'আবির্ভাব' কবিতায়। পথে পথে 'ফ্যান দাও' ধ্বনি শুনে—

> 'মৃতদেহ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে,
> তরুণ-তরুণী ক্লাসে গিয়ে ভাবছে কিছু কি করা যায় না?
> একদা রিলিফ কমিটি গড়তে গিয়ে
> শুনল তারা বিকট আওয়াজ—
> দেশদ্রোহী জনযুদ্ধওয়ালারা যেন স্থান না পায় কমিটিতে।
> মহা গোলমালে সভাপতি অধ্যাপক হতবাক হতভম্ব।
> ছাত্রছাত্রী চকিত বিস্ময়ে চেয়ে দেখল
> ক্ষিপ্রবেগে সমুত্থিতা এক তরুণীকে,

যার কণ্ঠে শব্দের চাবুক :
ক্ষুধার অন্ন নিয়েও পলিটিক্স।' (আবির্ভাব)

বলা বাহুল্যই যে এই তরুণীই হেনা মৈত্র। গোলাম কুদ্দুসের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠিনী। 'জনযুদ্ধওয়ালা' কুদ্দুস যে দৃপ্ত প্রতিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে সে তো স্বাভাবিক, কিন্তু তরুণীটি কি জানতেন কুদ্দুসের পরিচয়? অন্তত এ গ্রন্থের পরবর্তী কবিতা থেকে কোনো ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বরং সখী পরিবৃতা এই তরুণী, 'কথায় কথায় সারা অঙ্গে খেলে যায় খুশির হিল্লোল' তাকে দেখে কবির মনে হত, 'আনন্দের ঝর্ণাতলা থেকে নির্বাসিত ছিল শুধু একজন।'

কিন্তু প্রেমের রসায়ন সব সময়ে তো সোজা পথে বিশ্লেষণ করা যায় না। কবি ভাবতেন, 'প্রেমাতুর আঁখি দুটি মৈত্র তনয়ার চৌহদ্দীতে এসে
সেখানে উদিত হতো মার্জিত সৌজন্যবোধ,
অত্যধিক ভদ্রতার স্বচ্ছ আবরণ
ডুবে যেত সব হাসিখুশি।' (ব্যর্থল ওয়াল)

এইভাবে প্রেম ও অপ্রেমের লুকোচুরির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠজীবন শেষের লগ্নে আর পাঁচটা অনুক্ত প্রেমের মতোই ছেদ পড়ে পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণের খেলায়।

কিন্তু জীবন এখানেই তো শেষ হতে পারে না। তরুণীটির হঠাৎ অসুস্থ, শয্যাশায়ী হয়ে পড়ার খবর পেয়ে তরুণীটি ছুটে যায় তার রোগশয্যা পাশে। অন্য বন্ধুরাও এসেছিল দেখা করতে।

'সবাই সহজ সুরে বলেছিল কথাবার্তা,
শুধু আমি সারাক্ষণ ছিলাম নির্বাক।
কিছু কি করেছিলাম আঁচ?
ঠিক তাই।
ছাত্রবন্ধু জানিয়েছিল পরে—
ও-বাড়িতে ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল ঢেলে
ধৌত করা হয়েছিল ম্লেচ্ছের পদধূলি।' (ম্লেচ্ছ বিদায়)

এই আচরণের অভিমানে আহত কবির জীবন থেকে আরো চার বছর কেটে যায় ইতিমধ্যে। দাঙ্গার কালো ধোঁয়া আরো জটিল-কুটিল করে চারপাশ। দেশ ভাগ হয়, কুদ্দুসের জন্মভিটা পাকিস্তানে পড়ে, সেখানে তাঁর বাল্য, কৈশোর, যৌবন-প্রারম্ভ দিনগুলি। হাতছানি দেয় নতুন জীবন গড়ার ডাক। কমিউনিস্ট কুদ্দুসকে পরবর্তী কালের বঙ্গবন্ধু আহ্বান জানান পাকিস্তান গড়ার কাজে লাগার জন্য :

'অবশেষে বঙ্গভঙ্গ পালা রাক্ষস মূর্তিকে এসে বলে
ভুলে যান তিক্ত বিসম্বাদ,
চলুন এবার গিয়ে আমাদের নবরাষ্ট্র পাকিস্তান।' (অদ্ভুত উদ্বাস্তু)

সায় দিতে পারেন না তিনি। এতদিনে 'শ্রমিক কৃষক এলো জীবনে', এদের সঙ্গই ব্যক্তিজীবনের দুঃখ ভোলায়, তে-ভাগার আন্দোলন উজ্জীবিত করে।

'এমনি করেই হয়ত বা কেটে যেত কাল
যদি না ঝঞ্ঝার আঘাতে জীবনতরীর ছিঁড়ে যেত পাল,
দ্বি-খণ্ডিত বঙ্গ, জননীর শাবকেরা হতো শকুন চিলের গ্রাস,
ভাইবন্ধু একে অপরের ত্রাস,
তদুপরি সাম্যবাদী হঠকারী দুর্বিপাক
ছন্নছাড়া ছিন্নমূল—দুর্ভাগ্যের পাশাপাশি দিত ডাক
বিপ্লবের কিম্বা প্রলাপের।' (প্রত্যাখ্যান)

গোলাম কুদ্দুসকে পার্টি পাকিস্থানে যাওয়ারই নির্দেশ দিল। সেখানে গিয়ে পার্টির কাজ করার জন্য বলা হল। তবু, ঘড়া ঘড়া জল ঢালার অভিজ্ঞতার পরেও আশায় ভর করে 'কুসুমিকার' মনের কথা জানতে চান তিনি।

'আমি কিন্তু দু'দিন পরেই শুনলেম, না। অসম্ভব।
শোনামাত্র পলকে হলাম আমি বাজপড়া শব!'

'এই ভাল হলো'। বলে তরুণ যখন সব সম্পর্কের ইতির কথা ভাবে তখনই ভালবাসার অন্যবিধ রসায়ন এক অন্যতর জগৎ এনে দেয় :

'অনায়াসে যিনি করলেন প্রত্যাখ্যান
তার এটুকু ছিল না জ্ঞান,
হৃদয় মানে না নিজের উপর ১৪৪ ধারা জারী'

সে টেনে নামালো সুদীর্ঘ কালের নিরুদ্ধ ব্যথার অবরুদ্ধ অশ্রু রাশি রাশি' মায়ের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না মেয়ে।

মা, চুপি চুপি বললেন খুমণি
ভালবাসা অবহেলা করা উচিত নয়।
অমনি যাদুমন্ত্রে যেন বন্ধ হয়ে গেল মেয়ের অশ্রুজল।
(চোখের জলের নামল ধারা)

প্রেমের স্বীকৃতি মিলল, মিলনের নয়। মায়ের ধর্মভীরুতা, সমাজের বন্ধন কিছুতেই ভিন্ন ধর্মের জামাই হওয়াকে মানতে পারে না। 'নিঃস্ব মা বললেন, 'তোরা ঘর বাঁধ আমি কাশী যাই।' মেয়ে সংস্কার না মানলেও চিরদুঃখী, স্নেহশীলা মাকে ত্যাগ করার কথা ভাবতেও পারে না। অতঃপর,—

'এরপর স্নেহময়ী দুখিনী জননী
জ্বলেপুড়ে মরতে লাগলেন আদরের মেয়ের মুখের পানে চেয়ে।
মেয়েও তেমনি জ্বলেপুড়ে মরতে লাগলেন ত্যাগের অগ্নিতে,
বসন্তের দিনগুলি নিয়ত আহুতি দিতে দিতে।'

প্রেমের এই স্বীকৃতি অন্য জীবন গড়ার ভিত তৈরি করল। মেয়ে হেনা মৈত্রের সঙ্গে কবি গোলাম কুদ্দুসও এক অপরূপ তপস্যায় মাতলেন। হেনা চলে যান মফস্সল কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে। আবারও পার্টির নির্দেশে ঢাকা থেকে ফিরে আসেন কুদ্দুস।

মফস্‌সল শহরের কলেজে প্রেমিক কুদ্দুসের চিঠি গেলে পুলিশি খবরদারি পর্যন্ত হয়। অধ্যক্ষা শান্তিসুধা ঘোষের দৃঢ় প্রতিবাদে সে-যাত্রা হেনা হেনস্থার হাত থেকে রক্ষা পান। কলকাতার যোগমায়া দেবী কলেজে হেনা মৈত্রকে পছন্দ করেও তাঁর মুসলমান-প্রেমিক ও ভবিষ্যৎ স্বামীর পরিচয় পেয়ে তাঁকে উপাধ্যক্ষা করা হয় না।

এইসব বাধাকে উপেক্ষা করে কুসুম-কুসুমিকার জীবনবোধ, ভালবাসা গাঢ়তর হতে থাকে। নির্জনের সাক্ষাতে ইতিহাসের ছাত্ররা, ইতিহাসের অধ্যাপিকা ইতিহাস চেতনাকেই তাদের বিপরীত-স্রোতে সন্তরণের তরণী করে। এরই মধ্যে আবার দাঙ্গা, অসহায় দুজনের সে এক নতুন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হওয়া, নতুন অভিজ্ঞতার আঘাতে মূক বিধ্বস্ত হওয়া। ওঁরা দুজন গঙ্গার তীরে সন্ধ্যার নির্জনতায় এসেছিলেন। না সান্নিধ্যের উষ্ণতার জন্যে নয়, দুজনেই অন্যকে সঙ্গ দিয়ে বাঁচাবার তাড়নায় জনহীন গঙ্গার পাড়ে এসে হাজির হয়েছিলেন। চৌষট্টির দাঙ্গার এই রাত, এইদিন গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পাওয়াও স্বাভাবিক। উন্মত্ততা ও বিপন্নতার মুখে দাঁড়ানো এক বৃন্তের দুটি কুসুম মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেও যেন বিশ্বাস হারাতে বসেছিলেন। গোলাম কুদ্দুস ও হেনা মৈত্র এবং আরো আরো অনুরূপ বৃন্তস্থিত পুষ্পের জীবনে ধর্মীয় দাঙ্গা অন্যদের চেয়ে যে অনেক অন্যরূপে আসে, অন্য রকম তার অনুভব এটা খুব বোঝাবার বিষয় নয়।

সেদিন, 'শহরে বেঁধেছে দাঙ্গা,

সন উনিশ শ' চৌষট্টি।

গঙ্গার কিনারে বসে ওপারের তারাদের কাছে

একজন করছিল প্রার্থনা—

অন্যজন যেন কিছুতেই না আসে আজ।'

কিন্তু অন্যজনও তো একই আর্তিতে আক্রান্ত,

'না এসে কি পারি, আমি যে জানতাম অবাধ্য শিশুর মত

মানবে না তুমি বাধা বিপর্যয়,

প্রতীক্ষার তপস্যায় মানবে না হার,

অথচ যতই সময় গড়াবে, রাত্রি গভীর হবে,

ভয়ঙ্কর হবে দাঙ্গার প্রলাপ,

ততই আশঙ্কা আমাকে অস্থির করে দেবে,'

(ইনকিলাবের দখলে গঙ্গা)

এই অস্থিরতা, এই দাঙ্গার প্রলাপ নিয়ে, সেদিনের এ দুই জনের রাত্রির অভিসার, ট্যাক্সি করে কার্ফু-কবলিত কলকাতায় হিন্দু নারী আর মুসলমান পুরুষের সদা শঙ্কিত প্রহর গোনা আরো পাঁচটি কবিতা লিখেছেন কবি গোলাম কুদ্দুস। এই ছ'টি কবিতা আশ্চর্য সংবেদ তৈরি করতে পেরেছে।

দাঙ্গা-বিধ্বস্ততার মধ্যে বিহ্বল দুজন, হেনার বাড়িতে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে, তাঁর শঙ্কিত

চোখের মায়া আর ছায়াকে সঙ্গী করে কুদ্দুস তাঁর দক্ষিণ কলকাতার ডেরায় পৌঁছল। পথে চলতে চলতে উত্তর কলকাতায় ঠাঁই নেওয়ার উপযুক্ত কত কমরেড, কত পরিচিত জনের বাড়ির কথা মনে পড়ে, তিনি সেখানে যেতে পারেন না। তাঁর বস্তিঘেরা বাড়ির টান যে অনেক বেশি, সেখানে অসহায় সংখ্যালঘু বস্তিবাসীদের কথা মনে পড়ে পৌঁছে যান বাড়ির কাছাকাছি। কার্ফুর বিপুল বাধা তাঁকে পথেই আটকে দেয়। ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত তিনি রাতের পার্কে আশ্রয় নিলেন, সেখানেও বন্দুকধারী পুলিশ তাঁকে হঠিয়ে দেয়। অবশেষে হাঁটতে হাঁটতে আড়াই মাইল চলার পরে—

'সবার পিছে থেকে সবাইকে সম্মুখে এগিয়ে দিতে জন্ম যাঁর,
তাঁর কাছে নাম মিথ্যা, মিথ্যা যশমান,
সে রহিবে অজ্ঞাত, অখ্যাত।
সে সহিবে বন্যা ঠেলে গিয়ে
পুলিশের লাঠির আঘাত মেরুদণ্ডে।' (অন্য কলকাতা)

এমনই এক-মানুষের বাড়ি এসে উঠলেন কবি। গৃহস্বামী এবং 'কিছুক্ষণ পরে গৃহের গৃহিণী দিদিমণি/'পাঠ ভবনের' অধিষ্ঠাত্রী যিনি,/নেটের মশারি হাতে উপস্থিত তিনি।'

সে রাতে চিন্মোহন সেহানবীশ আর উমা সেহানবীশের দরদ ও মমতা কবিকে অভিভূত করে। একটা অন্য কলকাতার চিত্র চোখে নিয়ে গভীর প্রশান্ত নিদ্রার কোলে আশ্রয় নেন তিনি। তবু, দাঙ্গার অগ্নি, চাপ চাপ রক্তের স্মৃতি মুহূর্তের জন্য হলেও টলিয়ে দেয় তাঁকে—

'আকাশের হে অগ্নি বলয়, আজ আমি কিছুতেই হে সূর্যদেব,
বলব না এক বৃন্তে দুইটি কুসুম ফোটাতে আবার,
ও দুই কুসুম কাঁটার চেয়েও ভয়ঙ্কর।' (অন্য বৃন্ত অন্য কুসুম)

হেনা মৈত্রর মাতৃবিয়োগ হয় ১৯৬৯ সালে। অধ্যক্ষা হেনা মৈত্র তারপর কবি গোলাম কুদ্দুসকে স্বামীত্বে স্বীকৃতি দিতে পারেন। তাঁদের সংসার, কুসুমের সংসার শুরু হয় বস্তিঘেরা, বস্তিবাসীদের ঘেরা দু'খুপী একটি কোঠাবাড়িতে। কলকাতার একটি কলেজের অধ্যক্ষা এমন অনাড়ম্বর, অনাড়ম্বর বললে ভুল হয়, এমন অতি সাধারণ—প্রায় দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনকে গ্রহণ করলেন যার কথা ভাবতে গেলে কেবল বিস্ময়ই নয়, শ্রদ্ধাও অবনত করে মস্তক। এখানেও ধর্মীয় তরবারি, উদ্যত এবং উদ্ধত তরবারি। দম্পতি যেহেতু হিন্দু-মুসলমান তাই কাজের লোক পাওয়া দুষ্কর। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই বেঁকে দাঁড়াল—'প্রতিবেশীরা বলল,

'প্রতিবেশিরা বলল, ওরা দো-আঁশলা
ওদের বাড়িতে কেউ কাজ করো না।'

এই সমস্যারও সমাধান হল,

'যিনি এগিয়ে এলেন বয়কট বরবাদ করে
তিনি না হিন্দু, না মুসলমান, বিশুদ্ধ খৃস্টান। (এক বৃন্তে তিনটি কুসুম)

এখানে অধ্যক্ষা হেনা মৈত্র নতুন স্বজন, নতুন জগৎ খুঁজে পান। প্রায় আড়াই দশক প্রতীক্ষার পর এই দম্পতির জীবনের সুখানুভব ও তৃপ্তির সঙ্গে জুড়েছিল ওই বিশুদ্ধ খ্রিস্টান সুরেশের মা। যে তার ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য হেনার হাতে তুলে দেয় সুরেশকে। সুরেশ মণ্ডল-এর মা হয়ে ওঠেন হেনা, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বস্তি এলাকাটাই বদলে যায়। সবাই ভীড় করে লেখাপড়ার আবদার জানাতে থাকে। সবার মা হয়ে অধ্যক্ষা কলেজের কাজ শেষে বস্তিবাসীর শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

এ ভাবেই 'কুসুমিকা ও বহ্নিশিখা' কাব্যগ্রন্থে এক মরমী স্মৃতির ঝাঁপি খুলে প্রকৃত অর্থেই মৃত্যুহীন প্রেমের মুকুরে মুখ দেখেছেন কবি। আর সেই অবসরে কমিউনিস্ট গোলাম কুদ্দুসের পাশে যেন আরো বেশি উজ্জ্বল হতে পেরেছেন মানবিক এক মানবী। কাব্যগাথার নির্মাণ, শৈলীগত উৎকর্ষ বিচারের কথা মনে এলেও তা বড় হয়ে দেখা দেয় না এখানে। বরং দুটি সুন্দর, শুদ্ধ ফুলের মতো মানুষের আশ্চর্য তপস্যা, ভালো-মন্দয় মেশানো তাদের পারিপার্শ্ব পাঠককে মগ্ন না করে, আপ্লুত না করে পারে না। এই চল্লিশটি কবিতা একটা সময়ের কথা বলে, একনিষ্ঠ কমিউনিস্টের অনুভব ও সংগ্রামী প্রত্যয়ের কথা বলে আর বলে তাঁর প্রিয়তমার আশ্চর্য মানবিকতার কথা। পত্নী বিয়োগের পরবর্তী ভাবাবেগ যে নেই তা তো নয়, তবু গোলাম কুদ্দুস ঘটনার বস্তুগত সত্যের প্রতি নজর রেখেছেন বেশি। আর সেজন্যই মহাকাব্যিক উন্নতির প্রেম অন্য-বিবিক্ত হয়নি। সমাজ ও দেশ, মানুষ ও মানুষী সবলতা-দুর্বলতা নিয়ে এক পরিপূর্ণ জীবনগাথা হতে পেরেছে।

মুক্তির কথা, মিলনের কথা

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

প্রেক্ষিত : এক

স্বাধীনতার পর প্রায় ষাট বছর অতিক্রান্ত, তৎসত্ত্বেও আমাদের প্রেরণার উৎসমুখ এখনও বহির্বিশ্বের উন্নত দেশগুলির অর্থনীতি বিজয়ের পথ, তথাকথিত শিল্পায়ন নিয়ে যে কচকচি, তারও নিহিতে লুকিয়ে আছে 'নিকষ কলোনিয়াল' জটাজাল। বিশ্বায়নের চোটে সব কিছু ঢোক গিলেও মেনে নিতে হয়। মানতে হয় নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়।

প্রেক্ষিত : দুই

সময় বড় অস্থির, নরনারীর সামাজিক সম্পর্ক আরো অস্থির। কালের বিবর্তনে আদম-ইভের আদি সম্পর্ক পালটে পালটে আজ যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেটাকেও বুক চিতিয়ে সার্বিক নারী-স্বাধীনতা বলতে পারি না।

প্রেক্ষিত : তিন

বিশ্বযুদ্ধের (দ্বিতীয়) সময়কালে ইংরেজ শাসিত অখণ্ড ভারতবর্ষে এক বাঙালি মুসলিম পরিবারের কাহিনীচিত্র যখন রচিত হয়, তখন তা নিশ্চয় নিছক পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। সামন্তযুগীয় ধ্বংসাবশেষ পেরিয়ে ধনতান্ত্রিক যুগের বীজ বপনের আপ্রাণ চেষ্টা চলেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অধিকৃত ভারতবর্ষকে ইংলন্ডের রাণীর হাতে সরাসরি তুলে দেওয়ার মাধ্যমে। তারপর আমাদের সমাজ ও পরিবেশ বদলের ইতিহাস সকলেরই জানা। 'বিশ্বায়ন' শব্দের সঙ্গে পরিচিতি তখনও ঘটেনি। কিন্তু 'ব্রিটিশায়ন'-এ আমরা দেখছি, বিন্দু বিন্দু করে বাজার দখলের চেষ্টা। তৎকালীন দেশীয় সামন্তপ্রভুরা আধুনিকতার নামে এই ব্রিটিশায়নকে যেভাবে সহজেই গ্রহণ করে নিয়েছিল, এবং তার গ্রাহ্যতাও যেভাবে সাধারণ জনমানসে প্রতিফলিত হচ্ছিল, তা আজ আর কারও অজানা নয়। বহির্বিশ্বের জ্ঞানের আলোকে 'নবজাগরণ' তো সকলের জানা।

এতটা প্রেক্ষিতে বর্ণনা কেন অনিবার্য হয়ে গেল 'বাঁদী' উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে, তার উত্তর খোঁজার জন্যই এই উপন্যাস আলোচনা।

পাঠক ক্ষমা করবেন, আজ থেকে প্রায় ৫৫ বছর আগে প্রকাশিত গোলাম কুদ্দুস এইভাবেই এঁকেছিলেন এবং দেখেছিলেন একটি মুসলমান পরিবারকে। উপন্যাসের চরিত্র যেহেতু মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত এবং গোলাম কুদ্দুস যেহেতু একজন কমিউনিস্ট লেখক, অতএব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাষণ থাকবেই। থাকবেই উভয় ধর্মের মৌলবাদীদের প্রতি সতর্কীকরণের বিজ্ঞপ্তি। আমার আলোচনার কেন্দ্রীকতায় তাই ওই বিষয়গুলি স্থান পায়নি, যেমন স্থান পায়নি, 'বাঁদী' নামক মধ্যযুগীয় হারেম কাহিনীর আভাস। তৎকালীন সমাজের সমগ্রতাই আলোচনার প্রধান বিবেচ্য বলে নির্ণিত হয়েছে।

সমাজের অবজ্ঞাত অংশের, শ্রেণীর, সম্প্রদায়ের পাত্র-পাত্রীদের জীবন সমস্যা নিয়ে

গ্রথিত হয়েছে কাহিনীর বিন্যাস। একটা প্রতীকী মুসলমান পরিবারের মানুষজন এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক গল্পের মধ্যে তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে।

উপন্যাসের নাম 'বাঁদী' হলেও গল্পের মূল চরিত্র হলেন রফিক। গোটা উপন্যাস জুড়ে চরিত্রটি লক্ষ্যে স্থির কিন্তু পন্থা নির্বাচনে চঞ্চল।

চরিত্রটি ইতিহাস চেতনা ও ব্যক্তিগত গুণের সংমিশ্রণে বিশিষ্ট হয়েছে। এই চরিত্রের ইতিহাস নিছক পাঠ্যপুস্তকের মুখস্থ করা ইতিহাস নয়। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও তার মামা বাড়ির গোষ্ঠীর জীবনের অভিন্ন ইতিহাস। অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলে এই ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি, তারপর তার জানা আবহতে হস্তক্ষেপ করার সাহস ক্রমে ক্রমে এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছে।

আলোচনায় কাহিনীর আলোকপাত না ঘটালে, এমন গভীর বিষয় উত্থাপনের অনিবার্যতা অর্থ পায় না, তাই উপন্যাসের ভেতরের কাহিনী একটু বিবৃত করি। উপন্যাসের ভেতরের কাহিনী একটু বিবৃত করি।

কাহিনীটা এইরকম :

রফিক শহরে মামাবাড়িতে উচ্চশিক্ষার জন্য এসেছে গ্রাম থেকে। মামা সাদেক সাহেব ইংরেজ আনুকূল্যে সরকারি চাকুরে। তারপর এই চাকুরির সুবাদে বড় ঘরে বিয়ে, সব মিলিয়ে অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত মুসলিম। যার চারপাশে চাকর-বাকর, বাঁদী, দাসী ইত্যাদি। কুলসুম সুন্দরী অল্পবয়সী বাঁদী এই কাহিনীর মুখ্য চরিত্র। যারা বংশ পরম্পরায় বাঁদী। তারও একটা সুন্দর যুক্তিগ্রাহ্য ইতিহাস বর্ণনা করেছেন লেখক এইভাবে।

'হয়ত পঞ্চাশ বছর আগে...হয়ত তারও পূর্বে...

বিধবা হয়ে কৃষকের মেয়ে আমিরণ ফিরে এসেছিল তার ভাই রমজানের ঘরে...এক কুড়ি পণ নিয়ে আমিরণকে বেচে দিল নিকের নামে। ...তারপর সৎ বাপ আমিরণের মেয়ে করিমনকে বিক্রি করে দিয়ে এল দশ টাকায়, পাঁচ ক্রোশ দূরে এক জমিদার বাড়িতে, বরকতুল্লাহ হাজী সাত বছরের রাঙা টকটকে বাঁদী পেয়ে খুশীতে হাত বুলালেন দাড়িতে। একদা হাজীসাহেব জামাইকে যৌতুক দিলেন খাট-পালঙ্ক ইত্যাদির সঙ্গে বাঁদীকেও। করিমন চালান হয়ে গেল শ্রীহট্ট শহরে। চাকর বাকর থেকে মুনিব, সকলেই বাঁদী উপভোগ করতে থাকলেন ধর্মের বিধান মেনেই। বাঁদী হালাল। ইসলামের বিধান। শেষ পর্যন্ত নামকাওয়াস্তে বিয়ে দিয়ে দিলেন তাঁর আদরের চাকর পাঁচুর সঙ্গে, ...করিমনের হল একটি মেয়ে নাম রাখল শমীরণ। ...শমীরণের যখন বয়স বারো বৎসর, আব্বাস সাহেবের মেয়ে কামরুন্নেসার সঙ্গে চালান হয়ে গেল মুনীব কন্যার দোজবরের বাড়ী ঢাকাতে। এরপর...সালেহা বিবির বিয়ে হল সাদেক সাহেবের সঙ্গে। মা শমীরণ আর মেয়ে কুলসুম দুজনেই বাঁদী হয়ে এল এই সংসারে।'[১]

এই কুলসুমের ওপর চলে নানারকম অত্যাচার, মুখ বুজে সহ্য করে কুলসুম, প্রতিবাদ করতে শেখেনি এই ক্রীতদাস।

নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভুদের আধিপত্য রফিককে ক্রমশ প্রতিবাদী করে

তুলেছে, তবে বোধ ও বিশ্বাসের জগৎ ছিল স্থির। কিন্তু লড়াই-এর উপযুক্ত নির্মাণ প্রক্রিয়াটি ছিল দ্বিধাদ্বন্দ্বে পূর্ণ। এই ক্রীতদাস গোষ্ঠীর ওপর দীর্ঘ সময়ের দমন পীড়ন বঞ্চনার অবসান করতে হবে বলে সে নিজেই নানা সমাধান খুঁজেছে কলেজে পড়তে পড়তে। আলাপ হয়েছে সত্যবানের সঙ্গে। তাকেই চিন্তার অগ্রদূত বলে ভেবেছে কখনও। মুসলীম লিগপন্থী ছাত্র রহমত অথবা রহমানও তার বহতা চিন্তার সঙ্গী হয়েছে কখনও সখনও। কিন্তু সত্যবান তাকে হিন্দু-মুসলমানের জাতি সমস্যার বাইরে গিয়ে গোটা সমস্যাকে অর্থনীতির চোখে দেখতে শিখিয়েছে। যখন রফিক মুসলিম বন্ধুদের শেখাচ্ছে রবীন্দ্র উদ্ধৃতি দিয়ে "আমরা গোড়া হইতে ইংরেজের ইস্কুলে বেশী মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গভর্ণমেন্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশী পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। ...মুসলমানরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদ মান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্যবশত জাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা সৃষ্টি হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আজ প্রচুর পরিমাণে তা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রসাদের যেখানে সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা যেদিন দেখিবেন, বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া ওঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন যে একদেশে আমরা জন্মিয়াছি, সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে, ধর্মহানি হয়, এবং ধর্মহানি হইলে কখনোই স্বার্থরক্ষা হইতে পারে না, তখনই আমরা উভয় ভ্রাতার একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।" তখন সত্যবান বলছে "এটা ঠিক কথা যে ওভাবে পাওয়া যায় কিছু চাকরী, আর তাতে মধ্যবিত্তকে হাতেও রাখা যায় সাময়িক ভাবে" বা কখনও যুক্তি দেয়, "আসল কথা কি জানিস? বিরোধের (চাকরির সুযোগ নিয়ে কিছু মুসলমানের) সমস্যাই থাকত না দেশে যদি কোটী কোটী চাকরী থাকত। কিন্তু তা নেই কেন? ...সে দিক দিয়ে না ভাবলে পরস্পরের বিরোধ বাড়বেই, আর ইংরেজ দেবে তাতে উস্কানি। সেটাই ইংরেজের রাজত্ব চালানোর কায়দা।"

রবীন্দ্রনাথ-এর মৃত্যুদিবস এখানে আলোকিত হয়েছে এক অন্যমাত্রায়। রফিক নিজেকেই বারংবার প্রশ্ন করে রবীন্দ্রনাথ তো তার কেউ নন, তবে কেন ব্যথা লাগে এত? কেন এত যন্ত্রণা? দূরে থেকেও রবীন্দ্রনাথ কী করে এত কাছে এলেন?

করিমন্নেছা, মামা সাদেক সাহেবের শাশুড়ি, একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারী, হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ শুনে প্রতিক্রিয়া জানালেন—

"তা—সে তো হিন্দুর। একটা হিন্দু মারা গেছে তো তোমার কি?"

শুনে রফিক সম্পর্কের কথা ভুলে করিমন্নেছার গলা টিপে ধরল।

কিন্তু ঘটনায় যা প্রকাশ পেল, তা হল, ধর্মের বিষে নীল হয়ে গেল এই সমাজ। তলে তলে এত বিষ বুকে নিয়ে কি করে এরা মিলবে পরস্পরের সঙ্গে।

কলেজে পড়া রফিক-এর অল্প বয়সের এই অপমানের অভিজ্ঞতা তার চেতনায় দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রাখে। একদিকে কুলসুমদের জীবনে বঞ্চনা ও অপমানের ইতিহাস, অপর দিকে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের ফলে সাদেক সাহেবদের বাড়-বাড়ন্ত, রফিকের মনে বঞ্চনাবোধের জন্ম দেয়, তৎকালীন সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারবাদীদের আন্দোলন, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে মিলেমিশে যে প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা, রফিকের মনে কোনো ভরসা জোগায়নি। একই সময়ে পশ্চিমি সাম্যবাদের আদর্শে সত্যবানদের মতো ছাত্ররা কিছুটা প্রভাবিত হলেও, উন্নত জীবনের সুযোগ সন্ধানে তাদের আগ্রহের অভাব ছিল না।

তার তর্কপ্রবণ সমাজতত্ত্বের কিছু মূল প্রশ্ন বারংবার উচ্চারিত হয়েছে গোটা উপন্যাস জুড়ে।

বাঁদী কুলসুমের নামাজ পড়তে সময় না পাওয়ার জন্য সে বলেছিল 'নামাজ পড়ার জন্য সময় দেওয়া দরকার'। আবার সে কখনও বিশ্বাস করেনি নামাজ না পড়লে বেহেস্তে যায়। দুটি আপাত পারস্পরিক বিরোধী কথাকে তত্ত্বের সাযুজ্যে বুঝিয়ে বলেছে 'কেউ কাউকে নামাজ পড়তে যদি পাকে চক্রে (দাসত্বের কারণে) বাধা দেয় আমি তার বিরুদ্ধে। ...আবার যদি নামাজ পড়া ঠিক বলে মনে না হয়', তা হলে আমি তারও বিরুদ্ধে। ভয় নিয়ে কুলসুমকে বোঝানোর সময়ও তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রাধান্য পায় "যতই ভয় করা যায়, ততই ভয় এসে ধরে বসে, ঐ ভয় দেখিয়েই অধার্মিকরা ধর্মের নামে রাজত্ব করে। দেখ! মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই। সেই মানুষ যখন ভয় পায়, তখন সে হয়ে যায় ছোট, তার মেরুদণ্ড হয়ে যায় বাঁকা, যারা মানুষের ভালো চায় না, তারই বলে, একে ভয় করো, ওকে ভয় করবো কেন? যা সত্যি বলে বুঝবো, তাই কেবল মানবো।"

বাঁদী উপন্যাসে লেখকের মানসপুত্র রফিক। সে অক্ষয় মৈত্রের 'সিরাজদ্দৌলা পড়ে। সামান্য চাকরির তাগিদে শিক্ষিত হতে এসেছিল গ্রামের ছেলে রফিক। কিন্তু শহরের রাজনৈতিক উত্তেজনা থেকে সরে থাকতে পারেনি। ক্রমে দেখেছে শহরে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ। লিগ সমর্থিত ছাত্ররা বেশ গর্বিত তাদের লিগ সরকারের দাক্ষিণ্যে তাদের চাকরির সম্ভাবনার কথা ভেবে। হলওয়েল মনুমেন্ট নিয়ে বিরাট মিছিলে সামিল হয়েছে রফিক। 'হলওয়েল মনুমেন্ট ভেঙে ফেল' ধ্বনি দিতে দিতে বেরিয়ে পড়ল মিছিল। সত্যবান-রফিক সাত্তার-জলিল-কিরণ পাশাপাশি দাঁড়াল মিছিলে।

লিগ সমর্থিত ছাত্র রহমতের সঙ্গে মন্ত্রীদর্শন এবং সেই দিনের অভিজ্ঞতায় রফিকের মোহভঙ্গ হল। সেইখানে 'স্বার্থ ও অনর্থের কলগুঞ্জরণ' এবং বাংলা দেশের সমস্ত দুঃখযন্ত্রণা স্বার্থের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে চলেছে কেমনভাবে? তা দেখে রফিক স্তম্ভিত হয়ে গেল।

উপন্যাসের শেষ 'মুক্তি' দিয়ে। দাসত্ব থেকে মুক্তি। এ দাসত্ব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এসেছে। উপন্যাসটির ঘটনা বিন্যাসে তেমন অভিনবত্ব নেই অথচ বহুবিধ ঘটনা প্রবাহের ধারাবিবরণী দিয়েছেন নিপুণভাবে।

কালানুক্রমিক ঘটনাবলীকে 'দাসত্ব'-স্তম্ভের উপর দাঁড় করিয়ে রচিত করেছেন উপন্যাসের কাঠামো। এতে প্রতিটি অধ্যায়ের ভিতরে একটা সংযোগ তৈরি হয়েছে অথচ

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুসারে লেখক বহু উপঘটনার খুঁটিনাটি প্রশ্নের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন বিস্তৃতভাবে এই সযত্ন পর্যালোচনা মূল উপন্যাসের ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও যেন বিচ্ছিন্ন হয় না আবার পাঠককে ক্লান্তও করে না, এই উপন্যাসে পাঠকরা পেয়ে যাবেন অল্প পরিসরের মধ্যে অসাধারণ দক্ষতায় বর্ণিত নানাবিধ ঘটনার আকর্ষণীয় বর্ণনা। চরিত্রগুলির মধ্যে তথ্য ও তর্কের ঠাসবুনন আছে। বর্ণনায় কোনো চাল নেই। সহজ ভাষায় সরাসরি বক্তব্য পেশের একটা নিজস্ব স্টাইল আছে। পরিচিত রাজনৈতিক ঐতিহাসিক ঘটনার বিচার বিশ্লেষণে লেখকে রাজনৈতিক মতাদর্শের ছাপা স্পষ্ট।

বাঁদী উপন্যাসটি নিছক কাহিনীকেন্দ্রিক নয়; গোলাম কুদ্দুস কিছুটা রাজনৈতিক মনস্ক লেখক। প্রকৃতি-পরিবেশ-মানুষজনের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও প্রশ্ন তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। অবিরাম এই প্রশ্নের তরঙ্গমালা রফিকের সমগ্র চিত্ত জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে গেছে। 'মুক্তি'কে স্পর্শ করতে চেয়েছে। আর 'মুক্তি'কে স্পর্শ করার রহস্যমাতায় বেঁচে থাকা।

এই যে কুলসুম। কুলসুমের মা শমীরণ, বাঁদী বাতাসী—সবারই বুকে একই হাহাকার। এই হাহাকার থেকে মুক্ত নয় সালেহা বিবি, নঈমা, তহমিনা কেউ-ই, এ তো গেল নারীমুক্তি-নারী স্বাধীনতা, আবার এদের মধ্যে কুলসুম-শমীরণ-বাতাসী এরা বাঁদী-ক্রীতদাসী—এদের মুক্তি। অন্যত্র এর সঙ্গে আছে দেশের মানুষের স্বাধীনতা বা মুক্তি। আছে মৌলবাদী সংকীর্ণ চিন্তা থেকে মুক্তি, আছে এমমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি, আছে সত্যবানের মানবিক সত্তার মুক্তি, রফিকের মামার উপর নির্ভরতা থেকে মুক্তি।

এই সমস্ত মুক্তি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। উপন্যাসের শেষে কুলসুম চলে যায় তহমিনার সঙ্গে। আর রফিক চলে যায় "সমুখে অপরিচিত পথ, অজানা ভবিষ্যৎ, ভয় বাধা তুচ্ছ করা মরণ বিজয়ী মানুষ। কবে পুরুষ হবে মুক্ত আর নারী হবে স্বাধীন"—এই প্রশ্ন নিয়ে।

সমাজ—বিযুক্ত সমাজ

অজয় চট্টোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের মূল ধারা বৃত্তান্ত দাপটে পুষ্ট। কাহিনীর ঘনঘটা এবং ঘটনার সংঘাতে দোলাচল হয় আখ্যান বিন্যাস। সূচনা প্রসার এবং পরিণতি অবধি অব্যাহত থাকে কথকতার বুনন। সমস্যা-সমাধানের ছক অধ্যুসিত প্রশস্ত আঙিনা বয়কট করে আরো বিভিন্ন না শীর্ণ না উত্তাল ধারা সমান্তরাল গতিতে বহমান। যে ধারায় গল্প বড় কথা নয়, বড় কথা হল উন্মোচন এবং বিশ্লেষণ। যাকে বলে চর্চা। দহন রহস্যময়তা অনিশ্চয়তার আশ্রয় এই ধারা। নানাবিধ বৈচিত্র্যময় ধারার সন্নিবেশে বাংলা উপন্যাসের জগত উদ্দীপক আকর্ষণীয় এবং সুন্দর। অপ্রধান ধারার কাহিনীর গতিচঞ্চলতা বড় কথা নয়। সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্তঃশীল চরিত্রের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কামনা বাসনার জটিল আবর্ত; এই সবই বড় কথা। আলোচ্য উপন্যাস এই ধারার উত্তরসূরী।

প্রচুর রিপোর্তাজ রচনায় গোলাম কুদ্দুস সিদ্ধহস্ত। কবিতা বিশেষ ভাবে "ইলা মিত্র" কবিতাটি একসময় তাঁকে প্রসিদ্ধি দিয়েছে। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা বেশ কিছু। তিনি আমৃত্যু কম্যুনিস্ট পার্টি এবং গণআন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। আদর্শবোধের অনুদান হিসেবে তাঁর রচনায় তত্ত্বচিন্তা এবং মানবমুক্তি বিষয়ক চিন্তার ছায়াপাত প্রখর। আলোচ্য উপন্যাসটি সেই চরিত্র থেকে স্বতন্ত্র। এখানে তিনি নৈর্ব্যক্তিক। অর্জন এবং অবক্ষয়ে সফলতা এবং সংকটের নকসি কাঁথায় পর্যবসিত হয়েছে "লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে"। প্রত্যয় প্রণোদনে খণ্ড নয়। বিতর্কে জীবন্ত। বিতর্ক আছে। শালীনতা এবং সহিষ্ণুতা ধাক্কা খায় না এমন বিতর্ক। যে প্রেক্ষিতে চরিত্রসমূহের বিচরণ উর্বর হয় উপন্যাসটির অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে সেই প্রেক্ষিত অনুধাবনই হচ্ছে তোরণপথ।

উপন্যাসের ধর্ম শিল্প সত্য এবং জীবন সত্যকে প্রতিফলিত করা। তার অর্থ অবশ্য এই নয় উভয় সত্যের সমানুপাতিক সহাবস্থান হতে হবে। আসলে কোনো উপন্যাস জীবন সত্যের আধিক্যে অধিক ধনী। শিল্প সত্যে হয়ত বা ঈষৎ দরিদ্র। আবার উল্টোটাও হতে পারে। কোন গুণে কে ধনী কোন অভাবে কে দরিদ্র এই ফারাক নিয়ে খুঁতখুঁতানি বিচার্য নয়। কে কতটা বসতি জুড়ে আছে সেটার চেয়ে বিচার্য হচ্ছে উভয় সত্যের বসবাস।

এখন দেখা যাক আলোচ্য উপন্যাসটি উপন্যাসের নির্দিষ্ট ধর্ম কতটা পালন করেছে।

"লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে" উপন্যাসটির পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে সামরিক সমাজের আবেষ্টনে। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে সামরিক বাহিনীর ওপর। যুদ্ধ হানাহানি ষড়যন্ত্র গোপনীয়তা এই সমাজের অঙ্গবিজড়িত। জীবনব্যাপী জীবন সংশয় এবং উদ্বেগ। অশান্তির অন্ত্যেষ্টি নেই। সমাজের গর্ভেই ব্যক্তি সত্তার উৎস। অথচ সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। যেন ছেলে গেছে বনে। বরণে এবং প্রত্যাখ্যানে করুণ সমাজ। আবদ্ধ নিষিদ্ধ জগতের ঠিকানা। এমন এক জগৎকে আত্মীয়তার নৈকট্যে বাংলা সাহিত্যে

হাজির করেছেন লেখক। বস্তুত যা বলিষ্ঠ এক সমাজ শক্তির স্বীকৃতি। যে সমাজের আখ্যান আলাপ-বিলাপ-সংঘাত এবং শুভ পরিণতির ধরতাই কুলোর বাতাসে উড়িয়ে দেয়। বরণ করে সেই সমাজ সেই জীবন যে জীবনে বহে চলে নিরন্তর বক্র খেলা।

কঠিন নিয়মানুবর্তিতার ছাঁচে গঠিত সামরিক সমাজের গঠনতন্ত্র। ছাঁচে ঢালা সমাজ। প্রতিষ্ঠান। হোক না লোহার বাসর ঘর। রন্ধ্র থাকবেই, ফাঁক ফোকর এবং অবকাশ সৌজন্যে যোদ্ধারা হাত পা খেলায়। হয়ে ওঠে সামাজিক সত্তা। বদ্ধতার আগল ভাঙা পরিবেশকে লেখক বুদ্ধি এবং হৃদয়বৃত্তি দিয়ে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রসন্ন লেখনিতে গড়ে উঠেছে কাঠামো। স্ফুরণ হয়েছে চরিত্রের অন্তঃস্থল। আপাত দৃষ্টিতে ফৌজী সমাজের বার মহল ঝাঁ তকতক। শুধু কর্তব্য ছাড়া অন্য কোনো দিকে নজর নেই। অন্দর মহল ধোঁয়াটে। সেখানে কোন খেলা হচ্ছে তার তল পাওয়া যায় না। দু মহলের অন্তর্বর্তী ব্যাপ্ত অঞ্চল হয়ে ওঠে ধূসর এলাকা। বুদ্ধি প্রয়োগ করে দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে লেখক সেই তমসাচ্ছন্ন সমাজের বিভিন্ন স্তরকে আলোকিত করতে যত্নশীল হয়েছেন।

দ্বিধা ঝেড়ে ভনিতা ছেঁটে লেখক উপন্যাসটির নামকরণ করেছেন "লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে"। চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ তাঁর মূল্যায়নে যাদের কথা ইতিহাসে সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য—তারা তা পায়নি। ব্রাত্য থেকেছে। যোগ্য অথচ উপেক্ষিত; মূল্যায়ন বাড়াবাড়ি নয়।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। জনগণ চিরদিন বটপাতা চিবোয়। সাধারণ্যে প্রচলিত বাক্যের অন্তঃসার মান্যতার দাবী রাখে। এর মধ্যে সুপ্ত আছে সত্যের বীজ। যে গণসমাজ ইতিহাস সংগঠন করেন তারা থেকে যান অজ্ঞাত। ইতিহাসের পাতা থেকে প্রবাসে। লিখিত ইতিহাসের এ এক করুণ দিক। প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্ব বা প্রখর ব্যক্তিত্ব হিসেবে যারা চিহ্ন রাখেন তারা প্রতিভূ। নেপথ্য শক্তি হচ্ছে অগণন মানুষের ত্যাগ অশ্রু বীরত্ব। মাটি ঘেঁসা মানুষদের যাবতীয় পুঁজি তা সকলি হরণ হয়। স্বীকৃতিও জোটে না।

গোলাম কুদ্দুসের মরমী দৃষ্টি ইতিহাসের ঘাটতির দিকটা প্রথমেই চিহ্নিত করে। গোড়াতেই তাঁর চরিত্র জানান দেয়, "—সুদর্শন সিং-এর বাবা বড় ভারতীয়র মতই কাজ করেছিলেন, যদিও কোথাও স্বর্ণাক্ষরে তার নাম লেখা নেই। তিনি ছিলেন সাধারণ সেপাই এবং সেপাইদের বিদ্রোহে যোগ দিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন।"

সুদর্শন—অর্জুনের দাদু। অনেক বয়সী। বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। দেখা এবং শোনা বিস্তর। বহু ভূয়োদর্শনে অভিজ্ঞ। এই শ্রেণীর মানুষ খুব হিসেবী হয়। এরা প্রতিক্ষণে উদ্বিগ্ন এবং সংশয়ী। আবেগ তাড়না পলকা নয়। চারপাশের কঠিন নির্মম ঘটনা ক্রমাগত প্রত্যক্ষ করে করে মানসিক কাব্যময়তা বিনষ্ট। "ঘুঘু" বিশেষণে বিভূষিত হয়। রূঢ় লাগে শুনতে। কিন্তু বয়স্ক চরিত্রের এ এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা। যে কারণে বয়স্করা কোনো বড় ঘটনা ঘটাতে অক্ষম। নিয়ন্ত্রক নয়। পর্যবেক্ষক মাত্র। এই মানসিকতার প্রতিনিধি সুদর্শন। সে বিশ্বাস করে ইংরেজ শক্তিমান। এমন শক্তিমান যে ভারতীয়রা তার সঙ্গে লড়ে পারবে না। তা সে যতই লড়ুক। বিপরীতে অন্য চিত্র। কচি বয়সীরা অন্যায়ের প্রতি শোষণের প্রতি ঘৃণা

করতে উদ্বুদ্ধ হয়। বাল্য ধর্মের বৈশিষ্ট্যকে লেখক প্রকাশ করেছেন "অর্জুন"-চরিত্রে। সে ব্রাহ্মণদের মনে করে হাড়-খেকো। শুধু তাই নয়। তার মেথর দর্শন শুভ লক্ষণ। হাড়-খেকোদের দেখলে দিনটা তার মাটি। ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার একপেশে নয়। নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চ বর্ণের আছে ছুঁতমার্গতা। উচ্চবর্ণের প্রতি নিম্নবর্গেরও ছুঁতমার্গতা গাঢ়। প্রথমটা সোচ্চার। দ্বিতীয়টা ফল্গু ধারা।

অর্জুন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার শৈশব সাবেকি। পুঁথির জগৎ অপেক্ষা বাউণ্ডুলে জীবন তাকে টানে বেশি। পাঠশালার আঙিনা নয় পথ তাকে আকর্ষণ করে। পথ তাকে ডাকে। যে পথ হচ্ছে প্রান্তর। গাছপালা ফসল দিয়ে ঘেরা খেত তার কাছে মনোজ্ঞ বিচরণ ভূমি। বাল্য স্বভাব মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের ভাষা, আমি চঞ্চল হে,/আমি সুদূরের পিয়াসী।

তাই পাঠশালা পাপোষ। মোষ চরানোর কাজ বেছে নিতে পেরে অর্জুন তৃপ্ত। সুদূরের আহ্বান অর্জুনকে কেড়ে নেয়। গ্রামছাড়া করে। মায়ের করুণ মুখচ্ছবি স্মৃতি করে গ্রাম থেকে উৎখাত হয়। এক খাঁচা থেকে আর এক বন্দিশালায় বন্দি হয়। বাবার হাত ধরে আগ্রা ক্যান্টনমেন্টে এসে ভর্তি হয় ছাত্র হিসেবে। ওর কাছে এ এক আশ্চর্য জগৎ। মোষের রাখাল ব্যারাক বয় হয়ে দেখল বয়স্করা তার ছায়াসঙ্গী। বয়স্কদের সঙ্গে তার ওঠা বসা এবং শয়ন। ফলে যা দেখার নয় তাও দেখছে। যা শোনার নয় তা শুনছে। হয়ে পড়ছে অকালপক্ক। শৈশব বঞ্চিত দরকচা জীবন। লেখকের ভাষায়, "মাঠ ঘাট, বাহাদুর আর হিমালয়ের স্বপ্ন চুরচুর হয়ে যায়।"

এই উপন্যাসে লেখক চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব খননের দিকে মনোযোগ দেননি। পরিবেশ পরিস্থিতি সঞ্জাত চরিত্রের আবর্ত ঘটনা বিন্যাস বুননের দিকে ঝোঁক অধিক। অভিজ্ঞতার আলোকে এঁকে তুলেছেন সেই সমাজ। ফৌজী সমাজ। ফৌজী সমাজের মুখ্য অংশ সেপাই। নীচু তলার কর্মী। এদের জীবনযাত্রা নির্দয় কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ। কঠিন শ্রম নিগ্রহ এবং কষ্ট অঙ্গচ্যুত হয় না কোনো ক্ষণে। মানুষের হাতে মানুষের নিগ্রহ কত কঠিন নির্দয় হতে পারে তারই সাক্ষ্য বহন করছে ফৌজী সমাজ। কোনো বিরল ঘটনার নিদর্শন নয়। জীবনে নিত্য তার আনাগোনা। বিংশ শতাব্দীর কালপটে দাস সমাজের প্রতিচ্ছবি। ফৌজী সমাজের অন্তর্গতে যে ছবি প্রকৃত ছবি তাকে লেখক অক্ষরমালায় গেঁথেছেন। উপন্যাসে প্রকাশ্য হয়েছে খণ্ডিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এক মানবসমাজ। যে সমাজে কারুকার্যময় বসনের আবরণ খসে গেলে প্রত্যক্ষ করা যায় মানুষ এখানে ব্যবহৃত হয় জন্তুর মর্যাদায়। নারী ব্যবহৃত হয় পণ্যে। এমন এক সমাজ যে সমাজে রেপিং অপরাধ নয়। বিক্ষুব্ধ অন্তরের উপশম মাত্র। ক্লান্তির আরোগ্য। মর্মন্তুদ আলেখ্য। অথচ এই সমাজ সম্পর্কে আমরা বিজ্ঞ নই।

সামাজিক রাজনৈতিক ঐতিহাসিক নানান বিভাগে উপন্যাসকে বিভক্ত করার প্রথা আছে। অবশ্য গূঢ় অর্থে বিভাজন প্রথা বেকার। বরং সীমিত অর্থে মান্য করা যায় যে উপন্যাসের বিষয় নির্ভরতাই উপন্যাসের শ্রেণী নির্ণয়ে নিয়ামক। আবার এ ব্যাখ্যাও গোলমেলে লাগে। বিষয় নির্ভরতাই যদি উপন্যাসের খোপ হিসেবে চিহ্নিত হয় তো

তারাশঙ্করের "আরোগ্য নিকেতন" এবং মনোজ বসুর "নিশিকুটুম্ব" যার একটি বিষয় কবিরাজি এবং আর একটির বিষয় চুরি। তত্ত্বগত বিচারে তাহলে কি একটিকে কবিরাজী এবং আর একটিকে চুরি উপন্যাস হিসেবে বর্ণিত করা যায়! শেকসপীয়রের যে সব নাটকে হত্যা আছে বারবার সেই সব নাটককে কি খুনী নাটক আখ্যা দেওয়া সঙ্গত। বলা বাহুল্য তেমন সাহিত্য বিচার সে বড় মূর্খামি।

সমাজ বিন্যাস-রাজনীতি-যুদ্ধ বিগ্রহ, যে-কোনো প্রেক্ষাপট থেকেই ইতিহাসকে যখন তুলে আনা হয় উপজীব্য বিষয় হিসেবে তখন তা কি অনুবাদিত ইতিহাস থাকে। থাকে না। যাকে ইতিহাসের ভগ্নাংশ। দৃষ্টিভঙ্গির কারণে উপাদান সংগ্রহের কারণে উদ্দেশ্য সংগঠনের কারণে এক একজনের কাছে ইতিহাস এক এক আদল নেয়। তাই টয়েনবী, এইচ জি ওয়েলস, টলস্টয়, মার্কস প্রমুখ ইতিহাসবিদদের মধ্যে ইতিহাস নিয়ে মাকু ঠেলাঠেলি। ইতিহাস হয়ে ওঠে বিতর্কমূলক। এখানে এ্যারিস্টটল হয়ে ওঠেন স্মরণযোগ্য। তাঁর মতে ইতিহাসের তথ্যগত সত্য বিশেষের সত্য। সাহিত্যের সত্য সম্ভাব্যতার সত্য। দার্শনিক সত্য। উপন্যাসে বর্ণিত সমাজ সংস্থা চরিত্রের অবস্থান দর্শন এবং ইতিহাসের মাঝামাঝি বিজড়িত অংশ।

উপন্যাসের নিজস্ব স্বধর্ম সৌন্দর্যচেতনা। অন্যতর প্রাণীজদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য কিনা জানা নেই। কিন্তু সৌন্দর্যবোধ মানব প্রজাতির স্বভাবধর্ম। প্রসারতা এবং গভীরতার তারতম্য সত্ত্বেও। রূপদৃষ্টি মানুষ মাত্রই স্বভাব প্রবণতা। রবীন্দ্রনাথ তাই মানুষ মাত্রকেই অভিহিত করেছেন "স্রষ্টা"। সৌন্দর্যের স্বভাবধর্ম মানবধর্মের প্রাথমিক শর্ত। পক্ষান্তরে সৌন্দর্য জিজ্ঞাসার অবস্থান মানবধর্মের উপরি কাঠামোয়। যা লালন প্রশ্রয় এবং চর্চার ধন। একটা জন্মের অনুদানে পড়ে পাওয়া ধন। আর একটা অর্জন। এখানে সৌন্দর্যবোধ সুন্দরের উপলব্ধি। সুন্দরের চেতনা সম্পর্কে চেতনা। এই স্তরেই তত্ত্বের অনুপ্রবেশ। যাকে বলা হয় নন্দনতত্ত্ব। দেখা যাক সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা উপন্যাসটিতে কিভাবে প্রতিফলিত। দেখা যাক তার স্বরূপ।

একদিকে নিয়মতান্ত্রিকতার বেড়া, কড়া অনুশাসিত জীবন চর্চা। বাহ্যরূপ। অন্দরমহলের চিত্র ভিন্ন প্রকার। রেপিং নিগ্রহ এবং ব্যাভিচার সেখানে খেলার নিত্য সঙ্গ। যেসব উপকরণ স্ফূর্তির আয়োজনে জরুরী হয় অর্থাৎ নাচগান-হল্লা-বেলেল্লাপনার রমরমা। আনন্দ নয় স্ফূর্তি স্বাগত। জীবন দুদিনের জন্য বৈ তো নয়। এস ভোগ করি। এই হচ্ছে জীবন দর্শন। বাঁচার প্রেরণা। আভরণ উজ্জ্বল। তলে তলে মুমূর্ষু সমাজ। যে সমাজে জিজ্ঞাসা নেই। ক্লান্তি নেই। দয়া নেই। অনুক্ষণ আছে কেবল উত্তেজনার ঢেউয়ে ভেসে থাকা। কিন্তু মুমূর্ষু সমাজেও শিল্পের লাবণ্য থাকে। সুপ্ত থাকে। খুঁজে নিতে হয়। আপাত আবৃত যথাযথ স্থানে ঘা পড়লে উদ্ভাসিত হয়। লেখক এই কাজটি করেছেন। ঠিক জায়গা খুঁড়েছেন। অবগুণ্ঠন ভেদ করে চরিত্র উঠে এসেছে উপরিকাঠামোয়। আমরা দেখতে পাই অর্জুন এমন এক চরিত্র যে গতানুগতিকতার দাস নয়। দূষণযুক্ত সমাজ তাকে গ্রাস করতে ব্যর্থ। উলটে সেই ছড়ি ঘোরাচ্ছে মূল ব্যবস্থার ওপর। প্রথাসিদ্ধতা তছনছ করতে উদ্যত। এখানেই অর্জুন হয়ে উঠেছে লেখকের সৌন্দর্য চেতনার প্রতীকী।

প্রত্যেক সমাজে বিরাজ করে দৃশ্যমান এক চেহারা। যাকে বলা হয় সমাজের মূল আকৃতি। এ ছাড়াও সমাজের অন্য প্রকার চেহারাও আছে। যার অবস্থান কুণ্ঠিত। যাকে বলা হয় গৌণ সমাজ। সর্বকালে কোনো কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সমাজের মূল ধারায় সংখ্যালঘু। মুখ্য অংশ থেকে নিজেদের বিযুক্ত রেখে তৈরি করে নিজস্ব চেতনার আদরে গড়া খোল। শ্রী বৃদ্ধির অভিলাষে খোলটাকে তা দেয়। চলতে থাকে বিকল্প প্রথার পুনর্বাসন আয়োজন। সামাজিক অভিঘাত প্রবল হলে উজ্জ্বল অভিঘাতে স্থিতাবস্থা আলুথালু হয়ে যায়। নৌ বিদ্রোহ তেমনই এক ঘটনা যে ঘটনার তোড় ফৌজী সমাজে নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি করে।

কাহিনী এগোয়। অর্জুন অভিজ্ঞ হতে থাকে। তার হৃদয়ে প্রেমানুভূতির প্রস্তুতি শুরু হয়নি। কোষে কোষে কামানুভূতির উদ্বোধন হয়নি। অথচ সঙ্গদোষে হয়ে যায় বেশ্যাসন্দর্শন। প্রচণ্ড ধাক্কা খায় অর্জুন। সেপাইদের কাম নির্বাপণ, ফৌজী ভাবায় কুলিং-এর জন্য লালিত। এই পরিবেশ থেকে অর্জুন নিজেকে গুটিয়ে নিতে উদ্যোগী। কিন্তু কোথায় পালাবে? ব্যারাকে ফিরে আসতে তাকে ডাক দিল ডলি নামের মেয়েটি। যে মেয়েটি গেরস্থ ঘরের। অথচ ব্রাউনিং-এর কাছে রোজ রাতে অভিসার করে। কুৎসিত আত্মদানে। জমায়েতের আলোচনা অবক্ষয়ী। পুরুষগুলোর বিশ্বাস আর্মির ইন্ডিয়ানাইজেশন দূর অস্ত। আই-সি-এস অফিসার, ফৌজী শাসন করার যোগ্যতা ভারতীয়দের মধ্যে নেই। অর্জুনের বিতৃষ্ণা তিক্ততা হতাশা সর্বব্যাপক হয় না। গণেশলালের মত চরিত্র আছে বলে। গণেশলালের প্রত্যয় ফৌজী পরিচালনার সব যোগ্যতাই ভারতীয়দের আছে। অন্যতম দৃষ্টান্ত তাজমহল। তাজমহলের মত শ্রেষ্ঠ কীর্তি যে দেশের মানুষ গঠন করতে সক্ষম তাদের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত।

অর্জুন আস্থা অর্জন করে। মনের গ্লানি ধুয়ে যায়। অর্জুনের কাছে গণেশলাল রাজনৈতিক দিশারী। গণেশলালের মুখ দিয়ে ইতিহাস কথা বলছে। দেশে ঘোর স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে। বিভিন্ন প্রান্ত গণসত্যাগ্রহে অস্থির। কাতারে কাতারে মানুষ কারাবরণ করছে। শুধু পুরুষরা নয় মহিলারাও সহযাত্রী।

অর্জুন শুনছে। দেশকে জানছে। বলা বাহুল্য শিহরিত হচ্ছে। কৃষকরা খাজনা দিচ্ছে না। ছাত্ররা স্কুল কলেজ বয়কট করছে। কারখানায় হরতাল হচ্ছে। কোথাও কোথাও সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে। নানান তথ্যের সমারোহ। অর্জুন জানল গণেশলাল হিংসার পথ সমর্থন করে না। যদিও সংগ্রাম প্রশংসা করে।

গণেশলাল বলে ইতিহাস-ভূগোল-সাহিত্য অনুধাবন জরুরী। জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করতে হয়। অজ্ঞ থাকলে পিছিয়ে পড়তে হয়।

অর্জুন অনুপ্রাণিত। পাঠ্যজগৎ তার কাছে ছিল নিরস। অত্যাজ্য। এক্ষণে নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। জ্ঞানের জগৎ হয়ে ওঠে আনন্দময় হাতছানি। নতুন বার্তা, নতুন কাহিনী শুধু অর্জুনে নয়—সেপাইদের মধ্যে সঞ্চার করে অন্য অনুভূতি অন্য এক প্রেরণা। অন্য এক ইশারা।

বিদ্রোহ বৈকি। অচলায়তনকে ভাঙার উদ্যোগ। বিদ্রোহের ইতিহাসে যা হবার তাই হল। শিক্ষক গণেশলালের ফাঁসি হল।

গণেশলালের মৃত্যু সেপাইদের মনে নতুন বোধের উদয় ঘটায়। তারা বুঝতে শেখে তারা গোলাম। দাস যখন বুঝতে শেখে তারা দাস তখনই মনোজগতে মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। অর্জুন বড় হচ্ছে। ব্যারাকের বাইরে যে জনসমাজ, সেই জনসমাজের স্কুলে ভর্তি হয়ে যোগব্রতর সান্নিধ্যে আসে। বাঙালী এবং পাঞ্জাবী বিপ্লবীদের কাহিনী পড়ে বইতে। মন শান্ত হয় না। যে উৎসে তার সত্ত্বা নিহিত সেই জাঠদের ইতিহাস জিজ্ঞাসায় আর্ত হয়। জাঠদের ইতিহাস নেই? প্রশ্ন জর্জর হয়। জিজ্ঞাসার উপশম হয় না। যোগব্রত শুধু বলে নিজেদের বলে কিছু নেই। মা আমাদের গঙ্গা। হিমালয় বাবা। আমরা সবাই ভারতবাসী।

নবীন বয়সে অর্জুন ২টি ভয়ানক শোক পায়। মৃত্যু শোক। তার জীবনে আলোকবর্তিকা গণেশলালের প্রয়াণ। আর বন্ধু শুকুলের মৃত্যু। প্রথম জন অত্যাচারের শিকার। অত্যাচারী বৃটিশ রাজশক্তি। দ্বিতীয়জন হতাশার শিকার। হতাশার উৎস ব্যর্থ প্রেম। এই দুই মৃত্যু অর্জুনের মানসিক জগৎকে বিপর্যস্ত করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় একটি মেয়ের প্রতি তার আসক্তি। মনভূমি ব্যেপে শূন্যতার রাজত্ব। অর্জুনের নিজেকে একলা মনে হয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত হয় প্রত্যয়ের ইশারা; বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।

অর্জুন উপলব্ধি করে; যা প্রতিভাত কাব্যে :

অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই;
অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই;
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।

—প্রতীক্ষা। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

অর্জুন প্রত্যয়ী হয় বোধে; এখনও গেল না ভোলা, যদিও এ দেশ স্নিগ্ধ নয়
সুবর্ণধারায়;

—তীর্থপরিক্রমা। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

মননের সন্ধ্যাকালে অর্জুন জানতে পারে পৃথিবীর মানচিত্রে অনেক বড় ঘটনা ঘটছে। মুসোলিনী আবিসিনিয়া আক্রমণ করেছে। হিটলার ভার্সাই চুক্তির নিরস্ত্রিকরণ ধারা বাতিল করেছে। আর্ত জিজ্ঞাসায় অর্জুন উদ্বেল হয়। "বিশ্ব কি রসাতলের দিকে যাচ্ছে?"

এই অর্জুনের খরা মানসভূমি প্রেমের কর্ষণে ফুল্ল কুসুমিত হয়ে ওঠে। গাঢ় বিষাদ অস্ত যায় দুলারীর প্রেমে। প্রেম আশা সিঞ্চন করে। অর্জুন জাগে। আনন্দ খুঁজে পায় জীবনের আবর্তে উৎসাহ আসে দিনযাপনে।

প্রেমের বর্ণনার পাশাপাশি উপন্যাসটিতে সেনাবাহিনীর সংগঠন সম্পর্কেও খুঁটিনাটি বিবরণ আছে। সেটাও কর্ম প্রাপ্তি নয়। তথ্য এবং উপভোগ্যতা—উভয় দিক দিয়ে। অর্জুন ছাত্র জীবন শেষ করে মিলিটারিতে ঢুকেছে। অফিসার হওয়ার প্রস্তুতি চলছে। প্রেম পর্বও চলছে। পৃথিবীতে যুদ্ধ লেগেছে। যে যুদ্ধে কৌশলগত দিক দিয়ে ভারতের অবস্থান বিশিষ্ট। অর্জুন আদ্যপান্ত বিপ্লবী। সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে আছে।

যুদ্ধ লেগে গেছে। ভারতকে আপন স্বার্থে যুদ্ধে জড়াতে বৃটিশরাজ বদ্ধপরিকর। বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের কর্মসূচী নির্ধারণে কংগ্রেস দ্বিধাজর্জর। সুভাষচন্দ্র বন্দি। এমন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কাহিনীর ঘনবদ্ধতা।

যাকে বলে বিশ্বযুদ্ধ—লেগে গেছে বিশ্বে। দেশে দেশে সংঘাত। সংঘাত এবং মৈত্রীর বক্র খেলা। ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও ক্ষোভ দানা বাঁধছে। অর্জুন লক্ষ করছে দেশাত্মবোধের চারা। এটাও তার হিসেবে আসে যে ভারতীয় সৈন্যর সংখ্যা কুড়ি লক্ষ উত্তীর্ণ। অধিকাংশ সেনা যে সমাজ থেকে আগত শ্রেণী চরিত্রে তারা কৃষক। উত্তাল জনজীবন। কংগ্রেস দ্বিধা চিন্তায় একা দোকা খেলছে। সভ্যতার সংকট চলছে। তারই মধ্যে নর-নারীর ভালবাসা স্বীকৃতি পাচ্ছে। অর্থাৎ জীবন যেরকম তারই ধারা বহমান। ইতিহাস আছে। ইতিহাসের উপকরণ আছে। তবু আলোচ্য উপন্যাসটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। ইতিহাসের আশ্রয়ে জনজীবনের লীলায়িত জীবন।

আর্মি অফিসার অর্জুন নানান রাজনৈতিক প্রশ্নে জর্জর। জেল থেকে বেরিয়ে নেহেরু ঘোষণা করলেন, "দেশের প্রগতিশীল শক্তিগুলো এখন রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা এবং চীনের সঙ্গে সংযুক্ত।" স্পষ্ট মত। কিন্তু কোন পথে চলবে স্বাধীনতা সংগ্রাম। গান্ধী মনে করছেন যুদ্ধে জড়ান ঠিক হবে না। ফ্যাসিস্ট এবং ফ্যাসিস্ট বিরোধী দুপক্ষের মধ্যে কৌশল চালিয়ে ফায়দা লুটতে হবে বলে কেউ কেউ ভাবছেন। কেউ ভাবছেন বৃটিশ পরাজিত হোক। ভারতের স্বাধীনতা লাভ সহজ হবে। নানা মুনি নানা মত।

পরাধীনতা যেমন আছে স্বাধীন চেতনার প্রবাহও আছে। ফৌজী সমাজে এমনকি অফিসার মহলেও এর ধাক্কা প্রবল। রুটিন কাজের অবসরে মজলিসে চলে জোর যুক্তি তর্ক। বৃটিশ রাজশক্তির যুক্তি ভারতকে তারা দিয়েছে উন্নয়ন। তথা রেলওয়ে, জ্ঞান এবং ভারতীয় ঐক্য চেতনা। তারা এ যুক্তিও দেখায় ভারতীয়রা যোগ্য হলেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির অধিকারী হবে। প্রভুত্ববাদের শাশ্বত যুক্তি। যুক্তি ধোপে টেকসই হয় না। ভারতীয় অফিসাররা যুক্তি দেন উন্নয়ন সূত্রে তোমরা ভারতীয় সমাজ-সংস্থা আলুথালু ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। আর্থিক লুঠতরাজ কায়েম করেছ। বিনিময়ে দিয়েছ—অফিসার খাত্রের ভাষায়: "ইউ হ্যাভ গিভন আস পভার্টি, হাঙ্গার, সিফিলিস এ্যান্ড গনোরিয়া।"

গর্জে ওঠে জাতিসত্তা। বিবর শৃঙ্খল মোচন। আখ্যান জুড়ে আকাঙ্ক্ষার বিস্তার। আমরা লক্ষ করি যে ফৌজী সমাজের আপাত ঈর্ষণীয় ঐক্য আর অন্তঃপুর কী ভীষণ ফাঁপা। লক্ষ করি একই মিত্রশক্তির গাঁটছড়া। রাশিয়ার পরাজয়ে বৃটিশ সৈন্যর উল্লাস। ভাব এবং আড়ি দ্বৈতলীলা। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বৃটিশ রাজত্বের বিপন্নতা বৃটিশ সৈন্যদের বিবর্ণ করে। অথচ অন্য জাতির স্বাধীনতা হরণে উদ্দামতার অন্ত নেই। বোধের দ্বিচারিতা আখ্যানের মূল শাখা। আবার মূল শাখার খাঁজে খাঁজে উপশাখার বসতি। সেখানেও নানান প্রশ্নের দ্বন্দ্ব নীতি। ভারত যেন যুদ্ধে না জড়ায়। ঘোষণা গান্ধীজীর। শত্রুর শত্রু আমার মিত্র। অতএব জাপানের সাহায্য নিলে লাভ আছে। নেতাজীর মত। বৃটিশদের দুঃসময়ে চাপ দিলে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব। জাতীয় কংগ্রেস এইভাবে ভাবছে। বিশ্বযুদ্ধ ফ্যাসিবাদ

বনাম গণতন্ত্রের। অতএব এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ। রাশিয়া এবং বৃটিশ এক কোর্টে। সুতরাং বৃটিশকে মদত দাও। কম্যুনিস্টরা এই পথের পথিক। প্রশ্নে প্রশ্নে উথাল পাথাল। এরই মধ্যে বিভিন্ন ধারায় মুক্তি সংগ্রাম চলছে। সামাজিক কূট তর্ক উপন্যাসে জোরালভাবে উপস্থিত হয়েছে। যদিও একথা উল্লেখ্য যে প্রতি ক্ষেত্রে চরিত্রের সঙ্গে মতামত উপস্থাপন খাপ খায়নি। অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিকতা যা উপন্যাসের প্রধান ধর্ম, যেন ঈষৎ আহত। এক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অবস্থানের কিঞ্চিৎ ছায়াপাত ঘটেছে। এমন ইশারা উঁকি দেয়। বর্তমান সময়ে যে তথ্য সংকলন আহরিত; তার নিরিখে লেখক যুদ্ধ, রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির বিন্যাস, সখ্যতা—বিরূপতার দ্বন্দ্ব; মানবমুক্তি ইত্যাদি বিষয়ক যে ব্যাখ্যা বিস্তার করেছেন তা হয়ত প্রসাদগুণ কিঞ্চিত ক্ষুণ্ণ করেছে। তৎকালীন যুগে তথ্যের অপ্রতুলতা এবং লেখকের দৃষ্টিতে তত্ত্বের মায়াঞ্জন টুকটাক বিভ্রান্তির জনক, এমন সন্দেহও উঁকি দেয়।

গায়ে সভ্যতার পোশাক। পোশাক যে আবৃত করার ব্যবস্থা, তা ধরা পড়ে নানান ঘটনায়। বৃটিশদের অস্থিমজ্জায় জাতি বিদ্বেষ। ভারতীয় ফৌজীদের আচার-আচরণ খাদ্যাভ্যাস রীতিনীতি যাবতীয় মূল্যবোধকে ধ্বংস করতে সাংস্কৃতিক উপবীত খসায়। বলপূর্বক নিজস্ব সংস্কৃতি আরোপ করতে উদগ্রীব। প্রতিক্রিয়া হয়। সেনাবাহিনীতে সৃষ্টি হয় ব্যাপক ক্ষোভ। বিতত হয় বিতংস।

১৯৪২, পাঁচই ফেব্রুয়ারি। নিশীথে অফিসার অর্জুনের ঘরে বিনোদন ব্যবস্থা। বহিরঙ্গে মদের আসর। অন্তরঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের খসড়া নির্মাণ। ঘরোয়া আসরে তৈরি হয়ে যায় বিদ্রোহী সংগঠন। কমিটি গঠন হয়। অর্জুন আহ্বায়ক।

স্বাধীনতা সংগ্রাম চেতনার মূল স্রোত। কিন্তু নিরঙ্কুশ স্রোত নয়। ব্যক্তিগত সমস্যা এবং দুঃখ কাতরতা ইত্যাদি অনুভূতিও ঠাঁই পেয়েছে। দরিদ্র আবদুলের কষ্ট জর্জর জীবনে অর্জুন খুঁজে পায় আপন সত্তা। অস্তিত্বের শেকড়। স্মরণে আসে ও যদি একমাত্র সন্তান না হত, অর্থানুকূল্য না থাকত, পেত কি উচ্চশিক্ষার সুযোগ। আজ সে যত উঁচু পদেই উঠুক তার শ্রেণী অবস্থান দরিদ্র সমাজ। ঘটনাচক্রে আজ তার বড়লোকদের সঙ্গে সঙ্গ তা। কিন্তু উঠকো বনে যাওয়ার প্রবঞ্চনা তার ধাতে নেই। অর্জুন শপথ নেয়। যতদিন পরাধীনতা আছে দেশজ ধনীরা আমার বন্ধু। পরাধীনতা মোচন হলে বড়লোকদের সঙ্গে হিসেব নিকেশ শুরু হবে। শেকড় ছিন্ন হতে অনীহা। একেই কি বলে ইন সার্চ অফ রুট। যার অন্বেষণ অর্জুনের ধ্যান।

মেধা এবং লেখনি নৈপুণ্যে যুদ্ধের ইতিহাস নিছক প্রযুক্তিগত ধারা বিবরণী থাকে না। হয়ে ওঠে মানব ইতিহাস।

যুদ্ধের দামামায় আক্রান্ত দুনিয়া। প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই ভারতে। আছে আতঙ্ক। সেনাবাহিনীর অন্দরে বিভিন্ন স্তরে বিদ্রোহীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে। বিস্তৃত হচ্ছে সংগঠন। আলোচনা সাপেক্ষ ১৯ দফা কর্মসূচী গৃহীত হয়।

যুদ্ধের আবহ। তাতে কি। জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম থেমে থাকছে না। ঘটে যাচ্ছে বিয়ের মত স্নিগ্ধ কাণ্ড। পৃথিবী কঠিন। বিদ্রোহের পথ কণ্টকাকীর্ণ। পদে পদে বাঁক।

বন্ধুরতা। এরই মধ্যে পথ কেটে কেটে অগ্রসরতার অভিযান। অর্থ সমস্যাও আছে। অসহযোগিতা আছে। এমনকি প্রাক্তন বিপ্লবী মথুরাপ্রসাদও সাহায্যের হাত প্রসার না করে হাত গুটিয়ে নেন। জীবন বড় জটিল। কৃতকর্মের জন্য বিপ্লবী মথুরাপ্রসাদের অনুতাপ অর্জুনকে আত্মসমীক্ষার মুখোমুখি করে। অর্জুন বিষণ্ণ হয়।

যুদ্ধ চলে। বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডেরও বিশ্রাম নেই। বৃটিশরা ভারতকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত এমন ভাব দেখাচ্ছে। আসল চিত্র অন্য। খোলামেলা পরিবেশে বৃটিশ সৈন্যর মুখ থেকে যে মনোভাব প্রকাশ পায় তাতে স্পষ্ট যে যুদ্ধ শেষ হলেও তারা ভারতকে স্বাধীনতা দেবে না। বিদ্রোহীরা দমে না। আয়োজন চলতে থাকে। কেন্দ্রীয় চরিত্র অর্জুন। তাকে ঘিরে ঘাত-প্রতিঘাতের ঘূর্ণিজাল। বিস্তর অভিজ্ঞতা হচ্ছে। অনুকূল-প্রতিকূল। বিদ্রোহী কাজের সূত্রে সে কম্যুনিস্টদের সংস্পর্শে আসে। বৃটিশ রাজত্ব সম্পর্কে সাম্যবাদীদের সহিষ্ণু মনোভাব অর্জুনকে পীড়া দেয়, তার মনে হয় বৃটিশরাজ ভারতীয় সুসন্তানদের এক জটিল অবস্থার মধ্যে টেনে এনেছে। কমিউনিস্ট-কংগ্রেস-সুভাষবাদী বিভিন্ন শাখায় ছড়ান সুসন্তানরা মত ও পথ নিয়ে ছত্রাকার।

আইন পরিবর্তন নয়। আর্থিক বিষয় নিয়ে দর কষাকষি নয়। প্রতিপক্ষ কোনো ব্যক্তি মালিক নয়। স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। প্রতিপক্ষ ইংরেজ রাজশক্তি। প্রতি মুহূর্তে জীবন-মৃত্যুর দোলাচল। যেন তারের ওপর দিয়ে হাঁটা। এই আছি। এই নেই। যে-কোনো ক্ষণে কোর্ট মার্শালের ঝুঁকি' তবু অর্জুনের রক্তে অহরহ বিদ্রোহের সুর বাজে। এ ক্যাম্প থেকে ও ক্যাম্প। ও ক্যাম্প থেকে সে ক্যাম্প। যাযাবরী জীবিকা। যখন যে ক্যাম্পে তার পদচ্ছাপ সেখানেই ছোঁক ছোঁক করে বিদ্রোহের বীজ বপনে। ইতিমধ্যে দেশ জুড়ে "কুইট ইন্ডিয়া" আন্দোলন চলছে। আগস্ট আন্দোলন গান্ধীবাদী পথে আটকে থাকছে না। হিংস্র রূপ নিচ্ছে। অর্জুন খবর পেয়েছে সত্যাগ্রহ করে গ্রেপ্তার এবং কারাবরণ করেছে স্ত্রী দুলারী।

সেনাবাহিনী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ নেবে কি না তা নিয়ে চুলচেরা বিতর্ক চলে। ব্যাখ্যার বাড়াবাড়ি কোনো কোনো সময় বক্তৃতার মত শোনায়। যা উপদেশের নামান্তর। সীমাবদ্ধতা মান্য করেও মাননীয় যে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি তথা অত্যাচারের তথ্য, শ্রেণী বিভাজন, ঘরোয়া কোঁদল; সমূহ তথ্য উঠে আসে। জানা যায় বাতাসে বইছে নিরন্ন মানুষের হাহাকার। একই সঙ্গে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অনুপুঙ্খ বিবরণ ফুটে উঠেছে। লেখক প্রত্যক্ষ করেছেন স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ জাত নিরপেক্ষ। বৃটিশ সৈনিকদের মধ্যেও সংখ্যায় স্বল্প হলেও এমন সৈনিক আছে যারা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল।

পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন ঘটনার সূত্রপাত হয়। রেড আর্মির বিজয় সূচিত হচ্ছে। রেড আর্মির জয়যাত্রায় কমিউনিস্টরা খুশি। কিন্তু ভারতবাসীর সর্বস্তরে এই খুশি সংক্রামিত নয়। বৃটিশ সম্পর্কে অকমিউনিস্টদের মধ্যে যে ঘৃণার আক্রোশ কমিউনিস্টদের মধ্যে তার অভাব। অর্জুনের মতো দেশপ্রেমিকরা এতে বিষাদগ্রস্ত। উৎপাদনশীলতায় ঘাটতি নেই। বন্টন নৈরাজ্যের ফলে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা। অসহায় নারীদের ওপর সৈন্যদের পশুসুলভ

আচরণ। মানব বিরোধী ক্রিয়াকলাপের জন্য অর্জুন দায়ী করছে বৃটিশরাজকে। তার সংগ্রামের তীর কেন্দ্রীত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। বুভুক্ষা মানুষের আর্তনাদ তাকে আমূল নাড়া দেয়। সৌখীন দরদ নয়। স্বেচ্ছা অনশনে সে ব্রতী হয়। অনশনের কষ্ট কোষে কোষে অনুভব করতে উৎসুক।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা বহুমুখী। ইতিহাসে পূর্ণ ইতিহাস ঠাঁই পায় না। সুভাষ বসুর আই এন এ-র হাজার হাজার সৈন্যকে বৃটিশরাজ হত্যা করেছে। ইতিহাসে উপেক্ষিত তথ্যকে লেখক অমরত্ব দিয়েছেন উপন্যাসে স্থান দিয়ে। উপন্যাসের চূড়ান্ত উত্তেজনাময় মুহূর্ত ইতিহাসেরও চরম মুহূর্ত। চরম অধ্যায়ের আবির্ভাব। আখ্যান গড় গড় করে এগোয়। এসে যায় ১৯৪৫ সাল। আগস্ট মাস। ৬ই থেকে ৯ই আগস্ট। সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধানে ২টো বৃহৎ ঘটনার সংযোজন। সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্কের ইতিহাস। প্রথম ঘটনা। ৬ই আগস্ট। এ্যাটম বোমা পড়ল হিরোসিমায়। দ্বিতীয় ঘটনা। ৯ই আগস্ট। দ্বিতীয় এ্যাটম বোমা পড়ল। স্থান নাগাসাকি। মৃত্যু; তিন লক্ষ মানুষ। পঙ্গুর হিসেব নেই। ১০ই আগস্ট জাপান আত্মসমর্থন করে। ১৪ই আগস্ট যুদ্ধাবসান ঘোষণা।

সভ্যতার নির্বাস। সভ্যতা নেই। পড়ে আছে সভ্যতার ভগ্নস্তূপ। স্বদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের ফর্ম নিয়ে বিস্তর মতভেদ। গান্ধীজী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বড় করে দেখে ভীত। জনগণের জঙ্গী রূপ দেখে ভীত। তিনি চান সংগ্রামের রূপ হবে নরম। অন্য অংশ চাইছে সংগ্রামের রূপ হোক জঙ্গী। সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহের ভূমিকা, ফল ভয়ংকর। নিজের জীবনে অর্জুন তা আঁচ করে। ১৯৪৭—এসে বন্দি হয়। দুলারীর সঙ্গে মধুচন্দ্রিমার দেড় বছর পর। অর্জুন বুঝল এই হচ্ছে জীবন। দিতে হবে। যাকে বলে জীবনদান। অথচ স্মরণীয় হয়ে থাকবে তেমন লেখা কেউ লিখল না। গোলাম কুদ্দুস লিখলেন। লিখে সমাজমনস্কতার চিহ্ন রেখে গেলেন।

জেলে দুলারীর প্রতি অর্জুনের চিঠি এক উল্লেখযোগ্য দলিল। যে চিঠিতে রাজনৈতিক অবস্থা, মতভেদ, ষড়যন্ত্রের খুঁটিনাটি বিবরণ মূল্যবান হয়ে উঠেছে। বিশেষভাবে অর্জুনের মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার মতে স্থলবাহিনী এবং নৌবাহিনীর মোর্চা ছাড়া বিদ্রোহ পণ্ড হতে বাধ্য। উপন্যাসটি নির্দেশ করে এক; ট্রাজিক দিক স্বাধীন ভারতের সম্ভবত প্রথম বন্দি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী।

উপন্যাসে লেখক যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা আটপৌরে। চরিত্রের কথ্য ভাষাকে ব্যবহার করেছেন। সংলাপ বাদ দিয়ে এমনকি বর্ণনার ক্ষেত্রেও লেখক কোন স্বাধীনতা নেননি। এর ভাল এবং মন্দ দু দিকই আছে। ভাল দিক; বাস্তবতার স্পর্শে তরতর করে পড়া যায়। খটমট লাগে না। মস্তিষ্কে ব্যায়ামের কষ্ট সহ্য করতে হয় না। উপভোগ্যতা সাবলীল হয়। বিষয়টা মাথায় গেঁথে থাকে। মন্দ দিক : চরিত্রের বহির্বিভাগ যে গুরুত্বে স্পষ্ট হয় অন্তর্বিভাগ সেই গুরুত্ব থেকে অভাবী। অর্থাৎ কল্পবাস্তব এবং ঘটমান বাস্তব, উভয় বাস্তবের পাকে যে মানবসত্তা গঠিত সেই সামগ্রিকতায় যেন ঈষৎ দরিদ্র। অবশ্য এই সীমাবদ্ধতা বাহ্য।

উপন্যাসটি পাঠ করে পাঠকের বাড়তি এক জ্ঞান হবে। তা হচ্ছে যোদ্ধা মানেই মনটা কঠিন। ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে।

১৯৪১ থেকে ১৯৪৭। উপন্যাসটির কালপট। চিঠির বয়ানে উপসংহার। দুই মলাটের মধ্যে ২৫৩ পৃষ্ঠার মুদ্রিত অক্ষর এক বাঙ্ময় মুখর সময়ের এক সামাজিক অংশের শৈল্পিক দলিল। পড়তে পড়তে পাঠক বিভিন্ন প্রশ্নে দ্বন্দ্ব বিধুর হবে। জিজ্ঞাসু হবে। এখানেই উপন্যাসটির সফলতা। এছাড়া পৌর সমাজ সেনাসমাজের চেহারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে উপন্যাসটি পাঠ করলে। এ দিকটাও আলাদা মর্যাদা দাবীর যোগ্য।

পাঠ : লেখা নেই বর্ণাক্ষরে : গোলাম কুদ্দুস।। দীপায়ন সংস্করণ/১৩৯১

গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গে একসঙ্গে

অনিল ঘোষ

চোখে ভাসছে 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন'-এর সেই উদ্বেল জনতার ছবি, মনে পড়ছে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার লক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ জনতার ভার্সাই অভিযানের কথা। মনে পড়ছে দুর্গম পাহাড়, বন্ধুর প্রান্তর মাড়িয়ে চলা পৃথিবীর দীর্ঘতম লং মার্চ-এর কথা। হ্যাঁ মনে পড়ছে দমকা বাতাসের মতো, হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো। যদিও এসবের সঙ্গে কোনও তুলনাই হয় না ১৯৫৪ সালের রানিগঞ্জ সেরামিক কারখানার শ্রমিকদের কলকাতা অভিযান। কিন্তু মনের উপর হাত চলে না। গোলাম কুদ্দুস-এর *একসঙ্গে* বইটা পড়ার পর ওইসব পৃথিবীখ্যাত ছবি বা ঘটনার রেশ বয়ে যাচ্ছে চোখের উপর, মনের ভিতর—এ সত্যও অস্বীকারের উপায় নেই। উদ্দেশ্য আদর্শ সংগ্রাম, সংগ্রামের দৃঢ়তা, লক্ষ্যকে জয় করবার ইচ্ছা, আন্দোলনের প্রভাব দিক দিগন্তে ছড়িয়ে দেবার আগ্রহ—এসব পাশে রাখলে পৃথিবীখ্যাত ওইসব যাত্রার সঙ্গে কোনও অংশেই খাটো নয় রানিগঞ্জ শ্রমিকদের কলকাতা অভিযান। আর তারই পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে গোলাম কুদ্দুস-এর *একসঙ্গে* বইতে, যা তিনি 'স্বাধীনতা' কাগজের সাংবাদিক হিসেবে দেখেছেন, শ্রমিকদের সঙ্গে থেকেছেন, অভিযানে অংশ নিয়েছেন, তারপর এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন কল্পনার আশ্রয় ছাড়াই, নির্মেদ গদ্যে, নির্মোহ ভঙ্গিতে।

গোলাম কুদ্দুস মানুষটার সঙ্গে আলাপ পরিচয় দূরস্থান, তাঁকে কখনও চোখে দেখিনি, *ইলা মিত্র, লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে* ছাড়া পড়াও ছিল না। আমার জানা চেনা পুরনো কমিউনিস্ট কর্মীদের কাছে তাঁর নাম শুনেছি, জেনেছি তিনি পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী, কবি ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক। এর বেশি তাঁকে পড়া জানা বোঝার তাগিদ ছিল না। অনুভবও করিনি। কিন্তু ১৯৯৪ সালে এক বিশিষ্ট কবির কথায় *একসঙ্গে* বইটার নতুন সংস্করণ (দীপায়ন ১৩৯৩) পড়ার পর চমকে উঠি। মনে হয়েছিল এ কি সত্যি! বাস্তব! আমাদের রাজ্যের ঘটনা। আমি ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন দেখেছি, ভার্সাই যাত্রা লং মার্চ পড়েছি শুনেছি, ডাণ্ডি যাত্রাও জানি, কিন্তু জানতাম না ঘরের পাশে বুভুক্ষু শ্রমিকের মরীয়া অভিযানের কথা।

তাই স্বীকার করতে লজ্জা নেই, রানিগঞ্জ সেরামিক কারখানার শ্রমিকদের কলকাতা অভিযানের ডকু-ফিচার পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল, এ অসম্ভব। কিন্তু সেই ইতিহাস পরবর্তীতে জেনে, কমিউনিস্ট কর্মীদের কাছে গোলাম কুদ্দুস সম্পর্কে শুনে আকৃষ্ট হতেই হয়েছে। শুরু হয়েছে তাঁকে জানা পড়া ও উপলব্ধির চেষ্টা। পড়েছি *মরিয়ম, বাঁদী* ইত্যাদি লেখা। কিন্তু *একসঙ্গে* বইটা একই সঙ্গে উদ্বেলিত উদ্বেজিত করেছে। সম্প্রতি আবার পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, এ কি আদৌ কোনও রিপোর্টাজ? রিপোর্টাজ বললে সংবাদপত্রের কেজো গদ্যের কথাই মনে হয়, বিষয়টা কেমন যেন হালকা হয়ে যায়।

একসঙ্গে রিপোর্টাজ হলেও এর সাহিত্যগুণ, শিল্পগুণ জড়িয়ে আছে পরতে পরতে। বলা যায় *একসঙ্গে* শ্রমজীবী মানুষের দৃঢ়বদ্ধ আন্দোলন, কষ্টসহিষ্ণু পথযাত্রার বিশ্বস্ত ডকুমেন্টারি। কিংবা হতে পারত একটি মানবিক দলিল, হতেই পারত নতুন নিরীক্ষার উপন্যাস। হ্যাঁ, হতেই পারত। গল্প উপন্যাস মানে নির্দিষ্ট চরিত্র থাকবে, ঘটনাক্রম থাকবে—এমন কী মানে আছে। চলমান জীবনই তো চরিত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চিহ্ন* উপন্যাস যেমন। সেও তো চলমান মানুষের কথাকাব্য। এই জীবনের হাসি কান্না ক্রোধ বেদনা—এ সবও কি উপন্যাসের উপকরণ নয়। দুর্ভাগ্য, *একসঙ্গে* আমাদের প্রজন্মের কাছে শুধুমাত্র রিপোর্টাজ হয়েই থাকল, মহৎ সাহিত্যের সব গুণ থাকা সত্ত্বেও।

কী আছে বইতে যা উদ্বেলিত উত্তেজিত করে। উত্তর এক কথায় জীবনকাহিনি। শ্রমজীবী মানুষের মরণপণ সংগ্রামের দৃশ্যচিত্র, লক্ষ্যে পৌঁছবার, দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে জয় করবার অদম্য ইচ্ছা। যদিও ২০০৭ সালের আবহাওয়ায় বসে ১৯৫৪ সালের প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করা সহজ নয়। ক্রম-পরিবর্তমান পৃথিবীতে আমরাও কম বদলাইনি। সেইসঙ্গে বদলেছে আমাদের পারিপার্শ্বিক, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি চাহিদা, সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি ইত্যাদি। তাই, সেইসব রুক্ষ দিনের উত্তপ্ত ক্ষুধার্ত শ্রমিকের কান্না ঘাম ক্রোধের কথাপট আজ মনে হতেই পারে কাল্পনিক। হাতে যদি টাইম মেশিন থাকত, আর তাতে যদি পৌঁছনো যেত ১৯৫৪-এর রানিগঞ্জে, তাহলে উপলব্ধিতে নিশ্চয়ই আসত সেই রুক্ষ দিনের প্রখর উত্তাপ।

কী হয়েছিল সেদিন, যার প্রেক্ষাপটে রচিত হল এমন মহাকাব্যিক পদযাত্রা! নাটকের ভাষায় বলা যাক : স্থান—রানিগঞ্জ। কাল—১৯৫৪ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর। কুশীলব—রানিগঞ্জ সেরামিক রিফ্যাক্টরি কারখানার আড়াই হাজার শ্রমিক, এবং মার্টিন বার্ন কোম্পানির কর্তৃপক্ষ। একদিকে লড়াকু শ্রমিক ইউনিয়ন, অন্যদিকে বার্ন কোম্পানির মালিক অনমনীয় শিল্পপতি স্যার বীরেন মুখার্জী।

শ্রমিকদের দাবি কী ছিল? কারখানায় সিলিকা ম্যাগনেসাইট ও প্রচুর ধুলোবালির মধ্যে কাজ করতে হয়, ফলে রোগভোগ তাঁদের নিত্যসঙ্গী। বছরে ৩০/৪০ জন যক্ষায় আক্রান্ত হয়, মারাও যায় প্রায় বিনা চিকিৎসায়। এ নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনার পর একটি চিকিৎসা-সংক্রান্ত চুক্তির চেষ্টা চলে, কিন্তু কোম্পানি সেটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেয়। ফলে 'শ্রমিকেরা টি-বিতে প্রাণ দিতে থাকলেন মালিকের মুনাফার বেদীতলে।' (কয়েকটি কথা)।

এই হল ঘটনার সূত্রপাত। এর সঙ্গে আছে শ্রমিক-মালিকের চিরাচরিত দ্বন্দ্ব অর্থাৎ বেতন বোনাস ও সুবিধা-সুযোগ নিয়ে দাবি-দাওয়ার আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গ ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাইবুনাল এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তা অগ্রাহ্য করে। শিল্পপতি স্যার বীরেন মুখার্জী তখন আমেরিকান পুঁজির বলে বলীয়ান। সদ্য আমেরিকা ঘুরে এসেছেন, বিশ্বব্যাংক থেকে পনেরো কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন। আর তাতেই তিনি রানিগঞ্জের শ্রমিকদের মানুষ গণ্য করেননি। তাঁর অনড় মনোভাব শ্রমিক ইউনিয়নকে

ধর্মঘটের নোটিশ দিতে বাধ্য করে। প্রতিক্রিয়া হিসেবে কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের সম্পাদক, সহ-সম্পাদকসহ ১৮ জন শ্রমিককে বরখাস্ত করে।

এর পর যা হয়, অনিবার্য সংঘাত। তখন রাজ্যে বিধানচন্দ্র রায়ের সরকার। তাঁদের তরফে চেষ্টা ছিল এই সমস্যা সমাধানের। কিন্তু দক্ষিণপন্থী সরকার শ্রমিক স্বার্থ দেখার থেকে মালিক স্বার্থের ক্ষতি না হওয়ার দিক দেখতে যথেষ্ট তৎপর ছিল। এভাবে আলোচনা অনুরোধ উপরোধ—সব পথ রুদ্ধ হলে রানিগঞ্জ সেরামিক কারখানার শ্রমিকরা চরম পথই নিলেন। ১৯৫৪ সালের ২৮ এপ্রিল বিকেল চারটেয় কোম্পানির আটটি মিলে ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল।

এই প্রেক্ষাপট না জানলে *একসঙ্গে* বইটার মর্ম উপলব্ধি বোধহয় সম্ভব নয়। বইটার কয়েকটি ভাগ আছে। মূলত দুটি পর্ব। এক, ২৮ এপ্রিল থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত। দুই, ২২ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রথম পর্বে শ্রমিকদের মালিকের কাছে কোনও অবস্থায় মাথা না নোয়ানোর লড়াই। এ লড়াই ধৈর্যের, ত্যাগের, তিতিক্ষার। এ তো যে-কোনও লড়াইয়ের চিরাচরিত চরিত্র। হ্যাভ-এর সঙ্গে হ্যাভ নট-দের লড়াই। এক পক্ষ দেখতে চায় অন্য পক্ষের ধৈর্য দম সাহস। দু-পক্ষেরই আছে অপেক্ষা। অনন্ত অপেক্ষা। কোন পক্ষ নমনীয় হয়, কে বা প্রাণ করিবেক দান! এক পক্ষের আছে পেট ভরা ভাত, বিলাসিতায় থাকার মতো সব রকম রসদ। অন্য পক্ষের পেট শূন্য, রসদ শূন্য। তবু লড়াই চলছে। বুভুক্ষু শ্রমিক পক্ষের লড়াই মালিক পক্ষের সঙ্গে যেমন, তেমনই অহরহ নিজের সঙ্গে। তীব্র জঠরজ্বালা আর মারণরোগ নিয়ে তাদের লড়তে হয়েছে একদিন দু-দিন নয়, প্রায় সাত মাস। আর লড়তে হয়েছে কীভাবে? আড়াই হাজার শ্রমিকের মধ্যে প্রায় হাজারখানেক শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে পরামর্শ করে বা না করে দেশে চলে গেছে। বাকি শ্রমিকদের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ধর্মঘটে অচল কারখানার গেট পাহারা দেওয়া থেকে শুরু করে কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। কাজ নেই। দূরে কাছে কোথাও। নেই মানে পাওয়া যাবে না। ধর্মঘটী শ্রমিকদের অন্য কারখানা বা খনিতে কেউ কাজ দেবে না। এ ব্যাপারে সব মালিকের এক রা। তাই কেউ রিকশা চালাচ্ছে, কেউ মুটেগিরি করছে। কেউ মাঠ থেকে ঘুটিং চুন (এক রকম চুনা পাথর, রং করার কাজে লাগে), কুন্দরম (পাটের আঁশের মতো দেখতে, বাংলায় বন-অমূল্য) জোগাড়ে পরিশ্রম করছে, কেউ মাঠের কাজ, চাষবাসের কাজ করছে। ঘর শূন্য। জমানো ট্যাকা, থালা ঘটি বাটি, গরু ছাগল—সব চলে যাচ্ছে একে একে, তবু লড়াই ছোড়েগা নেহি। লেখক এখানে একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। ধর্মঘটী শ্রমিকের ঘরের মেয়েরা কীভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে! তিনি একজনকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাদের নিশ্চয়ই দু-বেলা খাওয়া জুটছে না। উত্তরে শুনলেন খিলখিল হাসিমাখা মন্তব্য—'হাম কিসিকো পাস রোনে নেহি জায়গা, যব রহেগা তো হাসিসে রহেগা।' পৃ. ২।

কঠিন লড়াই-এর ময়দানে অন্দরমহল যখন এভাবে হাসতে পারে, সব শূন্য হলেও দৃপ্ত প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হতে পারে, তখন অগ্রবাহিনীর লড়াই যত অসমই হোক, তা হয় সহজ এবং শক্তিশালী। লেখক খুব সংগতভাবেই এই পর্বের নামকরণ করেছেন 'এরা কি মাথা

নোয়াবে'। প্রথমে দ্বিধা সংশয় সন্দেহ থাকলেও শেষে শ্রমিক ঘরের ঘরণীর হাসির মধ্যে সেইসব সংশয় সন্দেহ ফুৎকারে উবে যায়। প্রবল বিশ্বাসে তিনি বলেন—

> কুলটি-বার্নপুরে লোহা গলানো হয়, আর রানীগঞ্জে সেই লোহাগলানোর ফার্নেস তৈরির ইট বানানো হয়। সেই শক্ত ইট যারা বানায় তারা কোন্ ধাতুতে গড়া, কী শক্তির তারা পরিচয় দেবে? শুধু এইটুকু জানি, বার্নপুরের তুলনায় রানীগঞ্জের শ্রমিকদের ঐক্য অনেক বেশী অটুট। পৃ. ৩

শ্রমিকের এই লড়াইটা বড় করুণ, বড়ই মর্মান্তিক। শ্রমিকদের শরীর স্বাস্থ্য ভেঙেছে, তারা ক্ষুধায় অস্থির হয়েছে; একা একা কেঁদেছে, তবু ভাঙেনি তাদের মনের জোর। একমাত্র মনের জোর ছাড়া মূলধন বলতে কিছুই নেই। আর এই নেই রাজ্যের বাসিন্দা হয়ে লেখক দেখেছেন—

> চারদিকে রুক্ষ চুল, ছেঁড়া কাপড় আর জীর্ণ শরীরের মিছিল। চেয়ে চেয়ে দেখছি যারা আসছে তাদের অধিকাংশই হয় মেয়ে শ্রমিক অথবা শ্রমিকদের বৌ। অনেকেরই কোলে ময়লা ন্যাকড়ায় জড়ানো বাচ্চা। একে তো এদের হাড্ডিসার দেহ, তার উপর এই পৌষের শীতের মধ্যে টিপটিপ করে সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে। খালি গায়ে সারাক্ষণ কামিনগুলো কাঁপছে। নির্বাক হয়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফিরে যাচ্ছে আঁচলে চাল নিয়ে, অথবা কিছু জীবনীশক্তি? পৃ. ৪

তবু এর মধ্যে কি প্রশ্ন সন্দেহ সংশয় ছিল না? ছিল। ইউনিয়নের সততা আন্তরিকতা নিয়েই ছিল। আর তার বহির্প্রকাশ ঘটত ইউনিয়নের কাছে সাহায্য নেওয়ার সময়। শ্রমিকদের কারও কারও মনে হত, ইউনিয়নের বাবুরা বুঝি তাদের বাছাই করা, পছন্দের লোকদেরই সাহায্য করছেন। অর্থাৎ সেই চিরাচরিত দ্বন্দ্ব, পাশাপাশি অনমনীয় দৃঢ়তা। এমন অবস্থার মধ্যেও তাঁরা ইউনিয়ন ভেঙে কারখানায় ঢুকে পড়ার কথা ভাবে না শত প্রলোভন সত্ত্বেও।—'মরি তো সব একসঙ্গে মরব। ইউনিয়ন যখন বলবে তখন ঢুকব। নইলে নয়।' পৃ. ৫।

রানিগঞ্জ আসানসোল শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক ইউনিয়নের এক দৃঢ় ভিত্তি আছে। অনেক সংগ্রামের পথ বেয়ে, অনেক বন্ধুর পথ মাড়িয়ে, অনেক মানুষের হাড়গোড়ের বিনিময়ে গড়ে ওঠা ইউনিয়ন শ্রমিকের বিশ্বাস ভালোবাসার প্রতীক হয়ে উঠেছে। রাগ দুঃখ সন্দেহ সংশয় থাকলেও প্রাণের জিনিসকে কেউ অবহেলা করতে পারে না। কেননা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইউনিয়ন বৃহত্তর জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছবেই দুর্গম গিরি-প্রান্তর অতিক্রম করে।

তবে যুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখনই তো আসল পরীক্ষা। শ্রমিক চেতনা কতটা ঐক্যবদ্ধ, কতটা দৃঢ়, কতটা রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ—তখনই বোঝার সময়। বৈপরীত্য মানুষের জীবনে স্বাভাবিক ঘটনা। এখানেও তার ব্যতিক্রম নয়। লেখকের চোখে আমরা দেখি ধর্মঘটের তীব্র জ্বালা যন্ত্রণার মাঝে নানা অসংগতি। নারী মজুর কাপড়ের অভাবে ঘরের বার হতে পারছে না, অথচ তার পাশেই চাঁদা তুলে কালীপুজো করা হচ্ছে। যার ঘরে এক দানা চাল নেই, সে গাছতলায় বসে তাস পিটছে। অর্ধভুক্ত অবস্থায় দু-চার গণ্ডা

পয়সা পেয়ে মদ খাচ্ছে কিংবা জুয়া খেলছে। এভাবে শক্তি ঝরে যাচ্ছে, ভোঁতা হচ্ছে চেতনা, প্রাণও ঝরে যাচ্ছে অকালে।

ইউনিয়ন এক্ষেত্রে উদাসীন। তারা পারেনি এসব ঠেকাতে, যেমন পারেনি শ্রমিকদের স্থানীয় ব্যবসায়ী, ঠিকাদারদের নির্মম শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে। কাজ হারিয়ে শ্রমিকরা কাজ খুঁজছে, আর সস্তায় তাদের শ্রমশক্তি কিনতে তৎপর হয়ে উঠেছে ব্যবসায়ী ঠিকাদার প্রমুখ। এমন অবস্থা দেখেও ইউনিয়ন যেন নির্বিকার। যদি শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতেই হয়, তাহলে কারখানা কী দোষ করল। ওখানে বড় শোষণ, এখানে না হয় ছোটখাটো শোষণ। চরিত্র একই। লেখক এখানে শুধুমাত্র দৃশ্যচিত্র এঁকেছেন, কোনও মন্তব্য ছাড়াই। আসলে বোধহয়, বড় শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে ছোটখাটো শোষণ অত্যাচারে উদাসীন থাকতে হয়।

এতসব বৈপরীত্য অসংগতি সত্ত্বেও একতা এবং দৃঢ়বদ্ধতা কীভাবে সম্ভব? এটা রহস্য। আর তার উত্তর পাচ্ছি লেখকের কথায়—

> ধর্ম এবং সংস্কার, সংগ্রাম এবং বদভ্যাস যত সোজা এবং বাঁকা পথেই চলুক না কেন, প্রাণশক্তি তার মধ্যেও প্রবাহিত।...মুনাফা শিকারীর দল জব্দ করে রাখার যে পাপ ব্যবস্থা করে রেখেছে তার মধ্যেই নতুন মানুষ জেগে উঠতে চেষ্টা করছে। সংগ্রাম করতে করতে পুরনো মানুষের মধ্যে নতুন মানুষের উপাদান সৃষ্টি হচ্ছে।
>
> পৃ.৯

এইরকম তীব্র ও করুণ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কলকাতা অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ইউনিয়ন। লেখকের ভাষায় 'হাতের কাজ বন্ধ, তাই এবার পায়ের কাজ শুরু হবে শ্রমিকদের।' পৃ. ১১। এতদিন ছিল ঘরের লড়াই, নিজের সঙ্গে লড়াই। তীব্র কঠিন লড়াই। এবার লড়াই বাইরের, বৃহত্তর মঞ্চে। এটাই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, ছ-মাস শ্রমিকরা অর্ধভুক্ত অবস্থায় জীর্ণ শীর্ণ শরীর নিয়ে কাটানোর পর কেন এই কষ্টকর অভিযানের সিদ্ধান্ত? এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্য কী? শুধু কি শ্রমিক স্বার্থ? না কি শ্রমিকের লড়াই-এর বৃহত্তর প্রেক্ষাপট রচনা? লেখক এইসব প্রশ্নের উত্তর দেননি, তবে ভাষা ও শব্দের আড়ালে ইঙ্গিতময়তায় অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর আছে।

কলকাতা অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল ধর্মঘট চলাকালীন অর্থাৎ একে আন্দোলনের চরম পর্ব বলা যেতে পারে। ইউনিয়ন বা ইউনিয়নের পশ্চাতে যে রাজনৈতিক শক্তি আছে, তাঁদের হয়তো মনে হয়েছিল যে, ছ-মাস ধর্মঘট চলার পরেও বিষয়টি বৃহত্তর ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাচ্ছিল না। দেখা যাচ্ছিল না মালিক পক্ষের নমনীয় হওয়ার কোনও লক্ষণ। মনে রাখতে হবে আজকের মতো মিডিয়ার দাপট তখন ছিল না। বৃহত্তর বাণিজ্যিক সংবাদপত্রগুলি নিয়ন্ত্রিত হত পুঁজিপতিদের স্বার্থেই। স্বভাবতই দীর্ঘদিন ধরে চলা ধর্মঘটের সংবাদ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছিল না। তাই আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ না থেকে

ধর্মঘটের ক্রিয়াকে রাজ্য তথা জাতীয় স্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কলকাতা অভিযান ছিল চরম পদক্ষেপ। আর এখানে পেয়েছি দীর্ঘ পথযাত্রার চাক্ষুষ বিবরণ। পরিসর স্বল্প, তাই সে বিবরণ বিশ্লেষণে ক্ষান্ত থাকতে হচ্ছে।

মোট আড়াই হাজার শ্রমিকের মধ্যে অনেকেই অভিযানে অংশ নেবে না। তারা থাকবে মিল গেটে পাহারা দেওয়ার জন্য, কাজের জন্য, অন্ন-সংস্থানের জন্য। সবাইকে নেওয়াও মুশকিল। এতগুলো মানুষের খাবার, জুতো কম্বল জোগানো কঠিন। তবু যেতে হবে। কী এক আবেগে ধ্বনি উঠেছে যেতে হবে, যেতে হবে। এও তো লড়াই। এ লড়াইয়ে আবেগ থাকা স্বাভাবিক। যাত্রাপথের কঠিন উষর ভূমি পার হয়ে লক্ষ্যের সোনালি সূর্য কে না পেতে চায়। বুড়ো করিমন, জোয়ান ভীম—সবাই এককাট্টা। মেয়েরা যাবে না, কিন্তু পুরুষদের প্রেরণা দিচ্ছে যেতে। সোচ্চারে বলেছে—

তুমি যাও, দরকার হলে আমি ভলান্টিয়ারি করব, গেটে পাহারা দেব। পৃ. ২০

আগেই বলেছি রানিগঞ্জের শ্রমিকদের আসল শক্তি ছিল তাঁদের ঘরের মেয়েরা। তাঁরাই প্রেরণা দিয়েছে, ঝাঁপিয়ে পড়েছে সর্বস্ব নিয়ে। আবার তীব্র সংকটে খিল খিল হাসিতে লঘু করে দিয়েছে গম্ভীর পরিস্থিতি।

মোট বিরানব্বই জন শ্রমিক। তাদের মধ্যে হিন্দুস্থানী ৩৫, মুসলিম ৩, মুণ্ডা ৩, বাউরি ৫, ডোম ৩, হাড়ি ১, বাগদি ১ ও অন্যান্য ৪১। এখানে প্রশ্ন জাগে, যাচ্ছে তো শ্রমিকশ্রেণী, তবে কেন এত জাতপাত বা সম্প্রদায় বিভাগ। জানি না এটা কেন, কী উদ্দেশ্যে?

অভিযানকারীদের সকলেরই অবস্থা করুণ। জীর্ণ শীর্ণ হাড্ডিসার চেহারা। পায়ে জুতো নেই, গায়ে চাদর নেই। শীতের দিনে গায়ে ময়লা হাফ শার্ট। 'এরাই যাচ্ছে দিগ্বিজয় করতে' পৃ. ১৯।

হ্যাঁ দিগ্বিজয়। জয়যাত্রা। দুঃখ কষ্টের যাত্রা। পথ বন্ধুর। শরীর দেবে না, তবু যেতে হবে।

লেখক শ্রমিকদের এই পথযাত্রার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধির ডাণ্ডি অভিযানের তুলনা টেনেছেন। বলেছেন—

শুনেছি ডাণ্ডি মার্চের লোকসংখ্যা ছিল উনআশি। সেদিক থেকে হয়ত একটা মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আহম্মদনগর থেকে সুরাট দু'শ মাইল, রানীগঞ্জ থেকে কলকাতা দেড়শ' মাইল। গান্ধিজী দু'শ মাইল পৌঁছেছিলেন চল্লিশ দিনে—এরা দেড়শ' মাইল যাবে দশ দিনে। তিনি গিয়েছিলেন আইন ভাঙতে, এরা যাচ্ছে আইনসঙ্গত দাবি নিয়ে। সে মার্চের সামনে ছিলেন গান্ধিজী, এ মার্চে আছে শুধু একদল উপবাসী শ্রমিক। সে মার্চের সঙ্গে ছিল দুনিয়ার সব খবরের কাগজের লোক, এখানে এদের সঙ্গে কেউ নেই। বিধি বহির্ভূত আন্দোলন হলেও সে খবর কাগজের পাতায় বড় বড় করে উঠেছিল, এটা আইনসঙ্গত হলেও কাগজে স্থান পাবে না। প্রাসাদ থেকে নেমে এসে সেদিন ধরণীর ধূলায় নেমেছিল বুর্জোয়াদের শ্রেষ্ঠতম নেতা, এরা ধুলো থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। ওরা

ক্ষমতা চেয়েছিল, এরা এখনো শুধু বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত। ওদের নেতৃত্বে যে আন্দোলন তাতে ভারতব্যাপী সাড়া জেগেছিল, এদের পথ হাঁটার খবর কেউ হয়ত জানবে না। আকাশের সঙ্গে কি পাতালের তুলনা হয়? পৃ. ১৯

১৯৫৪ সালের ২২ নভেম্বর শ্রমিকদের অভিযান শুরু হল, চলল ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। রানিগঞ্জ বর্ধমান হয়ে কলকাতা। কখনও গ্রামের পথ, কখনও গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, কখনও সাধারণ রাস্তা—এভাবেই চলেছে অভিযাত্রীরা। আর তাদের দেখতে, অভিনন্দন জানাতে ছুটে আসছে গ্রামের কৃষিজীবী মানুষ, ছোট ছোট শহরের মানুষ, অন্য কারখানার শ্রমিক, শিক্ষক ছাত্র—বলতে গেলে সর্বস্তরের মানুষ তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছে, অর্থ সাহায্য করেছে। খাবার দিয়েছে। ভোলা যায় না সেই ভিখিরিকে, যে তার সমস্ত সঞ্চয় তুলে দিয়েছে শ্রমিকদের, ভোলা যায় না সেই বাস-ড্রাইভারকে, যিনি পথশ্রমে ক্লান্ত শ্রমিকদের বাসে করে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। ভোলা যায় না সেইসব গ্রামের মহিলাদের, যাঁরা পথের দু-ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের মালা পরানোর প্রতিযোগিতায় মেতেছে, নিজেরা রান্না করে খাইয়েছে। কী এক আবেগে সেদিন উত্তাল হয়ে উঠেছিল সর্বস্তরের মানুষ। আর সব কিছুতে হাসিমুখে সাড়া দিয়ে অভিযানকারীরা এগিয়ে চলেছে। কষ্ট হয়েছে তবু থামেনি। যন্ত্রণায় পা দুটো রক্তাক্ত হয়েছে, তবু দাঁড়িয়ে পড়েনি। এক মহামন্ত্র যেন তাঁদের কানে গুঞ্জরিত হয়েছে : এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। চলতেই হবে। চললে তুমি সার্থক, চললে তুমি জয়ী। তারা গান গেয়েছে। ক্লান্তি হরণের গান, বিজয়ের গান। ভার্সাই অভিযানকারীরাও গান গেয়েছিল। 'লা মার্সাই'। সে গান পরে ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত হয়। (সেই গানের ভারতীয়করণ করেছেন হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—'আব্ কোমরবন্ধ তৈয়ার হো লাখো কোটি ভাইয়ো...', মৃণাল সেন-এর 'কোরাস' ছবিতে যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই ছবির দীর্ঘ মিছিল দৃশ্যটি অনুপ্রাণিত হয়েছিল *একসঙ্গে* বই থেকে।) এঁদেরও মুখের গানে ছিল এগিয়ে চলার অঙ্গীকার—

'বঢ় চলো কৃষাণ ধীর বঢ় চলো মজুর বীর
বঢ়ে চলো বঢ়ে চলো।
হাতমে নিশান লো ইনকিলাব গান লো
পুঁজিবাদী দুর্গ পর চঢ়ে চলো, চঢ়ে চলো!' পৃ. ৩১

এ গান জাতীয় সংগীত হয়নি, কিন্তু শ্রমিকের সংগীত হয়েছিল।

এই অভিযানের ধার ভার এত বেশি ছিল যে তখনকার দিনে মিডিয়ার দাপট না থাকা সত্ত্বেও কাতারে কাতারে মানুষ পথে নেমেছে, শ্রমিকদের অভিনন্দন জানিয়েছে, সাহায্য করেছে খাবার দিয়ে, অর্থ দিয়ে, নানাভাবে। তবে লেখকের বিবরণ ধরলে পরিষ্কার হয়—এই অভিযানে দাবি-দাওয়া থেকে প্রচারের দিকেই ঝোঁক বেশি ছিল। অবস্থা এমন হয়েছে যে, সারাদিনে পথশ্রমে ক্লান্ত শ্রমিকদের আরও হাঁটানো হয়েছে। লেখকের কথায় তাই স্বভাবতই বিরক্তি ঝরে পড়েছে—

প্রত্যেকটি শ্রমিকদের পা যখন ব্যথায় টনটন করছে তখন তাদের খামোকা আরো

> তিন মাইল পথ বেশী হাঁটানো কোন দেশী দরদের নমুনা? এতে কার না রাগ হয়? আর এভাবে একটা মিছিলকে হাঁটালেই অসংগঠিত মজুররা সংগঠিত হয়ে যাবে? পৃ. ৮১

আসলে লক্ষ্য শুধু একটা কারখানার শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া বা তাদের জয় ছিল না, তাঁদের কেন্দ্র করে রাজ্য তথা দেশের মজদুর সংগঠনগুলিকে একটা রাজনৈতিক লক্ষ্যে একত্রিত করার প্রচেষ্টাও ছিল এইসঙ্গে।

রানিগঞ্জের শ্রমিকরা অভিনন্দিত হয়েছেন, অভিযান প্রচার পেয়েছে, রাজনৈতিক লক্ষ্যও হয়তো পূরণ হয়েছে, কিন্তু সেই শ্রমিকদের উদ্দেশ্য কি সাধিত হয়েছিল? যে দাবি নিয়ে তাঁরা পথে নেমেছিলেন, এত কষ্ট করলেন, তার কী হল? শ্রমিকরা কি পেলেন রোটি কাপড়া মকান আর চিকিৎসার সুবিধা? লেখক বলেছেন—

> কলকাতায় পৌঁছবার পর থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কোম্পানির মাথা এ যাত্রায় নোয়ানো যাবে না। মহানগরীতে যতখানি আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারলে তা সম্ভব হত, ততখানি করা যায়নি। পৃ. ৯৫

অর্থাৎ মালিক পক্ষের অনড় মনোভাবের কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁরা যেখানে ছিলেন, সেখানেই থেকে গেলেন। কিন্তু শ্রমিকরা? তাঁরা কি নমনীয় হলেন? আপস করলেন? এ প্রশ্নের জবাব কিন্তু বইয়ে পাওয়া যায়নি। শ্রমিকদের কলকাতা অভিযান, তাই স্বভাবতই প্রচার অভিযানেই যেন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। আর সেটা সফল ভাবেই। কেননা ছ-মাস পার হয়ে গেলেও রানিগঞ্জের শ্রমিকদের অভিনন্দনের পালা শেষ হয়েও হচ্ছিল না। রোটি কাপড়া মকানের পরিবর্তে অভিনন্দন, মালা। এতে তিতিবিরক্ত হয়ে এক শ্রমিক (বঙ্কুনাথ) বলেই ফেলল—

> এখনো লোকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে, গলায় মালা দিচ্ছে। কিন্তু এ আর আমাদের সহ্য হচ্ছে না, মনে হচ্ছে ওরা শহীদ স্তম্ভে মালা দিচ্ছে। পৃ. ৯৬

এর পরেও ওরা বেঁচে আছে, থাকবে রাগ নিয়ে বিরক্তি নিয়ে, মৃত্যুর ইচ্ছা নিয়ে। কেননা সংগ্রামের পরাজয় নেই। কোনও সংগ্রামই ব্যর্থ নয়, আপাত ফল না ফললেও।

রানিগঞ্জের শ্রমিকদের কলকাতা অভিযানের ঘটনাকে বৃহৎ করে দেখানো হয়। হ্যাঁ, বিষয়টার মধ্যে চমক ছিল, অভিনবত্ব ছিল। কিন্তু রানিগঞ্জে ছ-মাস ধরে ক্ষুধা আর মারণ রোগের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা যে লড়াই করেছে তা আরও অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক স্বার্থে কলকাতা অভিযান গুরুত্ব পাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে, নিজের সঙ্গে, ঘরের মধ্যে যে লড়াই তাঁরা করেছেন, তার তুলনা পৃথিবীতে মেলা ভার।

একসঙ্গে লেখার মধ্যে বিবরণ আছে। রিপোর্টাজে যেমন থাকে। তবে সে বিবরণ নির্মোহ, সাদামাটা শব্দসম্ভারে সীমাবদ্ধ থাকেনি, কখনও কখনও উঁকি দিয়েছে কবিতার ভাষা—

> দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মধ্যে পাকা ধানের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে রৌদ্র-ঝলোমল প্রকৃতিরানী। পৃ. ৪৩

আছে নির্মল হাস্যরস—

নস্যি বিলিয়ে মিশিরজী ধ্বনি তুললেন, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।
শ'খানেক লোক উত্তর দিল, হাঁচ্চো।
মিশিরজী হাঁক ছাড়লেন, দুনিয়ার মজুর এক হও।
আবার উত্তর : হাঁচ্চো।
সমবেত কণ্ঠধ্বনির বদলে এ কী সাংঘাতিক নাসিকাধ্বনি। কোথায় লাগে কুম্ভকর্ণের হাঁচি। পৃ. ৫৬

আবার কোথাও কাব্যিক সুষমা—

কে বলবে এদের বুভুক্ষু শ্রমিক, এ যেন একটা আস্ত ফুলের বাগান চলেছে কলকাতার দিকে। পৃ. ৯৫

রানিগঞ্জের শ্রমিকদের কান্না হাসি ঘাম ভরা যাত্রার কথা পড়তে পড়তে কখনও আবেগে আপ্লুত হয়েছি, কখনও বেদনায় পীড়িত হয়েছি, আবার কখনও অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে ভেবেছি, এত মানুষ, এত বৈচিত্র্য। সত্যি, এ আমাদের বিচিত্র ভারতবর্ষ। যার পূর্ণ ছায়া পড়েছে বইয়ের পাতায় পাতায়। কোনও একক চরিত্র নেই। নেই নির্দিষ্ট কাহিনি। আছে শুধু চলমান জনতার কথা। টুকরো হাসি গান। আছে পা ফেলা, হাত তোলা। জয় করবার উৎসাহ আর অফুরান বেগ। আজ এই একবিংশ শতকের সুশীতল হাওয়ায় বসে বিশ্বায়ন শিল্পায়ন কমপিউটার ইন্টারনেট শোভিত মনে সেদিনের বুভুক্ষু মানুষের মর্মবেদনা উপলব্ধির ক্ষমতা আমাদের কতটুকু? সত্যিই কি উপলব্ধি করতে পারছি? একসঙ্গে আমাদের যেন সেই আয়নার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, যা আমরা ভুলেছি বা ভুলতে বসেছি।

অবিচল একজন কবি ও 'ইলা মিত্র'

তমোনাশ ভট্টাচার্য

১.

আমরা যারা কবিতার ইচ্ছুক পাঠক, তাদের প্রত্যাশা কি কবিতার কাছে? অথবা কবিতার মধ্যে যাকে খুঁজছি ব'লে ভাবছি, তা আসলে কবির কাছে পাঠকের অন্তর্লীন চাহিদা? এভাবেই কি কবিতাকে ভালোলাগা-মন্দলাগার বোধ নির্মিত হয়? সেই বোধের পেছনে কি কোনো সচেতন স্বীকার অনুজ্ঞা কাজ করে? কবিতার (অথবা কবির) মধ্যে যে বিভাজন, তার ভিত্তি কি নান্দনিক? ন্যারেটোলজি চর্চায় আঙ্গিক ও বিষয়ের যে বিতর্ক, সমতুল বিতর্ক-বিভাজন কবিতার ইতিহাসেও অপ্রতুল নয়। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন যখন শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকাশমাধ্যমের সামাজিক অভিমুখ নির্দিষ্টভাবে সূচীত করছিলো, পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি ছিলো সেই সর্জন ভাবনার অন্যতম প্রেরণা। কবির কবিতা 'সর্বত্রগামী' হয় না, এটা আক্ষেপ হ'লেও, কবিতাকে 'সর্বত্রগামী' হ'তেই হবে অথবা 'সর্বত্রগামী' না হ'লে তা গুরুতর অপরাধ ব'লে মান্য হবে—এমন ভাবনা কি একধরনের একপেশেমিকেই লালন করে না? তেমনই, যে কবির কবিতা 'বিচিত্র পথে'-র সন্ধানে পা বাড়ায় না, সময়ের চিহ্ন গায়ে ব'য়ে সময়কে অতিক্রম ক'রে যাওয়ার কথা বলে না, তিনি কি সত্যিই বড়ো কবি? সাহিত্যের ইতিহাসে, ফরাসি দেশে কি বাঙলায়, দেখা গেছে যে কোনো একটি ধারার লেখক/কবি হিশেবে চিহ্নিত সাহিত্যকার কোনো বিশেষ সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর তথাকথিত পরিচিত স্বভাবের বাইরে গিয়েও সৃষ্টি করেন। এবং তার মুন্সিয়ানা সেখানেই যে সেই সৃষ্টিস্বাক্ষর সেই সময়ের পরিসরকে ছাড়িয়ে যায়, কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। সব সাহিত্যিকের সব রচনাই যে পাঠকের মনে চিরকালীনের সম্মান পায়, তা-ও নয়। আবার এমন সাহিত্যিকও থাকেন, যাঁর লেখাকে বাদ দিয়ে তাঁর সেই সময়টাকে ছোঁয়া-ই সম্ভব হয় না। পাঠকের মনে, কোনো অমোঘ দীপ্তির মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকে কোনো কবিতা/গদ্য—এমনকী তার লাইনগুলোও। আর যে লেখকটি শ্রমিকদের মিছিল থেকে সংগ্রহ করেন রিপোর্টাজের উপাদান, জীবনের উপান্তে এসেও উপন্যাসের চরিত্রর মধ্যে খুঁজে ফেরেন সমাজযন্ত্রণা ও সমাজবিপ্লবের সম্ভাবনা, তাঁর সেই সচেতন দায়বদ্ধ জীবন-জিজ্ঞাসার অবিচল প্রত্যয় কবিতার মধ্যেও স্পষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক। আলগোছে ভালোলাগার যে সুশীল বোধ, তার পাশে সচেতন কবিতা পাঠ—এ দুই বিষয়ের সমন্বয় একজন কবিকে পাঠকের কাছে প্রিয় করে। 'হে বন্ধু! কোথায় সেই মনমাতানো প্রেম/দুর্দ্ধর্ব সাহসে যে ডেকে বলতে পারে,/পুরনো পৃথিবীকে ভেঙ্গে গড়ব নতুন করে।/হাতে তার পরিয়ে দেব কঙ্কণ,/কপালে তার এঁকে দেব চন্দনের টিপ,/হৃদয় তার ভরিয়ে দেব গানের গুঞ্জনে।' (নতুন দিগন্ত)। এ'রকম কবিতার লাইন থেকে পাঠক যখন পৌঁছে যান সেই অসম্ভব তীব্রতম পঙ্‌ক্তির অভিঘাতে, 'ইলা মিত্র

মর্মে মর্মে জানে/যৌন নয়, সমস্যা জমির!'—তখন কবি গোলাম কুদ্দুসের কবিতার পাঠ পাঠককে এক সমগ্রের সন্ধান দেয়।

২.

'...বিগত 7/1/50 [1950] তারিখে আমি রোহনপুরে গ্রেফতার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোলে নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে মারধোর করে এবং...সবকিছু স্বীকার না করলে আমাকে উলঙ্গ করে দেওয়া হবে এই বলে এস.আই. আমাকে হুমকি দেখায়। আমার যেহেতু বলার মতো কিছু ছিলো না, কাজেই তারা আমার সমস্ত কাপড় চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দী করে রাখে।

আমাকে কোনো খাবার দেওয়া হয়নি, একবিন্দু জল পর্যন্ত না। সেদিন সন্ধ্যাবেলাতে এস.আই.-এর উপস্থিতিতে সেপাইরা তাদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত শুরু করে। সে সময়ে আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে।...

যে কামরাটিতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তারা নানারকম অমানুষিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালালো।...'

(ইলা মিত্র/রাজশাহী কোর্টে পেশ করা জবানবন্দি।)

বলা নিষ্প্রয়োজন এই চূড়ান্ত ঘৃণ্য নির্যাতনের পরেও ইলা মিত্র তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তি তথা পুলিশবাহিনীকে কিছুই বলেননি এবং সেই নিপীড়নেও দৃঢ়চেতা ছিলেন। 9/1/50 ও 10/1/50 তারিখে তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয়া কর্মী ইলা মিত্রকে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের পুলিশ যে অকথ্য অত্যাচার চালায় তার ফলে 11/1/50 তাঁকে প্রথমে নবাবগঞ্জ সরকারি চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন অবস্থায় নবাবগঞ্জ জেলের একটি সেলে রাখা হয়। সেখানেও মানসিক নির্যাতন ও শারীরিক পীড়ন চলতে থাকায় অবস্থার অবনতি হওয়ায় ইলা মিত্রকে রাজশাহী জেলের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির প্রভাবে 'আজাদ' অথবা 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকা এই জঘন্য অত্যাচারের খবর সেভাবে প্রকাশ করেনি। বামপন্থী (তৎকালীন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির) আন্দোলন এই ঘটনাটিকে মানুষের সামনে নিয়ে আসে। চিকিৎসার জন্য কলকাতা মেডিকেল কলেজে ইলা মিত্রকে নিয়ে আসা হয়। এ ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের জননেতা ফজলুল হকের প্রয়াস অবিস্মরণীয়। তৎকালীন বিদেশি নাগরিক ইলা মিত্রকে ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ গুহ প্রমুখ আবেদন করেন। এবং নেহরু ইলা মিত্রকে এ দেশের নাগরিকত্ব দেন।

এই স্বল্পকথিত ইতিহাসের প্রেক্ষাপট উঠে আসে প্রবাদপ্রতিম কবিতার লাইনে, 'ইলা মিত্র রাজশাহী জেলে।/...এ বেদনা কবি চিত্তে যদি/মাঝে মাঝে আনে ব্যাকুলতা,/তবু জেনো প্রকাশের মত/ভাষা নেই বিদ্যুৎসঞ্চারী।' সেই অস্থির সময়, একদিকে মন্বন্তরক্লিষ্ট দেশ, দেশভাগ, দেশত্যাগ, ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা—অন্যদিকে কৃষকের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, তেভাগার লড়াই। এই ইতিহাস সম্পর্কে যারা নির্লিপ্ত থাকতে চেয়েছিলেন, তাদের

সেই নৈর্ব্যক্তিক যাপনকে নাড়িয়ে দিতে পেরেছিলো 'ইলা মিত্র' কবিতাটি। ক্রমে শম্ভু মিত্রর আবৃত্তির কারণে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই কবিতা। প্রসঙ্গত কবিতাটির অনুষঙ্গে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য ব'লে মনে হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্তক্রমে নির্বাচনী প্রচার সভা (ও অন্যত্র রাজনৈতিক সভায়) শম্ভু মিত্র 'ইলা মিত্র' কবিতাটি আবৃত্তি ক'রে (শ্রোতা-দর্শকদের অনুরোধে হ'লেও) পার্টি তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন। একটি কবিতা যে বাঙলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এত প্রাসঙ্গিক ও ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হ'তে পারে, এমন উদাহরণ খুব বেশি নেই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ দশকে মহিলাদের যে রাজনৈতিক ভূমিকা ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চেতনা ও মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজবদলের লড়াইতে মহিলাদের অগ্রসৃতি, শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মহিলাদের যে জীবনপণ যুদ্ধ—তার ইতিহাস প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে যখন গোলাম কুদ্দুস লেখেন, '...খুন-ঝরা নাচোলে সেদিন/একটি নারীর ডরে, হায়,/জেগে ওঠে কত না পৌরুষ!' অথবা এদেশের নারীমুক্তি আন্দোলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা কমরেডদের অসামান্য দান পরিস্ফুট হয়, '...আবেষ্টনী করে অতিক্রম,/অতিক্রম করে সমাজের/নারীত্বের শাশ্বত নিয়ম।'

কবিতাটিতে একটি আখ্যানধর্মিতা আছে। ইলা মিত্রর সংগ্রাম ও তাঁর ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের কাহিনি আছে। কিন্তু সেই মর্মন্তুদ বিবরণকে ছাপিয়ে যায় বন্দিনীর প্রত্যয়, অনমনীয় সাহস ও আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ডাঃ রণেন সেন (বর্তমানে প্রয়াত) যেমন লিখেছিলেন, ইলা মিত্রর স্মৃতিচারণায়, '...কমরেড গোলাম কুদ্দুসের অবিস্মরণীয় ও অসামান্য কবিতা 'ইলা মিত্র'...এমন কবিতা আর কেউ লিখেছে বলে জানা নেই। কবিতা পড়ে আমি চোখের জল আটকাতে পারিনি।' যাঁরা ওই সময়ের সাক্ষী, যাঁরা ওই সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগঠক/কর্মী/নেতৃত্বস্থানীয়, তাঁদের কাছে কবিতাটির আবেদন পরিচিত সাহিত্যতাত্ত্বিক নান্দনিকতার ঊর্ধ্বে।

রত্নপ্রসবিনী বাংলা ভাষায় এমন প্রায়শ ঘটেছে, 'ইলা মিত্র' কবিতার ক্ষেত্রেও সেটা ঘটেছে, একটি কবিতা ও একজন কবি সমার্থক হয়ে গেছেন—এবং এমন একটি বিষয় নির্ভর সেই কবিতা যার ক্ষেত্রে রয়েছে এক কঠোর বাস্তব আর নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক বিশ্বাস। 'ইলা মিত্র' শীর্ষক কবিতা অন্য কবিরাও (যেমন বর্তমান বাংলাদেশে) লিখেছেন, কিন্তু গোলাম কুদ্দুসের কবিতাটির মতো কোনোটিই কিংবদন্তীতুল্য হয়নি। যদিও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে নানা মতভেদ ও বিতর্ক দেখা দিয়েছে, স্তালিন সম্পর্কিত মূল্যায়ন পাল্টেছে—এমনকী স্তালিন সম্বন্ধীয় উচ্ছ্বাস ও ব্যক্তিপূজা বন্ধ হয়ে স্তালিন-বিরোধী সমালোচনার ধারা কখনও তীব্র হয়েছে কখনওবা স্তিমিত হয়েছে—তথাপি যখন নিভৃতে পাঠকরা হয় অথবা উদাত্ত আবৃত্তি শোনা যায়, 'ইলা মিত্র কৃষকের প্রাণ!/ইলা মিত্র মুচিকের বোন।/ইলা মিত্র স্তালিননন্দিনী।/ইলা মিত্র তোমার আমার/সংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ বিবেক।'—আমরা আলোড়িত হই, আমাদের

অনুভূতির শিকড়-বাকড়ে প্রাণের স্পর্শ লাগে। এমনকী ষষ্ঠ সংস্করণের প্রাক্‌কথনে কবি নিজেই জানিয়েছিলেন যে 'স্তালিন-বিতর্ক আগেকার তীব্রতা হারিয়েছে.....' (2002 খ্রিস্টাব্দ) (যদিও এ ব্যাপারে বর্তমান আলোচকের ভিন্নমত আছে) এবং বিতর্ক সত্ত্বেও উপযুক্ত ছত্রটি বাদ দেওয়ার কোনো ইচ্ছাও তাঁর ছিল না (সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? যে সময়টা এই কবিতার পটভূমি, তখন স্তালিন তো সন্দেহাতীত নায়ক। এবং যাবতীয় বিতর্ক সত্ত্বেও, কাব্যিক অতিরঞ্জন মনে হ'লেও, পঙ্‌ক্তিটি তৎকালীন কট্টরপন্থী বাম রাজনীতির প্রতিফলন নয়?)। এই সামগ্রিক রাজনৈতিক ও সামাজিক পট ও পটপরিবর্তনকে মনে রেখেই 'ইলা মিত্র' কবিতার পাঠ হওয়া উচিত। রাজনৈতিক কর্মী/সংগঠকদেরও একটা নিজস্ব ভালোলাগা-মন্দলাগার জায়গা থাকে। সাংস্কৃতিক কর্মীরা তাঁদের সামনে চিন্তা ও পঠন-পাঠনের পরিসরটা আরো বড়ো ক'রে দেন। সমাজবিমুখ সাহিত্যসমালোচক এতে ভুরু কুঁচ্‌কোতে পারেন, গাল দিতে পারেন, কিন্তু যে দেশে 'ইলা মিত্র'রা জন্মান, বড়ো হন, জমি-জিরেতের লড়াই থাকে, বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, অন্য সমাজের স্বপ্ন থাকে—সে দেশে কবিরা কীভাবে নির্লিপ্ত থাকতে পারেন?

৩.

'দীপায়ন' প্রকাশিত (নভেম্বর 2002 সংস্করণ) 'ইলা মিত্র' শীর্ষক কবিতার বইটিতে আরও অনেকগুলো কবিতা আছে। যার মধ্যে একাংশে 'সাম্প্রতিক সংযোজন' হিশেবে কতগুলো কবিতা আছে। তাছাড়া ইরাক যুদ্ধ চলাকালে 'কালান্তর' পত্রিকাতে 'মনের মুকুরে যুদ্ধ' শীর্ষক একাধিক কবিতার সিরিজ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই কবিতাগুলোতেও গোলাম কুদ্দুসের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও সমাজচেতনা পরিস্ফুট। আসলে গোলাম কুদ্দুস কবি হিশেবেও তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও মানবিক চেতনাকে নান্দনিকতার ওপরেই স্থান দিয়েছিলেন—তাঁর গভীর জীবনবোধ কবিতার হাত ধ'রে প্রকাশ পেয়েছে, গদ্যাশ্রয়ী হয়েও হয়ে উঠেছে জীবনের কবিতাযাপন, '...ঘুমন্ত কমরেডের ভারী হাতখানা আমার বুকের উপর,/সরিয়ে দিতে পারলাম না পাছে তার ঘুম ভেঙে যায়।/এইভাবে সুবিধাবাদের অন্ধকার ভেদ করে পোহাল আমার রাত।'

ব্যাপ্ত বিশ্বে বদ্ধ মানুষের আধারে : রাম বসু

তরুণ সান্যাল

সেই উনিশশো উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশে প্রথম রাম বসুর লেখার সঙ্গে পরিচয়। মনে হয় এই সে দিন। তখন কারণে-অকারণে জেলখানা ঘুরে আসতে হতো। উনপঞ্চাশেই কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়বার সময়, বর্ধমানে ১৪ই আগষ্ট একেবারে বিনা বিচারের ডেটিনিউ করে ধরে নিয়ে গেল। আর জেলখানাই তো ছিল যেন আরেক ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। তখন আমার কবিতায় হাত মকশো করার সময়। লিখতাম চাঁদ ফুল নিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা বিরহী বিরহী কবিতা। জেলখানা সে লিখন মুছে দিলো। তখনকার 'অগ্রণী' পত্রিকায় একটি কবিতা কোনো মুক্ত-বন্দীর হাত দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। ১৩৫৬ সালের, কী আশ্চর্য শারদ সংখ্যায় বেরোলো সেটি। কিন্তু নানা হাত ঘুরে বন্দীশালায় সংখ্যাটি যখন পৌঁছলো, অনেক রাম বসুর কবিতা পড়লাম। এই সেই রাম বসু? যাঁর কবিতা পড়েছি ছন্দ-মিলে চমৎকার 'আমরা তোমার শবাধার বই কমরেড' ছাত্র অভিযানে? গুলি খেয়ে শহীদ ছাত্রটির দেহ মর্গ থেকে মুক্ত করে আনা এক দৃপ্ত মিছিলের উপর লেখা কবিতা ছিল সেটি। এমন কবিতা, এমন গড়ন, গদ্য ভঙ্গিতে এমন গভীর উচ্চারণ এমন চিত্রকল্প, এমন কি এমন কবি-নির্দেশ, সব মিলে শিহরণ আনলো। কবিতাটি 'পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে'।

বৃষ্টিভেজা রাত, গ্রাম থেকে ধান নিয়ে মহাজন-ব্যাপারীরা স্টিমারে তুলে দেবে, ইছামতীর স্রোত বেয়ে আসছে সেই জলযান, তার সার্চ লাইট পড়েছে নদীর বাঁকে, গ্রামের গরিব-গুর্বোরা তাদের রক্তে বোনা ধান গ্রামের বাইরে নিতে দেবে না। মিনতিতে কোনো তো কাজ হয় না। সড়কি হাতে চাষীরা "কেউটে আঁধার" ফাঁক করে ধান কেড়ে আনবে। তেরশো পঞ্চাশের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে দেব না তারা। এই কবিতার নায়ক এক শিশুর পিতা, সরু চাঁদের সূরেখাময়ী তরুণীর প্রেমিক স্বামী, কিন্তু ঘরের চালায় ছাউনি ভাঙা, ঘরে চাল বাড়ন্ত। এক মোহময়ী রাতে সদাজাগ্রত কবিতাটির নায়ক, পরান মাঝির হাঁক শুনেছে। কে এই পরাণ মাঝি; সে কি 'জীবনদেবতা' এসেনসিয়্যাল ম্যান? সেই প্রথম রাম বসুর কবিতাকে ভালোবাসা। অবশ্য ঢের আগেই ১৯৪৩ সালে অরণীতে ছাপা তাঁর প্রথম কবিতা।

কলকাতায় পড়তে এলাম বি.এ. ১৯৫২ সালে। আমার কলেজের কাছেই বিবেকানন্দ রোডের ধার ঘেঁষে সেই কিশোরী বাবুর গলি। আমার এঞ্জিনিয়ার দাদা অরুণ সান্যাল কলেজে ভর্তি করে দিয়ে, বললো 'চল্, কাছেই রামের বাড়ি। পরিচয় করাবি। ছোড়দার সঙ্গে এলাম রাম বসুর বাড়ি। গায়ে ধুতির অংশ জড়িয়ে একতলার রোয়াকে এলেন রাম বসু। ছোড়দা বললেন, 'এই আমার ছোট ভাই, তোকে ওর কথা আগেই বলেছি, কবিতা-টবিতা লেখে। দেখিস। রামদা শেক হ্যান্ডের মতো করে ডান হাত শক্ত করে ধরলেন। সে হাত উনি ছাড়লেন এই সে দিন। রাম বসু বলেন বউ বাজারে ছাত্র ফেডারেশনের তিনতলায় অফিসে ছোড়দা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। হবেও বা। আমি অবশ্য ১৯৫০

সালে প্রকাশিত তাঁর 'তোমাকে' বইটি প্রায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই হাতে পেয়েছিলাম। পড়েছিলাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নিকোণ' বিমলচন্দ্র ঘোষের 'ফতোয়া' পুস্তিকা দুটির সঙ্গে। তিনটি বইয়ের বাচনভঙ্গি ভিন্ন। বিমল চন্দ্র ঘোষের 'ক্ষুধাকে তোমরা যে আইনি করেছো/ক্ষুধিতকে বলেছো বিপজ্জনক' এরকম স্পষ্ট বাচন ছিল ছিল রাম বসুর 'ভাষণ' কবিতাটিতে। 'রবীন্দ্রনাথ, আমরা তীব্র ঘৃণায় পবিত্র হয়েছি...'। তবে কবিতাটিতে শুধু বক্তৃতাই ছিল না, ছিল কাব্যও। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সেই 'মিছিলের মুখ' 'একটি কবিতার জন্য' কবিতা দুটি তখনই মুখস্থ হয়ে যায়। রাম বসু তখন পরিণতির পথে, কবি তখন তাঁর নিজ কণ্ঠস্বর আবিষ্কার করছেন। অবলীলায় কিছু গড়া নয়। কাব্যশ্রমে শুরু হয় নির্মিতি ঐ 'ভাষণ' কবিতাটিতে ছিল রাম বসুর জন্মপরিচয়। 'আমি ছিলাম গ্রামের ছেলে/আমি ছিলাম ইছামতীর ছেলে। কাশফুল আর ঝুমকো লতা/আর নদীর চর নিয়ে/খড়ের চালে যখন চাল কুমড়ো লতিয়ে উঠত/বাগানে যখন কনক রাঙা শাক জাগত/দুপুর বেলায় গাঁয়ের বাউল যখন গান গাইত/নিস্তব্ধ আকাশের নিচে যখন বাঁশ বনের মর্মর উঠত..."। রাম বসু বসিরহাটের কাছে, ইছামতী নদীর ধার ঘেঁষা গ্রাম তারাগুনিয়ায় জন্মেছিলেন ৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ সালে। বাবা ললিত কুমার। মা ইন্দুবালা। অতি শৈশবেই ঘটে তাঁর মাতৃবিয়োগ। দিদিমা, মাটি মা, নদী মা, জরাইকেলা অরণ্য মার কাছেই তাঁর প্রথম বিশ্ব পরিচয়। কাঠ ব্যবসায়ী বাবা ছিলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকও, খুড়-ঠাকুর্দা অঘোর নাথের ছিল আপনকালে কবি পরিচিতি। স্কুল কলেজের সার্টিফিকেটের নাম রাম বসুর অতি আদরের রামধন। অঘোরনাথকে নিয়ে গর্বও করতেন রামধন। বৈমাতৃক ভাই-বোনেদের মনেও হয়নি কখনো আপন মাতৃ জঠরের কেউ নয় বলে। রামের পর ভাইয়েরা ছিল লক্ষ্মণ-ভরত। ঐ ভাইয়েরাও ছিল ঐ রামায়ণের চরিত্রের মতো দাদাঅন্ত প্রাণ। রাম বসু গ্রামীণ পাঠশালায় পড়েছেন। বাদুড়িয়ার মিশনারি হাইস্কুলে পাঠ শেষে ১৯৪২-এ প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি-কম পাশ করেন। চাকরি করেছেন মাধ্যমিক স্কুল বোর্ডে। শেষ পর্যন্ত ডেপুটি সেক্রেটারি হয়েছিলেন।

রাম বসুর ছাত্র জীবনে ছিল দুমুখী টান প্রবল। এক, বাড়ির বড় ছেলে বলে দ্রুত সংসারের দায়িত্ব নেওয়া। অন্যদিকে ছিল দেশের ডাক। আর সেই তরুণ কলেজ জীবনে ছিল কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট গোষ্ঠী, আর.এস.পি, ফরোয়ার্ড ব্লক, সোশালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি—এমনি কতই না পার্টির হাতছানি। ছিল বেয়াল্লিশের আন্দোলন, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের ছাত্র-কৃষক-শ্রমিকের নৌ-সেনানীর আন্দোলন, দেখেছেন ছেচল্লিশের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। দেশভাগ। এই তীব্র জীবন প্রবাহে প্রায় অকূল দরিয়ায় ভাসমান স্পর্শপ্রবন এক তরুণের কাছে ছিল কবি ও কমিউনিস্ট হওয়া নিয়তির মতো বিশ্বে তখন চলেছে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, সোভিয়েত বীর জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম (১৯৪১-১৯৪৫)। প্রায় সার্ত্রর অস্তিত্ববাদীর ব্যক্তিভূমিকা নেওয়া এবং আত্মযন্ত্রণার তীব্র শীর্ষে যাপন ছিল যেন সেই দশকের পাদপীঠ। এই দশকের পুঞ্জীভূত অ্যাংগুইস, ত্রিশের দশকের বিপ্লব আবিষ্কার ও মার্কসবাদী ভূমিকা

নেবার কমিউনিস্ট পদচারণা তারাগুনিয়া—জরাইকেলার বালককে কবি করে তুলেছিল। সে ছিল আবার বাংলা কবিতার উর্বর উত্তরাধিকার তীব্রভাবে প্রকাশ করার যুগ। বাংলা কবিতার যে মানবমুখীন মূল ধারা, যেটি মূলধারা, যা রবীন্দ্রনাথ, হয়ে প্রসারিত ছিল, রাম বসু সেই ধারারই চল্লিশ দশকের শেষদিকে প্রকাশ পাওয়া কবি। বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, মৃগাঙ্ক রায়, চিত্ত ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর সেন প্রমুখেরা ছিলেন কেউ তাঁর অগ্রজ কেউ সমবয়সী, এক অর্থে বয়সে তফাৎ হলেও বিশ্ব ও স্বদেশ আবিষ্কারে ওঁরা হয়ে পড়েছিলেন সমকালীন। এখন যেমন দশকওয়ারি কবিদের কোনো কয়াল ওজন মাপেন, রাম বসুর উৎসকালে তেমনটি ছিল না। সবাই ছিলেন যেন এক সত্যের জন্য দায়বদ্ধ। সেই সত্য আবিষ্কারকে কোনভাবে করছেন সেটাই ছিল বিচার করার। এখন কোনো বয়স্ক কবিকেও দেখি দশক চিহ্নিত হয়ে একেবারে বিধর্মী কবির ঝাঁকে নিজের পালক গুঁজে স্বস্তি ও প্রীতিবোধ করছেন।

'তোমাকে'র কবিতাগুলি অতি রোমান্টিকও বটে। বিপ্লবী রোমান্টিক। কবিকে ছুঁয়ে আছেন শেকস্‌পীয়র থেকে লোর্কা। তবু সেই রোমান্টিক বিপ্লবীর কলমে ফুটছে নানা ছন্দ বন্ধনের নক্‌সা। কবিতার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা তখন অতি স্পষ্ট। 'হারিয়ে গিয়েছে তারা গুণে গ্রাম নির্জন ইছামতী'। রোলাঁর ক্রীস্তফের মতো তাঁর যাত্রা আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু রাম বসুর আপন কণ্ঠ স্বর ঠিকঠাক পেয়ে যাওয়া সম্ভবত 'যখন যন্ত্রণা' (১৯৫৪) থেকে। স্রোতের দাপট সামলিয়ে আগামী দিনের শিশুটিকে ডাঙায় পৌঁছে দিতে কী দুর্বহ ভার সেই জন্মপ্রার্থী শিশুটি। ১৯৪৮-৫০ এর তারুণ্যের বিদ্রোহ কারো কাছে অবশ্যই হঠকারী মনে হবে। কিন্তু ঐ সময়টা ছিল নানা ব্যক্তির নানান কর্মশালা। পরবর্তীকালে কেউ হয়েছেন শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক সংগ্রামের নেতা। কেউ হয়েছেন বিধায়ক-সাংসদ। কেউ হয়েছেন পদস্থ আমলা, কৃতী ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক। অধিকাংশই ঝরে গেছেন। কোনো না কোনো ভাবে, কোনো না কোনো ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিলেন অনেকেই। তাঁদের অনুসারকদের নিয়ে ক্ষমতাদর্পী দলগড়া যায়। কিন্তু রাম বসুদের আবেদন ছিল চিত্তের কাছে মেধার কাছে, সৎ ও নিষ্ঠ মনস্বিতার কাছে। ক্ষমতা ও তজ্জনিত সাফল্যর ধারে-কাছেও ছিলেন না রাম বসু। ঐ 'হঠকারী' বিদ্রোহ বিষয়ে চমৎকার মূল্যায়ন আছে রাম বসুর। 'কান্না' কবিতায়। 'ব্যথাবধির মুখে ভিড়ে হারিয়ে গেল রক্ত/টিনের পাতে আকাশ মোড়া, ভাবনা আততায়ী/মানুষ তবে বন্দী হল মনের কারাগারে/হৃদয় শেষে অপরাধী স্মরণ ধূলিশায়ী/কাঁদছি আমি কারণ আমি এখনো বেঁচে আছি।' কবিতাটি 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যায় ১৯৫১ সালে ছাপা হয়েছিল যেন মনে পড়ে। পরে 'যখন যন্ত্রণা'য় প্রকাশিত। আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই কবিতাটির সত্যভাষণে। আসলে নিজ সময়ে প্রতিটি কবিরই তো ব্যক্তিগত ভূমিকা নিতে হয়। প্রচলিত শব্দ দিয়েই কাব্য ভাষার সামর্থ বৃদ্ধি করতে হয়। তবে জুলিয়াস ফুচিকের মতো দর্শকহীন রঙ্গমঞ্চের দায়বদ্ধ অভিনেতাই শুধু হয়ে ওঠা নয়। কবির উচ্চারণতো সময় রেকর্ড করে ফেলে। একদা ফরাসি কমিউনিস্ট

পত্রিকা লু'মানিত্তের সম্পাদক গ্যাব্রিয়েল পেরী হিটলার-পেতাঁর বধ্যমঞ্চে শহীদ হবার কালে বলেছিলেন 'যচ্ছি ভাবিকালের জন গান গাইতে গাইতে'? এতদিন পর পড়তে গেলে মৎপ্রণীত 'মাটির বেহালায়', প্রকাশিত 'নদী সমুদ্রের কথা'য় রাম বসুর ঐ কান্নার অনুরণন পেয়ে যাই, 'প্রেমের নামে প্রেতের হাতে দিয়েছি তুলে মন' ধরনের পঙক্তি। লিখেছি "কৈশোর গেছে উনপঞ্চাশী বয়েসে/সে-যে কী জ্বালার দুঃসহতম ভ্রান্তি'। কিন্তু ঐ ভ্রান্তপথেই আত্মদহনে শিল্পচর্চার নিজস্ব কণ্ঠস্বর খুঁজে নিতে সহায়তা দিয়েছে।

রাম বসুর 'যখন যন্ত্রণা' কাব্যগ্রন্থটি যেন মার্ক্সীয় ও সার্ত্রীয় অস্তিবাদী। ঐ ভরটেক্স অব অ্যাংগুইশে বেঁচে থাকা। রাম বসু এবার ছবি দিয়ে কথা বলবেন। তাঁর কথন শিকড় পেয়ে যান চিত্রকল্পে। 'পলাশের শাড়ি পরে রাজেশ্বরী সন্ধ্যা/স্বর্ণ চাঁপা আলোর ভেতর পেবল পাহাড়/হরিয়াল ময়নার ডাক, হরিণের দৃষ্টি, ঝর্ণার শব্দ, হাতীর গন্ধ/সিংভূম, তোমার কঠোর রূপসী শরীরের বাঁকে শিল্পীর সংযম/পেখমতোলা ময়ূরের মতো রোদের বনস্থলী।' 'পৃথিবীর বাসিন্দা' কমিউনিস্ট এবং কবি পাবলো নেরুদার সঙ্গে রাম বসু একই পঙক্তিতে বসে কবিতার আন্তর্জাতিকতায় রূপ ধরছেন। 'নিটোল নিস্তব্ধ বনে অস্ত মেঘ, অকস্মাৎ আছড়ায়/রক্তাক্তবাসিনী তার পাটল গায়ের রঙ, অঙ্গরাগে/থাবা মারে। দাঁত ঘসে, মেঘ ফাটে, পাথরও কাতরায়/ঘুর খেয়ে লাফ দেয়। তপ্ত তামা চোখ, প্রতিবিম্ব লাগে/পিংপল পাহাড়ে...' (রক্তাক্ত বাঘিনী)। রাম বসুর কবিতা হয়ে পড়েছে ইন্দ্রিয়গাঢ়, 'চিত্ররূপময়', ছবি ও মানবিক অনুভব কেমন একাকার হয়ে যায়, তার উদাহরণ দিলে দেখা যাবে প্রায় প্রতিটি পঙক্তিই ঐশ্বর্যময় সেখানে। তাঁর 'গজেন মালী' কবিতাটির মিনতি এখন কি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য দায়বদ্ধ জমিগ্রাসী নয়া শোষকদের শক্ত মুঠি খুলে দেবে? "দ্বীপান্তরেই যদি চলে যায় গজেন মালী/বাঁচব কি করে? মন শুধু হবে চরের বালি/বুক চাপড়িয়ে আছড়িয়ে পড়ে ঝড়ো বাতাস/বিদ্যুৎ নখে ফালফাল করে কালো আকাশ।" এমনি কবিতা "একটি হত্যা'। 'ও যেখানে পড়ে আছে রক্তপদ্ম ফুটেছে সেখানে।/জনহীন রাজপথ সংজ্ঞাহীন ট্রামের লাইন/এপাশে নিষ্প্রাণ বাড়ি জড়সড় অন্ধকার মুখে/কয়েকটা পুলিশ ট্রাক, হেলমেট রাইফেল, জীপ,/একটি শেলের শব্দ, মাটি ফেটে ধোঁয়ার নাগিনী/পাক খেয়ে উঠে পড়ে, শূন্যে দোলে চক্রময় ফণা।/রক্তাক্ত সে শুয়ে আছে—পৃথিবীর সান্ত্বনার কোলে/ওখানে রয়েছে শুয়ে গুলিবিদ্ধ একটা মানুষ/বুকে তার রক্তপদ্ম মুখে তার চৈত্রের পলাশ/অঙ্গজুড়ে শান্ত নদী যন্ত্রণার গোলাপ বাগানে/তাকে ঘিরে গাছপাখি বসন্তের প্রকৃতি আকাশ।" এছবি এখনও গ্রামে শহরে দেখছি, কবিতা বা শিল্পপ্রেমিক বলে নয়, দেখছি ক্ষমতা দর্পীদের দাক্ষিণ্যে। এমন দৃশ্য আমি কলকাতায় কতবার চোখে দেখেছি। রাম বসুর এভাবেই ছিল আমাদের চোখ খুলে দেখানো, মনের অন্তর্লোকে সে সব চিত্র আকর প্রত্নচিত্র করে তোলা। ছবি শুধু ছবি নয়, একটি কোলাজে সব সত্য ইঙ্গিতে ধরিয়ে দেওয়া।

রাম বসুর বাকি কবিতার বইগুলি নিয়ে কিছু লিখবো না। তাঁর কণ্ঠস্বর যে বই থেকে প্রথম পেয়েছি তার ইঙ্গিতই রাখা গেল। রাম বসুর ষোলটি গ্রন্থিত কবিতার বই ছাড়াও

বহু অগ্রন্থিত কবিতা পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। কোনো বইয়ে সেগুলি প্রকাশিত হয়নি। রয়েছে বেশ কয়েকটি কাব্যনাট্য নিয়ে 'একগুচ্ছ কাব্যনাট্য'। 'কনিষ্ক'র লেখনীতে লেখা আছে ইতিহাস-বাহন কয়েকটি উপন্যাস তাঁর ইতিহাস বাহন উপন্যাসের ভিত্তিতে আছে গিওর্গি লুকাচের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী, আছে একটি প্রবন্ধের বইও। আছে বহু গ্রন্থে না বাঁধা প্রবন্ধ। 'কবিতা সমগ্রের কাছাকাছি' তাঁর সঙ্কলিত কবিতা সম্ভারের অঙ্গ।

রাম বসু বলেছেন 'মানবতা দীপ্ত সময়ের সন্তান বলে আমি আদো আদো ভাষায় মিহিকথা বসতে পারিনি। সুললিত শীতল পেলব পদচারণাকে কবিতার মোক্ষ বলে ভাবিনি, আজও ভাবি না। কবিতাকে রক্ষা করার জন্যই কবিতাকে একদিকে হতে হবে রুক্ষ পেষল পাহাড়, অন্যদিকে তাকেই হতে হবে, স্নিগ্ধ ও স্বপ্নময়। কারণ কবিতার অন্বেষণ হল সমগ্রতা।' তিনি চাননি কবিতায় শীতলতা ও লঘু লিরিকে সীমাবদ্ধতা। ভাবতেন 'কবিতাকে তথ্য ও তত্ত্বের বাইরে রেখে (যারা) আধো আধো সান্ধ্যভাষাকে সিদ্ধি ভাবে, তারা কবিতার বন্ধু নয়।'

কবি রাম বসুর উপল বন্ধুর পথে পরিক্রমা নিয়ে নিশ্চয় বহু রচনা প্রকাশিত হবে। আমার জানা বিষয়ের মধ্যে রয়েছে রাম বসুর দিনযাপন। আপন পরিচিত পরিজন বিষয়ে নিত্য উৎকণ্ঠা তাঁর মাধ্যমিক শিক্ষাদপ্তরে বিনীত মধ্যবর্গীয় কর্মী থেকে পদস্থ হওয়া ধাপে ধাপে, এবং এক বাক্স সন্দেশ, ফুলের তোড়া, ছাতা-লাঠি উত্তরীয় নিয়ে অবসর গ্রহণ এসবও দেখেছি। রাম বসু কবিতার জন্য নন, 'একগুচ্ছ কাব্যনাট্য'র জন্য রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৮৯ সালে। যুগ্মভাবে শঙ্খ ঘোষের (ধুম লেগেছে হৃদকমলে) সঙ্গে। রাম বসুর এক ধরনের ক্ষোভ ছিল কবিতার জন্য পুরস্কৃত না হওয়ায়। আমাদেরও ছিল। ঐ সময়ে পুরস্কারটি ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। রাম বসু খুব খুশি হয়েছিলেন বিপ্লবী দম্পতি রমেন্দ্রনাথ মিত্র ও ইলা মিত্রর একমাত্র পুত্র রণেন (মোহন)-এর সঙ্গে তাঁর একমাত্র মেয়ে সুকন্যার বিবাহে। ঐ বিবাহে দু-পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে দেবার কাজে আমারও কিঞ্চিৎ হাত ছিল। রাম বসু তাঁর দৌহিত্রের বিদেশে স্কলারশিপ নিয়ে পঠনকৃতিত্বে খুব খুশি ছিলেন। একসময় পশ্চিমী ধ্রুপদী সংগীত শুনতে ব্যাকুল হয়েছিলেন। তখনও লং প্লেয়িং রেকর্ডের যুগ। আমার সামান্য সংগ্রহ উনি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। ভারতীয়ত্ব ও কমিউনিস্ট আন্দোলন নিয়ে তাঁর প্রশ্ন জমা হয়েছিল। লেনিনবাদী পার্টির গঠন নিয়েও। ব্যক্তির বিযুক্তি বা অ্যালিয়েনেশান থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষাই ছিল তাঁর জীবনের মুখ্য অন্বেষণ। ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় মৃত্যুচিন্তা, আনুগত্য, ভক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, সার্ত্রর অ্যালিয়েনেশন থেকে মুক্তির তত্ত্বও চিরে চিরে দেখেছেন, ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের মার্কসচিন্তাও পাঠ করেছেন, কবিতাকে দর্শনে নিসিক্ত দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু সারাজীবন পরিক্রমার ফসল তবু 'সে যেখানে শুয়ে আছে রক্তপদ্ম ফুটেছে সেখানে'।

তত্ত্ববাদীরা তর্ক করুন, কিন্তু কবির ধ্যান তবু তাঁর কাজেই প্রতিফলিত হয়। সেই তাঁর প্রাক্সিস। মানুষ শোষণ থেকে মুক্ত হোক, খেতে পরতে পাক, মাথার উপরে ছাদ,

শিক্ষাস্বাস্থ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা হোক—আমরা ভাবতে থাকব ঐ অর্জনের সঙ্গে মধু বাতাস, মধু নদীপ্রবাহ, মধু হয়ে ওঠা প্রভাত সন্ধ্যায়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি ইত্যাদি। ধরা যাক এক প্রবল ঔপনিবেশিক অন্ধকারে বসবাস আমাদের। জল বাতাস সামান্য ক্ষুদ কুড়োও যখন জরুরি, তখন মহাস্রষ্টা আছেন কি নেই নিয়ে তর্ক করব? নাকি আগে ভেঙে ফেলা জরুরি পায়ের হাতের মনের শিকল।

রাম বসু বস্তুত অতি সজ্জন প্রকাশ্যে বীতবিতর্ক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁকে মিছিলে-ময়দানে দেখা যেতো না। তিনি বেছে নিয়েছিলেন ঋষি জনের মতো ধ্যানের গুহা। অজস্র জ্ঞানের প্রবাহ তাঁর ঐ গুহায় মুদ্রিত বই ও বইয়ের বহু ফোটো কপিতে আবর্তিত হতো। আমার কেন যেন মনে হয়, এক রাম বসু দার্শনিক প্রশ্ন তুলেছেন অ্যালিয়েনেশন নিরাকরণের জন্য—প্রকৃতি, সমাজ, অহং থেকে। আর তাঁর নিত্য উপায় ছিল সৃষ্টিশীল জীবন—যা কবিতার কাব্যনাট্যে বারবার রূপ নিয়েছে। তবে, গজেন মালী বা পরান মাঝিরা কি আর স্পষ্ট তাঁর চোখে ধরা পড়তো না? পার্টি ভাঙাভাঙি কি একদা কাকদ্বীপে খবর দেওয়া নেওয়া কুবিয়রকে পীড়িত করতো না? সোভিয়েত-চীনে দ্বন্দ্ব, কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন, জাতীয় গণতন্ত্র বনাম জনগণতন্ত্রের কূটকচালি, কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্টদের দু-বর্গেরই মিতালি—এসব রাম বসুকে খুব পীড়ন করতো, জানতাম। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিনাশ তাঁকে আর্ত করেছিল। মনে পড়ে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য তালিকায় আমরা নাম খারিজ হওয়ার সংবাদে, বাড়ি বয়ে এসে বলেছিলেম, 'বাঁচলি। মিছেই ফ্যাক খাটছিলি এম.পি., এম.এল.এ. হবার জন্য দায়বদ্ধ দেবদেবীদের। ওরা মিছেই তত্ত্ব দাঁড় করায় নিজেদের ইচ্ছার চারপাশে। ছেড়েদে ভাই ওসব। তুই কবি। কবিতা লেখাই তোর কাজ।'

রাম বসুর সঙ্গে সম্পাদনা করেছি সীমান্ত কবিতা পত্রিকা। মৃগাঙ্ক রায় ও প্রসূন বসুও সেই সম্পাদনায় অন্যতম ছিলেন। তিনজনই আজ বিয়োগপঞ্জীর অংশ। সদ্যপ্রয়াত মৃগাঙ্ক রায় ও প্রসূন বসুকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করা হলো না। হলে ভালো হতো।

স্ত্রী অলকাদেবীর মৃত্যুর পর রাম বসু ভেঙে পড়েছিলেন। অসুস্থ হয়ে ইস্ট এণ্ড নার্সিং হোমে ছিলেন বেশ কিছুদিন। মেয়ের কাছে ছিলেন তারপর। তিনি তখন যেন এক শিশু। কবিতা সীমান্তর দীপেন রায়, গোবিন্দ ভট্টাচার্য, নীরেন্দু হাজরা নিত্যসঙ্গী ছিলেন। তাঁর শেষ দিক্‌কার কবিতাগুলি অবশ্য এবং মুশায়েরা 'যাই, যাচ্ছি'তে গ্রন্থবদ্ধ করেছে।

রাম বসু খুব গৌরব দিয়েছিলেন আমাকে। আমার সত্তর বছর বয়স পূর্তিতে আমার বিষয়ে সস্নেহে দু-কথা লিখেছিলেন ওসব কথা সত্যিই আমার পাওনা নয় : 'রাজনীতির কথা থাক। আমি দেখলাম, প্রথাগত দলীয় রাজনীতির বাইরে আরো উদার বিস্তৃতি আছে সেখানে ক্ষমতার জন্য কামড়া কামড়ি নেই। সেখানে সে যেতে পারে অনায়াসে। রাজনীতি তার কাছে ডগমা ছিল না, আজও নেই। আজ যখন মার্কসবাদ ভিন্ন চেহারা পাচ্ছে। তখনো সে বিচলিত হলেও সত্তার সত্যকে জোর করে আঁকড়ে ধরতে পারে, কারণ সত্তা যে পরম বস্তু। তার উপলব্ধি ছড়িয়ে আছে তার শিরায় শিরায়। স্থূল উপযোগিতাবাদের

কাছে, শর্তহীন প্রাগমাটিজম-এর কাছে তার দায় নেই। এত উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত, ক্লেদ ও বিষ দু-হাতে নিয়েও সে বিকিয়ে দেয়নি তার কবিতার মানব সত্য। সব নিয়ে সে 'হয়ে' ওঠে। ...তরুণ বলেছিল, যদি 'শেষ' কি হয় (মানে, গ্রাম শহরে সভা-সমিতি করতে গিয়ে হৃদরোগ নিয়ে) সেটা বাইরেই হোক। ...এটা কথার কথা নয়। সে হলো বিস্তারের প্রতি তার একান্ত আকর্ষণ। এ হলো তার মানবরহস্যের প্রতি অঙ্গীকার, নিখিল বিশ্বের সঙ্গে একীকরণের অভীপ্সা। অন্যকথায় অ্যালিয়েনেশন থেকে মুক্তি। ...তার দায় ও দায়িত্ব হলো নিজের সঙ্গে বিশ্বের সত্তার একীকরণ, নিবিড় ও নিষ্ঠুর মিলন।"

আমার তো মনে হয় রাম বসু নিজেকে নিয়েই লিখছিলেন কথাগুলি অবশ্য আমাকে উপলক্ষ করেই ওসব লেখা। কবিরা তো গুলি খাওয়া বাঘ, পেবল পাহাড় সব কিছুতেই আত্ম আবিষ্কার করেন। তাঁর মনে হয়েছিল 'বাঁচার বাস্তব থেকে নিংড়ে আনা সত্যের সারাৎসার তার কাছে পরম। তাই সাংগঠনিক, রাজনৈতিক, সমাজ কল্যাণকামী এবং কবি ...আদপে একটি সার্বিক ব্যক্তি, যার অম্বিষ্ট স্বভাবগত মানুষের পরিমাপকে পেরিয়ে গিয়ে পরম নৈঃশব্দের পথ প্রশস্ত করা যেখানে নিয়ত ধ্বনিত হয় ঋতুকালীন ছন্দ। আলো আঁধারের দ্বৈততা থেকেই যায়। এতো মানুষের সীমাবদ্ধতা। আবার এই আঁধারের সঙ্গে থাকে তিমিরজয়ী আলোর তীর্থে উত্তরণের সম্ভাবনা। অবশ্যই, এটা আমার ভাষ্য। তাই আমি আজকের যুগের মৌল সঙ্কটকে নির্ধারণ করতে চেয়েছি ব্যাপ্ত বিশ্ব বদ্ধ মানুষের আধারে। ...তরুণের কথায় শেষ করি আমার কথা—

"আমি.তাকে নিয়ে যাই যে ঘুরছে প্রতি ঋতুর সঙ্গে আবর্তনে।
শিরায় অন্ধকার ধমনীতে জ্যোৎস্না হয়ে
মার্বেল মূর্তির মতো নীল
কৃষ্ণা দ্বাদশীর শেষরাতে
নক্ষত্রের জেগে থাকা যেমন
সেতো পরিণত ফল। ফুল নয় বীজপত্র নয়
সে তখন বীজ হয়ে আবার মাটিতে ফিরে যাবে
তোমরা আবার কোনও ধান চারায় শিশু
শাল অড়হর বা গম শিশুতে
ফিরে আসবে। মৌসুমী হাওয়ায় খেলবে
দুজন দুভাই।"

অন্ধকার, আদিম নিষাদ এইভাবে হয় তামসী আলোক। উষার সহচারিণী এইভাবেই হয় নক্তা ও সন্ধ্যা। দিন এই ভাবেই বুকের কাছে তুলে নেয় সন্ধ্যার হাত।" (সপ্তাহ : ৬-১৩ ডিসেম্বর, ২০০২)

এসব উক্তি তরুণ সান্যালের বিষয় ভাবি না। ভাবতে পারিও না। এ রাম বসুর নিজের বিষয়ে কথন। আমার লেখা একটি কাব্যনাট্যাংশ তিনি দয়া পরবশ হয়ে ব্যবহার করেছিলেন মাত্র।

আর একটি ছোট্ট কথা।

রামায়ণের দণ্ডকারণ্য নিয়ে লেখা একটি ছোট কাব্যনাট্য আছে আমার। 'জয় জয়-পরাজয়' নাম। উৎসর্গ করা ছিল রাম বসুকে অলকা বৌদির মৃত্যুর পর-পর তাঁর অসুস্থতার সময়েই। নাটকটিতে চরিত্রগুলি—রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ, শূর্পনখা। রাবণকে একটু-আধটু ধ্রুপদী চারিত্র্যচ্যুত করে দুমুখ খোলা মীথ অনুসারী একটু স্বাধীনতা নিয়ে দেখানো আছে। রাম বসু ঐ নাটকটি কবি নীরেন্দুর হাজরার পঠনে পুরোটা শোনেন এবং বলেছিলেন, তাঁর নতুন করে আবার কাব্যনাট্য লেখার ইচ্ছা হচ্ছে। অর্থাৎ শেষ দিনগুলিতেও আমাদের কাছে কবি-শিক্ষক হয়েই থাকতে চেয়েছিলেন তিনি। আমার কাছে তো বটেই। মীথ বিষয়েও তাঁর কিছু কিছু কথা বলার ছিল। মনে পড়ছে, কাব্যনাট্য ও কবিতায় মীথের ব্যবহার নিয়ে তাঁর বিশেষ মতামত। বলতেন, ভারতীয়রা মীথের মধ্যেই জীবন কাটায়। নামেও মীথ, যেমন রাম, তেমনি নানা প্রবাদ বা আপ্তবাক্য কথনেও এসে যায় মীথ। যেদিন মার্কসবাদ কোনো সৃষ্টিশীল মীথে প্রবেশ করবে। সহজেই মানুষ এই শাস্ত্রর মর্মলোক বুঝে যাবে। রজার গারোদির উক্তিমতো মীথচর্চারও প্রয়োজন আছে। লুকাচ লক্ষ করেছিলেন। হিটলার ও নাৎসীরা বহু লোকজীব্য কাহিনীকে দুমড়িয়ে-মুচড়িয়ে জার্মান জনগণকে পথভ্রষ্ট করার জন্যও ভূমিকা নিয়েছে। কবিকে এজন্য যথেষ্ট সতর্কও হতে হবে। ভারতে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রগতি বিচারে—মীথ দু'ধার তরোয়ালের মতো। এমনি ইতিহাস আশ্রয়ও। আঞ্চলিকতা ভারতীয়তা এক বৃত্তেরই ধরা রয়েছে। তাঁকে অগ্নিস্থলীতে সমর্পণের আগে, তাঁর মুরারী পুকুরের আপন গৃহাঙ্গনে ছোট্ট ভাষণে বলেছিলাম, রাম বসু বাংলা কবিতার প্রগতিশীল মূল ধারার সেই মহাস্থপতি, যে ধারা থেকে বর্তমান কবিতা বিচ্যুত হচ্ছে। বলেছিলাম, রাম বসুর সঙ্গেই আমাদের শেষ অভিভাবকের নিষ্ক্রমণ ঘটলো মঞ্চ থেকে। রাম বসু কবি, রাম বসু জীবন-মরণ সম্পর্ক জিজ্ঞাসু, বিশ্বজগৎ থেকে জীবনের বিযুক্তি নিরাকরণের সাধক, সমাজ বিপ্লবী, শিল্প-শিক্ষক ও জীবনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সত্তা সন্ধানী এক ঋষিপ্রতিম ব্যক্তিত্ব যিনি দ্রষ্টা হয়ে উঠেছিলেন। যেমন বলা হয়েছে কঠোপনিষদের 'ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধারের উপর ঘটে পথ চলা ব্রহ্মজ্ঞান পাবার জন্য মানুষের এমন কথাই কবিরা (কবয়ো)বলেছেন।' এমনই কবি ছিলেন রাম বসু। তাঁর বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিরা চর্চা করবেন। তবে ভয় হয়, এ রাজ্যে তো সত্যিই যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান পাবো বর্তমানে? অপেক্ষা করলেও চলবে। অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ড. তরুণ মুখোপাধ্যায় রাম বসুর বিষয়ে চমৎকার একটি মনোগ্রাফ প্রকাশ করেছেন। 'সময়ের দংশিত বিবেক রাম বসু'। রাম বসু বইটি দেখেও গেছেন। রাম বসু তো সুস্থিত ও চিরায়ত বহু অমীমাংসিত প্রশ্ন উত্তর পুরুষদের কাছে রেখে গেছেন। কস্মৈ দেবায় যজ্ঞ হবি তাঁর? 'ব্যাপ্ত বিশ্বে বদ্ধ মানুষ : রাম বসু'-বিধর্বে আপাতত এখানেই কুজ্ঞানামায় 'তামাম শোধ'।

রাম বসুর কবিতা : সমুদ্র, যে কাল

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

রাম বসুর প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত ১৯৫০-এ—'তোমাকে'। অর্থাৎ কবির পঁচিশ বছর বয়সে। বইটির প্রায় সব কবিতাই ১৯৪৯-৫০-এ লেখা। কবিদের দশকওয়ারি অভিধানে চিহ্নিত করা শুরু হয় 'ত্রিশের দশকের কবিদের' কথা বলে। এই অভিধান ছোট কবিদের ক্ষেত্রে অনেকটা অর্থবহ হলেও বড় কবিদের ক্ষেত্রে ভ্রান্তিমূলক। রাম বসুকে চল্লিশের দশকের কবি বলা সে কারণে অর্থহীন, কারণ আমাদের বিবেচনায় তিনি বড় কবি। ১৯৪০-এ তাঁর বয়স পনেরো—১৯৪৯-৫০-এ চল্লিশের সময়ের বৃত্তেই তাঁর কবিতার প্রাথমিক রসায়ন গড়ে ওঠে। কিন্তু ওই প্রাথমিক যাত্রার প্রস্থানভূমি দিয়ে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত প্রসারিত এই কবি ব্যক্তিত্বের চলমান অভিযানকে চিহ্নিত করলে, ভুল হয়। বড় কবি একটি বীক্ষায় একটি তত্ত্ববিশ্বে নিজেকে বাঁধেন—চলিষ্ণু হয়ে ওঠায় ওই বিশ্ব ভাঙে, গড়ে, আবার এই প্রক্রিয়ায় বহে যায়। ওই চল্লিশের দশকে রাম বসু যে বীক্ষায় নিজের নির্মাণকে নির্দিষ্টতা দিয়েছিলেন, সময়ের আবর্তনে ও তার সঙ্গে কবির দ্বন্দ্ব—সংক্ষেপে সেই বীক্ষা অন্যমাত্রা পায়, যদিও সেই মাত্রা তাঁর প্রাথমিক বীক্ষাকে লুপ্ত করে না। এই দু-হাজার সাত-এ যখন তাঁর কবিতা পড়ি, তখন পাঠক হিসাবে পাই এক বড় কবির, মেজর পোয়েটের বহুমাত্রিক বিস্তার, পাঠকের পাঠে তাঁর কবিতা তার প্রাথমিক জেসচার-এর হাত ছাড়িয়ে নানাভাবে পুনরুৎপাদিত হয়।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে রাম বসু পনেরো থেকে পঁচিশে পৌঁছল। বয়ঃসন্ধির সংকট ও তার উত্তরণে এই কবি তাঁর নিজের লড়াই যে সঙ্গে পান সময়কে। ওই দশক বড় খারাপ সময়ের আবার বড় ভালো সময়েরও। যে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থান রাম বসু জন্মসূত্রে পেয়েছিলেন, সেই শ্রেণী যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশ বিভাগে এই দশকে বিপর্যস্ত—পরপর যাকে 'ট্রম্যাটিক' বলে সেই অভিজ্ঞতায় এই শ্রেণীর বাস্তবভূমি ও মনোভূমি দীর্ণ। আবার এই দশকেই ওই মধ্যবিত্ত তার শ্রেণীর সীমা ও অতিক্রম করতে চাইছে ত্রিশের উত্তরাধিকার, এই সময়েই স্বপ্নের জয় লাভ নাৎসি ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে, এ সময়ই মনে হচ্ছে থেমে গেলে ট্যাঙ্কের শব্দ নিয়ে আসে ট্রাক্টরের দিন জোসেফ স্তালিন। আর এই সময়েই বীরত্বপূর্ণ তেভাগা আন্দোলন, মধ্যবিত্তকে যা আরও স্বপ্নের মধ্যে, লড়াইয়ের মধ্যে নিয়ে যায়। এই বিপ্রতীপ বাস্তব রাম বসুর বীক্ষাকে সংগঠিত করে :

> আমার ইতিহাস করুণ
> সেজন্য আমার কোনো ক্ষোভ নেই।
> আমার কোনো দুঃখ নেই
> আমি গর্বিত
> আমি যে বাংলা দেশের ইতিহাস।

বৃহত্তর এক ইতিহাস বোধে বাস্তব পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ অসহনীয়তার অন্তরালে আর এক বাস্তবকে রাম বসু দেখেছিলেন। ঘৃণার অসহ্য কুণ্ডন, পিশাচের মতো নৃশংস অব্যয় রাত্রি, অন্তিম শিশু চিৎকার আকাশর তারা খসে পড়া চতুর্দিকে আচ্ছন্ন করছে, অজস্র মানুষকে কয়েদের আড়ালে পশুরা ছিঁড়ে খাচ্ছে—রাম বসু তাঁর বয়ঃসন্ধি থেকে যৌবনের যাত্রাপথে এসবই দেখেছেন। ওই বাস্তব তাঁর বয়ঃসন্ধির জৈবনিক সংকটকে উত্তরণের পথে নিয়ে যায়, ব্যক্তিগত পাখা মেলে সমূহে, মরণজয়ী এক আকাশে।

আমি দেখেছি কারাগারের কবাটে প্রশস্ত ললাট মেলে
দীপ্তি কল্যাণ
সূর্যকে ডাকছে
আমি দেখেছি বিদ্যুৎরেখার মতো সুভাষ
একটি কবিতার জন্য মিছিলের মুখ দেখছে
আমি দেখেছি অজস্র মানুষকে কয়েদের আড়ালে
পশুরা ছিঁড়ে খাচ্ছে।

এই দুই 'দেখা'র জ্যাবদ্ধ ধনুতে নির্মাণ করেন রাম বসু তাঁর তত্ত্ববিশ্ব। আর এই তত্ত্ব-বিশ্বনির্মাণে তিনি কবিতার পরম্পরাকে নিজের মতো আত্মস্থ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বিশ্বে একটি ধ্রুবতারা : তাঁর বহুমাত্রিক; তুমি, তোমাকেতে রবীন্দ্রনাথ স্থির, তাঁর প্রণাম চান, আশীর্বাদ চান। আর যাঁদের ওই দশক-ওয়ারি অভিধানে ত্রিশের কবি বলা হয়, তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু দে-র কবিতার উত্তরণকে সামনে রাখেন; এই সূত্রে এলিয়টও আসেন। আসেন আরাগঁ, নেরুদা। আরাগঁ বলছেন, কবিতাকে সংবাদ-পত্রের মতোই পড়া উচিত আর "প্রণম্য ও শ্রদ্ধেয় কবি বিষ্ণু দে বলেছিলেন 'সংবাদ মূলত কাব্য'।" রাম বসু মনে করেন, শেষ অবধি মনে করেছেন, তাঁর শেষ জীবনের অনন্ত-অসীম বিশ্বের বেদনার মধ্যেও এটাই বলেছেন : "এই জন্যেই কবিতা হল, শাশ্বতের ভারে অবনত মানুষের পদধ্বনি। তার অভিযান প্রত্যক্ষ থেকে প্রজ্ঞার দিকে, সমগ্রের দিকে, অবিচ্ছিন্ন অন্তরাত্মার দিকে ঘাস থেকে নক্ষত্রের সহমর্মীতায়।" ২০০৪-এ রাম বসু এ কথা বলেন। এই ঘাস ও নক্ষত্রের দ্বান্দ্বিক ট্রানসেনডেনস রাম বসুর কবিতাকে করে তুলেছে বহুস্বরিক, বহুমাত্রিক।

রাম বসুর কবিতাসমগ্রের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমাদের বাস্তবে ও ইতিহাসে আধুনিক বা আধুনিকতার প্রশ্নেরই সামনে আসি। কবি লিখেছিলেন, "আমি তো আদৌ প্রশংসিত কবি নই। বরং চিৎকারের জন্যে ধিকৃত। আমি অবশ্য গর্বিত। অমাবস্যার রাতে বন্যায় ভাসা মহিষের ডাক শুনেছেন? জ্বলন্ত গোয়ালের গরুর চিৎকার? তারা তখন কোকিল কণ্ঠে ডাকে না। তাদের ডাক আদিম, জান্তব। এই হল সেন্স অব ইমিডিয়েসি; সোর্স অব আর্জেনসি।" বলাই বাহুল্য, রাম বসুর কবিতায় একরৈখিক চিৎকার থাকে না। কিন্তু মূল বিষয় ওই ইমিডিয়েসি ও আর্জেনসির চেতনা। শাশ্বতের ভারে অবনত মানুষের পদধ্বনি শোনার যে মন ও মনন, তাতে প্রত্যক্ষ বাস্তবের ইতিহাস পুরোভূমিতে। তিরিশের দশকে আমাদের আধুনিকে একটা দ্বিখণ্ডন দেখা দেয়—কবিরা তাঁদের মালার্মে-ইয়েটস্-

এলিয়ট প্রণোদনায় যে আধুনিকের কথা বলেন, তাতে ওই প্রত্যক্ষ ভূমি থাকলেও তা সামনে অনেক সময়ই আসে না—পশ্চিমের ক্লান্তি, বিষাদ, অবসাদ, অপস্মার, পতিতভূমি, বন্ধ্যাসময়, এসবই বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু এর পাশাপাশি উপন্যাসে আর এক আধুনিক আসে—তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীক্ষাগত রসায়নে ওই আধুনিকে আমাদের মানুষ-প্রকৃতি পুরোভূমিতে চলে আসে। বিশ-ত্রিশ দশকের রাজনীতি, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন এক ভবিষ্যৎমুখী আবর্ত এনেছিল, যাতে পশ্চিমাগত ধনতান্ত্রিক বাস্তব তার অবসাদ-ক্লান্তি-বিষাদ যেন খণ্ডিত হয়। এটাও আধুনিক। রাম বসু তাঁর চল্লিশের হয়ে ওঠায় ওই দ্বিতীয় আধুনিককে নিজের সত্তায় বিশ্লেষণ করেন, তাই ত্রিশের কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে-ই তাঁর কাছে প্রণম্য, কারণ এই মহৎ কবি তাঁর প্রাথমিক আধুনিক-ভূমি ছাড়িয়ে এক মার্কসীয় সৌরবিবর্তনে, খণ্ড চৈতন্যের মহাকবি এলিয়টকে অতিক্রম করে আর এক আধুনিকের দিকে অগ্রসর হন অন্বিষ্ট-সঙ্গী সন্দ্বীপের চড়ে, স্মৃতি-সত্তায়-ভবিষ্যতে। আর ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ অবধি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর শেষ জীবনের নিজ আধুনিকের অঙ্কে ও প্রবাহে : তাঁর মধ্যেই দুই আধুনিক যেন মিলেছিল। রাম বসু তাই রবীন্দ্রনাথে ফিরে তাকান চল্লিশের ভয়ঙ্কর সময়ের মধ্যেও। যে মহিষের ডাক, জ্বলন্ত গোয়ালের গরুর চিৎকারের কথা রাম বসু বলেন তা আমাদের এ বাস্তবে শিল্পে-সাহিত্যে এমন আধুনিক যার হদিশ পশ্চিমের অনুসরণে পাওয়া যায় না। বিশ শতকের পশ্চিমের 'আধুনিক' সম্পর্কে রাম বসু অনবহিত ছিলেন না। এ আধুনিকের পশ্চিমী বাস্তবে যাথার্থ্যও তিনি অস্বীকার করেননি, কিন্তু বুঝেছিলেন আমাদের 'আধুনিক' অন্য বাস্তবের। আমাদের স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ, আমাদের দারিদ্র্য, আমাদের ঔপনিবেশিক ক্লিন্নতা, আবার এর প্রতিপক্ষে উঠে দাঁড়ানোর প্রত্যয়, নিম্নবর্গের মানুষদের ইতিহাসের মঞ্চে দাঁড়ানো, সব মিলিয়ে কবিতায়, শিল্পে অন্বেষণ করতে হবে আমাদের আধুনিককে। এই অন্বেষণে আমাদের বিরাট দিশারী রবীন্দ্রনাথ, আবার এই অন্বেষার যন্ত্রণাতেই বিষ্ণু দে-র মতো কবি মানুষের পায়ে পায়ে হাঁটতে চান। রাম বসু এই আধুনিককেই কবিতার নির্মাণে আনেন। আবার সময়ের আবর্তনে তিনি তাঁর আধুনিকের বীক্ষাকে সচল রাখেন—আইডেনটিটি ইন গ্রুপ-এর কথা বলেন। মানুষের ইতিহাসকে ভাবেন ক্রমাগতভাবে চৈতন্যের বিকাশের, মানুষের মানবিক পরিব্যাপ্তির ইতিহাস। চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের 'আধুনিকতা' প্রসারিত হয় পরবর্তী তিরিশ-চল্লিশ বছরে বিশ্বকে আত্মীকরণের কথা বলেন কবি। "মহাবিশ্বকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিচেতনাকে জানা অবাস্তব।" 'অবাস্তব' শব্দটি লক্ষণীয়। চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের যে বাস্তব কবির চৈতন্যের পুরোভাগে, সেই বাস্তব এখন মহাবৈশ্বিকতায় স্পষ্ট। বৈদিক কবি থেকে হোমার—গ্রিক ট্র্যাজেডিতে এই মহাবিশ্বকে পান। রবীন্দ্রনাথ যেমন তেমনি সার্ত্র হাইডেগারও এতে "আত্মস্থ"। আমাদের এখানে মহাবিশ্বে মহাকাশে ব্যক্তিকে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। আণবিক যুগের সূচনাতেই বিষ্ণু দে খুঁজেছেন অণুর সংহতি। কিন্তু এই মহাবিশ্ব চেতনার মধ্যেই রাম বসু জানেন, 'ছিন্ন মানুষ সমাজ বিবর্তনের ধাপ বেয়ে অনন্বিত বা এ্যালিয়েনেটেড।" এর কথা অ্যাবসার্ড-এ বলা হয়, সঠিক কথাটা বেঠিকভাবে। কবি'

জানেন, "বাক্যের অতীত কিছু আছে, কিন্তু তা শূন্যতা নয়। তিনি গুরুত্ব দেন ভারতীয় নিগেশনকে, যা নঙর্থকে ক্ষান্ত হয় না। ব্রেকডাউন অব কমিউনিকেশন হয়, অভিব্যক্তির চূড়ান্ত স্তরে। সে হল পুষ্পিত স্তব্ধতা। অ্যাবসার্ডরা যে ব্রেকডাউন অব কমিউনিকেশন বলেন তা সিভিল সোসাইটির বিকৃত অহং-এর অন্তরীণ আর্তনাদ। এটা প্রাক্তন বিশ্বের আমি, ধনতন্ত্রের আমি—যার মূলোচ্ছেদ হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।" এর জায়গায় যে কসমিক আমি, তা প্রমেথিয়ান ম্যান, সোস্যাল বিয়িং, স্পিসিস বিয়িং। সদর্থক অর্থে। চল্লিশের যে তত্ত্ববিশ্ব রাম বসু নির্মাণ করেন, তা প্রসারিত হয় পরবর্তী সময়ের আবর্তে, কিন্তু সে অসীম সৃষ্টির চেতনায় তিনি স্থির হন, তাতেও ওই চল্লিশের সামাজিক সত্তার বীক্ষাটি অটুট থাকে : রাম বসুর কবি হিসাবে বিকামিং-এ এই বিয়িং-এর ধারণা সদাপ্রবহমান।

তবে এই তত্ত্ববিশ্ব বা বীক্ষাই তো কবিতা নয়—বড় কবি ওই বীক্ষার আসঞ্জনে কবিতাকে নির্মাণ করেন। নির্মাণ ও সৃষ্টি একসূত্রে গাঁথা। কবিতার শরীর ওই বীক্ষার মেরুদণ্ডে তৈরি করে কবিতার বাস্তবকে। রাম বসু যে বড় কবি তার প্রমাণ ওই কবিতার বাস্তব নির্মাণে তাঁর একনিষ্ঠতা। তাঁর যে কবিতাটি সর্বাধিক পরিচিত এবং কলেজ-স্তরে পাঠ্যসূচির অন্তর্গত হওয়ায় বিপন্নও বটে, সেই ৪০-এর দশকের 'পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে' কবিতাটিই ধরা যাক। কবিতাগ্রন্থের আগের কবিতায় কবি প্রশ্ন করেছেন, "কেন? কেন এমন সকালে হত্যার রক্ত মানুষের সভ্যতাকে বিদ্রূপ করে কেন এমন সকালে বারুদের গন্ধে শিশু মেয়েটা হাঁপিয়ে ওঠে।" এক অভিশপ্ত রাত্রির কথা বলেন। বলেন, দারুণ বিক্ষোভের ঝড় তোলার কথা। এরপরের কবিতাতে পরাণ মাঝি ডাক দেয়। কবিতাটি ৩৭-তম লাইনে এসে পাঠক জানে "বাঁকের মুখে পরাণ=মাঝি হাঁক দিয়েছে।" কবিতাটির কথক অভাবের কথা বলে :

> তোমার ভুরুর মতো সরু চাঁদ
> তোমার চুলের মতো কালো আকাশে

এই চিত্রকল্পের পরই : বর্ষার ঘোলাজল মাঠ ছাপিয়ে নদীতে মিশে গেছে, বাঁশের সাঁকো ভেঙে গেছে। কী রকম : অভাবের টানে যেমন আমাদের আনন্দ ভেসে যায়। খোকার মুখে দুধ নেই এক ফোঁটা তবু কেন এই গঞ্জ হাসিতে উছলে ওঠে, স্টিমার শস্যেতে ভরে যায় : "আমাদের অভাবের নদীর ওপর কেন ওরা সব পাঁজর গুড়িয়ে যায়?" কেন—এই প্রশ্ন বারবার ধ্বনিত হয়। ঘোলাজলে কিন্তু স্টিমারের আলো পড়ে রামধনুর মতো। রামধনুর মতো এই রাত্রির বেলা। "ধান খেত ভাসিয়ে জল গড়ায় নদীতে স্টীমারের তলায় আমাদের অভাবের মতো, আমাদের কপালের মতো।" চিত্রকল্পের প্রবাহে ও সংহতিতে কবিতাটি তৈরি করে আপন বাস্তব : 'আমাদের' শব্দে সামাজিক ও সামূহিক ব্যঞ্জনা। ওই অভাব ও রামধনুর কাটাকাটিতে বাইরে এসো, পরাণ=মাঝি হাঁক দিয়েছে। ওই হাঁক আসলে উত্তাল সময়ের, নতুন চৈতন্যের প্রাণের সে মাঝি যে হাল ধরে আছে অভাবের-নদীকে পেরিয়ে-নিয়ে যাবে, ভাঙা সাঁকোকে জোড়া লাগাবে। পরাণের অন্তস্তলেই

ওই হাঁক বেজে যাচ্ছে—শাঁখের ফুঁয়ে, লণ্ঠনের বাড়তি আলোয়। আসলে হাঁক দিয়েছে "আমরা", আমাদের মন, আমাদের চৈতন্য।

আমাদের হাঁকে রূপনারাণের স্রোত ফিরে যাক
আমাদের সড়কিতে কেউটে আঁধার ফর্সা হয়ে যাক
আমাদের হৃৎপিণ্ডের তাল দামামার মতো
ঝড়ের চেয়েও তীব্র আমাদের গতি।

এখন "বাইরে এসো"—না মরার, না ভেসে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে। এসো হাত ধরে—পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে। এ এক লৌকিক ও মিথিক, বাস্তব ও স্বপ্নের হাঁক। পরাণ মাঝি কোনও ব্যক্তি নয়, পরাণ মাঝি সামূহিক চৈতন্য। তার হাঁক যে শুনেছে তাকে তো আমি-থেকে, সংকীর্ণ-গহ্বর থেকে বাইরে আসতেই হবে। আজ এই দু-হাজার সাতেও তো ওই হাঁকের জন্য অপেক্ষা করছি। এভাবেই রাম বসুর কবিতা এক প্রতীকীমাত্রায় বিশেষ থেকে নির্বিশেষে চলে যায়।

যখন যন্ত্রণার (১৯৪৫) একটি কবিতা 'গজেন মালী'। রাম বসুর আর একটি পরিচিত কবিতা। ঐতিহাসিক ব্যক্তি—আমাদের আধুনিকের জাগরণে—গজেন মালীদেরই তো ঐতিহাসিক হওয়ার কথা। গজেন মালীর জন্য হাহাকার করে কারা? "দ্বীপান্তরেই যদি চলে যায় গজেন মালী বাঁচব কি করে?" বুক চাপড়ে আছড়ে পড়ে ক্ষেপা বাতাস, বিদ্যুৎ নখে, ফালা ফালা করে কালো আকাশ। সোঁদরবনও বলে, তুমি ছাড়া বেঁচে থাকা লাগে কি নির্জন। "পীর-গাজীদের গান থেকে গজেন মালী। কনক ধানও বলে "আমার হৃদয়ে স্বাদে ও গন্ধে গজেন মালী। জল নিয়ে ফেরা বৌ চমকায় : সেই তো শাঁখে ফু দিয়েছে, গজেন মালীর গলার শব্দে কেঁপেছে। এই চারটি স্তবকে গজেন মালী ঝড়-বিদ্যুৎ-অরণ্য-ধান, মিলে এক স্বপ্নের মহামানুষ। গজেন মালী একটি প্রত্যয়, পরাণ মাঝির মতোই চৈতন্য—ছন্দের ভিন্ন চালে গজেন মালী এভাবেই মার খেয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি।

আজ সন্ধ্যায় তারায় তারায় একটা মুখ
খুঁজেছে সে শুধু সবার জন্যে চেয়েছে সুখ
শিশুর জন্যে চেয়েছে রঙের সে চতুরালি
বারবার এক নাম মনে আসে গজেন মালী।

গজেন মালী সময়ের হাত ছাড়িয়ে, তার ব্যক্তিক সীমা ছাড়িয়ে কবিতার বাস্তবে আজও প্রবহমান—লড়াইয়ের শাঁখে ফুঁ দিলেই গজেন মালী চৈতন্যে, কর্মে আসে গ্রামে, ক্ষেতে, শহরে।

চল্লিশ-পঞ্চাশে রাম বসুর কবিতা এই প্রত্যয়ে-স্বপ্নে, সংগ্রামে যে বাস্তব রচনা করে, সে বাস্তবের বহিরাশ্রয় ক্রমশ অবলুপ্ত হয়। প্রশ্ন করেন কবি : "নিরীশ্বর, যারা মানুষীর অহংকারে প্রেমের কস্তুরী বিশ্বের চিরকাল হতে চেয়েছিল, কোন দিকে যাবে তারা?"

আমার ব্যর্থতা কান্না যত্ন করে বিদ্রূপে সাজাই
জন্তুর মতন শুষ্ক আর্তনাদ, আর

পতঙ্গের সহজাত সঙ্গীত রচনা সাধ্যাতীত
তাই, অতঃপর, কোথায় কোথায়?

তাই, এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "ততদিন শূন্যে জাল বুনে ধ্যানে স্থির হও।" এর চেয়ে গাঢ় ও ক্রুর অন্ধকারের ঝড় কখনো দেখেননি তিনি। তবুও ষাটের দশকে বলেন,

দিগন্তের দিকে মাথা তুলে রয়।
অন্ধকার যত পিশাচ মানুষের মুখের মহিমা ততই
দুর্নিবার।
অন্ধকার যত পিশাচ আমাদের চোখ ততই
নিষ্কলঙ্ক আকাশ।

নিজের প্রত্যক্ষ বাস্তবে এ সময় উতরোল ছিল, যদিও তা পরাণ মাঝি-গজেন মালীর চৈতন্য থেকে আলাদা। তবু দিগন্তে ছিল এশিয়ার ছোট্ট দেশ : "ভিয়েতনাম, মানুষের বিবেকের হে দিব্য বিভূতি আমার প্রণাম, আমার প্রণাম।" আমাদের এখন আমার—এ নিজের মধ্যেই ধ্যানে শুদ্ধ হওয়া। বারবার আসে 'আমি'—আমি অবশ্যই দুই বাহু প্রসারিত করে যাব। আমি জানি নীলিমা দেওয়াল মাত্র। "সত্যিই তো সময় আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছে কৃষকের হাতে ধানের বীজের মতো ছড়িয়ে পড়েছি তাপে ও কাদায়।" রাম বসু কবিতায় এভাবেই সময়ের জালকে ছিন্ন করে প্রসারিত হতে চান—এই 'আমি' বেঁধে নিতে চায় সময়কে, কবিতার সংযোগকে।

কিন্তু সময় বড় ক্রুর, বড় নির্মম।

আজ আমি এমন শিশুকেও দেখি না যার কথা বন্দনার
মতো। যে মেয়েটিকে আমি ভালবাসতাম তার চোখেও
দেখলাম নরকের আয়োজন। তার ঠোঁটে মুখ রাখতেই
এক ঝলক বারুদের গন্ধ আমাকে আবিল করল। তার
আঙুলের ফাঁকে কখনও মাংস জড়িয়েছিল।

"হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমরা আজ বিচ্ছেদের অরাজক উন্মাদনা ছাড়া কিছু জানি না"—তবু প্রার্থনা 'আমাদের ব্যাপ্ত কর', কবিতা হয় বাক্‌রূপ ধ্বনি।

১৯৪০-এর দশকের স্বপ্ন, আকাশের রামধনু স্বপ্ন বিলীন হয়ে যায় পরবর্তী দশকগুলিতে। আমি ও আমরার এক আততিতে রাম বসু দেখেন, কবি বিষ্ণু দে-র ভাষায় 'সমুদ্রের আন্দোলন বান ডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ।" কিন্তু প্রচলিত বিবাদে, ক্লান্তিতে, অ্যাবসার্ডে গা ভাসান না। সামাজিক সত্তায় এক তবু শূন্য শূন্য নয়ের, লড়াইয়ের যন্ত্রণার উত্তরণে যেতে চান। সময় তৈরি করে এক কানাগলি, আবৃত্ত নয়নে যেন এই কানামাছি খেলা। শূন্য বুকে ধাক্কা দেয় হাওয়া, নক্ষত্রের আলো গাছ পাখি ধ্বনি, সব মানুষের উত্তরাধিকার তার সার্থকতা-ব্যর্থতা নিয়ে ডাকে : রাম, রাম তুমিও ঘুমালে? তুমিও—এই ও অক্ষরটিতে আবৃত সময়ের জটিল বাঁধায় শেষ ধাক্কা। সব কথা যখন বাসি পচা মাংস হয়ে গেছে, স্তব্ধতাই অমোঘ ভাষণ, তখন ওই চৈতন্যই কি ঘুমিয়ে পড়ে, সে একদিন পরাণ মাঝির হাঁক শুনেছে, গজেন

মার্সীর প্রাকৃতিক মিথিক প্রত্যয়ে বেঁধেছে। "আমি জেগে আছি ভাই", ছিন্নভিন্ন তবু "জেগে আছি" প্রসারিত করেছি নিজেকে। সত্তা ও সন্ধান থাকলে ফিরতেই হবে মধুমূলে। বিষ্ণু দে যেমন বলেছিলেন আশা নেই, ভাষা নেই, এমনকি নরকও নেই, আছে নরকের ব্যঙ্গ, রাম্ বসুও তাঁর এই প্রিয় কবির মতোই বলেন,

এ কোথায় নিয়ে এলে?
এখানে যে গাছ নেই ছায়া নেই জল নেই
এ কোথায় নিয়ে এলে
এখানে যে লোক নেই ঘর নেই গান নেই

এখানে এই আত্মঘাতী রক্তের পাঁকে আনলে কেন? তবে যাঁর সন্ধান ছিল সমগ্র মানুষ, তিনি তো ওই পাঁকে শেষ হয়ে যান না, তিনি তো জেগে আছেন। তাই সময়ের ওই রক্তাক্ত কবন্ধ কালবেলাতেই তিনি প্রার্থনা করেন পরিচ্ছন্ন প্রেমের : প্রেম ছাড়া তাঁকে আর কী স্নিগ্ধতা দিতে পারো?

অপরিমিত, উদার সম্ভাবনার ক্লিন্ন কবরের ওপর দাঁড়িয়ে
তোমার কাছে মার্জনা চাইব এমন সাহস আমার নেই। তবু
পারো তো আমাকে ঢেকে দিও শ্যাওলার সবুজে, জোনাকির
দীপ্তিতে, মাটির নুনের অমৃতে। পার তো সঞ্চারিত হয়ো
জলের গন্ধের মতো অনাবৃষ্টি-দগ্ধ দিনে।
আজ আমি পরিচ্ছন্ন প্রেমের প্রার্থনা করি।

এই প্রার্থনা থেকেই সময়ের কাছে, সমুদ্রের কাছে যেতে চান কবি। ফিরে আসা তো ফেরা নয়, যাওয়া আর "যাওয়াই বিকাশের দিকে ক্রমাগত আত্মানুসন্ধানে আপনাকে ভেঙেচুরে বারে বারে গঠিত ও পুনর্গঠিত করে।" এই গঠিত-পুনর্গঠিত, নির্মাণ-বিনির্মাণের মধ্যেই কবি এগোন। নিজের ভূমিকা চতুর্দিকের কবরের মাঝখানে জেনে গেছেন তিনি, তাই প্রশ্ন করতে বলেন সময়কে, সমুদ্রকে। ১৯৮০-র দশকের সামনে এসে মন্ত্র খুঁজতে চান, সেই অন্বেষণে এক বহুস্বর বেজে যায়। ১৯৮১-তে প্রকাশিত 'মন্ত্র খুঁজি' রাম বসুর কবিজীবনের নতুন পর্বের শুরু : "কে তুমি আমাকে ছুঁড়ে দিয়েছে সময়ের উলঙ্গ কৃপাণে", এরকম চিত্রকল্প আসে, এরই পাশে : "কে তুমি আমাকে অনিঃশেষ শিখায়িত করেই চলেছ।" তুমি ও তোমার—আর আমি : "সূর্য আর একবার দিগন্তের বুকে/আমি অনাথ উলঙ্গ আলোয়/আমার অসম্পূর্ণতায় নামুক তোমার অগ্নি/তোমার অগ্নির সহস্র পালক আমাকে ঢেকে দিক/তুমি প্রসন্ন হও সূর্য।"

চতুষ্পার্শ্বের কুৎসিত ধ্বংসের মধ্যেই, আমরা আগুন থেকে ফুটে উঠে আবার হেঁটে ফিরে যাই অন্য এক আগুনের নিটোল বলয়ে, স্থিরতায়, ভালোবাসায়, প্রসন্নতায় : আজ হৃদয়কে যখন করা দরকার চৈত্রের পূর্ণিমার অগাধ আকাশ তখন মাটিতে গোড়ালি পুঁতে-নিরাসক্ত ভালোবাসায় বিশ্বাসের লাঠি ভর করে দাঁড়াও। কবি নিজের সঙ্গে, তাঁর বাস্তবের সঙ্গে লড়াইয়ে এক অভেদে পৌঁছন : আমার নিসর্গ আমি এবং আমিই নিসর্গ। মন্ত্র খোঁজেন

মাটিতে আকাশে। এক মানবিক ঐতিহাসিক প্রকৃতিতে। তাঁর কবিতাসমগ্রে তত্ত্ব ও তথ্যের এমন সংলগ্নতা যে 'বাঁচার তপস্যা'র মতো গদ্য ওই কবিতারই অন্তর্গত। বাঁচা, এখন বাঁচাটাই তপস্যা। সূর্য, সমুদ্র, মেঘ, পাখি, আকাশ, তাঁকে বাঁচায়। অনন্ত পরিসরের মাঝখানে নিয়ে যায়। দেশকালে প্রসারিত করে চলেছে এই জীবন : এই-ই হল জীবনের আদিতম স্বাদু ভোরের মাটির গন্ধ শব্দহীন উচাটন মন্ত্র বলে যায় আমিই আমার শেষ, এই অস্তিত্বময়তার সঙ্গেই বাঁধা গোচরাতীতের সেতু।

রাম বসুর কবিতায় যেমন মৃত্যুচেতনা এসেছে তেমনি প্রশ্নের উত্তর না পাওয়ার চেতনা।

আস্তে আস্তে গড়িয়ে আসছে বেলা
কী করে ধরব আমি মানবপুত্রের মতো
হিরন্ময় কটুপাত্র ঝ্যাংলানো ঠোঁটের গোড়ায়
কি আমার স্থির উচ্চারণ পৃথিবীর প্রজন্মের কাছে?

নিজেও জানি না। শুধু নির্মোহ নিষ্ঠায় নিজেকেই বারবার ভাঙি আর গড়ি। আকাশের দিকে চোখ চেয়ে কাদা মাটি ছেনে ছেঁদে গড়তে চান রূপের প্রতিমা। নির্মোহ নিষ্ঠা, আকাশের চোখ, রূপের প্রতিমা—এই ত্রিমাত্রায় এক কবির প্রধান স্বর নিজেকে বারবার ভাঙা ও গড়া। অদিতি-সম্বিতের, জীবনের তলায় তলায় কাজ করে—তার কথা যেমন তাঁর কবিতায় তেমনি তিনি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ষাট বর্ষ পূর্তিতে বীর শহীদ ও প্রয়াত সৈনিকদের স্মরণ করেন : "অপরাধ কবলিত যুগে হে আমার প্রেম আমি বেঁচে আছি শুধু তোমার জন্যই।" অপরিমিত বিষাদের স্তূপ সময় তৈরি করেছে, চারপাশে গুটিয়ে আসছে ছায়া—"নগ্ন আমি প্রস্রাবখানার জানলায় মাথা রেখে তাকিয়ে আছি অপলক নক্ষত্রের দিকে।" আমাদের চতুর্দিকের বিষাদের মধ্যে, চেপে ধরা ছায়ার মধ্যে রাম বসুর কবিতা ওই নক্ষত্রের কথা ভুলতে দেয় না। বিশ্বায়নের বিশ্বের মধ্যে হ্যামলেটকে নিয়ে আসেন—"হ্যামেলেট ভাবার সময় নেই।" তিনি এই বিশ্বের ভয়াবহতার প্রতিপক্ষে হ্যামলেটদের, আধুনিক রাজপুত্রদের ডাক দেন :

হ্যামলেট, স্বপ্ন-পাওয়া মাতাল পবিত্র
চিন্তা ও প্রয়োগসিদ্ধ পৌরুষ দাপটে
রাহুমুক্ত কর পৃথিবীকে
দোলাচল নয়, প্রতিশোধ নাও
শোনো সময়ের ডাক।

রাম বসুর নির্মাণ-বিনির্মাণ এরকমই। সময়ের বিষাদ, কবন্ধ অন্ধকারের মধ্যেই তিনি সময়ের ডাক শুনতে ও শোনাতে চান, প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলেন : আমাদের এই ভয়ঙ্কর এলসিনোরের বিরুদ্ধে উদ্যত হতে বলেন। তাঁর আদিত্য-চেতনার, নৈঃশব্দ্যের বোধ, ধৃতিমান শূন্যতারই সংলগ্ন এটা। অগ্নি, পূত অগ্নির আলোয় নতুন জন্মের ধ্বনি ছড়িয়ে যায়। অসহায়তা, একাকীত্ব থেকে যায়ই, সময় ঝ্যাংলায়, তবু লেপে দেন নক্ষত্রের

চোখের জলের চন্দন। "তারপর নিপুণ মুচি, আমি, ছেঁড়া জুতো তাপ্পি দিয়ে যাই।" চারদিকে স্তব্ধতা আকাশের দিকে, পৃথিবীর দিকে আস্তে আস্তে পা চালানো ভালো। জীবনের কানমলা খেয়ে হতমান দিন মুখ চুন করে চলে যায়।

আমারও সময় হলে আমি চলে যাব
ক্ষোভ নিয়ে নয়
এক বুক নীরবতা নিয়ে
প্রার্থনার মতো।
সবুজ আগুনে।
নিজের হাতেই জ্বালা।

বলাই বাহুল্য, রাম বসুর কবিতার কোনও সামগ্রিক পরিচয় আমরা দিচ্ছি না। কেবল এটাই বলতে চাইছি, প্রয়াত এই কবি তাঁর কবি জীবনের গড়া-ভাঙায়, নির্মাণে-বিনির্মাণে এক বহুস্বরিক ও বহুমাত্রিক কবিতার জগৎ সৃষ্টি করে গেছেন—সময়-সমাজ-প্রকৃতির সমবেত স্বরে এমন এক চলমান বিশ্ব নির্মাণ করেছেন যেখানে পাঠক গড়ে নিতে পারে নিজেরই ভুবন। কাব্যনাট্য সম্পর্কে রাম বসু যে প্রত্যক্ষের স্তর, কবিতার স্তর, যুব মার্কস কথিত ট্রানসেন্ডেন্স-এর স্তরের কথা বলেন, তা তাঁর কবি জীবনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—সব মিলিয়ে এক সমগ্রের সন্ধান। আমরা তাঁর কাব্যনাটক নিয়ে কিছু বলিনি—মনে করি এরাও তাঁর কবিসত্তাজাত। 'রক্তকরবী' ও 'ডাকঘর' সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন অবশ্যই ভাবায়।

এই বহুমাত্রিক বাংলাভাষার বড় কবি সেভাবে পঠিত নন এখন। পঠিত হলেই অবাক হতাম। বাংলা কবিতার মূল পাঠক বাঙালি মধ্যশ্রেণী। কোন কবি পঠিত হবেন, তা কবির ওপর সবটা নির্ভর করে না। করে সময় পাঠক শ্রেণীর ওপর। গত কয়েক দশক ধরে যে মড়ক মধ্যবিত্ত চৈতন্যে লেগেছে, তাতে রাম বসুর মতো কবির-পাঠক বেশি হওয়ার কথা নয়—এই কবির প্রচণ্ড অন্বেষণ, দ্বান্দ্বিক বীক্ষার সামনে অবসন্ন, নিরাপত্তাহীন আবার নিরাপত্তার সন্ধানে অসহায় পঙ্গু মধ্যবিত্ত দাঁড়াতে চায় না, পারে না। সংবাদপত্র ও দূরদর্শন ধর্ষিত বোধে রাম বসুকে গ্রহণ করা দুরূহ। রাম বসু দুঃখ করেছেন তথ্যে-তত্ত্বে ধনী বিষ্ণু দে-র কবিতা এখন কেউ পড়ে না। কারণ একই—ভাড়া করা পশ্চিমী ছদ্মবেশী আধুনিকে উত্তর আধুনিকে, হাহাকারে রাম বসু ও বিষ্ণু দে-র মতো এখন অনেকটাই অপঠিত থাকবেন। তবে সময় তো এক জায়গায় থেমে থাকে না—সময়ের এই স্রোত তার বাধা কাটিয়ে সমুদ্রগামী হলে, আবার রাম বসুর কাছে আমাদের যেতে হবে—হ্যাঁ, যেতেই হবে।

রাম বসুর কবিতা-ভাবনা

তরুণ মুখোপাধ্যায়

।। ১ ।।

"মানুষ ও মনুষ্যত্ব আমার কাছে বড় বলেই কবিতা এবং সাহিত্য আমার শেষ আশ্রয়"— একটি সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেছিলেন সদ্যপ্রয়াত কবি রাম বসু। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর গদ্য-পদ্য নির্বিচারে পড়তে গিয়ে এখন আমি আবিষ্কার করলাম এই নির্মম সত্য : রাম বসু-কে আমি বা আমরা ঠিকমতো পড়িনি ; বুঝিনি। মৃত বলেই বানিয়ে কথা সাজাতে হবে, এমন নয়। তাঁর প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, যুগবিচার কিছুই তলিয়ে দেখা হয়নি। প্রচারের আলো তাঁর মুখে পড়েনি (রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেও)। তাই তিনি একাধারে সত্যি কবি ও মনীষী, এর মূল্যায়ন আগামী প্রজন্মের কাছে অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করি। শব্দ সাজিয়ে অথবা ভাবাবেগে কবিতা লিখে কবি অভিধা তিনি পেতে চাননি। সৌখিন মজদুরি করে মানুষের কবি আখ্যায় আগ্রহ তাঁর ছিল না। সত্য-সত্যই তিনি যুগের, মানুষের তথা অস্তিত্বের সংকট অনুভব করেছিলেন। গদ্যে-পদ্যে উচ্চারণ করেছেন সেই ফাঁক ও ফাঁকি। সতর্ক করেছেন। আমরা শুনিনি। পড়ার জন্য পড়েছি। এখন পুনর্পাঠে আক্ষেপ জাগছে, কেন তাঁর কাছে গিয়ে, সময় নিয়ে পৃথিবীর গভীর গভীরতর ব্যাধির উৎস আর নিদান জেনে নিইনি। রাম বসু প্রমেথীয়ান ম্যান হতে চেয়েছেন। তাকে খুঁজেছেন। কোথাও পান নি। শেষে রবীন্দ্রনাথে শান্তি ও আশ্রয় পেয়েছেন। ১৯৯৯-এ লেখা "চেতনার রঙে রবীন্দ্রনাথ" কবিতায় লিখেছিলেন,

> ভাবি, বোধির নৈতিক আনন্তো যদি বিশ্বজনীনতার
> পেতাম প্রোজ্জ্বল আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ যদি
> কস্‌মেটিক না হয়ে কস্‌মস্‌ হতেন তা হলে
> আমরা ও আমাদের সমাজ জীবন হয়তো
> ভরাডুবি থেকে রক্ষা পেত।

আরেকটি সাক্ষাৎকারে রাম বসু স্পষ্টই জানান, তাঁর কবিতার ভুবনে আছে "এই বিশ্বজীবন আর তার কেন্দ্রস্থ প্রমেথীয়ান মানুষ।"

একজন কবি কেন লেখেন, তার উত্তর একই রকম হতে পারে না। কলাকৈবল্যবাদে রাম বসুর ঘোর অবিশ্বাস। তিনি বলেন, যে অন্ধকার তাঁকে অমানুষ করতে চায়, তার চক্রান্ত ছিঁড়ে ফেলার জন্য লেখেন। কবিতা তাঁর কাছে আত্ম আবিষ্কার ও আত্মানুসন্ধান। শখ করে নয়, মানবিক দায় মেনে তিনি কবিতা লেখেন। তাই তাঁর কবিতায় থাকে 'সেন্স অব ইমিডিয়েসি' ও 'সেন্স অব আর্জেন্সি'। নিজেকে চিৎকৃত কবি বলতে গর্ববোধ করেন।

পাবলো নেরুদা, পল এলুয়ার, লুই আরাগঁ, এলিয়ট, মায়াকোভস্কির কবিতা পাঠে ঋদ্ধ কবি রাম বসু নির্দিষ্ট মতাদর্শে (কোনো পার্টিকেন্দ্রিক নয়) কবিতা লেখেন, লিখতে

চান। তিনি কেন কমুনিস্ট হয়েছেন? কবি হওয়ার জন্য নয়। একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, কমিউনিজমে তিনি দীক্ষা নিয়েছেন "জীবনকে সামগ্রিকভাবে জানবার, জীবনের বিপুল সম্ভাবনাকে মুক্ত করার পথ সন্ধানের জন্য।" পি. সি. যোশীর কাছে জেনেছিলেন, সাম্যবাদীর ধর্ম হল "বিশ্বের যা কিছু মহৎ তাকে আত্মীকরণ করা।" পরবর্তী দীর্ঘ জীবনে তার ব্যত্যয় দেখে কবি ব্যথিত, ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু সুযোগ সন্ধানীর দলে নাম লেখান নি। মানসিকভাবে নিঃসঙ্গ থেকেছেন। শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "যাই, যাচ্ছি"তে বলেছেন—

তোমরা তোমাদের মতো থাকো
আমাকে আমার মতো থাকতে দাও
একা একা
একা।

আসলে এ কবির ব্যক্তিক অভিমান। তিনি থাকতে চান মানুষের পাশে। ওই কাব্যগ্রন্থেই তো তিনি বলেছেন—

শুনছ মানুষ, আমি বৃদ্ধ অসমর্থ
চেঁচিয়ে বলছি—তোমাদের মধ্যে
আমি বাঁচবো এবং মরবো
রাজন্যের কৃপা নিয়ে নয়
দেহাতি বস্তির জীব তোমাদের ভালোবাসা নিয়ে.

'পৃথিবীর গর্বিত সন্তান' যে-মানুষ, তিনি তাদের কবি।

।।২।।

সৎ কবিমাত্র নির্দিষ্ট জীবনাদর্শ ও কাব্যাদর্শ মেনে চলেন, এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ কম। সকলের লক্ষ্য পূর্ণতা ও সমগ্রতা। কবি যেহেতু মাটির পৃথিবীর সামাজিক মানুষ, তাই চক্রভুক হলে তাঁকে মানায় না। রুদ্রের দক্ষিণমুখ ও অপ্রসন্ন মুখ দুই-ই দেখা দরকার। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মিলনেই কবিতার সার্থকতা। রাম বসুর মতো দায়বদ্ধ কবি জানেন, কবিতা লেখা তাঁর কাছে কলম কণ্ডুয়ণ নয়; অর্থ-খ্যাতি—প্রতিষ্ঠার সোপান নয়। তা জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর কাব্যচিন্তা কেমন, তাঁর লেখা প্রবন্ধাদি থেকে উৎকলন করে বুঝে নিতে চাই।

১. প্রত্যেক কবিতার পিছনে থাকে নিজেকে অতিক্রম করে নিজেকে পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা। সময় জগৎ ও জীবনের আবর্তে নতুন আত্মপরিচয়। .....কবিতা আজ জীবনের স্তব। (দে'জ শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকা)

২. কলাকৈবল্যে আমার ঘোর অবিশ্বাস। আমি জীবনের অনুগত। .....আমার কাছে কবিতা হলো নিয়ত বস্তুময় স্থানকালের দৃশ্যপটে আত্মআবিষ্কার পদ্ধতি। (ভারবির শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকা)

৩. মনে পড়ে আরাগঁ-র উক্তি : Poetry reads like a newspaper. .. কেমন করে বলবো—নিঃসন্দেহে এ যেমন সমাসা, ঠিক তেমনি আশু ও জরুরি সমস্যা হল : কি বলবো।.... স্পষ্টতাই আমার অন্বিষ্ট (মন্ত্র খুঁজির ভূমিকা)
৪. ...উচ্চকণ্ঠ হলেই কবিতার হানি হবে, এ সঠিক সাহিত্যরুচি নয়। কবিতা জাতেই আদিম ও ভয়ংকর। ....(যারা) কবিতাকে তথ্য ও তত্ত্বের বাইরে রেখে আধো আধো সান্ধ্য ভাষাকে সিদ্ধি ভাবে, তারা কবিতার বন্ধু নয়।

(এবং এই সময় পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকার)

৫. ...কবিতাকে হতে হবে একদিকে রুক্ষ পেষল পাহাড়, অন্যদিকে তাকেই হতে হবে, একই সঙ্গে হতে হবে স্নিগ্ধ ও স্বপ্নময়। কারণ কবিতার অন্বেষণ হল সমগ্রতা। ....কবিতা হল শাশ্বতের ভারে অবনত মানুষের পদধ্বনি। তার অভিযান প্রত্যক্ষ থেকে প্রজ্ঞার দিকে, সমগ্রের দিকে, অবিচ্ছিন্ন অন্তরাত্মার দিকে, ঘাস থেকে নক্ষত্রের সহমর্মিতায়। (সিদ্ধি আজও অনায়ত্ত/কবিতা সমগ্রের কাছাকাছি)
৬. কবিতা তো মানি প্ল্যান্ট নয়, কবিতা বনস্পতি। বুক চিতিয়ে তাকে ঝড়ঝাপটা সইতে হবে। আবার সরে এসে একান্ত নির্জনে তাকে নিজের মুখোমুখি হতে হবে।.... স্পর্ধার নাম কবিতা। বশ্যতা না-মানার নাম কবিতা। সে আবার কোমল প্রেম। কবিতা রুদ্রাণী। আমার ঊষা। ...কবিতা অনন্তের স্তব। কবিতা আমার কাছে, আমার ও বিশ্বের সহমর্মিতায় আত্মউন্মোচন। (উত্তর খুঁজছি)
৭. আমি মানুষ এবং কবি। আমি নিজেকে নিঃশেষ করে দিই মানুষ এবং পৃথিবীতে এবং চির অতৃপ্তির আশ্লেষে তাকে আবার শুষে নিই। (অস্তিত্বের সংকট; কবিতার সংকট)
৮. জীবনের আশ্চর্য রসায়ন হল সেই নতুন ও পুরাতনের সংশ্লেষণে আরও একটা স্বতন্ত্র 'কিছু'। সেই 'কিছু'টাই কবিতা। তাই এক অর্থে কবিতা ইতিহাসে বিধৃত এবং সে সেইসঙ্গে ইতিহাসকেও ডিঙিয়ে যায়।....
কবিতা যেন বেদোক্ত সুপর্ণ পাখি, যে তাকে নিয়ে যাবে অনন্ত নক্ষত্ররাজির মধ্যে আত্মিক বিস্তারের জন্যে। এবং সেই সঙ্গে নিয়ে আসবে আরও মানবিক বিভূতিসম্পন্ন চৈতন্য মধুময় পৃথিবীর ধূলিতে। (কবিতা ভাবনা)

আমার মনে হয়, এই অষ্টাঙ্গিক মার্গে কবি রাম বসুর কাব্যচিন্তা ও কাব্যাদর্শ স্পষ্টভাবে বিকশিত হয়েছে।

কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশের আগে তিনি অব্যবহিত তিরিশের কবিতা ও কাব্যভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। স্বীকার করেছেন, "তাঁদের পরাগে আমি নিশ্চয়ই পুষ্ট, গোচরে অগোচরে।" এঁরা হলেন কবি বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী ও পরিণত জীবনানন্দ দাশ। কিন্তু কলোনিয়াল কাল্চারে তাঁর ঘোর অনীহা। একাধিক প্রবন্ধে ও সাক্ষাৎকারে বলেছেন :

> আমি ভারতীয় ঘরাণার অনুবর্তী হয়ে থাকতে চাই। ঔপনিবেশিক কাল্‌চারের একটা বড় দোষ যে, সে না-ঘরকা না-ঘাটকা।

আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতার ভিতরে দেখেছেন "বোরখার আড়ালে কালোনিয়াল কালচার এবং ইউরোপীয়ান ডোমিনেশন সমানে চলেছে।" সত্যকার স্বাধীন মানুষ তিনি চান, যে মিমিক ম্যান না-হয়ে হবে সোস্যাল ম্যান হবে। সেই সঙ্গে মানুষের সাধনা হবে বিশ্বমানব হওয়া। "রাজকীয় পদশব্দগুলি" কাব্যনাটকে কবির প্রার্থনা—"যেন আমাদের জীবন হয় সময়ের বন্দনা ও ঐশ্বর্য।" কবি হিসেবে রাম বসু সময়ের সওয়ার।

।।৩।।

কবিতা 'আমি'র প্রকাশ মনে করেন রাম বসু। বাল্মীকির অন্তরে প্রথম কবিতার পদধ্বনিতে যে বিস্ময় 'কিমিদম্‌'—তাকে তিনিও গুরুত্ব দেন। দুই আমির দ্বন্দ্বে মানুষ অস্থির—কে তুমি? কে আমি?

> ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
> মানুষের সীমানায়,
> তাকেই বলে 'আমি'। (রবীন্দ্রনাথ)

একে বিশ্ব আমির ভূমিকা দিয়েছেন কবিগুরু। ছোট আমি থেকে বড় আমির জেগে ওঠা তাঁর লক্ষ্য—'I am' in me crosses its finitude whenever it deeply realizes itself in the 'thou art'. কার্ল মার্কসও মানুষের তিনটি অবস্থা গুণানুসারে নির্দেশ করেছেন—Total. Personal. Auto-active. তিনি এ কথাও জানাতে ভোলেন না : 'The individual is the social being'.

এই জেট-নেট-সাইবার-শাসিত যুগে মানুষ বিশ্বকে মুঠোয় পেয়েছে। প্রযুক্তির চরম উন্নতিতে সে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। অধিক ক্ষমতা মানেই দম্ভ, শোষণ, পীড়ন আর আত্মঅহমিকা। বিশ্ব চলমান, মানুষ কি তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে? কবি রাম বসুর অভিমত—

> ...ক্রমবিকশিত বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিস্তৃত হতে পারল না মানুষের চেতনা। ...একদিকে ক্রমবিকশিত বিশ্ব, অন্যদিকে ক্রমসংকুচিত মানবসত্তা।
> (কবিতা ভাবনা)

তিনি মনে করেন দায়বদ্ধ কবি ও কবিতাকে এই বৈপরীত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। ব্যক্তি আমির মান-অভিমান নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে না। সামাজিক আমির গুরুত্ব দিতে হবে। কার্যত আজকের দুনিয়ায় তিনি দেখতে পান বাঙালি কবিরা বিশেষভাবে বেছে নিয়েছেন

হেগেলের সিভিল সোসাইটির আমি এবং অ্যাডাম স্মিথ, হক্‌স্‌, লকের মুক্ত অর্থনীতির আমিকে। কবিতার সংকট এখানেই। আঘাত-ব্যাঘাত বাধা মেনেই মানুষকে চলতে হয়। হয়ে উঠতে হয়। হওয়ার জন্য কবিতায় তথ্য, তত্ত্ব, দর্শন যদি আসে তাতে ক্ষতি নেই। মালার্মে তো বলেছেন, 'Poetry and philosophy are one'. রাম বসু মনে করেন—"বহির্বিশ্ব ও অন্তর্লোকের মেলবন্ধনে জীবনের অনন্ত বৈপুল্য হলো কবিতার অপরিহার্য শর্ত।" তাঁর "ওরা চারজন" কাব্যনাটিকে চতুর্থ যুবকের সংলাপ এখানে প্রাসঙ্গিক মনে করি। যে বলে—

> আমি একদিন খসে পড়ব। যতদিন না পড়ি আমাকেও খুঁজতে হবে, গড়তে হবে।
> সত্তার বাইরে যেতে হবে। সেখানে আমি পরিব্যাপ্ত বিশ্ব। চিহ্নহীন অপরিমেয়তা, দাহহীন দীপ্তি।

আর কবিতায় বলেন—

> সাবধান
> আমি জেনেছি মানুষের পরিমাপ
> একমাত্র মানুষ, মানুষ (অসতো মা)

মানুষের জন্য তাঁর যত ভাবনা ও ভালোবাসা। তাঁর কবিতার উপাদান ও ভরকেন্দ্র মানুষ। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অসম্মান, অসাম্য জেনে ও জেনেও তিনি চান, মানুষ বিকশিত হোক। মানুষ শিখুক প্রকৃত বাঁচা।

হ্যাঁ, বাঁচার ধরনও তাঁর কবিতা-ভাবনায় মিশে যায়। টিকে থাকা আর বেঁচে থাকা তো সমার্থক নয়। গাছ, পাখি, মানবেতর জীবে টিকে থাকে; শুধু মানুষ বাঁচে। কীসে? যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বলে, মনে যে বাঁচে সেই প্রকৃত জীবিত। কবি রাম বসু সার্ত্রকে আশ্রয় করে "বাঁচার তপস্যা" করেছেন। খুঁজেছেন বাঁচার সার্থকতা কীসে? to exist মানে 'standing out, emerging, treanscending' সার্ত্র বলেন, 'Man must create for himself his own essence' বাঁচার ধরন কারোর নকল হতে পারে না। প্রত্যেকে নিজের মতো করে বাঁচে। তবে যন্ত্রণা ছাড়া বাঁচা যায় না, যথার্থ বাঁচা মানেই 'আনহ্যাপি কনসাসনেস'—মেনে নিতে হয়। রাম বসু কবিতায় লেখেন—

> অবক্ষয় মর্মমূলে এলে
> অনুগত থেকো
> স্বেচ্ছা-আরোপিত মূল্যমানে
> অনুগত থেকো
> অনাবৃত জীবনের কাছে।

বুদ্ধ, যিশু, গান্ধী, মার্কস-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, এঁরা যন্ত্রণার কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়েই বাঁচার মন্ত্র শিখেছেন ও শিখিয়েছেন। সেই মন্ত্র রাম বসু কবিতায় উচ্চারণ করেন— "এসো, মাটিতে গোড়ালি পুঁতে আকাশের দিকে তাকাই'।

॥৪॥

তাঁর কবিতায় তিনি যে মানবতাবাদী উচ্চারণ রাখেন তা-ও তাঁর কাব্যাদর্শ ও জীবনাদর্শকে প্রতিফলিত করে। কিছু কবিতাংশ তাঁর ভাবনার সমর্থনে উদ্ধৃত করছি—

(১) আমরা সেই মানুষ
পৃথিবীর গর্বিত সন্তান
মরব না। (না, আমরা মরব না)

(২) সন্ধানের নাম : অগ্নি
প্রেমের নাম : অগ্নি
মৃত্যু অগ্নিময় (সেই দেখতে পায়)

(৩) ১. জীবনের জন্যে এক দুর্গ গড়ো
২. মরণের জন্যে এক দুর্গ গড়ো
৩. প্রেমের জন্যে এক দুর্গ গড়ো (আমি বলি)

(৪) সাহস পবিত্র শব্দ
মানুষ পবিত্র ধ্বনি
কমরেড বিশ্বরূপ প্রীতি
ভালোবাসা জীবনের প্রসন্ন নিয়তি
শ্রম শস্যের অমৃত
হো চি মিন সহজের সরল বিভূতি যার
চারপাশে আশা
(হো চি মিন মারা গেল আজ)

(৫) আত্মানুসন্ধানই জীবন
ছিন্নভিন্ন হতে হতে জবাবদিহির দায় থেকে যায়
(দয়াময়ী নিঃসঙ্গতা)

"মন্ত্রগুপ্তি" (১৯৮১) কাব্য থেকে আপাতত শেষ কাব্য "যাই, যাচ্ছি" (২০০৬) পর্যন্ত আমরা দেখি, রাম বসু তাঁর কবিতায় সূর্যচেতনা ও অগ্নিচেতনা-কে গুরুত্ব দিয়েছেন। মানবসত্তায় তার উদ্ভাসন চেয়েছেন। বলেছেন, "সূর্যের রশ্মির বৈপুল্যে আমি অপরূপ উষার বর্ণাঢ্য বিবৃতি।" আদিতে ও অন্তে অগ্নিতে দেখে তিনি আলোর মধ্যে আলো হতে চেয়েছেন। হৃদয়কে সময়ের উর্ধ্ববৃত্তে নিয়ে যাবার বাসনা প্রকাশ করেছেন। আর জেনেছেন এই সত্য—

> কবিতা তো ক্রিয়াশীল প্রেম ও প্রজ্ঞার শরীর। মাঝ আকাশের দ্বীপগুলো পরিচ্ছন্ন করে হবো বিশ্বরূপ বাক্।
>
> (রূপকথা রিক্ত নয়)

স্পর্শের সীমায় কবি রাম বসু

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

আজ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭। মন ভারাক্রান্ত, সারাদিন খুব যন্ত্রণার মধ্যে। সকাল এগারোটায় খবর পেলাম রাম বসু আর নেই। গত ৬ ফেব্রুয়ারি শ্বাসকষ্ট বাড়ায় তাঁকে ইস্ট এন্ড নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছিল। গতকালও মোহন বলছিল—আজ উনি চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে খেয়েছেন। অর্থাৎ আশঙ্কার দিকটা অনেকখানি হালকা। নার্সিং হোম থেকে বলা হয়েছিল দু-এক দিনের মধ্যে বাড়ি চলে যাবেন।

রামদার মরদেহ নার্সিং হোম থেকে সুকন্যার বাড়ি হয়ে বাগমারির বাড়িতে এল বিকেল সাড়ে চারটেয়। আমরা বাগমারিতে অপেক্ষা করছিলাম। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, দীপেন রায়, নীরেন্দু হাজরা, কবি কৃষ্ণ ধর। বাংলা আকাদেমির সনৎ চট্টোপাধ্যায়, উৎপলেন্দু ঝা। এ ছাড়া স্বপন, সুস্নাত, সৌমিত্র লাহিড়ী। এবং আরও অনেক মানুষ। তরুণ সান্যাল এলেন রামদার শোকযাত্রার সঙ্গে সুকন্যার বাড়ি থেকে। রামদার আবাস পূর্বাচল সমবায় আবাসনের সভাপতি নিতাই সরকার ও সজল রায়চৌধুরীর উদ্যোগে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পর্ব শেষ হল। রামদাকে নিয়ে যখন তাঁর বাড়ি থেকে শেষ-যাত্রা শুরু, অন্ধকার নেমে এসেছে। সময় সন্ধে ছ'টা। আমরা পায়ে পায়ে কিছুটা পথ রামদার সঙ্গে সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রাম বসুর কবিতা 'ভাবণ'-এ 'আমার প্রণাম নাও/নাও ভোঁতা কলমের আর কবন্ধ কপালের নমস্কার'; রবীন্দ্রনাথের অন্তিম যাত্রার আলেখ্য প্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ' ও বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর'-এর উদ্দাম শোকপ্রবাহ; এই মুহূর্তে যেন মিলেমিশে একাকার। এই আগ্রাসী সন্ধ্যায় কেবলই মনে হচ্ছে একালের শবানুগমন কেন যে সেকালের মতো শোকযাত্রা হয়ে ওঠে না!

রামদা তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ (২০০৬) 'যাই, যাচ্ছি'-তে বলেছেন—

'আমার ঘরের দেওয়াল আয়নায়
এবং, তা-ও ময়লা এবং ঝাপসা, পারা ঝরা,
আমাকে কখনো দেখায় ঋষি, কখনো রাক্ষস।'

না রামদা, আপনি ঋষিও নন, রাক্ষসও নন। চলমান এই মুহূর্তে কাচের গাড়ির ঝিম ধরা আলোর নীচে ফুলে আবৃত আপনার শরীর, মুখটি শুধু খোলা। সেই মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আর এক চিলতে বাঁকা হাসি। সে কি এই পারা ঝরা সময়ের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

আমার সাম্প্রতিক গ্রন্থে রামদা প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ আছে, শিরোনাম 'যাই, যাচ্ছি ও কবি রাম বসু'। যে-আমি আমার বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশে কঠোর অনাস্থাবাদী, সেই আমারও প্রবল বাসনা ছিল বইটা বার হলে রামদার বাড়িতে গিয়ে প্রথম তাঁর হাতে শ্রদ্ধা উপহার দেব। কিন্তু বইটি পেলাম ১০ ফেব্রুয়ারি রাতে। আর আজ ১১ তারিখ

সকালে এই দুঃসংবাদ। একটি দুর্ঘটনার স্মৃতিতে আমার এই বইয়ের প্রকাশ তারিখ কিছুটা পশ্চাদবর্তী।

সব সৃষ্টিশীল মানুষেরই নিঃসঙ্গতাবোধ নিত্যসঙ্গী। রামদার-ও। বিশেষ করে গত বছর তাঁর স্ত্রীর প্রয়াণের পর থেকে। রামদা চাইতেন আমরা প্রত্যহ তার সঙ্গে সংযোগ রাখি। রামদার সঙ্গে আমার ও দীপেনের শর্ত ছিল, আপনি ফোন করবেন না, একদিন পর পর আমরাই আপনাকে ফোন করব। রামদার ফোনের বিলের কথা ভেবেই আমাদের এরকম শর্ত। এক সকালে রামদার ফোন—কই, তুমি তো ফোন করলে না। আমি রামদাকে স্মরণ করালাম—গতকালই তো আপনি আপনার নতুন কবিতা পড়ে শোনালেন। রামদা হেসে বললেন—ও, তাইতো। আমি ভুলে গেছি। মৃত্যুর মাসখানেক আগে থাকতে রামদা নতুন উদ্যমে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। বেশ কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা ফোনে পড়ে শোনান আমাকে ও দীপেনকে। এইসব কবিতার বেশিটাই দার্শনিকতা, এবং তা জীবন নিয়ে। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থের নাম যেমন 'যাই, যাচ্ছি', তেমনি তাঁর এখনকার কবিতার মধ্যেও একটা যাই যাই। 'যাই, যাচ্ছি'-তে তিনি বলেছেন—

> 'মৃত লবণাক্ত জলে সুগন্ধি শব কাঁধে নিয়ে যেতে হবে
> যেতে হবে এই সত্য একমাত্র সত্য জেনেছি জীবনে'

এগুলিকে আমি মৃত্যুচেতনা বলি না। চারদিকের বন্ধু আত্মীয় নিজের স্ত্রীর পরপর চলে যাওয়া মনের উপর যে মেঘ সঞ্চার করে, কবিতায় সে মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত তো খুবই স্বাভাবিক। প্রত্যেকবার কবিতা শুনে রামদাকে জিজ্ঞাসা করেছি—কবিতার কী নাম দিলেন? রামদা বলতেন—না, এখনো কোনো নাম দেওয়া হয়নি।

বাগমারিতে নিজের বাড়ি, আর মেয়ে সুকন্যার বাড়ি যাওয়া আসা, রামদার এমন মাঝে মাঝেই ঘটছিল যে একদিন আমি ফোন না করলেই শুনতে হত রামদা সি.আই.টি. রোডের বাড়িতে। প্রায়ই তো শরীর খারাপ করত। কথাতেই শ্বাসকষ্ট বোঝা যেত। কোনোদিন কণ্ঠস্বর একটু পরিষ্কার শুনে বলতাম—রামদা, আজ তো একটু ভালো আছেন! আমাদের যৌবনে রামদাকে সভা সমিতিতে স্বকণ্ঠে কবিতা পড়তে শুনেছি। ভরাট, গম্ভীর কণ্ঠস্বর। শম্ভু মিত্রর আবৃত্তি মনে পড়ত।

শ্রদ্ধেয় গোপালদার-ও (গোপাল হালদার) খুব শ্বাসকষ্ট ছিল। উনি বলতেন, হাঁচি বাঁচি। হাঁচি হলে তো একটু স্বস্তি। গোপালদাকে স্মরণ করার আর একটি কারণ—তাঁর জন্মদিন। ১১ ফেব্রুয়ারি তাঁর ক্রিস্টোফার রোডের বাড়িতে আমরা যেতাম তাঁকে জন্মদিনের প্রণাম জানাতে। রামদার প্রয়াণও সেই ১১ ফেব্রুয়ারি। রামদার জন্মসন ১৯২৫-এর সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা-সনেরও এমনি একটি কাকতালীয় মিল আছে। একে অলৌকিক বলব না, এক একজন প্রণম্য মানুষ চলে গেলে কত কথাই তো মনে আসে!

গোপালদা সম্পর্কে রামদার শ্রদ্ধাবোধ রামদার লেখা থেকেই উদ্ধৃত করি। "গোপালদা বরাবরই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। সমালোচনা করে ভুল শুধরে দিয়েছেন। তরুণ

বয়েসে তাঁর বাড়িতে নিয়মিত যেতাম। ভয়ঙ্কর কাজের মানুষ। তবু আমার মতো নগণ্যকে বসতে দিতেন, গল্প করতেন। সদ্য-লেখা কবিতা শুনতে শুনতে বলতেন, এ শব্দটা বদলে দিন। ভালো লাগছে না, বয়েসে অনেক ছোট, তবু আমাকে বলতেন 'আপনি'। এটাই গোপালদার অভ্যেস।''

রামদার পঞ্চাশ বছর বয়েসের জন্মদিন; ১৯৭৫ সাল। আমি তখন রামমোহন রায় রোডে থাকি। দীপেন রায় সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন মিলে গেলাম মানিকতলায় রামদার রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিটের বাড়িতে। অনাবিল হাসি আড্ডা ছবি তোলায় এমন প্রাণবন্ত ঘরোয়া জন্মদিন পালন মানুষের অনেকদিন মনে থাকে। রামদাকে সল্টলেক ইসকাস-এ, সীমান্ত-র অনুষ্ঠানে, আরও অনেক জায়গায় সংবর্ধনা জানিয়েছি। কিন্তু মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে সেই ঘরোয়া পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন।

রামদাকে এমন অন্তরঙ্গ পাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমাদের যে কেবল প্রতিষ্ঠিত কবি হিসেবে তাঁকে চিত্রিত করতে মন চায় না। কবিপ্রতিভা ও মনুষ্যত্বকে পাশাপাশি খুঁজতে গিয়ে আমরা পেয়েছি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, মৃগাঙ্ক রায়, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ অগ্রজদের, যাঁরা খুব অল্প ব্যবধানে পরপর অনন্তে পাড়ি জমালেন। গোপালদা, ধনঞ্জয় দাশ, মঙ্গলাদা, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়—সবাই এখন স্মৃতিচিত্র। যতদিন আমরা তাঁদের মনে রাখতে পারি, সেটাই হবে মনুষ্যত্বকে মনে রাখা। বিস্মৃতি যে এক দুরারোগ্য সংক্রমণ, এ-কথাও আমাদের সদাশঙ্কিত রাখে।

রাম বসু তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থে 'মৃত প্রেম' কবিতাটি এই বলে শেষ করেছেন—

'আমি ভালবাসি বলে বলছি
তুমি স্মরণের ওপারে চলে যাও।'

তাঁর প্রয়াত স্ত্রীকে স্মরণ করে এই লেখা।

স্মরণের ওপারে তো এক মহাশূন্য। আমরা স্মরণ নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই।

রাম বসুর কবিতা : 'সময়ের গ্রন্থিতে আত্ম-আবিষ্কার'

দিলীপ সাহা

এক

জীবন-অন্বীক্ষা ছিল যাঁর অভিপ্রেত, মানবতার কাছেই যাঁর একমাত্র দায়বদ্ধতা, যাঁর সত্তার অনুভবে ধ্রুবতারার মতো সত্য হয়ে থাকেন রবীন্দ্রনাথ, চল্লিশের দ্বিতীয়ার্ধের প্রতিনিধিস্থানীর সেই কালসচেতন সাম্যবাদী কবি, কাব্যনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, একান্ত স্বভাষী রাম বসুর বিরাশি বছরের দীর্ঘ জীবন শেষ হয়ে গেল গত ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, রবিবার, সকাল দশটায়, মধ্য কলকাতার একটি নার্সিং হোমে।

কবিতাকে সমাজ চৈতন্যের বহুবর্ণিল অভিব্যক্তি বলে মেনে নিলে চল্লিশের বাংলা কবিতার জগৎ নিঃসন্দেহে সমসময়ের অভিধান। আর সেই উত্তাল চল্লিশের সংক্ষুব্ধ ক্রান্তিলগ্নেই জীবনবাদী কবি রাম বসুর কবিসত্তার উন্মেষকাল। তাঁর কথাতেই বলা যায় :

> 'আমাদের সেই যুগ যা চিহ্নিত হয়ে আছে দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, আই.এন.এ, নৌ-বিদ্রোহ, আসমুদ্র হিমাচল কাঁপানো জাতীয় আন্দোলনে, দেশবিভাগে, কোটি কোটি উদ্বাস্তুর অসহায় মৃত্যুতে, তেলেঙ্গানা দেশবিভাগে, কোটি কোটি উদ্বাস্তুর অসহায় মৃত্যুতে, তেলেঙ্গানা কাকদ্বীপ হাজং অভ্যুত্থানে এবং নীচ লোভী স্বার্থকে তৃপ্ত করার পাশবিক কৌশলে অন্যায়ের আশ্রয়ে স্বাধীনতা লাভে' (চল্লিশের কবিতার প্রেক্ষিত)।

চল্লিশের এহেন অগ্নিগর্ভ ঝোড়ো যুগই যে তাঁর কবিতা রচনার 'অনুকূল সময়' ছিল সে-কথা রাম বসু স্বীকার করেছেন অকপটে :

> 'আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে সময়। সেই সময়ে কোনো অ্যাকশানে যাবার আগে মিটিং-এ কবিতা পড়া হতো। এই কবিতা পড়া আমাকে পরিচিত করায় বৃহত্তর ছাত্র সমাজের কাছে। ওরাই আমাকে কবি বলে স্বীকার করে নেয়। তারপর দরজা খুলে দেয় প্রফুল্ল রায়ের 'অগ্রণী' পত্রিকা। আজও যে হাল না ছেড়ে হাত-পা ছুড়ছি তা ওই দুটি আকস্মিকতার অসামান্য বদান্যতার যোগফলে। তা ভিন্ন কোথায় তলিয়ে যেতাম এতদিন। 'তোমাকে' বইটা বার করলো প্রয়াত কবিবন্ধু রোহীন্দ্র চক্রবর্তী। খরচ যোগাল কিন্তু কফি হাউসের ছাত্ররা, যাদের অনেকেই আমার কাছে অপরিচিত। এতবড় ঋণ কৃতজ্ঞতা দিয়ে শোধ করা যায় না। গভীর ভালবাসা সেদিন পেয়েছিলাম অভিজাত সাম্যবাদীদের উপেক্ষা সত্ত্বেও। কেন পেলাম? আমার নিজের কোনো গুণপনার জন্য নয়। সময়ের জন্যে। সময় আমার অনুকূল ছিল' ('কথায় কথায়', সীমান্ত, শারদীয় ১৩৯৭)।

অভিজাত সাম্যবাদীদের উপেক্ষা, চারপাশের নিন্দা ও অপবাদের পাহাড় অগ্রাহ্য করে সমকালে 'স্লোগান-সর্বস্ব চিৎকৃত কবি হিসেবে ধিকৃত' 'নতুন প্রজন্মের কাছে প্রায়

অপরিচিত' এই কবি আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্পে স্থির থেকে সময়ের দাবি মেনে সামাজিক দায়বোধে চেনালেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য তথা আইডেন্টিটি।

দুই

১৯৪৩-এ 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রাম বসুর প্রথম কবিতা। আত্মপ্রকাশের সেই প্রথম পর্বের কথা জানিয়েছেন তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে :

> 'ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে। আমাদের গ্রামের বাড়ি। তার সামনে ছিল পাঠশালা। তার এক পাশে পানাপুকুর। লাগোয়া বাঁশঝাড়। পুকুরপাড়ে আমগাছ। পাশে আমলকি গাছ। আমার ছোটোবেলাটা ছিল নির্জন। পাঠশালার ছুটি হলে আমি দাওয়ায় বসে তাকিয়ে থাকতাম গাছগাছালি, পুকুর, বাঁশঝাড়ের দিকে। মগ্ন হয়ে যেতাম। তখন এক ধরনের বোদ আমাকে গ্রাস করত। তারপর নিজের মনে লিখতাম।.....এই ছিল এক পর্ব।.....সেই ধূসর স্মৃতি হাতড়াতে হাতড়াতে এখন মনে হচ্ছে—আত্মপরিচয়, সেলফহুড, আইডেনটিটি খোঁজার জন্য হয়তো লিখতাম' (উত্তর খুঁজছি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কেন লিখি'?)।

এরপর জীবনের পট পরিবর্তন। তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি :

> 'বিয়াল্লিশ সালে এলাম কলকাতায়। তখন সময় উথাল-পাথাল। যুদ্ধ দাঙ্গা দেশভাগ স্বাধীনতা উদ্বাস্তু আরও কত দুঃস্বপ্নের ইতিকথা। এই সময় হলাম কমিউনিস্ট। পৃথিবীর রূপ গেল পালটে। পেলাম জীবনের অর্থ। তার ভুলভ্রান্তি ক্ষয়ক্ষতি। উপকার অপকার যা-ই হোক না কেন, এই অগ্নিসিদ্ধ সময় অনন্যতায় দিব্য। জন্মান্তর হল যেন' (তদেব)।

আসলে সময়ের গ্রন্থিতে তিনি চেয়েছিলেন নিজেকে আবিষ্কার করতে। স্বভাবতই স্থির বিশ্বাসে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর অনন্যব্রত :

উত্তরমেঘে আশ্বাস পাই পৃথিবী যে আমাদের।

প্রবঞ্চনার মরীচিকা মুছে তলোয়ার হয়ে জ্বলি
প্রাচীন দেওয়াল কুঁদে লিখে রাখি ঘৃণার গায়ত্রী।

(উত্তরমেঘ : তোমাকে)

বলাবাহুল্য, এ কণ্ঠস্বর আরোপিত নয়। কারও প্রতিধ্বনি নয়। রাম বসুর একান্ত নিজস্ব। আর তাই একদিকে যেমন তিনি অনুভব করেছেন আকাশ-বাতাস-নদী-মাটির টান, অপরদিকে তেমনি দেশজ মানুষকে খুঁজে ফিরেছেন তার স্বাভাবিক মূর্তিতে। ক্রমে দৃষ্টি সংহত হয়েছে দেশকাল সমাজের বৃত্তে :

এসো-না আমরা পাহাড়ের মতো দাঁড়াই
দানো-ডাকা রাতে আমাদের পথে কে আসে

সজাগ প্রহরী সবল মুষ্টি বাড়াই
আলোক কুন্দে করপুট ভরে নিলাম
এ মাটিতে প্রাণ সোমরস ঢেলে দিলাম। (মে মাসের গান ('৪৮)

যে খেত ও গ্রাম ছিল তাঁর 'নিঃশ্বাসের মতো পরিচিত', 'পাঁজরের মতো আপনার' সেই পথে ফেরারি সম্রাটের মতো চুপি চুপি হাঁটতে হাঁটতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন :

সহোদরা ধানক্ষেত
আমি প্রতিজ্ঞা করছি আবার ফিরে আসব
বিগত বন্ধু
তোমার রক্তের প্রতিশোধ তুলব
আমার স্বপ্ন, তোমাকে উজ্জ্বল করব
যদিও একবুক শস্যের ভেতর পা টিপে টিপে চলি।
(একবুক শস্যের ভিতর : তোমাকে)

বস্তুত, সমকালীন যুগধর্ম সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন রাম বসু কোনো অবস্থাতেই মাটি আর মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। সমসময়ের সেই সংকট থেকে সরে আসেননি। বরং সমষ্টিগত ভাবনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চেয়েছেন :

এ কি হতে পারে আমি আর কোনোদিন ধানের শীষ ছুঁয়ে যাব না
কাস্তেকে বাঁকিয়ে ধরে প্রতিবেশীকে ডাকব না
এ কি হতে পারে
আমি আর কোনোদিন গান গাইব না? (ঐ)

এরপরই উল্লেখ্য, কাকদ্বীপ অঞ্চলের রক্তধারা তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত রাজনৈতিক সংগ্রামের কবিতা 'পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে'। চল্লিশের সেই ঘোড়ো যুগে, দামাল সময়ে প্রায় প্রবাদের মর্যাদা পাওয়া ওই কবিতাটি দুরন্ত আশা ও আবেগে প্রতিবাদে ঝলসেই ওঠেনি, মুক্তিকামী অবমানিত জনগণকে উত্থল করেছিল দৃপ্ত প্রতিরোধে, সংঘবদ্ধ লড়াইয়ে। তার সাক্ষ্য মেলে প্রয়াত শিল্পী-কবি পূর্ণেন্দু পত্রীর জবানিতে :

'কলকাতার বাতাসে তখন থরথরিয়ে কাঁপছে তাঁর পরান মাঝির ডাক। কলকাতার কবিরা ডুবে যেতে চাইতো এক বুক শস্যের ভিতর। অল্পকালে পরে তাঁর 'তোমাকে' নামের পাতলা ছিপছিপে কবিতার বইটি যখন ঘুরছে আমাদের হাতে, তার ভিতরের মন্ত্রধ্বনিতে আমরা হয়ে গেছি একই সঙ্গে প্রবল প্রেমিক আর পরাক্রান্ত যোদ্ধা' (ভূমিনি)।

বলাবাহুল্য, 'পরান মাঝি' কোনো চরিত্র নয়। আলোচ্য কবিতায় তার কোনো প্রত্যক্ষ উপস্থিতিও নেই। পরান মাঝি যেন কবির চৈতন্যরূপী সুতীক্ষ্ণ বিবেক। যতই দুর্দিন আসুক, তা যতই দুর্ভর হোক, দুর্যোগের কাল কেটে যাবেই। আর তাই 'বাঁকের মুখে' সংগ্রাম করার দায় বহন করতে শপথের মন্ত্রে ধ্বনিত হয় সময়ের বিবেকী কণ্ঠস্বর : 'পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে'।

বৃষ্টি থামার মধ্যে এ কবিতার সূচনা, আর শেষ মৃত্যুর বিভীষিকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায়। এক অভাবী কৃষক দম্পতির দুস্থ জীবনের অণু গল্পের সূত্রেও যে সংগ্রামের ছবি আঁকা যায় এ কবিতা তারই বিদ্রোহাত্মক শিল্পরূপ। আটটি স্তবকে বিন্যস্ত এই কবিতাটির একদিকে গল্পরসের আমেজ, অপরদিকে নাটকীয় টানের ওঠা-পড়া। প্রথম স্তবকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রস্তাবনা। দ্বিতীয় স্তবক থেকেই পরিস্থিতির টানটান উত্তেজনা। 'অনেকক্ষণ বৃষ্টি থেমে গেছে'। আপাতত দুর্যোগ নেই। ফুটো চাল থেকে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও কম। তাই খোকাকে শুইয়ে দেওয়া যায়। এরপরই সেই কঠিন বাস্তব। অভাবী সংসারে ভাঙনের ছবি। যে ধানের সঙ্গে সংগ্রামী মানুষের আজন্ম সম্পর্ক, গঞ্জের স্টিমার অভাবী মানুষের কপালের মতো নদীপথে ভাসিয়ে দেয় তাদের সারা বছরের আশা-ভরসা 'ধানক্ষেত'। রক্ত, ঘাম আর শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত তাদের শস্য কেন ধনিক শ্রেণির স্টিমারে ভরে ওঠে, কেনই-বা এই গঞ্জ হাসিতে উছলে ওঠে, কেনই-বা তাদের 'অভাবের নদীর ওপর', 'ওরা সব' পাঁজর গুঁড়িয়ে চলে যায়—এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই হৃতমান দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের কাছে। স্বভাবতই এই কঠিন সময়ে 'দংশিত বিবেক'-রূপ কবিকেই নিতে হয় মানুষকে জাগিয়ে তোলার দায়ভার :

> শোনো
> বাইরে এসো
> বাঁকের মুখে পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে
> শোনো—বাইরে এসো

আসন্ন দিন বদলের পালা। অবমানিত মানুষদের এবার ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সেই লড়াই সমাগত। তাই পরিবর্তনের অভিমুখে পরান মাঝির হাঁক। সমাজ বদলের লড়াইয়ের সাথী পরান মাঝির কাজই মানুষকে জাগানো। সময়ের জাগ্রত বিবেক বলেই বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে পরান মাঝি আমাদের জাগিয়ে দেয়, বিপর্যয়ের প্রতিরোধে রুখে দাঁড়াতে বলে। কাজেই অগণিত মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া ধান বোঝাই নৌকাকে রাতারাতি পেরিয়ে যাবার আগেই আটকাতে হবে। সামনে লড়াই। তাই 'কিন্দার বৌ শাঁকে ফুঁ দিয়েছে'। সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ মানুষের কণ্ঠে তাই সরাসরি উচ্চারিত হয় শপথের রণধ্বনি :

> এবার আমরা ধান তুলে দিয়ে
> মুখ বুজিয়ে মরব না
> এবার প্রাণ তুলে দিয়ে
> অন্ধকারে কাঁদব না।

শুধু তাই নয়, ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে লণ্ঠনের আলোয় শত্রুকে চিহ্নিত করে তারা ফেটে পড়ে অন্যায়ের প্রতিরোধে :

> আমাদের হাঁকে রূপনারায়ণের স্রোত ফিরে যাক
> আমাদের সড়কিতে কেউটে আঁধার ফর্সা হয়ে যাক

'শাসনের মুগুর মেরে' চুপ করিয়ে রাখার দিন শেষ। প্রতিরোধ গড়ে তোলার পালা এবার। বাঁচার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে তারা তাই ঘোষণা করে :

আমরা হেরে যাব না
আমরা মরে যাব না
আমরা ভেসে যাব না

হতাশাই শেষ কথা নয়। জীবন থেমে থাকে না। সংগ্রাম থাকেই। আর থাকে বলেই অস্তিত্বের সংকট সত্ত্বেও মৃত্যুর বিভীষিকার বিরুদ্ধে, সর্বব্যাপী শোষণের বিরুদ্ধে বাঁচার লড়াইয়ে জাগরণী মন্ত্রের মতো পথ-নির্দেশক হিসেবে পরান মাঝির ডাক শোনা যাবেই। কবিতার শেষ স্তবকে শেষ আশ্বাসেরই আহ্বান :

এসো বাইরে এসো
আমার হাত ধরো
পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে।

সৃষ্টি ও সংগ্রামে পরান মাঝির কম্বুকণ্ঠের ডাকই তো আমাদের উজ্জীবিত করে, প্রেরণা জোগায় সর্বোপরি প্রাণিত করে মহত্তর এক রাজনৈতিক প্রত্যয়বোধে। সেই কারণেই কৃষক যুবক ও বৌটি তখন আর শুধুই স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকে না, সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করে হয়ে ওঠে প্রকৃত 'কমরেড'।

কাকদ্বীপ আন্দোলনের অন্যতম নেতা গজেন মালীর দ্বীপান্তর-সংবাদে ব্যথিত কবির প্রতিক্রিয়া :

সূর্য-মুকুট নামিয়ে বলেছে সোঁদরবন
"তুমি ছাড়া বলো বেঁচে থাকা লাগে কি নির্জন
পীর গাজীদের গান থেকে এলে গজেন মালী
তোমার নামেই বন-বন্ধনে চেরাগ জ্বালি।"

(গজেন মালী : যখন যন্ত্রণা)

'পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে'-র মতো এ কবিতা ততটা শিল্পোত্তীর্ণ নয়, তথাপি চল্লিশের সেই প্রমেথিউস গজেন মালীর ঐতিহাসিক ভূমিকা তাঁকে দীপ্ত করেছিল অথৈ আবেগে। কারণ আন্দোলনের বাঁকের কোণে উচ্চারিত হয় বারবার এক নাম—গজেন মালী :

গজেন মালীর গলার শব্দে কেঁপেছে তারা
মার খেয়ে ঘুরে রুখে উঠেছিল বাঁচবে যারা। (ঐ)

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য 'একটি হত্যা' কবিতাটি। জনহীন রাজপথে শুয়ে থাকা রক্তাক্ত মানুষটির স্বপ্ন বিফলে যায় না। বরং প্রত্যয়ের গভীরতায় গুলিবিদ্ধ মানুষটিও পেয়ে যায় সংগ্রামী নায়কের মহিমা :

একটা হত্যার রক্তে ভেসে গেল শহরের মুখ
চমকে নিভল আলো। তারপর ঘন অন্ধকারে
তার খোলা চোখে এল আস্তে আস্তে ভোরের আকাশ

সেই চোখে চোখ রাখে এত সাধ্য ছিল না খুনীর।
ও যেখানে শুয়ে আছে সেখানেই জয়ের সম্মান
সেখানেই সূর্য ওঠে, সেখানেই জেগে থাকে ধান।
(একটি হত্যা : যখন যন্ত্রণা)

'কানামাছি' কবিতাটি সত্তরের বিক্ষুব্ধ রাজনীতির পালাবদলে উদ্বেগ কবির গভীর বেদনাবোধ থেকে উৎসারিত। প্রথমে সন্ত্রাসের বর্ণনা :

চোখে ছানি
হাতে ছোরা
রক্তাক্ত সময়

মাটিতে লুণ্ঠিত লাশ
হিম দেহে জেগে আছে ছুরি (কানামাছি)

তারপর একাত্তরের অভিমন্যু 'ব্যূহবন্দী উদ্‌ভ্রান্ত নায়ক'-এর প্রতি তীব্র মনস্তাপ :

শিরে চিতার দাহ গঙ্গা বয় ক্ষোভ হাহাকার
তোমার উদ্ধার তুমি অভিমন্যু হে বাংলা আমার।
(একাত্তরের অভিমন্যু)

পরিশেষে পুলিশ ভ্যান থেকে ছাড়া-পাওয়া তরুণের করুণ মৃত্যুতে বেদনার্ত কবির ব্যঙ্গোক্তি :

একটা গুলির শব্দ
আলোড়িত সবুজে সে গড়াগড়ি খেয়ে তিনবার, স্তব্ধ
সাবাস সাবাস বীর গণতন্ত্র রাহুমুক্ত হল। (দিনলিপি থেকে)

শেষ পর্যন্ত লেনিনের 'উদ্ভাসিত' 'দিব্য মুখ' স্মরণ করে তিনি অনুগত থাকতে চেয়েছেন জীবনের কাছে :

মাঠের শিশিরে আমি ফিরে পাই আমাকে আবার
এবং তোমাকে

তুমি
মানুষের ধ্রুবতারা
তুমি
স্পর্ধিত মানুষ।

আচ্ছন্ন ধানের গন্ধে ফিরে পাই তোমাকে আবার
সময়ের বন্দনায়
(১৯৬৯ সালে লেনিনকে স্মরণ করে : সময়ের কাছে, সমুদ্রের কাছে)

ক্রমাগত আত্মানুসন্ধানে নিজেকে ভেঙেচুরে গঠিত ও পুনর্গঠিত করে দায়বদ্ধ কবি ফিরতে চেয়েছেন মানুষেরই কাছে, সময়ের হাত ধরে :

১. মানুষ, আমার স্পর্ধিত মানুষ
সামুদ্রিক বিহঙ্গের মতো মুক্ত ও অবাধ
পাথরে চাঙড় ফাটিয়ে অঙ্কুরিত বীজ, মানুষ
(বিচিত্র মনটাজ : ঐ)

২. শক্তি নয়, সংঘ নয়, রাষ্ট্র নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তি নয়
জীবন, মানুষ, রূপ
দীনতা বিনয়ে
বিশ্বকে নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে বিশ্ব হয়ে যেয়ো।
(হো চি মিন মারা গেল আজ : ঐ)

তিন

শুধু বিষয় নয়, আঙ্গিককেও রাম বসু খুঁজেছেন 'অনাবৃত জীবনের' উৎসে। তাঁর সৃজনে তাই জীবন ও শিল্পের নিবিড় অধিষ্ঠান। উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হল 'রক্তাক্ত বাঘিনী' কবিতাটির কিয়দংশ :

নিটোল নিস্তব্ধ বনে অস্ত মেঘ, অকস্মাৎ আছড়ায়
রক্তাক্ত বাঘিনী তার পাটল গায়ের রঙ, অন্ধ রাগে
থাবা মারে। দাঁত ঘষে, মেঘ ফাটে, পাথরও কাতরায়
ঘুর খেয়ে লাফ দেয়। তপ্ত তামা চোখ, প্রতিবিম্ব লাগে
পিংগল পাহাড়ে। (যখন যন্ত্রণা)

নিসর্গ-সন্দর্শনের রূপকে এ কবিতায় ব্যঞ্জিত হয়েছে আদিম জীবনের বৃত্তান্ত। সঙ্গত কারণেই প্রাজ্ঞ সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছেন : 'এমন এক বলিষ্ঠ জীবন সৌন্দর্য, ভাষার এবং বাক্‌রীতির এমন এক সজীব প্রাণময় কঠিনতা এ কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে, যা সচরাচর বাংলা কবিতায় নজরে পড়ে না। ব্যঞ্জনা-সঞ্চারী নানা মৌখিক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ, কথ্যরীতির সঙ্গে গম্ভীর শব্দ সম্পদের সহজ ও অনিবার্য সংযোগ-সাধনে কবিতাটি রাম বসুরই শুধু নয়, আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও একটি স্মরণীয় কবিতা' (পরিচয়, ১৪১২)।

'ধলকাবাদের বাংলোয়' কবিতার কিন্তু অন্য স্বর, অন্য বাক্‌রীতি যেখানে কবি নিবিষ্ট হয়েছেন স্বগত গাম্ভীর্যে :

আমার ভাবনাগুলো এক ঝাঁক পাখি
মৃগনাভির গন্ধের মতো আমার ইচ্ছা
আধখানা চাঁদের মতো শাণিত উজ্জ্বল আমার শরীর
এলিয়ে দিয়েছি বাংলোর বারান্দায়।
আমি যেন একরাশ ফুলের ভেতর মুখ ডুবিয়ে
আমার অস্তিত্বের তলায় ডুবে যাচ্ছি। (দৃশ্যের দর্পণে)

বলিষ্ঠতার পাশাপাশি গীতিধর্মিতার এহেন সহাবস্থান রাম বসুর কবিতাকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। দিয়েছে অনন্যপরতা।

'পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে' সরাসরি রাজনৈতিক সংগ্রামের কবিতা। তথাপি সময়ের দাবি মেটাতে কবি এড়িয়ে যাননি শিল্পের দায়কে। আটপৌরে ভাষায়, প্রত্যক্ষ সিচ্যুয়েশন সৃষ্টির ইঙ্গিতময়তায়, প্রতীক চিত্রকল্প ও উপমার সমাহারে সর্বোপরি গদ্যছন্দের অসংকোচ প্রকাশে কবিতাটি রাম বসুর এক অনবদ্য শিল্পকর্ম। তাঁর অম্বিষ্ট যেহেতু কবিতা ও জীবনের অঙ্গাঙ্গী সংযোগ তাই এ কবিতার কেন্দ্রে রয়েছে এক অভাবী কৃষক দম্পতির সংগ্রামী জীবনচিত্র বা ঘটনা সংস্থান, তারই বর্ণনায় কবির মাধ্যমে সংলাপের ঢঙে বলা আটপৌরে ভাষা। 'বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ' 'ফুটো চাল থেকে আর জল গড়িয়ে পড়বে না' 'খোকাকে শুইয়ে দাও'—এহেন সিচ্যুয়েশন বর্ণনার ভঙ্গি সহজ ও অনাড়ম্বর। ভাব ও ভাষার সারল্য কত স্বচ্ছ, আবেগ কত তীব্র, শব্দের ওঠানামা ও নাটকীয় সংলাপে সাযুজ্য কত সহজাত হতে পারে এ কবিতা তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

অন্যান্য কবিতার মতো এ কবিতাটিও চিত্ররূপময়। 'পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে'—এ উচ্চারণ আজ স্থায়ী প্রবাদে পর্যবসিত, প্রতীকের অর্থময়তায় দ্যুতিমান। ব্যবহৃত উপমা ও চিত্রকল্পগুলিও জীবন সম্পৃক্ত, প্রসঙ্গসাপেক্ষ। 'মেঘের পাশ দিয়ে কেমন সরু চাঁদ উঠেছে', 'তোমার ভুরুর মতো সরু চাঁদ', 'তোমার চুলের মতো কালো আকাশে'—এ জাতীয় উপমা আদৌ প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ নয়। বাঁকা চাঁদকে কাস্তের সঙ্গে তুলনা এর অনেক আগে দেখা গেছে দিনেশ দাসের কবিতায় 'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে' বা সুধীন্দ্রনাথে 'আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ'। কিন্তু 'ভুরুর মতো সরু চাঁদ' বা 'চুলের মতো কালো আকাশ'-এর উপমায় ভিন্নতর দ্যোতনার প্রতিভাস। 'জলের তোড়ে' 'বাঁশের সাঁকো' ভেসে যাওয়ার সঙ্গে 'অভাবের টানে যেমন আমাদের আনন্দ ভেসে যায়' উপমার প্রয়োগ বাস্তবকে ছুঁয়ে যায় পরম মমতায়। 'আমাদের সড়কিতে কেউটে আঁধার ফর্সা হয়ে যাক' বা 'নিঃস্বতার সমুদ্রে একটা দ্বীপের মতো আমাদের বিদ্রোহ' বা 'আলো পড়েছে ঘোলা জলে রামধনুর মতো'—এইসব চিত্রকল্প শুধু অভিনবই নয়, মৌলিকও।

অনায়াস সারল্যে, সাবলীল স্বচ্ছতায় চল্লিশের কবিদের মতো রাম বসুও চারিত্রিক নিষ্ঠায় অর্জন করেছেন এমন বাক্‌সিদ্ধি যা তাঁর কলাকৃতির অনন্যতার পরিচায়ক। সেই অসাধারণ বাক্‌নির্মিতির কয়েকটি নমুনা :

১. তুমি আছ
যেন একটা সংগীত
সত্তার উদ্ভ্রান্ত সমুদ্রে ঝড়ের ঈগলের মতো দুলতে থাকে
রক্তের ওঠোন-পড়নে একটা মাত্র মুখের আদল জ্বলতে থাকে।
(তোমাকে : তোমাকে)

২. আমার ভালোবাসা যদি সমুদ্র হ'ত
আমার হৃদয় যদি হ'ত চৈত্রের আকাশ

আমি ধুয়ে দিতাম
আমি মুছে দিতাম
রক্ত, কান্না, হত্যা, পাপ। (সিংভূম : যখন যন্ত্রণা)

৩. সর্বাঙ্গে ধানের গন্ধ
কথা তার নদীর আওয়াজ
চোখ দুটি সান্ত্বনার
রূপে ঝরে নক্ষত্রের আলো
স্তিমিত বিদ্যুৎ হাসি কি মায়া ছড়ালো। (সেই মুখ : ঐ)

৪. লোকটা মজার। তার প্রতিপদে কাঁটার শত্রুতা
কথা বলতে গেলে শব্দ জাদুমন্ত্রে রামধনু হয়
সে অবাক চেয়ে থাকে মোহমুগ্ধ প্রেমিকের মতো
যেন তার দাবি দাহ কিছু নেই, নেই কোনো ক্ষোভ।
(একটা মজার লোক : অন্তরালে প্রতিমা)

৫. কথা বলতে চাই
কথা
বোধের আগুনে পুড়ে যেতে চাই
কথা থেকে
বাক্-এ
শান্তিতে (ভাবনা (অংশ) আট : রাম বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা)

সুমিতি বোধে, সহজ সারল্যে, সংহত দ্যোতনার কাব্যভাষা এখানে সবাক ও জীবন্ত। সহজ আলাপনের সূত্রে বর্ণিত আটপৌরে ভাষায় চল্লিশের কবিদের মতো রাম বসুর কবিতায়ও কখনো উঠে এসেছে সংক্ষিপ্ত কাহিনি, কখনো-বা সংলাপের টুকরো ছবি, আবার কখনো-বা ঘটনা-সংস্থানের রূপরীতি। যেমন :

১. আজ আবার ঐ পথে পা দিলাম
সেদিনের সম্রাট
ভিখারীর মতো চুপি চুপি

দূরে দেখছি
সেপাই ছাউনি ফেলেছে
মন্দিরের মাঠে
বাঘের পিছনে ঢেউ-এর মতন সেবাদল
তাদের চাপা চাপা কথা ভেসে আসছে
আমি চলেছি। (এক বুক শস্যের ভিতর : তোমাকে)

২. বাঁকের মুখে যাও, কে?

লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দাও
লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দাও।
আমাদের হাঁকে রূপনারানের স্রোত ফিরে যাক
(পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে : ঐ)

৩. "একসঙ্গে কোথায় যাব গো
তোমার রক্তের বিষ আমার রক্তের বিষে মিশে
নীলমণি হবে যে আবার
একসঙ্গে কোথা যাব গো?"

"তুই যা রে উত্তরের দিকে, আমি
যমের দক্ষিণে।" (সোহাগীর সংসার : যখন যন্ত্রণা)

সমান পারদর্শিতা চিত্রকল্প নির্মাণেও :

১. লুকোনো পাহাড় হীরা হয়ে জ্বলে উজ্জ্বল রোদ্দুরে (উত্তরমেঘ : তোমাকে)
২. সিংভূম, তোমার কঠের রূপসী শরীরের বাঁকে শিল্পীর সংযম
পেখম তোলা ময়ূরের মতো রোদের বনস্থলী। (সিংভূম : যখন যন্ত্রণা)
৩. বিদ্যুৎ-কৃপাণ হাতে কাপালিক-মেঘ পাহাড় চূড়ায়
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন ভয়ে ডাক ছেড়ে মাথা আছড়ায় (যখন যন্ত্রণা : ঐ)
৪. পাহাড়ের কাঁধে মাথা রেখে রাতের চোখ ঢুলে আসে
যেন ক্লান্ত মদির সুঠাম ওরাং মেয়ে
শুকতারা কপালের টিপ (নৈঃশব্দের দেশ : ঐ)
৫. অন্ধকার থাবা তুলে, ফুলে' ফুলে' গর্জায় গাছ। (সোহাগীর সংসার : ঐ)

এইসব আশ্চর্য চিত্রকল্পের হাত ধরে আমরা পৌঁছে যাই কবিতার অন্তর্লোকে। ইঙ্গিতে ও বৈচিত্র্যে ঋদ্ধ এইসব চিত্রকল্প শুধু বস্তুগত অর্থই তুলে ধরে না, পাঠককেও নিয়ে যায় চেতনার ভিন্ন কোনো অনুপ্রেরণায় ও দীক্ষায়।

চার

রাম বসুর অনুভবে, 'আত্মানুসন্ধানই জীবন'। তাই সেই শিকড়ের টানে জীবনের উৎসে ফেরার জন্য তিনি চেয়েছিলেন 'নাটকের মাধ্যমে কবিতাকে কাছাকাছি' আনতে। কারণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এই সত্যে তিনি উপনীত হয়েছিলেন, মানব জীবনের চৈতন্যের গভীরে এমন কিছু স্তর আছে যার নির্মাণ কাব্যনাট্য ব্যতীত অসম্ভব। আর এ-ভাবেই তাঁর কাব্যনাট্যের শুরু। তাঁর বেশির ভাগ কাব্যনাট্যে ইতিহাসের প্রবহমানতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে মানবজীবনের বিচিত্র সমস্যার দ্বান্দ্বিক রূপ। কোথাও নায়ক নায়িকার তীব্র মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব (যেমন 'নীলকণ্ঠ'), কোথাও প্রকৃতির চিত্রে বিম্বিত মানবসত্তার প্রসারিত রূপ। শমীকের পাপবোধের বৈপরীত্যে মায়ার 'প্রাকৃতিক' হয়ে ওঠার মন্ত্রাজ্ঞ 'পাহাড়ের ডাক'

কাব্যনাট্যের উপজীব্য। সত্তরের সেই অস্থির সময়ে, নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত 'পার্থ ফিরে এলো'-তে ব্যক্তিত হয়েছে ঘরছাড়া পার্থদের জীবন সংগ্রাম ও পরাজয়ের ব্যর্থতা। 'গ্রীষ্ম' কাব্যনাট্যে অপর্ণা ও সুশান্তর চিড়ধরা দাম্পত্য সম্পর্কের বিবর্ণ রূপ প্রকট। আর 'মন্ত্র খুঁজি মাটিতে আকাশে' কাব্যনাট্যে বিশ্বাসের বৃত্তভূমিতে অমল খুঁজে ফেরে জীবনের প্রকৃত মানে।

তবে 'জীবনের পায়ে' নতজানু হলেও মার্কসবাদী কবি রাম বসু নৈরাশ্যের কাছে কখনোই আত্মসমর্পণ করেননি। 'পৃথিবীর গর্বিত মানুষ' হিসেবে তিনি চেয়েছিলেন 'নদীর মতো আবহমান কাল গান গাইতে'। তাঁর একান্ত অভীপ্সা : জীবন ও মানুষের 'স্বধর্ম উদ্ধার'। তাই সময়ের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে তিনি সংকল্প করেন 'হৃদয়কে সময়ের ঊর্ধ্ববৃত্তে নিয়ে যেতে হবে'। সে কারণেই তাঁর আহ্বান : 'হৃদয়ের মুক্তির জন্য ইতিহাস নয়, চাই আকাশ আর বিশ্বাস' (আজ যখন)। সেই কাঙ্ক্ষিত আকাশ ও বিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনতে 'পরম বাধ্যকতায় নিবেদিত' অগ্নিহোত্রী কবি নক্ষত্র, মৃত্তিকা আর সময়ের কাছে পাঠ নিতে ঐকান্তিক কামনায় উচ্চারণ করেছেন অপরাজেয় মানব মহিমার স্তোত্র। এ উচ্চারণ রাম বসুর একান্ত নিজস্ব। সে নিজস্বতার অপর নাম আত্ম-আবিষ্কার।

উপন্যাস

এক হিন্দুস্থানী

গোলাম কুদ্দুস

বহির্বিশ্বের মানুষের কাছে আমরা ভারতবাসী মাত্রই হিন্দুস্থানী। কিন্তু দেশের মধ্যে, নানা জাতির সমন্বয়ে গঠিত যে মহাজাতি, সেখানে আমরা বাঙালী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দুস্থানী... এই অর্থেই এই লেখার শিরোনামে শোভা পাচ্ছেন 'এক হিন্দুস্থানী'।

কমরেড মহাবীর প্রসাদ সিং ছিলেন বিহারের ছাপরা জেলার অধিবাসী। কলকাতায় এসে বহু বছর আমাদের সুখ দুঃখ আপদ বিপদ সংকটের ভাগীদার হয়ে তাঁর অমূল্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কাটিয়ে গেছেন। স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর দুই যুগেরও বেশি কালস্রোত বয়ে গেছে। আজ তাঁর স্মৃতি অতি ঘনিষ্ঠদের কাছেও বিবর্ণ ম্লান। আবার সেই ঘনিষ্ঠরাও আজ অনেকেই গতায়ু। তবু কেন কমরেড মহাবীরজীকে স্মরণ করা? কত মহান কমরেডের স্মৃতিই তো বিস্মৃতির অতলে বিলীন।

কিন্তু মহাবীরজীর যে এখনো আমার স্মৃতি-মন্দিরে অনির্বাণ দীপ-শিখার মত জ্বলছেন। সেই আলোর একটু ঝলক যে এখনো অন্যের চোখে বুলিয়ে দিতে আমার প্রাণমন উন্মুখ। তা আমি পারব কিনা, সে প্রশ্নটা ছাপিয়ে আমার হৃদয় প্রকাশের তাগিদ অনুভব করছে।

মহাবীরজীর প্রতি কেন আমার এত টান? আমি তাঁর মধ্যে দেখেছিলাম দৈহিক ও আত্মিক বলের যুগলবন্দীর অপূর্ব রূপ। সে রূপ ভোলা যায় না। তাই আজো তিনি আমার কাছে আকর্ষণীয়, আদরণীয়। হয়ত এ আমার এক প্রকার অন্ধত্ব, অনাবশ্যক পক্ষপাতিত্ব, অহেতুক দৌর্বল্য। এতদিনেও এ থেকে আমি যদি মুক্ত না হতে পারি, তবে আর কবে আমার ভাবের ঘোর কাটবে। আমার নয়নে শুধুই কি মোহ-অঞ্জন? অথবা দু'চোখ ভরে এক নর-শ্রেষ্ঠকে দেখার অনাবিল আনন্দ? জানি না। তবে সাহিত্যে রাজা-রাজড়ার যুগ অস্ত গেছে, সবাই বলছেন সাধারণই আসধারণ হয়ে উঠছেন।

একটা ব্যাপার ভেবে দেখার মত। বঙ্গ-সাহিত্য মহান এবং উদার, তার সুপ্রশস্ত অঙ্গনে সব জাতির মানুষের অবাধ পংক্তি ভোজনের অবারিত দ্বার। তবু অবাক হতে হয় কেন বহিরাগত ভিন্ন ভাষাভাষীরা, বিশেষত হিন্দীভাষী মানুষেরা বঙ্গ সাহিত্যে তেমন স্থান পাননি, যদিও তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর উল্লেখযোগ্য অংশ এবং ক্ষেত্র বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠও বটে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে তাঁদের বিষয়টি যথেষ্ট আলোচিত এবং উচ্চারিত, কিন্তু সাহিত্যের মঞ্চে তাঁদেরকে বাঙ্ময় করে তোলা হয়নি। তাঁরা হয় অনুপস্থিত, বা কদাচিত বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী।

উন্নাসিক বাঙালীরা একদা তাচ্ছিল্যভরে বিহারের বহিরাগতদের বলতেন খোট্টা। আমি মহাবীরজী সম্পর্কে কাঠখোট্টা ভাষায় লিখতে পারিনি। গল্পের ভঙ্গিতে তাঁকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে যদি এই রচনাটি জীবনোপন্যাসের ধাঁচপ্রাপ্ত হয়, তাতে বিস্মিত হব না। তাছাড়া এতদিন পর যে স্মৃতি-মন্থন, তাতে কিছু ভ্রান্তি থাকবে না বা কিছু কল্পনার উপাদান অনুপ্রবেশ করবে না এমন দাবি অযৌক্তিক এবং অসমীচীন মনে করি।

দুই

মহাবীর প্রসাদ সিং এবং কমল মিশ্র ছিলেন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। দু'জনেই একই গ্রামের

একই স্কুলের সহপাঠী। দু'জনেই সাধুদের পাল্লায় পড়েছিলেন, সহস্র বছর জীবন লাভের ধোঁকাবাজিতে ভুলে গুপ্ত মন্ত্র আয়ত্তের আশায় সাধুর চেলাগিরি করতেও পিছপা হননি। তবে দু'জনেরই কাঁধের উপর মস্তক এবং মস্তকের মধ্যে মস্তিষ্ক থাকায় ভণ্ডামীতে আটকে পড়েননি। দুজনেই এরপর স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে মহা উৎসাহে পড়াশোনার ইতি ঘটিয়ে বিহারের গ্রামে গ্রামে স্বদেশী প্রচারে মেতেছিলেন। এবং আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর বীতশ্রদ্ধ হয়ে মহানগরী কলকাতার উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছিলেন।

মহাবীরজীরা বংশানুক্রমে পালোয়ান এবং দারোয়ান। কমলজীরা বংশানুক্রমে শিক্ষক।

কলকাতায় পা দিয়ে মহাবীর সিং চলে গেলেন দারোয়ান ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে রানী রাসমণির বাড়িতে, কমলজী গিয়ে উঠলেন বেলেঘাটায় শিক্ষক-মামার বাসায়।

রানী রাসমণির গৃহে দারোয়ানদের জন্যে একটা কুস্তির আখড়া ছিল, ভাইদের সঙ্গে মিলে মহাবীরজী মহানন্দে মল্লক্রীড়ায় মত্ত হলেন। কমলজী মাঝে মাঝেই আসতে লাগলেন মহাবীরজীর কাছে। কিন্তু অপর পক্ষের তেমন সাড়া না-পাওয়ায় আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়লেন এবং শেষে যাতায়াত বন্ধ করে দিলেন। মহাবীরজী বন্ধুর গা-ঢাকা দেওয়াটা প্রায় লক্ষ্য বা অনুভবই করলেন না, পুরনো সখ্যতার বদলে তিনি বাহুবলের নতুন আস্বাদ পেয়ে প্রায় অন্য রকম হয়ে গেলেন।

তিন

তখন বৃটিশ আমলে কলকাতায় বড়দিনের ছুটি কাটাতে বড়লাট আসতেন দিল্লী থেকে। রাজদর্শনে দেশের নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসতেন বশম্বদ, দেশীয় রাজা, নওয়াব, জমিদার এবং শিল্পপতি। কলকাতার অভিজাতরাও রাজদর্শনে ব্যাকুল হতেন। রায় বাহাদুর এবং খান বাহাদুররা আগে থেকেই নতুন পোশাকের অর্ডার দিতেন। বড়লাটের টি-পার্টির আমন্ত্রণ-পত্র সংগ্রহের জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত। আর সে-সময় আসতেন নামজাদা কুস্তিগীর পালোয়ানরা কুস্তি লড়তে। তাঁদের মধ্যে গামা পালোয়ান ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত।

তখনকার দিনে খ্রীষ্টমাসে বিনোদন-ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না। কিছু সার্কাস-দল আসত, সেটা ছিল অন্যতম আকর্ষণ। কিন্তু সব চেয়ে বোধহয় বেশি হুড়োহুড়ি পড়ে যেত কুস্তির লড়াই দেখতে। এ-ব্যাপারে হিন্দীভাষীদের উৎসাহটা ছিল সমধিক। একবার গামা পালোয়ান এলেন না। কিন্তু তাতেও উৎসাহে ভাটা পড়ল না, গামার ভ্রাতা ইমাম বক্সের আকর্ষণ যথেষ্টই ছিল।

মহাবীর প্রসাদ সিং আগে গামা পালোয়ানের কাছে ঘেঁষতে ব্যর্থ হন। এবার কিন্তু ইমাম বক্সের সান্নিধ্য লাভ করে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করলেন। দিনরাত সেবার দৌলতে ইমাম বক্সের স্নেহধন্য হয়ে উঠলেন। বিনিময়ে পেলেন কিছু কুস্তির তালিম, এমন কি কিছু গোপন ঘরানার দীক্ষা। আর পেলেন কুস্তির প্রস্তুতির জন্য লম্বা খাদ্য-তালিকা। সকালে ঘণ্টাখানেক শ্রমসাধ্য ব্যায়ামাদি শুরু করার আগে উষালগ্নে উঠে খেতে হবে এক পোয়া

ঘৃত। সেইসঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে কিসমিস পেস্তা, বাদাম, আখরোট প্রভৃতি পাকস্থলিতে প্রেরণ করা চাই। ভাগ্যিস, এক দারোয়ান-খুড়ো রিটায়ার করার আগে প্রভুর অনুগ্রহে ভাইপোকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন, তবু মহাবীরজী দেখলেন তাঁর মাইনের গোটাটাই খাদ্য-তালিকা শুষে নিচ্ছে। দেশের বাড়িতে মাণি-অর্ডার পাঠানো বন্ধ। মহাবীরজীকে রক্ষা করলেন তাঁর সহৃদ কর্মরত দুই ভ্রাতা, তাঁকে উৎসাহিত করে বললেন, তুই চালিয়ে যা, আমরা তো রয়েছি। অতএব, খাদ্য-তালিকা মেনে কুস্তির কসরত চলতে লাগল।

পরের বছর গামা বা ইমাম বক্স কেউ বড়দিনে কলকাতার খেলায় এলেন না, এলেন না আরো কিছু নামী পালোয়ান; সবাই পাড়ি জমালেন বরোদা রাজ্যে মহারাজের আমন্ত্রণে। যাঁরা এলেন তাঁরাও নেহাৎ ফেল্‌না নন, আগের মতই তাঁরা আসর জমিয়ে তুললেন। একটা নাম ঘন ঘন উচ্চারিত হতে শোনা গেল—ভীম সিং। তাঁকে ইতিপূর্বে কলকাতায় দেখা যায়নি। লোকটি অযোধ্যাবাসী, পরম রামভক্ত, কিন্তু বড্ড বেশি দাম্ভিক। এবং মুখটা একটু আলগা। পরপর কয়েকটি মল্লযুদ্ধে জয়লাভের পর যখন তিনি শেষ খেলায় উপনীত হলেন, তখন তাঁর মুখ দিয়ে অশেষ শ্লেষ ব্যঙ্গ এবং স্থূল গালাগালি নির্গত হতে লাগল।

শেষ খেলায় ভীড়ের বন্যা বইছিল। কলকাতা যেন ভেঙে পড়েছিল কুস্তি দেখতে। আর কলকাতার সেরা পালোয়ানদের সেদিনই ছিল শক্তি-পরীক্ষার সুযোগ।

ভীম সিং লফিয়ে নামলেন আসরে। দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে। কলকাতার কোন পালোয়ান দ্বৈরথে নামবেন প্রথমে? কাউকেই তো এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না। তাঁরা প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু এখন কি ভীম সিং-য়ের তর্জনগর্জনে ঘাবড়ে গেলেন? চতুর্দিক নিঃশব্দ, থমথমে।

ততক্ষণে ভীম সিং-য়ের গর্জন সব শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করেছে—আও কলকাত্তা কো চুহাকো বাচ্চা, আও কলকাত্তাকো বিল্লী কো বাচ্চা, আজও কলকাত্তাকো চিংড়িখানে ওয়ালে...

দর্শকরা চঞ্চল হয়ে উঠল। এদিকে ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল—এমন কেউ কি নেই যে কলকাতার সম্মান বাঁচাতে পারে?

বেয়াদব লোকটা সমানে চিল্লাচ্ছে। আজকের দিন হলে ওর ঘাড়ের উপর মুণ্ডু থাকত?... আংরেজ তোমারা হিম্মত ছিন লিয়া! কলকাত্তাকো গোলামী কা সেণ্টার বনা দিয়া? সব কে গিদ্দড় বনা দিয়া? কুত্তাকা বাচ্চা বনা দয়া, উল্লুকা পাঠ্যে বনা দিয়া?

কলকাতায় দাঁড়িয়ে কলকাতার এত লোকের সামনে এমন চিল্লানি? লোকটা পাগল নাকি? স্থানকাল পাত্র জ্ঞান নেই। মহাবীর প্রসাদ সিং-য়ের রক্ত গরম হয়ে উঠছিল, খানিকটা তৈরি হয়েও এসেছিলেন, তাঁর ক্ষীণ আশা ছিল কুস্তির কোনো একটা পর্যায়ে তাঁর একটা চান্স মিলতেও পারে, কিন্তু হঠাৎ এমন একটা পরিস্থিতির জন্যে তৈরী ছিলেন না। দর্শকেরাও বোধ হয় তাই, সবাই স্তম্ভিত হয়ে ক্ষণতরে থমকে গিয়েছিল, সহসা মহাবীরজীর মনে হল এরূপ চলতে দিলে যে-কোনো মুহূর্তে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেতে পাবে কিন্তু কুস্তির আঙিনায়

ঝাঁপিয়ে পড়লে যদি তাঁর চেয়ে বয়স্করা ক্ষুব্ধ হন? যদি তাঁর হঠকারীতায় ক্রুদ্ধ হন? কিন্তু আর কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়? এই যখন তাঁর মনের অবস্থা, এমন সময় কে বা কারা তাঁকে ধাক্কা মেরে আসরে ঢুকিয়ে দিল। মহাবীরজী অগত্যা ত্বরিতে বহিরাবরণ খুলে বন্ধুদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। শুরু হয়ে গেল কলকাতার মান রক্ষার পালা।

অথচ তখনকার দিনে কলকাতার প্রায় সব পালোয়ানই ছিলেন পশ্চিমা, কেউই স্থানীয় বাসিন্দা নয়, তবু কলকাতার অপমান তাঁদের গায়ে বিঁধেছিল। ভীম সিংয়ের বিদ্রূপবাণ মহাবীরজীর অন্তরে জ্বালা ধরিয়ে না দিলে কুস্তির ফলাফল কলকাতার অনুকূলে না-ও যেতে পারত। লড়াইটা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়নি, তড়িতবেগে ঘটনাটা ঘটে গেল। সবাই সবিস্ময়ে দেখল অত বড় পালোয়ানের বুকের উপর অখ্যাত মহাবীর প্রসাদ সিং চড়াও হয়ে তাঁর দু'টো কাঁধ মাটিতে চেপে ধরেছেন। উল্লাসে ফেটে পড়ল দর্শকবৃন্দ।

চার

এই বিজয়োল্লাসে ভাটা পড়ল না। রাতারাতি মহাবীরজী কলকাতার পালোয়ানকুলের গুরু হয়ে উঠলেন। তাঁর চাঁদনিচকের পিছনের টেম্পল রোডের ঘরখানা এতদিনে লোকসমাগমে সরগরম হয়ে উঠল। ভারতের নানাজাতির মানুষদের এই বিশাল ফ্ল্যাটবাড়ির ডজন খানেক পরিবারের বাসিন্দারা পর্যন্ত এত লোকসমাগমে কৌতূহলী হয়ে তাঁদের দারোয়ানজীর ঘরে এসে খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

নবীন কুস্তিগীরদের উৎসাহটা বেশি। তাদের দাবি, তাদের গুরুজীকে একটা নতুন কুস্তির আখড়া খুলতে হবে।

টাকা কোথায়?

একবাক্যে জবাব এলো—টাকা আমরা তুলে দেব। মহাবীরজী সংশয়ে দুলতে লাগলেন, একটা বাড়তি বোঝা ঘাড়ে চাপবে যে।

গভীর রাতে আখড়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতে এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। সব কলরব থেমে গেছে। শহর নিদ্রামগ্ন। মহাবীরজীর মনের মধ্যে তীক্ষ্ণ ব্যথার মত একটা কী যেন শূন্যতা। একটা কিসের যেন তীব্র অভাববোধ। নিজেই নিজের মনের মধ্যে হাতড়ে ফিরতে লাগলেন। অবশেষে ব্যথার নির্দিষ্ট সূত্রটা খুঁজে পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে দারুণ অভিমান জেগে উঠল—এত লোক তাঁর কাছে আসছে, বন্ধুর একটু সময় হল না! কমলের কি পাষাণ-প্রাণ? এত বড় খুশির খবর তার কাছে পৌঁছায়নি, এ তো হতে পারে না।

অভিমান ক্রমে ক্রমে আত্মগ্লানিতে ভরে উঠল। বন্ধু তো বেশ কিছুদিন ঘন ঘন এসেছেন, তাঁর কাছে মহাবীরজী ক'বার গিয়েছেন? নতুন কুস্তির নেশায় মত্ত হয়ে থেকেছেন; কমলকে দোষ দিয়ে লাভ কী। অথচ এমন মনে হচ্ছে, সহস্র লোকের অভিনন্দনের চেয়ে কমলের চোখের হাসিভরা নীরব সমর্থন না পেয়েই এত শূন্যতাবোধ। ঘুম আসছে না, বন্ধুর ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা ছুরি হয়ে বুকে বিঁধছে। না, কাল সকালে মহম্মদই যাবে পর্বতের কাছে। ভাবামাত্র মহাবীরজী ঘুমিয়ে পড়লেন।

পাঁচ

সকালে উঠেই ত্বরিতে প্রস্তুত হয়ে মহাবীরজী বন্ধুর সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করতে রওয়ানা দিলেন। পথে যেতে যেতে মনে হল, ভালোই হল, আখড়া খোলার ব্যাপারেও কমলের মতামত নেব। এতদিন দুই বন্ধু যা করেছেন, পরস্পর পরামর্শ করেই তো করেছেন।

বেলেঘাটায় কর্পোরেশনের প্রাইমারি স্কুল। বাইরের সাইনবোর্ডটি ঝক্‌ঝকে নতুন, কিন্তু বাড়িটা জীর্ণ কঙ্কালসার। ভিতরে ঢুকে মহাবীরজী এক ঝাঁক কলরবমুখর-শিশুমুখ দেখতে পেলেন, কিন্তু কমল নেই। মহাবীরজী বিস্মিত হলেন। কমলের বাড়িতে গিয়েও তাকে পেলেন না। সে গেল কোথায় সাত সকালে। স্কুলের বাইরে বেরিয়ে আসতে মহাবীরজীর পা সরছিল না, শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে মনের সুখে বাচ্চাগুলো চিল্লাচিল্লি করছে, তাদের মুখগুলো আনন্দে উদ্ভাসিত, ফুলের মত এতগুলো মুখ মহাবীরজী অনেকদিন দেখেননি, শৈশবের পাঠশালার কথা মনে পড়ে গেল। কুস্তির গুঁতোগুঁতির মধ্যে বেশিকাল মগ্ন থাকার পর সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃশ্য মহাবীরজীকে মুগ্ধ করল। ভাঙাবাড়ির মধ্যে কুশ্রী-আসবাবহীন ঘরে ভাঙা বেঞ্চিতে উপবিষ্ট শিশুদের মুখশ্রী কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

মহাবীরজী ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলেন। এতদূর এসে ফিরে যাবেন? রাস্তায় একটু অপেক্ষা করে দেখাই যাক না।

পরক্ষণেই একদল উত্তেজিত মজুর শ্রেণীর লোকের সঙ্গে কমলজীকে আসতে দেখা গেল। তিনি মহাবীরজীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই স্কুলে ঢুকে গেলেন। স্কুল ছুটি হয়ে গেল। শিশুরা সোল্লাসে বেরিয়ে এল। উত্তেজিত লোকগুলো তখন স্কুলের ভিতর ঢুকল। এ-সব কী হচ্ছে? যাই হোক, মহাবীরজীও স্কুলে ওদের পিছন পিছন ঢুকলেন।

কমলজী লোকগুলোকে নিয়ে বাক্যালাপ করতে লাগলেন, একবার মহাবীরজীকে বসতেও বললেন না। মহাবীরজী দাঁড়িয়ে ওদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তিনি এসেছিলেন এই আশায় যে, বন্ধুর কাছ থেকে অন্তত একটু অভ্যর্থনা, একটু মুখের হাসি পাবেন। একবার মনে হল, চলে যাই, কিন্তু মনস্থির করতে না পেরে কলকাতার পালোয়ানকুল বন্দিত বিজয়ী বীর ভ্যাকাচ্যাকা খেয়ে এক ঠাঁই পাষাণবৎ স্থির হয়ে রইলেন। এত বড় অপমানে যেন চোখ ঠিকরে আগুন বের হতে লাগল। সেদিকে না তাকিয়ে বন্ধুবর একটু পরে লোকজনকে নিয়ে তাঁর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেলেন—বাহুবল ব্রুট ফোর্স।

আবার পিছন ফিরে যেন দয়াপরবশ হয়ে বললো, জরুরী কাম হ্যায়, দুস্‌রা দিন আও।

মহাবীরজী ক্রুদ্ধ স্বরে শুধু বলতে পারলেন—অভি নেহি আয়েঙ্গে।

ছয়

জাঁক করে বলে এলেন বটে আর ও-মুখো হবেন না, তবু রাত-না-পোহাতেই মহাবীরজীর মনে এক ঝাঁক প্রশ্ন দেখা দিল। মাত্র এক বছরের মধ্যে প্রিয় বন্ধু কী করে এতটা বদলে

গেল? ঐ শীর্ণ চেহারার লোকগুলিই বা কারা? তারা কি বন্ধুর এতটাই প্রিয় যে কমল তার এতদিনের মহাবীরকে এমন অনায়াসে এমন নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষা করতে পারল? দু'টো বাক্যালাপের মত সময় হল না? মহাবীরজীকে নিয়ে যখন কলকাতা সরগরম, তখন তাকে উদ্দেশ্য করে 'ব্রুট ফোর্সে'র মত কটুকথা প্রয়োগের অর্থ কী—? একজনের খ্যাতিতে কি অন্যজন ঈর্ষান্বিত? কিন্তু কমলের ক্ষেত্রে সে তো অসম্ভব। তার তো খুশিতে ফেটে পড়ার কথা ছিল। সব প্রশ্ন এক সঙ্গে ভীড় করে এসে মহাবীরজীকে রাত্রে জাগিয়ে রাখল। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। শয্যায় গা ঢেলে দেওয়া মাত্র যার এক ঘুমে রাত কাবার, তার এমন নিদ্রাহীনতা। কমলের সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। কথাটা ভাবামাত্র মহাবীরজীর দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

জেদী মন তবু আলোয়ানকে কয়েকদিন পিছু টেনে রাখল। শেষে থাকতে না পেরে বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে হাজির। যাবতীয় হেঁয়ালির সাফ সাফ জবাব দাবি করলেন মহাবীরজী।

কমলজী মুখ গোমড়া করে বললেন, আমার কথায় বিন্দুমাত্র রহস্যের আঁচ নেই। মহাবীর, তুমি সেদিন যাদের দেখেছিলে, তারা জুটমিলের মজুর। ধর্মঘটী মজুর। চারমাস ধরে ওদের ধর্মঘট চলেছে। এমন কী হচ্ছে জানো? রোজ মজুর বস্তিতে গুণ্ডাদের হামলা হচ্ছে। সেদিন সকালে গুণ্ডারা বস্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। ঐ মজুররা বাড়িছাড়া ঘরছাড়া হয়ে ছুটে এসেছিল। এরা সবাই আমাদের ছাপরা জেলার লোক। আর গুণ্ডারাও আমাদের ছাপরা জেলার লোক, ভাবতে পারো? আরও শুনতে চাও? এই গুণ্ডারা তোমার মত পালোয়ান! আঙ্‌গরেজ মালিকদের পোষা পালোয়ান। না, পোষা ডালকুত্তা। সাধে কি বলি, বাহুবল ব্রুট ফোর্স। আমার কাছে পালোয়ানির জয়-পরাজয় দেখাতে এসো না। ঘেন্না ধরে গেল।

এই বলে কমলজী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। স্তম্ভিত মহাবীর নির্বাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলেন তারপর ধীরে ধীরে তাঁর নতুন কুস্তির আখড়া গড়ার পরিকল্পনার কথা জানালেন। এবং প্রশ্ন করলেন, "তা হলে আখড়ার কাজ বন্ধ করে দি? তুমি কী বল? আখড়া টাখরা করে কী হবে, সবই যখন ব্রুট ফোর্স?"

কমলজী এতক্ষণে একটু নরম হয়ে হাসলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সবই ব্রুট ফোর্স নয়, এক বিশেষ অবস্থায় ব্রুট ফোর্স। যখন মালিকরা জমিদাররা গরীবদের খেলাপ 'মাস্‌ল পাওয়ার' ব্যবহার করে, তখন বাহুবল পশুবল। এমনিতে শক্তি তো মানুষকে সুস্থই রাখে, সাহস দেয়। এই দেখ না আমাদের বহুলোক যারা ফ্যামিলি ছেড়ে কলকাতায় আসে, পুলিশে কাজ করে, ডালহৌসী স্কোয়ারের অফিসে অফিসে এবং লোকের বাড়িতে বাড়িতে দারোয়ানি করে, তারা কেন বেশিরভাগই কামপ্রবৃত্তির বশ হয় না? শরীর-চর্চা করে বলেই না। সেদিক দিয়ে কুস্তির আখড়া ভালো। তোমাকে কুস্তির আখড়া খুলতে বারণ করব না যদি বাহুবলের সঙ্গে আত্মিক বলেরও কাজ করে যাও। তা না হলে খালি হাত-পা ছুঁড়ে কী লাভ। আত্মিক বল ছাড়া বাহুবলের কোনও মানে হয় না। আত্মিক বলের সাহায্যে মালিকদের পেটোয়া পালোয়ানদের মধ্যেও কিছু একটা করা যায়, বুঝেছ?'

"না বুঝিনি। আত্মিক বল মানে কী? মান্ধাতা আমলের আধ্যাত্মিক বল? তুমি-আমি কম ঘুরেছি আধ্যাত্মিক বলের জন্যে? দেখিনি সাধুদের ভণ্ডামী? তুমি-আমি সাধুবাবাজীদের পিছন পিছন দুই-তিন বছর লেগেছিলাম না? কত সেবা করেছি তাদের পেটের কথা বের করতে। শেষে তাদের ভণ্ডামী ধরতে পেরে সরে এসেছি না? বাব্বা। এক সাধু ধোঁকা দিয়েছিল হাজার বছর বাঁচার মন্ত্র জানে। সেই সব বস্তাপচা আধ্যাত্মিক বলের কথা আবার বলছ?"

"না, তা বলিনি। এ যুগের আত্মিক বল অন্যরকম।"

"কী রকম?"

"তার নাম মার্কসবাদ।"

"সেটা আবার কী?"

"তুমি যদি জানতে চাও, আমি বইপত্তর দিতে পারি।"

"আচ্ছা দিয়ো।"

কমলজী এবার কোমল স্বরে শুধালেন, "তোমার আখড়ায় কোন ধরনের লোক আসতে পারে?"

"কাছাকাছি লোকেরাই বেশি আসবে। এই ধরো লালবাজারের কনস্টেবলরা, ডালহৌসির দারোয়ানরা।"

"তা'হলে তো তোমার আখড়ার দাম আছে।"

"দাম। কিসের দাম?"

"সে নিয়ে একদিন কথা বলব। এখন সময় নেই, দেখি মজুরবস্তিতে কী-হচ্ছে। তুমি শুরু ক'রে দাও।"

"কিন্তু..."

"আহা, দেখোই না কী হয়।"

সাত

বলা যায় মহাবীরজীর সাংগঠনিক কাজে হাতেখড়ি হল কুস্তি-আখড়া প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায়। এর স্বাদ অবশ্য আগেই কিছু পেয়েছিলেন তিনি বিরাট ফ্ল্যাট বাড়ির দারোয়ানির কাজ করতে গিয়ে। বাড়িটার মালিক এক বনেদী-বাঙালী পরিবার। মহাবীরজী ওঁদের এতটাই বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন যে, ওঁরা বাড়ির সব দায়িত্বই ছেড়ে দিয়েছিলেন তাঁর হাতে। যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, জল-বিদ্যুৎ পৌর-কর প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং হিসেবপত্র রাখা, এমন কি ভাড়াটে বিদায় এবং নতুন ভাড়াটে বসানোও তাঁর কাজের এক্তিয়ারে। সময় বিশেষে কোনো ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের অভিভাবকত্ব পর্যন্ত তাঁকে কার্যত গ্রহণ করতে হয়। এক পার্শী পরিবার তো তাঁর প্রায় নিজের আত্মীয় হয়ে উঠেছে। কর্তাব্যক্তিটি নেভি ইঞ্জিনিয়ার, বছরের অধিকাংশ সময় জাহাজে জাহাজে বাইরে বিশ্বভ্রমণ করে বেড়ান, তখন তাঁর ছেলেমেয়েদের স্কুল-যাতায়াত থেকে হাট বাজার করারও দায়িত্ব

পর্যন্ত এসে চাপে মহাবীরজীর শক্ত কাঁধে। এসে চাপে মহাবীরজীর শক্ত কাঁধে। অনেক ফ্ল্যাটের নিঃসঙ্গ বুড়ো-বুড়িদের জন্য ডাক্তার ডাকা, নার্সিংহোমে ভর্তি করা— কী না করতে হয় তাঁকে। স্বেচ্ছায়-অনিচ্ছায় কখন যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হয়েছে। যেন এক বৃহৎ পরিবারের কর্তা সেজে বসা। বাইরের কেউ বুঝবে না এ-বাড়িটার তিনি শুধু দারোয়ান নন। এতে গৌরব যেমন, খাটুনিটাও কম নয়।

এত সব কাজের মধ্যে কুস্তির আখড়া চালানো অসম্ভব হ'ত যদি না বস্তুটা তাঁর প্রায় দোরগোড়ায় গজিয়ে উঠত। আবার এই সুবিধার সঙ্গে অসুবিধাও জড়িত—যখন-তখন উৎসাহী কুস্তিগিরদের আগমন ঘটতে লাগল তাঁর ডেরায়। জন-সংযোগ সর্বদাই তাঁর কাছে সুখদায়ক, তাই রক্ষে। কিন্তু কমলজীর দেওয়া বইপত্রের পাতা উল্টানোর মত নির্জনতা দুর্লভ হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনীয় নিদ্রার খানিকটা ব্যয় হ'তে লাগল বইপাঠের জন্য।

কুস্তির আখড়া স্থাপনের পর একটা সমস্যা মাথা চাড়া দিল। এটা পাড়ার লোকজনের কাছে বাড়তি উপদ্রব বলে প্রতিভাত হল। মানুষের চাপা অসন্তোষের আঁচ পেয়ে মহাবীরজী কুস্তিগিরদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। ঠিক হ'ল, লোকের চক্ষে আখড়াটির ইজ্জত বাড়াতে হবে। পালোয়ানরা অগ্রণী হয়ে পাড়ার শান্তিরক্ষার কাজে প্রবৃত্ত হবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনেরও চেষ্টা করতে হবে।

অবিলম্বেই চোরগুণ্ডা এবং অসামাজিক কাজের ব্যাপারীরা কুস্তিগিরদের মুষ্ট্যাঘাতের আস্বাদ পেতে লাগল। দেখা গেল, অচিরে তারা আঘাতের তীব্রতা অনুভব করে সতর্ক হল। যে-কজন বেপরোয়া ভাব দেখাল, তারা ছদ্মবেশী কুস্তিগীর কনস্টেবলদের হাত ধরে লালবাজারের পুলিশী লকআপের আনন্দ উপভোগ করল।

আখড়ার পালোয়ানদের ঈদ মোবারক এবং বিজয়ার শুভেচ্ছা জুটে যেতে লাগল। সেইসঙ্গে মিষ্টির বাক্স। এই রকম এক প্রীতি-সম্মিলনীতে তালতলার এক অজীর্ণরোগগ্রস্ত অতি শীর্ণ স্কুল মাস্টার বললেন, আপনাদের আখড়ার সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হোক— দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন সমিতি। মহাবীরজী প্রত্যুত্তরে বললেন— মাস্টারমশাই, আপনি এসে আমাদের সঙ্গে বরং কুস্তি শুরু করে দিন, আপনার সব ব্যামো ভালো হয়ে যাবে।

একদা বর্ষাকালের অপরাহ্নে যখন কুস্তির আখড়া বেশ জমে উঠেছে, তখন ঝমঝম করে প্রবল ধারায় নামল বৃষ্টি। তখনো আখড়ায় কোনো ছাউনি তৈরি হয়নি, আধভেজা হয়ে কুস্তিগীররা ছুটতে ছুটতে এসে আশ্রয় নিল তাদের গুরুজীর ফ্ল্যাটবাড়ির গাড়ি বারান্দায়। বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার কোনো লক্ষণই নেই। সন্ধ্যার অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে ঘনিয়ে আসছে। ফ্ল্যাটে বাসিন্দাদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে কিছু সতরঞ্চি জোগাড় করে মহাবীরজী বিছিয়ে দিলেন। ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে বসে পড়ল সবাই। অমনি শুরু হয়ে গেল রামধুন।

খানিকপরে মহাবীরজীও পুরনো অভ্যাসের টানে গলা মেলালেন। কণ্ঠস্বরের সে কী তেজ। সবাই জয় ধ্বনিতে ফেটে পড়ল। তারা সাবাশ গুরুজী! সাবাশ! ধ্বনী দিল।

ডালহৌসী স্কোয়ারের ভোজপুরী দারোয়ান গঙ্গাপ্রসাদ সিং বোধকরি সব চেয়ে চমৎকৃত হয়েছিল। বিদায় নেওয়ার আগে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল—"গুরুজী, সামনের

শনিবার সন্ধ্যায় আমাদের রামধুনের আসরে কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে। না, না, কোনো আপত্তি শুনব না।"

মহাবীরজী হেসে বললেন, 'এ তো অদ্ভুত আব্দার।'

—"আমাদের লোকেরা বুঝবে আমাদের গুরুজীর কেবল কব্জির জোর নেই, সমান জোর গলার।"

সবাই চলে গেলে ক্লান্ত মহাবীরজী সতরঞ্চিগুলো ভাঁজ করতে লাগলেন। উপর থেকে নেমে এলেন পূর্বে উল্লেখিত পার্শী ইঞ্জিনিয়ার, প্রায় জোর ক'রে মহাবীরজীর হাত থেকে সতরঞ্চির বোঝা নিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন, মহাবীরজী তাঁর পিছু পিছু চললেন, যার যার সতরঞ্চি, তার তার ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে।

অতঃপর স্বহস্তে, চালরুটি পাকানোর পালা। প্রশস্ত আঙিনার ওপাশে একটি ছোট্ট রান্নাঘর। এই আঙিনায় গুরুজী একবার দেশ থেকে দুধেল গরু এনে রেখেছিলেন। ভাগবতী গাভীটি যথেষ্ট দুধ দিয়ে তাঁর শরীর চর্চায় সাহায্য করেছিল।

তারপর স্নান। প্রচণ্ড দাবদাহের পর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মনোরম আবহাওয়া। খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমের আগে যখন মহাবীরজী বইয়ের পাতা খুললেন, তখন আবার ঝমঝম বৃষ্টি। এইরকম বৃষ্টি কি শুরু হয়ে গেছে সুদূর ছাপরা জেলার অখ্যাত রূপতলা নামক গ্রামেও? বাড়ির কথা ভাবতে লাগলেন মহাবীরজী।

অনেক দিন বাড়ি যাওয়া হয়নি। পাঁচ ভাইয়ের যৌথ পরিবার। বৃদ্ধ মা বাবাও বর্তমান। যাকে বলে ভরাট সংসার। এখন বড়ভাই এবং মেজোভাই ক্ষেতির কাজ করেন। তাঁরা নিশ্চয় বৃষ্টি দেখে খুশি। পাঁচ ভাইয়ের পাঁচ বৌ-য়ের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব। মহাবীরজীর একটি মাত্র শিশু সন্তান। সে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। মহাবীরজী সেই বধূটির কথা ভাবতে লাগলেন যে, কোনোদিন তাঁর কাছে কোনো কিছুর আব্দার করেনি। গতবার বিদায়কালে সে কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গিয়েছিল। কী বলতে চেয়েছিল যমুনা? আজ ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকের মতই সেটা বার বার ব্যথার মূল হয়ে তাঁকে বিঁধতে লাগল।

আট

একদা বাড়িওলা প্রবোধ বণিকের কাছ থেকে তাঁর অতি বিশ্বস্ত দারোয়ান মহাবীরজীর কাছে জরুরী তলব এল। মহাবীরজীকে সেদিন মুনীবগৃহে গিয়ে অফিসঘরে অপেক্ষা করতে হয়নি, সরাসরি মালিকের গানবাজনার আসরে হাজির হ'তে হয়েছিল মালিকের নির্দেশমত।

প্রবোধ বণিক হাতের তানপুরাখানি নামিয়ে ইঙ্গিতে আগন্তুককে বসতে বললেন। তখন বহিরাগত একজন ওস্তাদের রেওয়াজ চলছিল।

এমন আসর চাক্ষুষ করার সুযোগ মহাবীরজীর জীবনে কখনো হয়নি। কত রকমের গানবাজনার সাজ সরঞ্জাম।

বণিক-পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম খেলাধুলা নাচ গানবাজনার দিকে বেশি ঝুঁকেছে, আগেকার ব্যবসা-পত্র পায় গুটিয়ে এনেছে। শুধু পৈতৃক জুয়েলারী দোকানটি রমরমা

অবস্থায় অটুট আছে। সেখানে একজন উপযুক্ত ও বিশ্বাসভাজন দারোয়ান প্রয়োজন, মহাবীরজীকে সেই কারণেই তলব।

ব্যাপারটা অবগত হয়ে যখন তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন, তখন প্রায় আচমকা প্রবোধ বণিক প্রশ্ন করলেন, তুমি গান গাইতে পারো?

'না' বলতে গিয়ে মহাবীরজী আমতা-আমতা করে বলে ফেললেন—স্বদেশীযুগে অন্যদের সঙ্গে গলা মেলাতাম, সে কিছু না।

—তাই একটু শোনাও তো, কর্তা আদেশ করলেন।

মহাবীরজীকে অগত্যা গুণগুণ করতে হল।

—গলা ছেড়ে গাও।

মহাবীরজীর কণ্ঠস্বর শুনে কর্তা বলে উঠলেন— তোমাকে আমি ওস্তাদ বানিয়ে ছাড়ব।

বড়লোকের খামখেয়ালির পাল্লায় পড়ে এরপর মহাবীরজীকে মাঝেমাঝেই হাজিরা দিতে হল বড়কর্তার দরবারে।

মুনীব-কুঠির একাধিক দারোয়ান বলল, এবার ওস্তাদজী, আপনাকে ডবল ওস্তাদ হতে হবে।

দূর।

তারা জানাল— আগে মুনীব বাড়িতে প্রতি সন্ধ্যায় আশেপাশের হিন্দুস্থানীদের নিয়ে রামধুন গাওয়া হত। কিন্তু বহিরাগত ওস্তাদদের চাপে মুনীব এখন রামধুন নিষিদ্ধ করেছেন। ওস্তাদদের কানে নাকি ওটা বড্ড খারাপ লাগে।

মহাবীরজী হেসে বললেন, আমার কানেও ওঁদের গান কুস্তির লড়াই বলেই মনে হয়।

কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যাপারটা বদলে যেতে লাগল। বছরখানেক গানের তালিম নেওয়ার পরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কিছু উপলব্ধি হল মহাবীরজীর। এমন একটা সময় এলে যখন রামধুন তার কানেও অন্যরকম শোনাতে লাগল!

ডালহৌসী স্কোয়ারের গঙ্গাপ্রসাদ সিং শনিবার যথাসময়ে এসে কুস্তির আখড়ায় তাঁকে পাকড়াও করল। তাঁর মনে হল, কী কুক্ষণেই না তিনি বৃষ্টিভেজা পালোয়ানদের রামধুনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন।

তবু তাঁকে যেতে হল। যেতে যেতে মনে মনে যুক্তি খাড়া করলেন—কারোরই কোনো রকমের গানই নিষিদ্ধ করা ঠিক নয়। যে-রকম যে গাইতে চায় তাকে সে-রকম গাইতে দেওয়া উচিত। হঠাৎ দেশশুদ্ধ লোক ওস্তাদী গান গাইবে না কি? আসলে ওস্তাদরা দেশের লোক থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। ভাবতে ভাবতে মনে তাঁর শান্তি ফিরে এল। ওঁদেরকে একটু বুঝে চলতে হবে, আবার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বুঝতে সাধারণ মানুষকেও অনভ্যস্ত কানকে একটু শিক্ষিত করতে হবে, তাই না?

দিনের বেলায় ডালহৌসী স্কোয়ারে বহু বহু বার মহাবীরজীকে আসতে হয়েছে, কিন্তু সন্ধ্যার পর কখনো আসার দরকার পড়েনি। সত্যি, সন্ধ্যার পর এ তল্লাটের চেহারা সম্পূর্ণ

আলাদা। মহাবীরজির টের পেলেন কাকপক্ষীদের সরব অভ্যর্থনায়। মহাসমারোহে তখন তাদের রাগরাগিনীর পালা চলছিল। দিনের বেলায় এ-পাড়ায় কেউ ওদের অস্তিত্ব টের পায় না, তখন এই সঙ্গীতজ্ঞরা অফিস-পাড়ার কলরবে এবং গাড়ির হর্নের আওয়াজে বেপাত্তা হয়ে যায়।

ক্রমে কাকের ডাকাডাকি থেমে গেল। গভীর মৌন শান্তি নেমে এল। এই নৈঃশব্দের চাপ এমন যে, প্রথমটায় কানে তালা ধরে যায়।

গঙ্গাপ্রসাদ মহাবীরজীকে নিয়ে একটা মস্ত অফিস-বাড়ির গেট ফাঁক করে পিছনের আঙিনায় এসে থামলেন। কী আশ্চর্য! এখানে এতখানি ফাঁকা জায়গা! বাইরে থেকে টের পাওয়ার জো নেই। আর এত গাছপালা! এখানেই কাকেদের আস্তানা।

একটু পরেই পিলপিল করে লোক আসতে লাগল। তাদের প্রিয় ওস্তাদজী এসেছে, তারা না এসে পারে? এইসব লোকেরা বেশিরভাগ একদিকে যেমন দারোয়ান শ্রেণীর, অন্যদিকে তারাই ছিল কলকাতার সম্মান রক্ষাকারীর কুস্তি-খেলার আসরের দর্শক।

শুরু হল রামধুন। অনতিবিলম্বে মহাবীরজীর কণ্ঠস্বর যুক্ত হল। এত জোর আওয়াজ নির্গত হল যে, স্তব্ধ কাকেরা কা-কা করে ডেকে উঠল। সেইসঙ্গে অবশ্যই ধ্বনিত হল—গুরজীকে জয়! কুস্তির দর্শকরা এবার হয়েছিল রামধুনের শ্রোতা এবং তাদের কাছে এটা মহাবীরজীর দ্বিতীয় জয়!

ঘরে ফিরে তাঁর মাথায় একটা চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল। কুস্তিজয়ের দিনে কি উপস্থিত জনতা তাঁকে অতিরিক্ত শক্তি জুগিয়েছিল দুই বাহুতে? আর আজ কণ্ঠজয়ের দিনেও কি উপস্থিত জনতা অতিরিক্ত শক্তি জুগিয়েছে তাঁর কণ্ঠে? এও কি সম্ভব?

—হ্যাঁ, সম্ভব। সব শুনে পরদিন এই মন্তব্য করলেন কমলজী। বললেন দেখো মহাবীর, একে বলে inter-action! ব্যক্তি এবং জনতার যখন সফল যোগাযোগ ঘটে, তখন পরস্পর পরস্পরকে শক্তি জোগায়। আর শোনো, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।

—কী কথা?

—এই সুযোগ তুমি ছেড়ো না।

—ঠিক বুঝলাম না।

কমলজী একটু হেসে বললেন, কুস্তির আখড়া খোলার একটা সার্থকতা দেখছ তো?

—না, দেখছি না।

—ওহো! আখড়া না খুলে ডালহৌসীর এই যোগাযোগ তুমি পেতে? আর ব্যাপারটার তাৎপর্য না বোঝার কোনো কারণ নেই। বলতে পারো, ভূ-ভারতে আর কোথায় এত অফিস আছে পাশাপাশি? এটা হয়েছে অবশ্য বৃটিশের কল্যাণে। কলকাতা তাদের প্রথম রাজধানী ছিল, আর বাঙালীকে তারা বানিয়েছিল কেরাণী—ইংরেজি শিখিয়ে। আর যত অফিস তার দ্বিগুণ তিনগুণ দারোয়ান। আর অফিসের এই দারোয়ানরা লোকের বাড়ির দারোয়ানদের মত নয়, অনেক বেশি দীনদুনিয়ার খবর রাখে। তাদেরকে সঙ্গে পাওয়া কম কথা? এইবার তোমাকে আসল কাজে নামতে হবে।

—আসল কাজ' মানে?

—ও হো, তোমাকে দেখছি বইপত্তর দেওয়া বৃথা। দেখছ না ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ব্যবসাপত্রের মূল ঘাঁটি এই ডালহৌসির স্কোয়ারের অফিসগুলি? আর তার পাহারাদার আমাদের দেশী লোকরা, দারোয়ানরা, অন্তত রাতের বেলায়। সন্ধ্যার পর তাদের তুমি রামধুনের আসরে পাবে সাহেবরা যখন তাদের ক্লাবে ক্লাবে আনন্দে মশগুল। তখন তুমি ধীরে ধীরে রামধুনের পর শোনাতে পারো স্বদেশী গান। তাদের গুরুজীর কাছ থেকে সানন্দে তারা শুনবে। তারপর তাদের শোনাতে পারো ইনকিলাবি গান। এইভাবে তুমি জমি তৈরী করতে পারো।

হঠাৎ মহাবীরজী হাততালি দিয়ে উঠলেন—তুই একটা আস্ত খচ্চর।

—তা ঠিক শেয়ানে শেয়ানে যখন মোকাবিলা, বৃটিশ যেমন শেয়ান, আমাদেরও তেমনি শেয়ান হতে হবে। বিনয়-বাদল-দীনেশ মস্ত বীর ছিলেন, কিন্তু শেয়ানা ছিলেন না। ঐ ডালহৌসীর রাইটার্সে তাঁরা একদিনের লড়াই করে প্রাণ দিয়েছিলেন, তাতে যে কিছু ফল হয়নি তা বলব না, তবে ওখানে আমাদের একটা স্থায়ী ভীমরুলের চাক বানাতে হবে।

—অর্থাৎ কিনা, আমাদের একটা মজবুত দারোয়ান-ইউনিয়ন গড়ে তুলতে হবে, গড়তে হবে ইংরেজদের নাকের ডগায়। এটা আমার মাথায়ও ছিল কমল। নইলে আমি ওখানে যাই? বিনয়-বাদল-দীনেশ লড়েছিল বাইরে থেকে, আমরা লড়ব ভিতর থেকে। আমাদের লড়াই আরো গভীর লড়াই। শেষ পর্যন্ত সেটা হবে বৃটিশ পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই।

—সাবাশ মহাবীর! তোমার হাতেই শুধু জোর নেই, মাথাতেও ঘিলু আছে!

—মারব এক থাপ্পড়! মাথা ঘুরে প'ড়ে যাবি। কিন্তু যা ভাবি, তা কি সম্ভব হবে? গোপনে ইউনিয়ন গড়তে গেলে, ওরা যে-রকম চীজ, তাতে টের পেতে বিলম্ব হবে না।

—গোপনে কেন? ইউনিয়ন গড়া বেআইনী নয়। প্রকাশ্যেই চেষ্টা করতে হবে। এ-ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করব। আমার তো কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন করতে গিয়ে। ওরা প্রকাশ্যে ইউনিয়ন করতে না দিলে, তখন দেখা যাবে। আমি ডাঃ ভূপেন দত্তের সঙ্গে দেখা করব। জানো তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই?

কমলজীর কথাই ঠিক হল। ধূর্ত বৃটিশ-শাসক শ্রেণী স্বদেশে প্রত্যক্ষ করেছেন, বশম্বদ ট্রেড ইউনিয়নের চেয়ে ভালো 'সেপটি বাল্ব' আর কিছু হয় না। তাছাড়া ইদানীং রামধুনের কল্যাণে সাহেবরা দারোয়ানদের মধ্যে ধর্মভাবের প্রাবল্য লক্ষ্য করে খুশি। এই রামভক্তদের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রি হতে বিলম্ব হল না, বিশেষত যখন ধর্ম প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন।

নয়

—এমন অসময়ে?

—কোন্‌টা তোমার সময় বলতে পারো? সকালে এসে ফিরে গিয়েছিলাম।

—এখন মরার মত সময় নেই আমার। তুমিও অনেকখানি দায়ী তার জন্যে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে অস্ফুট স্বরে বললেন—আমি দায়ী।

—হ্যাঁ তুমি। তুমি 'না' বলে দিলে আমি কুস্তির আখড়া খুলতাম? তুমি দারোয়ান ইউনিয়নের ব্যাপারে আমাকে উস্কানি না দিলে আমি ওখানে জড়িয়ে পড়তাম। আবার দেখো, আমার মুনীবটিও হয়েছেন প্রায় তোমার দোসর—আমার সময় কেড়ে নিয়ে আমাকে গানের ওস্তাদ বানাবেন। আর এই ফ্ল্যাটবাড়ির লোকেরা? আমাকে পেয়েছে যেন বিনে মাইনের চাকর। যত দরকার, যত আব্দার, আমাকে মেটাতে হবে। সময়টা কি রবারের মত? টানলে ২৪ ঘন্টা থেকে ডবল হয় যাবে?

কমলজী সহানুভূতির সুরে বললেন, আমি নিজেকে দিয়েই তোমার অবস্থানটা অনুমান করতে পারি। বাড়িতে দু'দণ্ড বিশ্রামের সময় নেই, যখন তখন লোকের ঝামেলা। কিন্তু তার জন্যে তো আমিই দায়ী, অন্যকে তো তোমার মত দোষ দিই না।

তুমি নিজেই বিচার করে দেখো তোমার অবস্থার জন্যে তুমি নিজেই দায়ী কিনা। কুস্তির আখড়াটা খোলার ইচ্ছাটা তোমাকে পেয়ে বসেনি? না থাকলে শুধু আমার কথায় আখড়া হত? দারোয়ান ইউনিয়নের ব্যাপারটাও তাই। তা'ছাড়া.....

—যথেষ্ট হয়েছে। এখন বলো, এত রাতে কি বা উদ্দেশ্যে তব আগমন?

কমলজী হেসে ফেললেন?

—পরখ করতে এসেছিলাম পালোয়ানের পীঠের উপর জগদ্দল পাথর চাপানো যায় কিনা।

—হেঁয়ালি ছাড়ো।

—এখন দেখছি বোঝার উপর শাকের আটি সইবে না।

—প্রভু, কথাটা বলে ফেলুন।

—বললে তেড়ে মারতে আসবে। রাত অনেক হল, যাই।

—কমল, আমিও তোমার কাছে যাব-যাব ভাবছিলাম। কাল সকালে বাড়ি থাকবে?

—যেতে হবে না, এখনি বলো।

এবার মহাবীরজীর হাসির পালা—কাল সকালে দু'জনে দু'জনের কথা শুনব। আজ গুড নাইট। ওহো। ঘড়ির দিকে তাকাও। এখন বাস পাবে না। অতটা পথ না হেঁটে এখানে থেকে যাও।

—আচ্ছা। কী বলবে এবার বলো।

—জনযুদ্ধ ব্যাপারটা তোমার কাছ থেকে বুঝে নিতে চেয়েছিলাম। এতদিন তো আমরা বলে আসছিলাম—না একপাই, না এক ভাই। এখন হঠাৎ কী হ'ল? জনযুদ্ধ মানে কী? নতুন ইউনিয়নের ওরা প্রশ্ন করছে। বলছে কমিউনিস্টরা বৃটিশের দালাল হয়ে গেছে। ওরা রাশিয়ার কথায় চলে। ওরা রাশিবার চর।

—দ্যাখো, ব্যাপারটা আমিও ভালো করে বুঝতে চাই। কিন্তু গুরুজীর দেখা পাচ্ছি না।

—গুরুজী! তুমি কি আবার নতুন করে গুরু ধরলে।

—ঠিক গুরু নয়, কমরেড। তাঁকে গুরুজী বললে তিনি নিজেই মারতে আসেন তেড়ে। কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী গুরুদের ঠিক উল্টো—মানুষের সঙ্গে সমানে সমানে মিশে যেতে

পারেন। তা' নাহলে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাই হ'ত না এবং আমি কমিউনিস্ট হতাম না। অথচ গুরু না হলেও তাঁকে আমার গুরু বলে মনে হয়। সব জিনিস এত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। আমার ধারণা, ওঁর সঙ্গে কথা বললে জনযুদ্ধ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

—কবে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে?

—মুস্কিল তো সেইখানে। টো-টো করে সর্বত্র ঘুরছেন। যেখানে মজুর নিয়ে কিছু ঘটতে যাচ্ছে, সেখানেই কমরেড নিত্যানন্দ। সারা বাংলায় কোথায় যাননি তিনি? কুষ্টিয়া থেকে রাণীগঞ্জ, চটকল মজুর থেকে খনি মজুর সর্বত্র তাঁর গতিবিধি। সময়ের কথা বলছ, কমরেড নিত্যানন্দ কোত্থেকে এত কাজের সময় পান? এমন সময় যখন চটকল মজুরদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ কোনোই যোগাযোগ ছিল না, তখন তিনি পায়ে ঘুঁঘুঁর বেঁধে গলায় ভাঙ্গা হারমনিয়াম ঝুলিয়ে গান গেয়ে মজুরদের সঙ্গে সংযোগ করতেন, কে বলবে লোকটা এম.এ পাশ। তাঁর নিজের চালচুলো বলতে কিছু নেই ঘর নেই, সংসার নেই...

বলতে বলতে হঠাৎই চুপ করে গেলেন কমলজী। তাঁর চোখে জল। রীতিমত বিস্মিত হয়ে মহাবীরজী বললেন, কী হল।

দ্রুত অশ্রু মুছে নিয়ে কমলজী মৃদুস্বরে প্রয়োগ করলেন, আমাদেরই কি ঘর-সংসার আছে?

—সত্যি। একেবারে সত্যি। মাসখানেক আগে তোমার স্ত্রীর অসুখের কথা শুনেছিলাম। তুমি যেতে পারোনি, সে তো চোখের সামনেই দেখছি।

—আর তোমার? তোমার পরে সন্তান এসেছে, তুমি একবার বাড়ি ঘুরে আসতে পেরেছ? কাজ, আর, কাজ। আমাদের চটকলে কাজ করতে সহজে কোনো কমরেড আসতে চায় না, কমরেড নিত্যানন্দই আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন জগদ্দল চটকলে তোমাকে কাজ করার অনুরোধ জানিয়ে। কিন্তু তোমার কথা শুনে বুঝেছি, এখন ও-সব আলোচনা বাতুলতা। যাঁদের ঘর-সংসার নেই, তাঁরা আমাদের মত সংসারীদের ঠিক বুঝতে পারেন না, এমনিক কমরেড নিত্যানন্দও নন।

দুই বন্ধু পাশাপাশি শুয়ে পড়লেন। শুয়ে পড়লেন বহু বছর পর। সেই স্বদেশী আন্দোলনের ভবঘুরে জীবনের পর এই প্রথম একসঙ্গে রাত্রিযাপন। কিন্তু দু'জনের কারো চোখেই ঘুম ছিল না।

এক সময়—একজন বলে উঠলেন—এই তো সেদিনের কথা, দিনগুলো কেমন কেটে গেল, না?

—বাকীটাও দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কিছু ভাবার আগেই আমরা চলে যাব। এই আমাদের জীবন।

রাত বাড়তে লাগল। দু'জনের কথা আর কমে না। মহানগরী নিস্তব্ধ।

কয়েকদিন পরে দুইবন্ধু কলকাতা থেকে দেশে পাড়ি দিলেন একসঙ্গে, যেমন একদা কারো মহানগরীতে এসে পা রেখেছিলেন একসঙ্গে।

দশ

...র্টফেল করে মারা গেলেন। মহাবীরজী এর বিন্দুবিসর্গ জানতেন না। তিনি ...রে কলকাতায় ফিরে বিস্ময়বোধ করলেন এই ভেবে যে, এর মধ্যে একবারও ...র অনুপস্থিতির সন্ধান নেননি। মহাবীরজী দেশে যাওয়ার আগে ইচ্ছে করেই প্রবো... বণিককে কিছু জানিয়ে যাননি এই ভয়ে আছে মালিক কোনো কারণে তাঁর যাত্রায় বাধা পান। কিন্তু নিজের আচরণে তাঁর মনে খচখচ করে বিঁধছিল। তাই কলকাতায় পা দিয়েই তিনি প্রবোধ বণিকের সন্ধানে ছুটলেন।

যথারীতি বণিক পরিবারের গানবাজনার ঘরে গিয়ে সরাসরি হাজির হলেন। ঘরখানা জনমানবশূন্য। গানবাজনার যন্ত্রপাতিগুলো মৌন, যথাস্থানে বিরাজ করছে; কেউ তাদের ঘুম ভাঙাচ্ছে না।

বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই পিছন থেকে বণিক বাড়ির এক দারোয়ান বলে উঠল— কাকে খুঁজছেন, বাবু আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ, গান গাইতে গাইতে হার্টঅ্যাটাক হয়। ডাক্তার আসার আগেই সব শেষ।

মহাবীরজী ধপ করে ফরাসের উপর বসে পড়লেন। মানসনেত্রে বাবুর দশা ছবির মত ফুটে উঠল। তবু সবই যেন বোধগম্যতার বাইরে চলে গেছে। অশ্রুজলের ধারা মুছে ফেলার কথা মনে হল না, যন্ত্রচালিত পা দু'খানা চালিয়ে বাড়ির বাইরে এলেন। লোকটিও পিছন-পিছন এসেছিল—মেজকর্তার সঙ্গে দেখা করবেন না?

উত্তর না দিয়ে মহাবীরজী সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন— কোন শ্মশানে?

—নিমতলায়।

কিছু চিন্তার অবকাশ না দিয়ে পা দু'খানা তাঁকে নিয়ে নিমতলার দিকে যাত্রা করল। শৈশবাবস্থার পর জানত তাঁকে ইতিপূর্বে কোনো নিকটজনের মৃত্যু দেখতে হয়নি। এটাই তাঁর জীবনে প্রথম মৃত্যুশোক।

যাঁকে কোনাভাবেই নিকটজন ভাবা যায় না, বরং যাঁর গানশেখানোর খামখেয়ালীর তিনি শিকার, যাঁকে তিনি সময়হরণকারী ব্যক্তি বলে আখ্যাত করেছিলেন এবং যাঁর খেয়ালীপনার বাতিক থেকে নিষ্কৃতির জন্য আকুল হয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুই শেলের মত এসে বিঁধল। এ মানবহৃদয়ের অদ্ভুত রহস্য ছাড়া কী। নিজের কাছেও মস্ত আবিষ্কার। যেন কিছুটা নিজেকেও আবিষ্কার। তাঁর মত একজন অতি নগণ্য অধস্তন কর্মচারীর গানের গলা শুনে যে-ব্যক্তি আন্তরিকভাবে গুণের কদর করতে এগিয়ে ছিলেন, তাঁর মস্ত হৃদয়টা মৃত্যুর আঘাতে এই প্রথম সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। সেই উপলব্ধির মধ্যেই মহাবীরজী মৃত্যুশোক খুঁজে গেলেন। কিন্তু এখন বড্ড বিলম্ব হয়ে গেছে যে। সেই মানুষটিকে কি শ্মশানে গিয়ে পাওয়া যাবে?

মহাবীরজী সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়িয়ে উল্টো দিকে যাত্রা করলেন এবং মৃতের বদলে জীবিতদের সান্নিধ্য পেতে আকুল হলেন। অনতি বিলম্বে এসে হাজির হলেন রানী রাসমণির

বাড়িতে তাঁর বড়ভাই মথুরানাথের কাছে। তখনো সকালের আখড়ার কু... মাতামাতিতে ব্যস্ত ছিলেন। মথুরানাথ বাড়ির কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। অন্যান্যরা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। একটু সুস্থির হতেই মথুরানাথ অনুজকে স্নানাহারের আদেশ দিলেন।

বিকালে নিজের ডেরায় ফিরে মিলল একখানা চিরকুট। মেজকর্তা সুবোধ বণিক অবিলম্বে দেখা করতে বলেছেন। বণিক-পরিবারের সম্পত্তি দেখাশোনার ভার মেজকর্তার ঘাড়েই বর্তানোর কথা। তিনি ডেকে পাঠাতেই পারেন।

আগে মেজকর্তা দাবাখেলা নিয়ে মত্ত থাকতেন, এখন কী করবেন? তিনি যদি অগ্রজের পথ অনুসরণ করে মহাবীরজীকে দাবা খেলার তালিম নিতে বলেন? এবং খেলার সঙ্গী না জুটলে তাঁকেই আটকে রাখেন? পালোয়ানের বুকটা দমে গেল। দুরুদুরু বক্ষেই তিনি মুনীবগৃহে রওয়ানা দিলেন। তখনও সন্ধ্যার আলো জ্বলেনি।

মেজকর্তার খেলার ঘরে তারে ঝোলানো একটা হাইপাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্‌ব দাবার টেবিল আলোকিত করেছে। একদিকে মেজকর্তা উপবিষ্ট, অন্যদিকে আসনটা শূন্য, কোনো আগন্তুকের আশায় বোধ হয় প্রতীক্ষা করছে।

মহাবীরজীকে দেখে সুবোধ বণিক একটা সোফার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন—বসো, তোমার সঙ্গে ভীষণ দরকারি কথা আছে।

এমন সময় প্রায় হৈ-হৈ করতে করতে যিনি এসে ঢুকলেন তাঁর হাতে জ্বলন্ত বর্মিজ চুরুট, মুখ দিয়ে খই ফুটছে—মহানগরীর হে গণ্যমান্য নাগরিক সুবোধ বণিক মহোদয়, আপনার অন্তঃপুরিকার কাছে আমার নিবেদন—দ্বারে অতিথি সমাগত এবং অত্যন্ত ক্ষুধার্ত।

ঘণ্টা বাজল। চাকর এল। হাতে তার আগে থেকে তৈরি সাজানো গোছানো খাদ্যের থালা। সেটা টুলে রাখার সময়-অপব্যয় বাঁচাতে অতিথি দ্রুত স্বহস্তে ধারণ করলেন এবং বিনাবাক্যে খাদ্যবস্তুসমূহ স্বীয় পাকস্থলিতে প্রেরণ করতে করতে বলে উঠলেন—জল।

জলের গ্লাসও এসে গেল অবিলম্বে, ঢকঢক করে জল খেয়ে অতিথি আক্ষেপের সুরে বললেন, যে ঈশ্বর, এই হতভাগা সুবোধের কপালে এমন রন্ধনপটিয়সীকে জুটিয়ে দিল, অথচ আমার বেলায় সোস্যাইটি লেডি! এই তোমার ন্যায় বিচার? আমার রসনা পরিতৃপ্তির দিকে তুমি নজর দিলে না? তাহলে আমার নাস্তিক হতে বাধা কোথায়? ঈশ্বরপুত্র সুবোধ বণিক যদি ঘরে মাল জোগাড় রাখত, আমাকে কি দৌড়াতে হত না এমন সব জায়গায় যেখানে তীর্থের উপবাসী কাকেরা আমার অপেক্ষায় ঘড়ির দিকে ঘন ঘন তাকায়। আমি তাদের বলে দিয়েছি, হে সহযাত্রী কমরেডবৃন্দ, এক পেগের বেশি আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করবেন না। আমার জেব খালি। হায়, ঐ মূর্খরা জেব শব্দের মানে পর্যন্ত জানে না।

ওহে সুবোধ বালক, শোন্—তুই কেন কবি কথিত জগতে আনন্দযজ্ঞে কিছুতেই যোগ দিতে চাস্ না? এমন করলে আমি বেশি দিন তোর দাবার পার্টনার থাকব না। তুই বুঝেও বুঝিস না, দেখেও দেখিস না জীবন পদ্মপত্রে নীর। দেখলি না তোর দাদা বিনা নোটিসে

কেমন ড্যাং ড্যাং করে চলে গেলেন। কী বললি? দাবাই তোর জীবনে আনন্দযজ্ঞ। নিজের মনকে ধোঁকা দিচ্ছিস। শোন :

This above all : to thine ownself be time. And it must follow as the night the day. Though can'st be then false to anyone.

এমন সময় মহাবীরজীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হতেই বাগ্মী বলে উঠলেন, এই গুণ্ডার মত পদার্থটি কে রে সুবোধ?

—এত মুখ আলগা করিস না, এ হ'ল কলকাতার সেরা মুষ্টিযোদ্ধা। তোর কথায় রেগে গিয়ে একটা ঘুঁষি উপহার দিলেই তুই কুপোকাৎ। তোর সব নেশা টুটে যাবে।

—দুত্তোর, থাম্। একে যেন কোথায় দেখেছি। ও হো, দাদার গানের আসরে। ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিল। এখুনি ওকে বিদায় করে দে, নইলে সেই রকম যদি গান ধরে। ভিরমী খাবো।

সুবোধ বণিক এতক্ষণ পর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। তার ভয় ওদের দু'জনের মধ্যে বিস্ফোরক কিছু ঘটে যেতে পারে। মহাবীরজীর কাছে গিয়ে বসে মৃদু মধুর স্বরে বললেন, তুমি কিছু মনে করো না মহাবীর, যখন মদ ওকে খায় না, তখন ও অন্য মানুষ। শোনো, তোমাকে ডেকেছিলাম একটা ভীষণ জরুরী কাজে। আমার ছোট মেয়ে বায়না ধরেছে নাচ শিখবে। তোমার সেরা নাচের স্কুল খুঁজে বের করতে হবে। পারবে?

—চেষ্টা করব।

—তোমার কথায় বিশ্বাস করা যায়। তবে বেশি দেরি করো না। আচ্ছা, এখন এসো।

মহাবীরজী মাতালটার প্রতি ঘৃণার ষ্ঠিবন নিক্ষেপ ক'রে নীরবে বিদায় নিলেন। কী কষ্টে যে তিনি হাত দু'টো কন্ট্রোল করে এতক্ষণ বসেছিলেন। এরা মানুষকে কত সহজেই অপমান করতে পারে। এটা ওদের সহজাত না হলে মাতাল অবস্থাতেও কি ও-রকম কথা মুখ দিয়ে নির্গত হতে পারে? আর মেজকর্তা তার সাফাই গাইলেন।

রাস্তার পা দিয়ে মেজকর্তার প্রতিও ঘৃণার আগুন জ্বলতে লাগল। নানা কথা মহাবীরজীর মনে একে একে উদয় হ'তে শুরু করল। অগ্রজের মৃত্যুতে শোকের চিহ্নমাত্র ছিল না মেজকর্তার চোখেমুখে। একটা কথা পর্যন্ত ও নিয়ে উচ্চাপ করলেন না। যেন ও-বাড়িতে তেমন কিছু ঘটেনি। আর মেয়ের নাচের স্কুল খুঁজে দেওয়াটা ভীষণ জরুরী! এ হেন মুনীবের অধীনেই এখন থেকে কাজ করতে হবে। হয়ত তার সুযোগেও বেশিদিন না থাকতে পারে। দাদার পেয়ারের দারোয়ানকে বিদায় করে দেওয়ার মন্ত্রদাতার অভাব-হবে না মেজকর্তার। মহাবীরজীর মনে হল, অগ্রজের মৃত্যুতে হয়ত নতুন মুনীব খুশিই হয়েছেন। সব সম্পত্তির দেখাশোনার কর্তৃত্ব পাওয়া কি কম কথা? ঠিক তাই। এদের কাছ থেকে স্নেহদয়ামায়া কোনো কিছুর আশা না রাখাই ভালো। যেন মহাবীরজীর এতদিনকার পায়ের তলার অভ্যস্ত মাটি স'রে যাচ্ছে। এখানকার কাজটা চ'লে গেলে অন্যত্র কাজ পেতে তাঁর অবশ্য অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, তবু এই ফ্ল্যাটবাড়ির এতগুলি পরিচিত আত্মীয়সম মানুষের সান্নিধ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে? কত সুখদুঃখের স্মৃতি এদের নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে। ভবিতব্য তখন মেনে নিতে হবেই।

কিন্তু আগ বাড়িয়ে মহাবীরজী কেন এত সব দুশ্চিন্তার মধ্যে গিয়ে পড়ছেন? তিনি চিন্তার রাশ টেনে ধরলেন। তবে একটা জানা জিনিস আগের থেকেও স্পষ্ট হয়ে উঠল—এ শহরের এত বাড়িগাড়ি বিষয়-সম্পত্তি ব্যবসাবাণিজ্য কিছুই গরীবের নয়। আর সারা দেশের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। এ-সব তো জানাই ছিল, তবু একটা মৃত্যুকে সামনে রেখে পরিবর্তনের স্রোত এসে ধাক্কা দিল।

আচমকা একটা প্রবল ইচ্ছা মনের মধ্যে জেগে উঠল। ঠিক এই মুহূর্তে যদি সেই সর্বত্যাগী মানুষটির সঙ্গে তাঁর দেখা হত, যে-মানুষটির নাম নিত্যানন্দ চৌধুরী। যাঁকে মহাবীরজী কোনো দিন সচক্ষে দেখেননি, শুধু যাঁর সম্পর্কে কয়েকটা কথা কানে এসেছে। সেই মানুষটিই এখন তাঁকে আকর্ষণ করছে অমোঘ টানে। এ যেন অনেক নোংরা ঘাঁটার পর স্ফটিক স্বচ্ছ বিশুদ্ধ জলে স্নান ক'রে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার ইচ্ছার মত একটা বাসনা। সেই নিত্যানন্দ নামক ব্যক্তির সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ হবেই, তখন তিনি যদি এ-সব জানতে পারেন, তা'হলে বীরবাহু মহাবীরজীকে কি অত্যধিক আবেগপ্রবণ মনে করবেন?

এগারো

সে-দিবসে ডালহৌসী স্কোয়ারে এক নতুন শক্তি আত্মপ্রকাশ করল। দারোয়ান ইউনিয়ন একদিনের অন্তরাল ছেড়ে এবার প্রকাশ্যে আবির্ভূত হল। অফিসপাড়া জুড়ে মহাচাঞ্চল্য। এ-পাড়ায় এমন কাণ্ড আগ কেউ কখনও দেখেনি। এখানে সমাবেশ এবং মিছিল তখন সম্পূর্ণ অভিনব। রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেল, চলন্ত গাড়ি ঘোড়া থেমে গেল, অফিস বাড়ি দোতলায় তিনতলায় মহা ঔৎসুক্যে কেরাণীবাবুরা জড়ো হয়ে সবিস্ময়ে দৃশ্য দেখতে লাগল। এমন কি বৃটিশ প্রভুদের সাহেব সুবোরা পর্যন্ত কৌতূহল দমন করতে পারল না।

বৈশাখের তপ্ত সূর্য লাল ঝাণ্ডাগুলির উপর উষ্ণ আশীর্বাদ ছড়িয়ে দিল। দক্ষিণের আতপ্ত মৃদুমন্দ বায়ু এসে ঝাণ্ডাগুলিকে ঈষৎ আন্দোলিত করে সমাদর জানিয়ে দিল। দক্ষিণ আতপ্ত মৃদুমন্দ বায়ু এসে ঝাণ্ডাগুলিকে আন্দোলিত করে সমাদর জানিয়ে গেল। প্রৌঢ় ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভাঙাচোরা মুখে যৌবনের ছোঁয়াচ লাগল। পার্শ্ববর্তী মহাবীরজীর কণ্ঠে সহসা ধ্বনিত হল—দুনিয়ার মজুর এক হও। নব উন্মাদনায় শত কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল রণধ্বনি। সারা দুনিয়ার মেহনতী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উজ্জ্বল আভায় জ্বলে উঠল বৃটিশ পুঁজির প্রহরারত কিছু মানুষের হৃদয় আবেগ। মিছিল রওয়ানা দিল ময়দানের দিকে। যেতে যেতে বাতাসে হিল্লোলিত লালঝাণ্ডা এতকাল পরে লালদিঘীর নাম সার্থক করল। নিকটবর্তী লালবাজারও বোধ করি কিছু মাহাত্ম্য খুঁজে পেল নবজাগ্রত ঝাণ্ডাধারীদের রক্তের ডাকে। কেন না দেখা গেল, রাইটার্সে ডিউটিরত কনস্টেবল রামশরণ শর্মা দ্রুত এগিয়ে এসে গদগদ স্বরে ব'লে উঠল—গুরুজী। কাল আখড়ামে হাম জরুর মারেঙ্গি মহাবীরজী মৃদু হাসলেন শুধু। মনে মনে অনুমান করতে ভুল হল না লালঝাণ্ডার বার্তা। লালবাজারের জওয়ান হিন্দুস্থানী পুলিশ মহলেও ছড়িয়ে যাবে।

গঙ্গাপ্রসাদ সিংকে দেখে মনে হচ্ছিল, গঙ্গার জোয়ার এসেছে তার বক্ষে, নিজের অফিসের পাশে এসে মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে সে অফিসের অপেক্ষমান এক কেরাণীবাবুকে জানাল— আইয়ে?

—হচ্ছেটা কী? বাবু ঈষৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন।

—হচ্ছে আপনাদের মুণ্ডু। আমাদের আপনাদেরও একদিন পথে নামতে হবে।

যুদ্ধজনিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পূর্বেকার তৈল চিক্কন বাঙালী কেরাণীবাবুদেরও ভিতরে অস্থির ক'রে তুলছিল, কিন্তু ঝাণ্ডা হাতে পথে নামা তখনো তাদের কাছে ছিল আভিজাত্য বিসর্জনের নামান্তর। অতি অকল্পনীয়।

পরদিন কুস্তির আখড়া জমজমাট। মিটিং-জৌলুসের প্রভাব পড়ল কুস্তির আখড়াতেও। অন্য আখড়ার নতুন নতুন মুখের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। লালবাজারের রামশরণ শর্মা সত্যি সত্যি হাজির। সঙ্গে বেশ কয়েকজন হৃষ্টপুষ্ট নওজোয়ান। সবাই অবশ্য সাদা পোশাকে। রামশরণ আচমকা প্রশ্ন করল—আমরা কি কোনোদিন মিছিল করতে পারব না?

—আপাতত মারাত্মক হবে, তবে কোনোদিন হয়ত তোমরাও মিছিল করবে, কে জানে। তবে অনেক ভালো কাজ আছে যা তোমরা এখনই করতে পারো।

—যথা?

—একটা ভালো কাজের ভার নেবে? শান্তিরক্ষা তো তোমাদের একটা আসল কাজ। একটা মিটিংয়ের শান্তিরক্ষা করতে পারবে?

—একটা কেন, দশটা দিন না, দেখি পারি কিনা।

রামশরণকে মহাবীরজী একান্তে ডেকে নিয়ে কী সব ফিসফাস ক'রে বললেন। শুনে রামশরণের চোখমুখ খুশিতে ভ'রে উঠল।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ-না-দেওয়া 'জনযুদ্ধে'র প্রবক্তাদের সে-সময়ে দেশদ্রোহী অপবাদের শিকার হওয়ার ফলে শান্তিতে মিটিং করা তাদের দুঃসাধ্য ছিল। তবু তারা মিটিং-মিছিল ক'রে নিজেদের বক্তব্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করত। শান্তিরক্ষার কাজে কিছু স্বেচ্ছাসেবককে ট্রেনিংও তারা দিয়েছিল। তবু প্রায়শ তাদের মিটিং পণ্ড করার দুষ্কৃতীর অভাব ঘটত না। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সুসংগঠিত একটা মিটিং-য়ের আয়োজন হয়। উদ্যোক্তারা শান্তিরক্ষা বিষয়ে আদৌ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। এই সভায় শান্তিরক্ষার দায় গ্রহণ করেছিল পূর্বোক্ত রামশরণ। সে এবং তার সঙ্গীরা এ-সভার বিন্দুমাত্র তাৎপর্য না বুঝেও তাদের গুরুজীর কথায় একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছিল এবং এই গন্ধই আরো কিছু নতুন নওজোয়ানকে আকৃষ্ট করেছিল।

তারা সাদা পোশাক প'রে সভা শুরুর অনেক আগে থেকেই উৎসাহভরে ছক সাজিয়ে ফেলেছিল। তাদের ফাঁদে প'ড়ে দুষ্কৃতীদের নাস্তেহাল হ'তে হয়েছিল—কোত্থেকে এত সব তাগড়া লোক এসে তাদের বিড়ালছানার মত ঘাড়ে ধ'রে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। সভার উদ্যোক্তারাও অবাক। ভালো ক'রে কিছু অনুধাবনের আগেই শান্তিরক্ষকরা কোথায়

উবে গেল। বিরোধীরা অবশ্য রটিয়ে দিল—কমিউনিস্টরা রাশিয়ার টাকায় গুণ্ডা আমদানি করেছিল।

আসল কথা অনেকেই জানল না—অরাজনৈতিক কাজ করিয়ে নেওয়া একটা আর্ট।

বারো

একদিন কুস্তির আখড়া থেকে মহাবীরজী ঘর্মাক্ত কলেবরে বাড়ি ফিরে লোহার গেটটা বন্ধ করতে যাচ্ছেন, এমন সময় দু'টি লোক পুলিশের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে তাঁর পিছনে আশ্রয় নিল। মহাবীরজীর হাতের ইশারায় পুলিশ প্রভুরা থেমে গেল, এবং 'ঠিক হ্যায় গুরুজী' বলে বিদায় নিল।

কিছুদিন যাবৎ শীর্ণকায় লোক দু'টিকে পাড়ার ফুটপাতে দেখা যাচ্ছিল। একদিন পাড়ার এক প্রবীণ বাসিন্দা এদের দিকে অঙ্গুলি উঁচিয়ে বলেছিলেন, জানেন, এরাও এককালে আপনাদের মতই কুস্তিগীর ছিল। ওদের সেই চেহারা যদি দেখতেন। ওদের ঘর-সংসার সবই ছিল। কিন্তু গাঁজা আফিম আর মদের নেশায় সব শেষ। ওদের একজন বেশ ভালো মেকানিক ছিল, আমার কারখানায় বেশ কিছুদিন কাজ করেছিল, ওদের অন্যজন ছিল ভালো রাজমিস্ত্রী, এ-পাড়ার অনেকের বাড়িতে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছে। এখন হতভাগারা সব হারিয়েছে—একজন বালাইয়ের কাজ করে বেড়ায়, অন্যজন রাজমিস্ত্রীদের helper, মাতাল আর নেশাখোরের পকেটে যেটুকু বাকি থাকে, পুলিশ তা হাতিয়ে নেয়, কিছু না পেলে হারামজাদারা ওদের মারধোর করে।

এই সব শুনে লোক দু'টি সম্বন্ধে মহাবীরজীর মনে একটা সহানুভূতির ভাব আগে থেকেই ছিল, কিন্তু ওদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়নি কখনো। ওরা মহাবীরজীকে দেখলে কেমন গুটিয়ে যেত। আজও ওরা হাতজোড় ক'রে সেলাম জানিয়ে দ্রুত প্রস্থান করল।

ঘরে ফিরে-মহাবীরজী বৃদ্ধ কুস্তিগীরদের কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁর কানে এসেছে—পাতিয়ালার মহারাজা নাকি তাঁর এককালের নামীদামী পালোয়ানদের অবসরকালীন ভাতা হিসাবে দিয়েছেন কিছু কিছু আমবাগান! আম বিক্রি ক'রে মানুষের চলে? চলত যদি বাগানগুলো যথেষ্ট বৃহদাকার হত। ঐ মাতাল আর নেশাখোর লোক দু'টি না হয় নিজেদের দোষে আত্মহননের বিপদ ডেকে এনেছে, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের বলিষ্ঠতম দেহ তো একদিন জরার কবলে ভেঙে পড়তে বাধ্য। তখন নিজস্ব বিষয়সম্পত্তি যাদের নেই, তাদের কী উপায়? বাস্তবিকই পালোয়ানদের জন্যই বর্তমান সমাজ নিরাপদ নয়।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, উপরোক্ত লোক দু'টি মহাবীরজীর গাড়িবারান্দার একটা কোণ রাত্রির স্থায়ী আস্তানায় পরিণত করেছে। পুলিশও আর ওদের পিছনে ঘোরে না। একটা মানসিক ভারসাম্যহীন আক্রাম এবং বিক্রম নামধারী ঐ দুই ব্যক্তি মহাবীরজীর কাছে আর্জি পেশ করল—গুরুজী, আখড়ায় আমাদের কুস্তির সুযোগ ক'রে দিন!

—এই দুর্বল শরীর নিয়ে কুস্তি লড়বি কী ক'রে রে?

—কুস্তিতে নামলেই শক্তি পাব!

—দূর হতভাগা। আগে নেশা ছাড়। ঠিকঠাক খাওয়াদাওয়া কর, শরীর ভালো কর। কী, নেশা ছাড়বি তো?

দু'জনই চুপ ক'রে রইল। গুরুজীকে কী ক'রে তারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে পারে।

মহাবীরজী মুচকি হাসলেন। তিনি জানতেন।

একদিন মাঝরাতে মাতাল এবং নেশাখোরের চিল্লানির চোটে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। গাড়ি-বারান্দায় এসে দেখলেন, দুই জ্যান্ত প্রেত-মূর্তি পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মহাবীরজীর আগমনে এদের সচল হাত-পাগুলো থেমে গেল।

আক্রাম এসে তাঁর বাঁ-পা ধ'রে বলতে লাগল—বলো ওস্তাদ তুমি মুসলমান, বিক্রম বলছে তুমি নাকি হিন্দু।

বিক্রম ডান-পা ধরে চেঁচিয়ে উঠল, গুরুজী, পাগলাকে এক গাট্টা মারো, আমি বললাম তুমি হিন্দু, ও আমাকে এই দ্যাখো কেমন খামচে দিয়েছে। বলো গুরুজী তুমি কী?

—আমি নানক।

—সে কে? না না, তুমি গুরুজী। তুমি মরার পর আমার সঙ্গে শ্মশানে যাবে তো?

—কীসে ক'রে যাবো?

—কেন, আমার সঙ্গে হেঁটে যাবে। গাড়ির ভাড়া দেওয়ার পয়সা নেই আমার, এই দ্যাখো আমার দুই পকেট একেবারে খালি। হেঁটে যাবে তো?

—আচ্ছা। মরার পরে তোর সঙ্গে হেঁটেই যাব।

আক্রাম মহা আক্রোশে গর্জে উঠল—না, আমার সঙ্গে হেঁটে যাবে গোরস্তানে। এই দ্যাখো আমার পকেটেও কানাকড়ি নেই।

—আচ্ছা, শ্মশান আর গোরস্তানে হেঁটেই যাব।

নেশাখোর এবং মাতাল খুশিতে ডগমগ হয়ে পরস্পর কোলাকুলি করল। পা দু'টো মুক্ত হওয়াতে মহাবীরজী ঘরে ফিরে গেলেন। কৌতূহলবশত একটু পরে ফিরে এসে দেখলেন দুইজন গলা জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে প'ড়েছে।

তেরো

কুস্তির আখড়া সুনাম এবং কার্যকলাপ যখন তুঙ্গে সেই সময় সেটি অভাবনীয় কারণে বন্ধ হ'য়ে গেল।

যা ভাবা যায়নি, তাই ধীরে ধীরে ঘটছিল। প্রথমে চারদিকে অসংখ্য ভিক্ষুকের ভীড় দেখা গিয়েছিল, পরে গ্রামের মানুষ দলে দলে শহরে এসে বাড়ি-বাড়ি ঘুরছিল 'ফ্যান দাও' ব'লে, শেষে আখড়ার ধারেপাশে ফুটপাতে দেখা যেতে লাগল শত শত কঙ্কালসার দেহ বা মৃত লাশ।

কুস্তিগীরদের অসহ্যবোধ হ'ল। গঙ্গাপ্রসাদ, রামশরণ এবং অনেকেই বলল, গুরুজী, এ-অবস্থায় আখড়া চলতে দেওয়া যায় না।

মহাবীরজী চাইছিলেন কথাটা ওদের দিক থেকেই উত্থাপিত হোক। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া

দিলেন—আমিও তাই ভাবছিলাম। মানুষ চোখের সামনে মরবে, আর আমরা দিব্যি ভালোমন্দ খেয়েদেয়ে দেহচর্চা করব, এতে লজ্জা তো হ'তেই পারে, যদি আমরা মানুষ হই।

দ্রুত একটা সভা ডাকা হ'ল। একবাক্যে সবাই বলে, না, আখড়া বন্ধ করলেই শুধু চলবে না, রাত্রের ঘুম যারা কেড়ে নিচ্ছে তাদের জন্যে কিছু করা চাই, নইলে, গুরুজী, আমাদের পেটের ভাত হজম হবে না।

গুরুজীর শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। বলিষ্ঠ দেহের আড়ালে বলিষ্ঠ মনের পরিচয় মিলল। সবাই এ-ও বলল যে, খুব তাড়াতাড়ি কিছু করা চাই।

সেই 'কিছু' হ'ল লঙ্গরখানা। কুস্তির আখড়া দু'দিনের মধ্যে লঙ্গরখানায় পরিণত হ'ল। পাড়াপড়শীও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল।

সব চেয়ে অবিশ্বাস্য কাণ্ড করল এক নেশাখোর এবং এক মাতাল।

বিক্রম এবং আক্রাম দু'জনেই রাত্রে গাড়ি-বারান্দায় হাত জোড় ক'রে প্রার্থনা জানাল—আমরা লঙ্গরখানার কাজ করব।

—পারবি? মদগাঁজা আফিম ছাড়তে পারবি?

—পারব। আপনি যদি আপনার আখড়া বন্ধ করতে পারেন, আমরাও নেশা বন্ধ করতে পারব।

শুনে মহাবীরজী থ হ'য়ে গেলেন। এদের মুখ থেকে এমন বাক্য নির্গত হ'তে পারে। তলিয়ে যাওয়া দু'টো মানুষের কাছ থেকেও কিছু শেখার আছে। কস্মিনকালে এমন ভাবা গিয়েছিল?

কাজের বেলায় অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল—বিক্রম আর আক্রামই হয়ে উঠেছে সব চেয়ে উৎসাহী কর্মী। এবং বলতে গেলে সর্বক্ষণের কর্মী। অন্যদের অন্য কাজ আছে, আক্রাম-বিক্রমদের সে বালাই নেই।

যাদের ঘর-সংসার ভেসে গেছে, তারাই মৃত্যুপথ যাত্রীদের বাঁচাতে কী ক'রে এতটা সক্রিয় হ'ল। মনস্তত্ত্ববিদরা হয়ত বলবেন, নিজেদের চেয়ে অন্যদের অতি অসহায় দেখলে ভিতরে ভিতরে একটা শ্রেষ্ঠত্বের প্রচ্ছন্ন বোধ মাথা চাড়া দেয় এবং পুনরায় পুনর্জীবনে ফিরিয়ে আনে। কিসের থেকে কী হয় কে জানে, কিন্তু আক্রাম-বিক্রম সবাইকে বিস্মিত ক'রে দিয়ে স্বাভাবিক মানুষের মত আচার-আচরণের স্বাক্ষর রাখল।

মুনীববাড়ি থেকে মহাবীরজীর হাতে একটা চিরকূট এল। প'ড়ে তিনি অবাক হলেন। মেজকর্তার গৃহিণী সুনীতি দেবী তাঁকে অবিলম্বে দেখা করতে বলেছেন। মেজকর্তার কী কিছু অঘটন ঘটেছে।

মুনীববাড়িতে ঢুকে মহাবীরজীর মনে হল, প্রথমে প্রয়াত প্রবোধ বণিকের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করাই সঙ্গত। উনি এ-বাড়ির সকলের বড়মা, প্রবোধবাবুর জীবিতকালেও সবাই জানত, এ-বাড়ির আসল পরিচালিকা কে। সকলেরই মতই মহাবীরজীও সেই শক্তিময়ীকে বড়মা বলেই সম্বোধন করতেন।

বড়মা যখন সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন মহাবীরজী একবার তাঁর দিকে তাকিয়েই চক্ষু নত না করে পারলেন না। বড়মাকে তিনি দেখেছিলেন সালঙ্কারা, আজ নিরাভরণা শুভ্রবস্ত্রধারিণীর মূর্তি মহাবীরজীর ভিতরের শোকার্ত হৃদয়টিকে প্রচণ্ড নাড়া দিল। মুখে কথা জোগাল না। বুদ্ধিমতী চক্ষের পলকেই বুঝে নিলেন। বড়মা স্বাভাবিকভাবেই বললেন আমি সুনীতিকে ডেকে পাঠাতে বলেছিলাম তোমাকে। তুমি বসো, আমি মেজোকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

মহাবীরজী অতি সংকুচিত হ'য়ে একটা সোফায় বসলেন। বড়মা তাঁর পাশে বসে বললেন, সুবোধ অনেকদিন ধ'রেই শ্বাসকষ্টে ভুগছিল, এখন বড্ড বেড়েছে। তাকে তাঁর মেয়েজামাইয়ের কাছে বোম্বে পাঠিয়ে দিয়েছি, সমুদ্রের ধারে ওদের বাসা, ডাক্তারবাবুই বলেছিলেন সমুদ্রের হাওয়া খুব উপকারী।

একটু থেমে বড়মা বললেন, যতদিন সুবোধ সুস্থ হ'য়ে না ফেরে ততদিন সুনীতিকেই বলেছি সম্পত্তি দেখাশোনার ভার নিতে। সুনীতি লেখাপড়া জানা মেয়েই শুধু নয়, আমার চেয়ে উপযুক্ত।

মুনীববাড়ির বৌ-দের মধ্যে এতখানি পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা দেখে মহাবীরজী মুগ্ধ হলেন। যে-সমাজে সব কিছু ভেঙে পড়ছে সেখানে এঁরা এখনো অক্ষত আছেন। তাঁর পূর্ববর্তী আশঙ্কা ছিল নিতান্তই অমূলক।

সুনীতিদেবী এসে সোজাসুজি বললেন, আমরা ঠিক করেছি ও-বাড়ির এ-মাসের ভাড়ার টাকাটা তোমার লঙ্গরখানা চালাতে আমরা দান করব। সামনে মাসে আবার ভেবে দেখব।

বড় মা তাঁর ভারি ওজনের দু'খানা অলঙ্কার তুলে দিলেন মহাবীরজীর হাতে।

মহাবীরজী পথে নেমে এতক্ষণের রুদ্ধ অশ্রু মুছে চারপাশের বাড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে চললেন। হায়, এইসব সম্পন্ন গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে যারা 'ফ্যান দাও' বলে এসেছিল, তাদের মুখের সামনেই অনেক বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই পাষাণময় মহানগরীতে এখনো সবাই পাষাণ হয়ে যায়নি, যদিও দৈত্যকুলে প্রহ্লাদদের জন্ম হলেও দৈত্যকুল দৈত্যকুলই থাকে।

ভাড়াটেরা ব্যাপারটা জেনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। ফ্ল্যাটের ছেলেমেয়েদের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে দান করতে দেখা গেল। পাড়াপড়শীরা বাদ গেল না। তাঁদের সক্রিয়তা এবং সন্ধানের ফলে পুলিস সাধুখাঁর চোরাই চালের গুদামে হানা দিতে বাধ্য হ'ল। আশেপাশের লঙ্গরখানাগুলো উপকৃত হল। তবু ফুটপাতে মৃত লাশের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। শোনা গেল, যাদের নীতির ফলে এই দুর্ভিক্ষ, তারা জাপানীদের হাতে প্রয়োজনবোধে বুভুক্ষু বাংলাকে ছেড়ে দিয়ে এলাহাবাদে ফ্রন্ট লাইনের প্ল্যান করেছে। তাদের শুভাগমনে একদা বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ শহরের পথে এমনি মৃত্যুর মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। যাবার বেলাতেও তারা রাঙিয়ে দিয়ে যাবে।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এলেন একদিন। কর্মরত আক্রাম এবং বিক্রমকে কাছে ডাকলেন হাতের ইশারায়। তাদের মাথার খুলিতে হাত বুলিয়ে স্বগতোক্তি করলেন, অস্ট্রোলয়েড, ঠিক আমার মতো! যা, কাজ কর্।

কিছু লোক চারপাশে জমে গেল। মহাবীরজী আর্জি পেশ করলেন, আপনি কিছু বলুন, এরা শুনতে চায়।

—বলার কিছু নেই। যতটা পারো করো। যদি শক্তিশালী কৃষক-আন্দোলন থাকত এই সময়—

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই তিনি চলে গেলেন।

চোদ্দ

শেষে পর্বতই এলেন মহম্মদের কাছে—কমলজীকে সঙ্গে নিয়ে নিত্যানন্দ চৌধুরী মহাবীরজীর ঘরে এসে হাজির। বললেন, কমরেড ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এসেছিলেন, আমি না এসে পারি?

মহাবীরজী সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন মাননীয় আগন্তুকের দিকে। একটিমাত্র বাক্যে নিত্যানন্দ চৌধুরী প্রকাশ করেছেন কী গভীর শ্রদ্ধা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতি।

—মানুষটিকে এখনো অনেকে চিনতে পারেনি। কমরেড দত্তের সহজ সরল ব্যবহারই হয়ত এর জন্য দায়ী। অতি সহজলভ্য হয়ে যাওয়াতে ঢাকা প'ড়ে গেছে তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্য এবং বিপ্লবী ঐতিহ্য। বুদ্ধিজীবীরা তাঁর পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে পারেনি। ক্ষতি হয়েছে সমাজের। এর জন্যে আমরা সবাই অপরাধী। কথাটা কি ঠিক বলিনি কমল?

—কী বলব, নিজেকেও অপরাধী মনে হয়। অথচ মুস্কিলে পড়লেই তাঁর কাছে দৌড়ে গেছি, তিনি বুকে টেনে নিয়েছেন, সাধ্যমত বলবুদ্ধি জুগিয়েছেন। কোনো কাজের অছিলায় কখনো আমাদের ফিরিয়ে দেননি।

নিত্যানন্দ চৌধুরী মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে বললেন, "এই অসামরিক ব্যবহারই আমাদের বুঝতে দেয়নি তাঁর অগ্রজ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে কোথায় তাঁর পার্থক্য। দেখো কমল, আমি স্বামীজীকে বিন্দুমাত্র খাটো করছি না, কমরেড দত্তও তা করেননি, বরং জ্যেষ্ঠকে তিনি সমাজতান্ত্রিক বলে মেনে নিয়েছিলেন, তবু আমরা যেন ভুলে না যাই দু'ভাইয়ের মধ্যেকার আকাশ-পাতাল ফারাক। বিবেকানন্দ গিয়েছিলেন ঈশ্বরসন্ধানে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে, আর আমাদের কমরেড দত্ত সত্যের সন্ধানে গিয়েছিলেন লেনিনের কাছে। স্বামীজীর বিশ্বজোড়া নাম, অথচ কমরেড দত্তকে ক'জন জানে? এর কারণ খুঁজে বের করতে পারো মহাবীর?"

মহাবীরজী থতমত খেয়ে প্রথমটা চুপ ক'রে রইলেন, এ-ধরনের আলোচনা তিনি কখনো শোনেননি, যোগ দেওয়া তো দূরের কথা। তবু একেবারে চুপ ক'রে যাওয়া বেমানান বোধ হওয়ায় আমতা-আমতা ক'রে বললেন, এখানে এসে কৃষক-আন্দোলন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উনি থেমে গিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ কমলের মুখে আমি শুনেছি। ঐ জায়গাটাতেই ওঁর ব্যথা। লেনিন ওঁকে ভারতে কৃষক-সংগঠনের ব্যাপারে মনোযোগী হ'তে চিঠিতে লিখেছিলেন। আমরা গ্রামেগঞ্জে

যেখানেই কৃষকদের মিটিং-য়ে ওঁকে ডেকেছি, উনি ছুটে গিয়েছেন, কিন্তু আশানুরূপ কর্মী পাননি, আবার বলছি ঐখানেই ওঁর ব্যথা, কারণ ভারত কৃষক-প্রধান দেশ, সেখানে ফাঁক থেকে গেলে সব মাটি। কমরেড নিত্যানন্দ থেমে গেলেন। তাঁর চোখে জল!

চোখ মুছে বিস্মিত কমলজী এবং মহাবীরজীকে ধরা গলায় বললেন, উনি যখন লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে রাশিয়ায় যান, তখন সেখানে এখানকার মতই দুর্ভিক্ষ চলছিল। শোষকরা বিপ্লবকে দুর্ভিক্ষের ফাঁসে গলা টিপে মেরে ফেলতে চেষ্টা করছিল। উনি সচক্ষে দেখে এসেছেন কীভাবে লেনিন এই চক্রান্ত ব্যর্থ করেন। আমাকে উনি বলেছেন, "দ্যাখো, বৃটিশ ইচ্ছে করলেই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু তাদের পলিসি তা নয়, তোমরা করছ 'জনযুদ্ধ', আর ওরা করছে লোকজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এমনি করেই সিরাজদ্দৌলা-খুনের পর ওরা দুর্ভিক্ষের বাঘকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিয়েছিল। বাংলার তখনকার রাজধানী মুর্শিদাবাদ শহর হয়েছিল কলকাতার ফুটপাতের মত মরা লাশে ভর্তি। পাকিস্তান-দাবি ওঠার ফলে আরো একটা ভয়ের ব্যাপার ঘটতে পারে। যে-পলিসিতে এবং যাদের দিয়ে ওরা দুর্ভিক্ষ ঘটিয়েছে, তাদের দিয়েই ওরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দিতে পারে। যেখানে জমিদারদের বেশিরভাগ হিন্দু এবং প্রজাদের বেশিরভাগ মুসলমান, সেখানে একটু কলকাঠি নাড়লেই সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়বে। সেই সুযোগ ওরা নেবে না কেন নিত্যানন্দ? কি দিয়ে আমরা বাধা দেব? সে রকম কৃষক সংগঠন কই?"

উদাস দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কমরেড দত্ত আবার মুখ খুলেছিলেন, "আমার ভ্রাতা স্বামীজী কী বলেছেন এবং দেশবাসী তা জানে—নতুন সমাজ-সভ্যতা নাকি তৈরি হবে যখন কৃষকের লাঙ্গল, কামারের হাপর, ধুনুরীর উনোনোর পাশ থাকে, জেলের মাছের ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে শূদ্ররাজ। আমাদের অত ভাসা-ভাসা কথায় চলবে না। লেনিন শিখিয়েছেন, শ্রমিক-কৃষকের জোট ছাড়া কিছু হবার নয়। কিন্তু এইখানেই আমরা ঠেকে যাচ্ছি।"

"কমরেড দত্তের সেই সকরুণ দৃষ্টি এবং চেহারা আমি আজো ভুলিনি।" কমরেড নিত্যানন্দ সেদিন এই ধরনের অনেক কথা বলেছিলেন। বলতে বলতে হাঁপিয়েও গিয়েছিলেন। তবু কমলজী বা মহাবীরজী কেউই সেদিন তাঁকে কিছু খাওয়াতে পারেননি।

কমরেড নিত্যানন্দ বলেছিলেন, আমি ইচ্ছে করলেও সহজে কিছু মুখে তুলতে পারিনে। একবেলার বেশি খাই না। কিন্তু কমরেড দত্ত? উনি তো গোটা একদিন উপোস দিয়ে পরদিন একবেলা একটু খান। অথবা তাও নয়। এইভাবে চললে ঐ বৃদ্ধ ক'দিন বাঁচবেন? উনিও এই দুর্ভিক্ষের শিকার হবেন।

অনেক রাত অবধি মহাবীরজীর চোখে নিদ্রা দেবীর আগমন ঘটেনি। তিনি প্রায় প্রতিজ্ঞার মত মনে মনে বললেন—কলকাতার পাট চুকে গেলে ডঃ দত্তের কথামত গ্রামে ফিরে আমি কৃষকদের মধ্যেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেব, দেখব কী করা যায়। এই চিন্তার পর ঘুম এল তাঁর চোখে।

এর কয়েকদিন পর কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পুরনো বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন কমরেড ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। হাসি হাসি মুখ। আচমকা মহাবীরজী পথে যেতে যেতে এই দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালেন। একটা পুরনো বই কিনে হাঁটতে লাগলেন কমরেড দত্ত। মহাবীরজী নীরবে চলতে লাগলেন পিছু পিছু। কী একটা কারণে কমরেড দত্ত পিছনে তাকিয়ে মহাবীরজীকে দেখে তেমনি হাসি হাসি মুখে বললেন, আরে তুমি।

—আপনি হাসছেন।

—কই না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে মনে হাসছি বটে।

—কেন কমরেড?

—কয়েকটা দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামে গিয়েছিলাম, আমাদের কমরেডরা প্রাণপণে খাটছে। সেখানেও লঙ্গরখানা খুলেছে! তাই হাসছি।

—তাই হাসছেন। মাপ করবেন, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

—আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। পার্টি জনযুদ্ধ ঘোষণার পর কিছু কমরেডকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়, জানো নিশ্চয়? সেই সব কমরেড, সংখ্যায় কম হ'লেও, জেলায় জেলায় ছড়িয়ে যায়; গ্রামে কিছু কাজে লেগে যায়, তাও জানো নিশ্চয়ই?

মহাবীরজী ঘাড় কাঁপিয়ে বললেন, জানি।

—এবার তাঁরা গ্রামে রিলিফের কাজ করতে গিয়ে বেশ কিছু জায়গায় কৃষকদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ক'রে চলেছে। ভবিষ্যতে এর সুফল পাওয়া যাবে নিশ্চয়। এ যেন ঘন দুর্যোগে মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু, তাই না?

পনেরো

একটানা আশি দিনের ট্রাম-ধর্মঘট নগরবাসীর কাছে ছিল বিস্ময়কর আর মহাবীরজীর জীবনে এটা ছিল শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শগত শিক্ষা। ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গ তিনি আগে থেকে আঁচ করতে পারেননি। প্রথম সজাগ হ'লেন যখন তাঁর দারোয়ান ইউনিয়নের কেউ কেউ প্রশ্ন করতে শুরু করল—গুরুজী, ট্রাম ধর্মঘট কি সত্যিই হবে?

মহাবীরজী সদুত্তর দিতে পারেননি। ট্রাম-ধর্মঘটের সম্ভাব্যতা অন্যান্যদের মতই তাঁরও কাছে ছিল অস্পষ্ট। ট্রাম শ্রমিকদের সংগঠন শক্তি তাঁর সম্পূর্ণ অজানা ছিল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ বৃটিশ রাজত্বে যে ট্রাম চিরকাল সচল, সে-ট্রাম কি অচল হ'তে পারে?

কিন্তু দারোয়ান ইউনিয়নের ওরা আসন্ন ট্রাম-ধর্মঘটের ব্যাপারে কেন এতটা জিজ্ঞাসু? বেশি খোঁজ নিতে হ'ল না। সহজেই জানালেন নানাসূত্রে দারোয়ান ইউনিয়নের অনেকেই ট্রাম-শ্রমিকদের সঙ্গে জড়িত। অনেকেরই ভাই-বন্ধু-আত্মীয় ট্রাম-শ্রমিক। এই জন্যেই ওদের এত ঔৎসুক্য, এত উদ্বেগ। ধর্মঘট করতে গিয়ে অনেকের চাকরিবাকরি খোওয়া যাবে না তো? তখনকার দিনে অধিকতর সংখ্যক ট্রাক-শ্রমিক ছিল হিন্দী-উর্দুভাষী বিহার ও যুক্তপ্রদেশের লোক, যাদের বলা হ'ত হিন্দুস্থানী।

সুসংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন সর্বদাই দীর্ঘ তপস্যার ফল। ট্রাম-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকায় আস্থাবান মুষ্টিমেয় কয়েকজন

ব্যক্তি লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে নিভৃতে বছর পনের আগে থেকে দারুণ অধ্যাবসায় সহকারে অসাধ্য সাধনে ব্রতী হন। তাঁদের জীবনে না ছিল দিনযাপনের রসদ, না ছিল পূর্ব অভিজ্ঞতা, না ছিল বিশেষ কোনো শক্তির সহায়তা বরং ছিল চরম অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্য এবং গোয়েন্দা চক্ষুর অচিন্ত্যনীয় প্রহরা। বলাই বাহুল্য, তখন প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগই ছিল না। গোপনে কাজ করতে গিয়ে মাজে মাঝে হাজতবাস ছিল প্রায় অবধারিত।

জাতীয়তাবাদী নেতাদের আন্দোলন পরিচালনায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে যে-সব বিপ্লবী জেল থেকে কমিউনিস্ট মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে মুক্তি পেয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে সামিল হ'তে চাইতেন, তাদের তখনকার দিনে কোনো-না-কোনো শ্রমিক অঞ্চলে কাজ করতে বলা হত। এঁদের কেউ কেউ ট্রাম-শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। তখনকার অতি অস্বাস্থ্যকর বস্তি এলাকা,' যেখানে বেশিরভাগ ট্রাম-শ্রমিক বাস করতেন, সেখানে পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা সহজসাধ্য ছিল না। নোনাপুকুরের ট্রাম-রিপেয়ার কারখানায় কয়েক সহস্র শ্রমিক কাজ করতেন এবং এখানকার বস্তিগুলিই ছিল সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র। বেলগাছিয়া, রাজাবাজার, হাওড়ার শিবপুর, বেহালা, কালিঘাট, খিদিরপুর, বালিগঞ্জ, বালিগঞ্জের ট্রাম-ডিপোগুলোর সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতেও যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক বাস করতেন, অতি ভোরে এক-একটা বিশেষ ট্রামে তাদের নোনাপুকুরে নিয়ে আসা হ'ত।

সংগঠকদের মধ্যমণি ছিলেন মার্কসবাদ-প্রয়োগদক্ষ কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী। তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজন বিপ্লবী নেতা। এঁদের সাহচর্যে কাজ করতে করতেই অভ্যুদয় ঘটে পরবর্তীকালের মহম্মদ ইসমাইল, ধীরেন মজুমদার এবং মিশিরজীর মত স্বনামধন্য শ্রমিক নেতার।

বাইরের লোকেদের কল্পনার অতীত ছিল যেভাবে খোদ কলকাতার বুকে সসাগরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অতি সংগোপনে একটি শক্তিশেল তৈরী হচ্ছে। এ কোনো আকস্মিক দুরন্তপ্রদর্শন নয়, বোমাবাজি নয়, হঠকারী অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নয়, এ হচ্ছে পুঁজি দানবকে মূলে উপড়ে ফেলার একটা দীর্ঘস্থায়ী সংগঠন—অন্তত সেটাই ছিল মূল সংগঠকদের প্রতিরোধ এবং সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য। তাঁরা শুধু সংগঠন বাড়াতেই মন দেননি, তাকে পারিপার্শ্বিকভাবে মজবুত করতে আশেপাশের মানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ সাধনের চেষ্টায় নিত্য তৎপর হলেন। বৃটিশ শাসক শ্রেণীর কাছে এ-সব ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অভাবনীয়। তাঁদের ট্রামের ব্যাপারে শক্তির স্তম্ভ ছিল পুলিশ, মিলিটারী, মামলা, কিছু আংলোইন্ডিয়ান টেকনিসিয়ান এবং কর্মাধ্যক্ষ।

নির্ধারিত দিনের অতি প্রত্যুষেই কলকাতার মানুষের চক্ষু থেকে চিরঅভ্যস্ত ট্রামগাড়ি অন্তর্হিত হল। কী একটা মন্ত্রবলে যেন কী একটা অঘটন ঘটে গেল। কোথাও হৈ-হল্লা, পিকেটিং নেই, স্লোগান নেই, সর্বত্র অটুট শান্তি বিরাজিত, তবু শাসকদের দানবীয় রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে একটা মানবিক অভ্যুত্থান।

মহাবীরজী স্বতঃপ্রবৃত্ত কিছু স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে নিয়ে অতি ভোরবেলা হাজির হয়েছিলেন শ্যামবাজার ট্রাম-ডিপোর সামনে। কেউ তাঁকে এ-কাজে অনুরোধ-উপরোধ করেনি। কিন্তু যাদের স্ট্রাইক, তাদের তো কাউকেই চোখে পড়ছে না। কেবল ডিপোর দরজা বন্ধ। ট্রামের

লোকজন কোথায় গেল। শুধু চোখে পড়ল অজস্র পুলিশ এবং পুলিশ ভ্যান, যাতে গ্রেপ্তার হওয়া ট্রাম শ্রমিকদের ভর্তি করার কথা। কিন্তু গ্রেপ্তার করবে কাকে? কাউকেই তো পাকড়াও করার মত পাওয়া যাচ্ছে না।

অথচ তারা আশেপাশেই ছিল, যথেষ্ট সংখ্যাতেই ছিল, শুধু ট্রামকোম্পানীর উর্দী ছেড়ে সাদা পোশাকে ছিল। ছিল পানবিড়ি দোকানের সামনে, চায়ের স্টলগুলিতে, মিষ্টির দোকানে এবং পাড়ার যুবকদের ব্যায়ামাগার বা ক্যারাম খেলার আসরে। ট্রাম-শ্রমিক বলে কাউকেই চেনার উপায় ছিল না।

মহাবীরজী এবং তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে স্ট্রাইকারদের আলাপ-আলোচনা জমে উঠল। বেলা ন'টা নাগাদ অতি সুপুরুষ বলিষ্ঠ ট্রাম শ্রমিক নেতা মিশিরজীর সঙ্গে এলেন মহম্মদ ইসমাইল। হাসি-হাসি মুখ। সর্বত্র ঘুরে এসেছেন। সর্বত্র সাফল্যের একই চিত্র। কোথাও গ্রেপ্তারের খবর নেই।

এমন সময় এলেন কমলজী। খৈনির আসর জমে উঠল।

এক বাঙালী কেরাণীবাবু কার্তিকটি সেজে, পান মুখে দিয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রত্যহ শ্যামবাজার ট্রামডিপোয় এসে উত্তর একটি আসন সংগ্রহ ক'রে অফিস-যাত্রা করতেন, আজও এসেছেন, তাঁর গড্ডলিকা প্রবাহে আচমকা ছেদ পড়ায় এ-দিক ও-দিক ঘোরাফেরা ক'রে হতাশ হয়ে এগিয়ে এসে বললেন, ট্রাম চলছে না কেন?

—ট্রামকেই জিজ্ঞাসা করুন।

—রসিকতা হচ্ছে! ছোট লোকদের বাড় বেড়েছে। এখন আমি ভীড়ের বাসে উঠি কী ক'রে?

—ঠিকই পারবেন, যদি একটু খৈনী খান, নিন না

—ধ্যাৎ। খৈনী আর ছাতুখোরদের বড্ড বাড়াবাড়ি! এই বলে উষ্মা চাপতে না পেরে পানের পিক গিলে ফেলে কাশতে কাশতে পদযাত্রা শুরু ক'রে বললেন, পাক্কা এক ঘণ্টা লেট হবে।

পিছনে হাসির শব্দ। পদযাত্রা দ্রুততর হল।

মহম্মদ ইসমাইলকে লক্ষ্য ক'রে মহাবীরজী বললেন, আপনারা সংগঠনের যাদু দেখালেন। বলবেন, এটা কী ক'রে সম্ভব হ'ল?

—এ বহু বছরের বহু দুঃখ কষ্ট এবং চেষ্টার ফল। আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না। সংগঠন করতে এসে চিনলাম। আট হাজার ট্রাম-মজুরদের অনেককেই আমি নাম ধ'রে ডাকতে পারি। মেলামেশায় আমরা একটা ফ্যামিলির মত হ'য়ে গেছি। শহীদ সূর্য সেনদের কাছে এটা নিশ্চয় ছিল কল্পনার অতীত, তাই না? আমাদের ব্যাপারটা আগাগোড়া অন্যরকম। এই দেখুন না ট্রামের কোন্ ড্রাইভার কোথায় তাকে, আমাদের নখদর্পণে। কিন্তু পুলিশের বাবার সাধ্যি নেই তাদের খোঁজ পায়, পেলেও তাদের ধরে এনে ট্রাম চালানো অসম্ভব, কেননা আমরা ওদের আগে থেকে স'রে থাকতে বলেছি। যাদের রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না, তারা অসহায়। ট্রামের কর্তারা আমাদের মত খৈনী টিপুক। আর কেরাণীবাবুরা রাগে মাটিতে ঢেলে ভাত খাক্!

একটু আগে এক পানের দোকানদার আমাকে কী বলল, জানেন? বাহাদুর ট্রাম-ওয়ার্কার। জানেন আমি আগে ছিলাম কলকাতার বাহাদুর পালোয়ান? এখন আপনারাই হ'লেন কলকাতার বাহাদুর ট্রাম-ওয়ার্কার।

আশি দিনের ট্রাম-ধর্মঘট আস্তে আস্তে যেন কলকাতার নাগরিক ভুলেই গেলেন কোনোকালে এ শহরে ট্রামগাড়ি ব'লে কিছু একটা চলত। ট্রাম লাইনের লোহায় জং ধরে গেল, জায়গায় ঘাস গজিয়ে উঠল। দীর্ঘকাল মাইনে না পেয়ে পেটে পাথর বেঁধে এত শ্রমিক ধর্মঘট চালাতে পারত কিনা সন্দেহ, যদি না তাদের পাশে এসে দাঁড়াত বহু জায়গার নানা শ্রমিক সংগঠন। তাঁরা শ্রমিক-সৌভ্রাতৃত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন দেখালেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন, সাধ্যমত টাকাপয়সা চাল, আটা, গম পাঠালেন। ট্রাম-শ্রমিকদের সমর্থনে সাধারণ ধর্মঘটের কথাও শোনা যেতে লাগল। ব্যাপারটা নাগালের বাইরে চ'লে যেতে পারে আশঙ্কায় শেষ পর্যায়ে বিলাতী কোম্পানী মাথা নত করল। অভাবিত জায়গাতেও ট্রাম শ্রমিকদের জয়ধ্বনি শোনা গেল। যেমন, অফিসে অফিসে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিতে জর্জরিত কেরাণীকুলের মধ্যে ফিসফাস, কানাকানি, ওরা যা পারে আমরা তা পারব না কেন?

কোথাকার জল কোথায় গড়াবে? হিন্দুস্থানী ট্রামওয়ার্কাররা কি এতকালের বৃটিশ আশীর্বাদধন্য গর্বিত বাঙালী কেরাণীবাবুদের পথ দেখাবে? তিন লক্ষাধিক কেরাণী অধ্যুষিত এতকালের নিস্তরঙ্গ অফিসপাড়ায় ভিতরে ভিতরে অসন্তোষের চোরাস্রোত বইছিল। এখন ট্রাম শ্রমিকদের সাফল্য নতুন ইন্ধন জোগাল। কমিউনিস্ট পার্টি লক্ষ্য রাখছিল এবং একজন অভিজ্ঞ ট্রেড ইউনিয়ন নেতার সন্ধান করছিল। এক যুগ আগের কলকাতার গাড়োয়ান ধর্মঘটের নেতা মোমিনকে আপাতত বাছাই করা হ'ল।

আব্দুল মোমিন একদিন কথায় কথায় মহাবীরজীকে বললেন, দেখুন, এখানকার কেরাণীবাবুদের এককালে মাছিমারা কেরাণী বলে উপহাস করা হ'ত, কিন্তু তাঁরা যদি ঘুরে দাঁড়ান? একটুখানি মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাঁড়ান? তা হ'লে কী হবে জানেন তো? ইংরেজী ভাষা চালু করে যে বৃটিশ একদা একদল পোষমানা কেরাণী বানাতে চেয়েছিল, সেই পলিসিই ব্যর্থ হবে। তার ফল সুদূরপ্রসারী। কেননা এই তিন লক্ষাধিক মানুষই এক হিসাবে মহানগরীর প্রাণ, এঁরা কোনো-না কোনো সূত্রে শিক্ষক ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-উকিলবাবুদের আত্মীয়, কুটুম্ব, এঁদের সবাকার ছেলেপুলেরাই এখানকার কলেজ স্কুলের বেশিরভাগ ছাত্র, খেলার মাঠ আর সিনেমা হলের প্রধান দর্শক। ডেলি প্যাসেঞ্জারদের একটা বড় অংশও এঁরাই। ডাক-তার-রেল বিভাগের সঙ্গেও এঁদের যোগ আছে। এঁরা যদি আন্দোলনের পথে নামে, মিছিল করতে ঝাণ্ডা কাঁধে নিতে লজ্জা না পায়, সব বাধো-বাধো ভাব ভেঙ্গে যায়, এবং আমরা যদি এঁদের সঙ্গে ঠিকমত পা মেলাতে পারি, তা'হলে হয়ত একটা নতুন পথ তৈরি হবে। রুশ বিপ্লবের পর কী হয়েছিল? লেনিন একজন দক্ষ ব্যাঙ্ককর্মী পর্যন্ত পাননি। ফলে পুরনো আমলাদের শরণ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, ফলে দুঃখ করে বলেছিলেন, ইঞ্জিন আমাদের হাতে কিন্তু গাড়ি চলছে অন্য পথে। লেনিনের ভাগ্যে কর্মচারী আন্দোলন করার মত গণতান্ত্রিক সুযোগ ঘটেনি। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পুরনো আমলাদের নতুন করে গড়া যায়নি। ফল যা হবার হয়েছে।

ষোলো

তখনকার দিনে তৈলক্ষেত্রে বৃটিশ বার্মা-শেল-কোম্পানীর ছিল একাধিপত্য। বজবজে ছিল বার্মা শেলের তৈল ডিপো। সেখানকার শ্রমিকদের ইউনিয়ন অনেক দিনের। কিন্তু হেড অফিসের কেরাণীবাবুরা সে ইউনিয়নের বিস্তার ঘটতে দেননি নিজেদের অফিসে। এবং নিজেরাও কোনো ইউনিয়ন করেননি। তাঁদের অফিসের দারোয়ান রঘুনাথ মিশ্রকে একদিন দেখা গেল মহাবীরজীর ডেরায়।

—না, দারোয়ান ইউনিয়নের কাজে আসিনি, আমাকে পাঠিয়েছে আমাদের অফিসের বাবুরা।

—কী ব্যাপার বলো তো।

—তাঁদের ধারণা, বঙ্কিম মুখার্জীর সঙ্গে আপনার 'জানপাচান' আছে।

—তা আছে, কিন্তু কেন?

—বঙ্কিম মুখার্জী বার্মাশেলের বজবজের মজুর ইউনিয়নের সভাপতি নন?

—হ্যাঁ, কী বলতে চাও সোজাসুজি বলো।

—বাবুরা অফিসে ইউনিয়ন করতে চান। আর বজবজের বার্মাশেলের মজুর ইউনিয়নের সভাপতি বঙ্কিম মুখার্জীকেই অফিস-ইউনিয়নেরও সভাপতি চান। আপনি বঙ্কিম মুখার্জীর কাছে বাবুদের একজনকে নিয়ে যেতে পারেন? শুনে ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন মহাবীরজী। কমরেড আব্দুল মোমিন যা বলেছিলেন, তা কি চোখের সামনে বাস্তবে পরিণত হ'তে যাচ্ছে? ঘাড় নেড়ে তিনি রঘুনাথ মিশ্রকে সম্মতি জানালেন।

এই সূত্রে এক বিচিত্র জীবের সঙ্গে মহাবীরজীর পরিচয় ঘটল। লোকটির নাম শিবপদ রায়। তিনি এক গ্রামের বাসিন্দা এবং ডেলি প্যাসেঞ্জার। গ্রামে তিনি জোতদার, প্রচুর জমি জমার মালিক এবং কেউ কখনো কৃষকদের প্রতি তাঁর দয়ামায়ার কথা শোনেনি। এই জীবটিই সর্বাগ্রে অগ্রসর হয়েছেন ইউনিয়ন গড়তে। গ্রামে তিনি শোষক, ডালহৌসীতে তিনি শোষকদের বিরুদ্ধে। তাঁকে সঙ্গে করেই মহাবীরজীকে যেতে হবে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর কাছে। বলা বাহুল্য, শিবপদ সম্বন্ধে উপরোক্ত তথ্যাদি মহাবীরজীকে সাপ্লাই করেছিলেন রঘুনাথ মিশ্র।

বঙ্কিম মুখার্জী এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন। যেন তিনি এরূপ আহ্বানের অপেক্ষাতেই ছিলেন। ফিরতি পথে শিবপদ রায় বললেন, আমার বাড়িতে কিন্তু একবার আপনাকে পায়ের ধুলো দিতে হবে।

—কী করে দেব, পায়ের জুতো খুলে খালি পায়ে যাব!

—আপনি খুব রসিক বটে। আমি মানুষই কিন্তু বে-রসিক, আমি কেবল বিষয়সম্পত্তিতে রস পাই।

—তা তো বটেই, তা তো বটেই।

মহাবীরজী মনে মনে বললেন, দাঁড়াও বাবু শিবপদ রায়, তোমাকে আমরা মজা দেখাচ্ছি। রঘুনাথ মিশ্রকে বেশ কয়েকজন গ্রাম দেখতে উৎসুক দারোয়ানকে জোগাড় করতে

লেন। এর আগে সঠিক দিনক্ষণ মত মহাবীরজী কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীকে ভারতসভা লে নিয়ে ঢোকামাত্র ধ্বনিত হল—বঙ্কিম মুখার্জী জিন্দাবাদ। সাংঠনিক পর্ব সমাপ্তির পর তুন সংগঠনের নতুন সভাপতি ভাষণের পালা। সভাপতি অভিনব একটা প্রস্তাব করলেন, াগে আপনারা কেউ একটা গান করুন।

কেউই প্রস্তুত ছিল না। সভা স্থল নিস্তব্ধ একটু অপেক্ষা করে কমরেড মুখার্জী লেন—তা'হলে আমি দারোয়ান ইউনিয়নের সেক্রেটারী কমরেড মহাবীরপ্রসাদ সিংকে কটি গান গাইতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি জানি তিনি সুগায়ক।

মহাবীরজীও অপ্রস্তুত। নিরুপায় হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গান ধরলেন, যে-গানের নাম ন্টারন্যাশনাল। সভাপতির ইঙ্গিতে শ্রোতারা উঠে দাঁড়াল। সভাপতির উদাত্তকণ্ঠও গানের ঙ্গে যুক্ত হল, হলের কেউ কেউ গলা মেলাল। একটা গান সহসা সভার ভিন্ন চরিত্র ৃষ্টি করল। করবেই তো, এ যে—'গাও ইন্টারন্যাশনাল। মেলাবে মানবজাত' গান শেষে হাবীরজী শিবপদ রায়ের পাশে গিয়ে বসলেন। শ্রীযুক্ত রায় গদ্গদ স্বরে বললেন, মৎকার! আমি যদি এমন গাহিতে পারতাম। কাল শনিবার, মনে আছে তো? যাচ্ছেন তা। ফিরতে রাত হ'লে আমার বড় ছেলে আপনাকে স্টেশনে গিয়ে গাড়িতে তুলে দেবে।

সভাশেষে বেরিয়ে আসার সময় কয়েকটি লোক সভাপতিকে ঘেরাও ক'রে ম্লান মুখে রুণ স্বরে বলল, আমাদের কথা তো কিছু বললেন না।

—আপনারা কা'রা?

—আমরা অফিসের বেয়ারা, পিয়ন ঝাড়ুদার... আমরা ইউনিয়নের মেম্বার হ'তে পারব না?

কমরেড মুখার্জীর কাছে এটা ছিল অপ্রত্যাশিত, একটু থমকে গেলেন। ধীরে ধীরে লেন, হ্যাঁ, আপনাদের কথাও ভাবতে হবে আমাদের। কিন্তু আপনারা তো একটা অফিসে খ্যায় নগণ্য, অন্যান্য অফিসের লোকদের নিয়ে একটা কিছু সংগঠন গড়তে হবে। দেখা ক, কী করা যায়, তাই না কমরেড মহাবীর?

মহাবীরজী ঘাড় বাঁকালেন। বঙ্কিম মুখার্জী তাঁকে ইঙ্গিতে গাড়িতে উঠতে বললেন। াড়ি চলতে আরম্ভ করলে কমরেড মুখার্জী বললেন অন্যান্য অফিসেও ইউনিয়ন হ'তে রু করলে সেখানেও কি এই রকম বেয়ারা, ঝাড়ুদারদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হবে না?

—হতে পারে।

—তা'হলে এখন থেকেই আপনারা ভাবতে থাকুন।

—কী ভাবব?

—আপনাদের দারোয়ান ইউনিয়নটার আরো প্রসার ঘটানো যায় কিনা, তাতে াপনাদেরও শক্তি বাড়বে, সংখ্যাও বাড়বে। সবাইকে নিয়ে ক্লাস ফোর এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ড়া যায় কিনা, তার মধ্যে থাকবে পিয়ন, বেয়ারা, ঝাড়ুদার, সাফাই ওয়ার্কার।

—আচ্ছা, আমাদের ইউনিয়নের একটা সভা ডাকব, আপনাকে আসতে হবে কিন্তু।

ট্যাক্সি থামল। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীকে ঘরে তুলে দিয়ে মহাবীরজী আবার আসব ল পা বাড়াতেই শুনলেন, একটু বসুন, কথা আছে।

ঘরে আলো জ্বলল। পাখা চলল। কয়েক গ্লাস জল খাওয়া হ'ল। জামা কাপড় ছাড়া হল। তারপর ধীরে সুস্থে মুখে একটা পান গুঁজে দিয়ে মহাবীরজীকে বিছানায় পাশে বসিয়ে রহস্যজনক হাসি হেসে কমরেড মুখার্জী শুধালেন, আজকের সভার তাৎপর্য কিছু বুঝলেন?

—ইউনিয়ন গড়া হল।

—দেখলেন না ছোটখাট একটা বিপ্লব ঘটে গেল?

—বিপ্লব!

—প্রায়! এতদিন আমরা বার্মা শেলের মজুরদের আন্দোলন করতে গিয়ে একটা জায়গায় এসে ঠেকে যেতাম। যেই দাবি দাওয়ার কথা উঠত, অমনি কোম্পানীর কর্তারা বলতেন, টাকা কোথায়? কোম্পানীর বার্ষিক রিপোর্ট এমনভাবে তৈরি করা হত যে, মনে হবে গরীব পোষার জন্যেই কোম্পানী চলছে। কিন্তু এবার?

প্রশ্নভরা চোখে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মহাবীরজীর মুখের দিকে। সে মুখে রা ছিল না। কমরেড মুখার্জী আরো একটা পানের খিলি হাতে তুলে নিয়ে বললেন, এবার কোম্পানী হিসেবের খাতা আমাদের হেড অফিসের ইউনিয়নের লোকদের দখলে। এবার বাছাধনরা মিছে কথা ব'লে পালাবে কোথায়? আর ধোঁকাবাজি চলবে না, সব গোপন তথ্য আমরা জেনে যাব।

—সত্যি! দারুণ ব্যাপার!

—দারুণ বলে দারুণ? অন্যান্য অফিসেও ইউনিয়ন হ'তে থাকলে আমরা মালিকের হাঁড়ি হাটে ভেঙ্গে ফেলতে পারব। এই দেখুন, চটকল শ্রমিকদের আন্দোলনে সব সময় আমরা বেকায়দায় থাকি, কোম্পানীগুলো মুনাফার অঙ্ক চেপে যায়। এতবড় ট্রাম-শ্রমিক ধর্মঘট হয়ে গেল, সেখানে ট্রামের হেড অফিসে নামকাওয়াস্তে একটা ইউনিয়ন থাকলেও সেটা ছিল দালালবাবুদের দখলে। সেখানেও যদি অন্য হাওয়া বইতে শুরু করে? ব্যাঙ্ক বীমা কোম্পানীগুলোর বাবুরাও যদি বিগড়ে যায়? সব জায়গায় কোম্পানীর দু'নম্বরী কারবার ধাক্কা খাবে, তাই না?

মহাবীরজীর চোখের সামনে যেন যবনিকার কালো পর্দা উঠে গেল, চোখে জ্বলে উঠল আরো, মুখে জাগল প্রবাদের ভাষা—একেই বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

পরদিন শনিবার দুপুরবেলা মহাবীরজী হাজির হলেন নির্ধারিত স্থানে বার্মাশেলের হেড অফিসের সামনে। শিবপদ রায় এগিয়ে এসে বললেন, দেরী দেখে ভাবলাম, ভুলে গেছেন।

—পিকনিকের ব্যাপারে ভুলে যাওয়া যায়?

—পিকনিক! পিকনিক করতে তো অনেক লোক লাগে।

—অনেক লোককেই পাবেন। এমন একটা মজার ব্যাপার, একা-একা যেতে কারো ভালো লাগে?

বাবা শিবপদ রায় ভড়কে গিয়ে বললেন, আমি তো শুধু আপনাকে নেমনতন্ন করেছিলাম।

—তাতে কি, সবাই মিলে একসঙ্গে গেলে কেমন আনন্দ হবে বলুন তো। অবশ্য আপনি যদি বলেন, আমরা সবাই ফিরে যাব।

—সে কি কথা। আমি কি তাই বলেছি!

—ঘাবড়াবেন না, সবাই কী আর আসবে?

—তাই বলুন!

কিন্তু একটু পরেই যখন ডজন দুই লোক এসে হাজির হল, তখন বাবু শিবপদর মুখ শুকিয়ে আমসী। অবশ্য রঘুনাথ মিশ্রও এসে হাজির—বড়বাবু, আমিও আপনার বাড়িটা গিয়ে দেখে আসব। সবাই একসঙ্গে গেলে ভারী মজা হবে।

বড়বাবুর মুখে মজার চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না। মহাবীরজী সান্ত্বনা দেওয়ার মত বললেন, আমি কিন্তু মিশ্রজীকে আসতে বলিনি।

—কী যে হচ্ছে! শিবপদবাবু কাতর করুণ স্বরে ব'লে উঠলেন।

—বাংলা মুলুকের দেহাত আমরা দেখিনি, তাই দেখতে যাচ্ছি।

শিবপদবাবু মনে মনে বললেন, আমি তো মাত্র একজন লোকের টিফিনের বন্দোবস্ত করেছিলাম, এখন কী হবে!

মহাবীরজী তাঁর মুখ দেখে মনের কথা আঁচ ক'রে বললেন, ভাববেন না, আমরা তো কেউ খাওয়াদাওয়ার জন্যে যাচ্ছি না, ঘুরতে যাচ্ছি।

স্টেশনে নেমে পাক্কা ক্রোশখানেক পথ হাঁটতে হাঁটতে আগন্তুকদের মুখে ফুটল অনাবিল খুশির ভাব। যারা গ্রামের মানুষ তারা শহরের খাঁচায় দীর্ঘদিন বন্দী থেকে উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে এসে অকৃত্রিম অভিনন্দন জানাতে লাগল শিবপদ রায়কে, যাঁর মুখে ক্রমেই কালো ছায়া ঘনিয়ে উঠছে। সূর্যাস্তের আলোয় মাঠের কাজ সেরে ঘরে ফেরা কৃষকেরা এতগুলি অচেনা মানুষকে দেখে অবাক। তারা ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে কী সব বলাবলি করতে লাগল। তারা বোধহয় জীবিতকালে এতগুলি ষণ্ডাগুণ্ডা মানুষকে গ্রামের মাটিতে একসঙ্গে দেখেনি। এদের সঙ্গে শিবপদবাবুকে দেখে তারা একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রইল।

—ওরা কি আপনার প্রজা? মহাবীরজীর প্রশ্ন।

—সবাই নয়। আমরা এসে গেছি।

একেবারে মাঠ ঘেঁষেই শিবপদবাবুর বিরাট খড়ের আটচালা বৈঠকখানা। অতিথিদের বসতে ব'লে গৃহকর্তা অন্দরমহলে প্রবেশের মুখে হাঁক দিলেন—কালিপদ! কালিপদ! কালিপদ! হারামজাদাকে কলেজ থেকে আজ একটু আগে ফিরতে বলেছিলাম, কিন্তু কে আমার কথা শোনে।

শিবপদবাবু ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়লেন? আগন্তুকেরা কিন্তু নিষ্ঠুর হাসল। মহাবীরজী বললেন, এখানে সময় নষ্ট না ক'রে আলো থাকতে থাকতে চলো আমরা গ্রামখানা ঘুরে দেখি।

গ্রাম-পরিক্রমা হ'ল না, অদূরেই গ্রামের হাটবারের হাট বসেছে, সেখানেই বাকী-সময়টা কেটে গেল। এ হাটের বৈশিষ্ট্য যা চোখে পড়ল, তা হচ্ছে ভিন গ্রামের চাষীরা অল্পস্বল্প পাটের বোঝা কাঁধে ক'রে এনে হাটের একটা বড় অংশ ভরিয়ে ফেলেছে। ফড়েরা ঘুরে ঘুরে পরখ করছে পাটের রং, জাত এবং শুষ্কতা। পাট কেনার পর পাটের ওজন বাড়ানোর জন্যে জল দেবে তারা গাঁটবাঁধার সময়।

চাষীদের হাহাকার সহজেই বোধগম্য হ'ল তাদের টুকরো টুকরো কথায়। একদম পাটের দাম প'ড়ে গেছে। তেল, লবণ কেনার জন্য ছোট ছোট চাষীদের একমাত্র অর্থকরী ফসলের কিছু কিছু জলের দামে বেচে দিতে হচ্ছে। অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলা হয় 'ডিস্ট্রেস সেল'।

মহাবীরজী দলবল নিয়ে ফিরে এলে শিবপদবাবু সহানুভূতির স্বরে বললেন, আহা ওদের পাট ধ'রে রাখার ক্ষমতা নেই। আমি কিন্তু সব পাট জমিয়ে রেখেছি, পাটের মরশুমের গোড়ায় মিল-মালিকেরা প্রতি বছর এই কাণ্ড করে। বদমাইস, হারামজাদা সাহেব কোম্পানী।

শিবপদবাবু তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় স্বরূপ টর্চ হাতে নিয়ে জমানো পাটের গুদামটি দেখালেন।

—বুঝলেন, পাটের ন্যায্যমূল্যের জন্যে পাটচাষীদের নিয়ে একটা আন্দোলন দরকার।

মহাবীরজী এই সর্বপ্রথম শিবপদবাবুর অন্য একটা রূপ দেখে তাঁর প্রতি সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে প্রশ্ন করলেন, আপনি চাষীদের সঙ্গে এই আন্দোলনে থাকবেন?

—আলবৎ। যেমন আছি অফিসের আন্দোলনের সঙ্গে।

মহাবীরজী শিবপদবাবুর দ্বৈতরূপের আর একটি পরিচয় পেয়ে মনে মনে বললেন গ্রামে আসা সার্থক হয়েছে, এখনো কত কিছু জানতে বাকী।

ওদিকে স্বল্পসময়ের ব্যবধানে অন্তঃপুরবাসিনী অসাধ্য সাধন করেছেন। এতগুলি লোকের জন্য মোহনভোগ সহ আরো কয়েকটি সুস্বাদু খাদ্য এসে গেল আটচালা-ঘরে সঙ্গে চা-বিস্কুট।

ক্ষুধানিবৃত্তির পরে স্টেশনের দিকে যখন আগন্তুকেরা পা বাড়াতে উদ্যত, সেই সময় উদয় হ'ল শিবপদবাবুর সুযোগ্য তনয় কালিপদ।

তাকে দেখামাত্র শিবপদ ফেটে পড়লেন ক্রোধে—তোর বড় বাড় বেড়েছে কালিপদ। এতক্ষণে আসা হ'ল বাবুর। বলি, বাবার কথাটা মনে ছিল? না, কলেজে পলিটিক্স করা হচ্ছিল?

পুত্রটি তার বাবাকে টেক্কা দিয়ে হাসিমুখে জবাব দিল—জানো বাবা, তোমার প্রেস্টিজ বেড়ে গেছে। পথে আসতে আসতে শুনলাম গাঁয়ের লোক বলছে, শিবপদবাবুর কী দাপট! কলকাতা থেকে কত অতিথি এনেছেন।

—কথা ঘোরানো হচ্ছে। তুই দেশোদ্ধার করিছিলি কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারী হয়ে, আমি বুঝি না?

—বাবা তুমি কোন মুখে এ-কথা বলছ? তুমিও তো এবার ইউনিয়ন করছ।

—দু'টো এক জিনিস হ'ল? আমি করছি রুজি রোজগারের জন্যে? আর তুই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছিস।

বাপ-ব্যাটার তুমুল কাণ্ড দেখে অতিথিরা হতবাক। কালিপদ বলে উঠল, আমি তোমার মত এত ছাত্রবন্ধুকে বাড়ি এনেছি কখনো?

অতিথিরা এই শুনে পালাবার পথ পায় না— রায় মশায় এবারে তবে আসি আমরা।

সে কথায় কান না দিয়ে রায় মশায় ব'লে উঠলেন, দ্যাখ কালিপদ, এ বাড়ির কর্তা আমি।

—তুমি গ্রামের গরীবদেরও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বাবা, আমি যদি বঙ্কিম মুখার্জীকে ডেকে এনে কৃষকদের একটা মিটিং করি? তিনি তো কৃষকদেরও নেতা শুনেছি।

—তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা!

—রায় মশায় এবার আসি আমরা। কথাটার পুনরাবৃত্তি শুনে বাবু শিবপদ বললেন, দাঁড়ান, একটা লণ্ঠন নিয়ে আসি।

—না বাবা, আমি যাচ্ছি স্টেশনে।

মহাবীরজী বললেন, চাঁদনি রাত, আমরা সোজা পথ ধ'রে যেতে পারব। তোমার আসার দরকার নেই।

দ্রুতপদে অতিথিরা নিষ্ক্রান্ত হল। পিছনের ঝগড়া কানে আসছিল। তবু গ্রামের নির্জন রাস্তায় মায়াময় জ্যোৎস্নায় হাঁটার সুযোগ পেয়ে সবাই উৎফুল্ল।

মহাবীরজী স্বরচিত গান গাইতে শুরু করলেন এবং সঙ্গীরা ধীরে ধীরে কণ্ঠ মেলাল,

জাগা জাগা হো কিষাণ, ভইলেঁ ভারত মে বেইমান
ভোট দেও মজবুল বনকেঁ, করি হে হমরা কাম,
উঁহা জায় হমকে বিসরৌলে, বেটি জমবলে শান... জাগা জাগা
বারহ টাক কৈ চাউর-বিকইনে, কপড়া কে না ঠিকান,
মিট্টি তেল কি পতা নই খে, নূন বিনা হৈরান...জাগা জাগা
আপস সা অব মেল করা তুলৈ লেয়া লাল নিশান,
গদ্দারন কে দূর হটাবা পহী মা বা কল্যাণ...জাগা জাগা

সতেরো

সব শুনে কমলজী বললেন, আমি যে কথাটা এতদিন বলতে পারিনি, আজ তা বলতে ইচ্ছে করছে।

ভনিতা দেখে মহাবীরজী হেসে ফেললেন।

—মনে হচ্ছে বক্তৃতা দেবে।

—প্রায় সেই রকমই। তুমি আমাদের সঙ্গে চটকলের আন্দোলনে এসো।

—আগেও একবার এইরকম বলেছিলে না?

—এত স্পষ্ট ক'রে এবং জোর দিয়ে নয়। তোমার মতিগতি দেখে এবার খুব খোলাখুলি বলছি।

—আমার আবার কী মতিগতি! বিস্ময়ভরে মহাবীরজী বললেন।

—তুমি বলেছিলে না শেষ জীবনটা কৃষকদের মধ্যে কাজ করবে বাড়ি ফিরে, এখানেই তার হাতে খড়ি হোক না।

—কী রকম?

হাতের খৈনির একটা অংশ মহাবীরজীকে উপহার দিয়ে কমলজী বললেন, আমাদের ছাপরা জেলার লোক চটকলে কম নেই, আছে তাদের সেই জাতপাতও, আছে দেশের সঙ্গে রীতিমত নাড়ির যোগও। তারাও তোমার আমার মত এখানকার কাজ সারা হ'লে দেশে ফিরবে, তুমি কৃষক আন্দোলন করতে গেলে নির্ঘাৎ তাদের পেয়ে যাবে।

—বেশ, তারপর?

—চটকল মানেই পাট, ভাত মানে যেমন চাল। তুমি সচক্ষে দেখে এসেছ সেই পাট চাষীদের কী হাল! চটকলের মজুররাও পায় না তার নায্য মজুরী। দুইয়ের মধ্যে স্বার্থের মিল আছে কিনা বলো।

—আছে।

—তা'হলে চটকলের মজুররা কেন দাঁড়াবে না চাষীদের পাশে, চাষীরা দাঁড়াবে না কেন মজুরদের পাশে?

—কী বলতে চাও?

—পাটচাষী আর চটকল-মজুরদের মধ্যে মিল ঘটানোর চেষ্টা করতে পারো যদি আমাদের সঙ্গে যোগ দাও।

—গ্রামের চাষী আমাদের ডাকবে কেন?

—নিশ্চয় ডাকবে, গ্রামে কৃষকদের মধ্যে আমাদের কমরেডরা কাজ করে, তারাই ডাকবে। নিজের গরজেই ডাকবে।

—তোমাকে কখনো ডেকেছে।

—দু'একবার, কেন না মজুরদের মধ্যে আমরা এখনো খুবই দুর্বল, গ্রামেও ওরা তেমনি দুর্বল। শক্তিশালী হ'তে গেলে অনেক অনেক কাজ করা চাই, আর অনেক অনেক কাজের লোকও চাই।

—এ-সব ভাবনা তোমার নিজের মাথা থেকে বেরিয়েছে?

—কিছুটা। কমরেড নিত্যানন্দ ব্যাপারটাকে অনেক অনেক ব্যাপকভাবে দেখেন।

—অর্থাৎ?

—তিনি বলেন, চটকলের বৃটিশ মালিক আর পাটচাষীদের মধ্যে বহুকাল থেকে মড়েলম্যান ব্যবসায়ী এবং ফড়েরা তো ছিলই এখন যুদ্ধের মধ্যে মজুতদার-মহাজনদের চক্র গড়ে উঠেছে এবং তারা এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। নীল চাষের সময় এমনটা ছিল না, এছাড়া প্রায় গোটা বাংলাতেই পাটে চাষ হয়, চাষীদের চেয়ে অনেক বেশি চাষীর আজ সর্বনাশ হচ্ছে, অথচ তাদের উপর জুলুম করতে এখন আর লাঠিয়াল, পাইক-বরকন্দাজের দরকার হচ্ছে না, অর্থনীতির প্যাঁচই যথেষ্ট! আর এই কৌশলেই চটশিল্প থাকে এখন বৃটিশদের হাতে আসে সবচেয়ে বেশি বিদেশী মুদ্রা। এ-সব কথা তুমি হয়ত এখনো বুঝতে পারছ না।

—না, পারছি না।

—আস্তে আস্তে পারবে। দেখেবে তুলো-চাষীরা মার খাচ্ছে কাপড়কলের মালিকদের কাছে। আখচাষীরা চিনিকলের মালিকদের আছে। এখন তুমি তো খানিকটা ফ্রি হ'য়ে গেছ—তোমার কুস্তির আখড়া আবার চালু হয়ে গেছে এবং গঙ্গাপ্রসাদই সেখানে যথেষ্ট, আমাদের ইউনিয়নের কাজও নতুন কর্মীরা চালাতে শুরু করেছে।

—আমাকে ছেড়ে দাও, আমার দ্বারা অত বড় কাজ হবে না।

—গোড়াতেই 'না' করো না। আমার সঙ্গে কয়েকদিন গোটা চটকল অঞ্চলটা ঘুরে দ্যাখো না।

কয়েকদিন দুই বন্ধু ঘুরল সমস্ত চটকল এলাকা—বাঁশবেড়িয়া থেকে বজবজ, পঞ্চাশ মাইল। গঙ্গার দু'ধারে গড়ে উঠেছে যে ৬০টি বড় বড় চটকল সেগুলির অপরিসীম দূষণ ক্ষমতা। গঙ্গার নির্মল আলো বায়ু আগের মত নির্মল নেই। কলের ধোঁয়া, আবর্জনা, ঘিঞ্জি বস্তি, মদ আর বারাঙ্গনাদের আঁস্তাকুড়।

—জঞ্জালের মধ্যে আমাকে টেনে নামাতে চাও, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি যা পারো, আমি তা পারব না।

—তুমি আবার বীর, পালোয়ান। সন্তোষ কুমারী ব্যারিষ্টারের মেয়ে হয়ে যা পেরেছে, তুমি দেহাতি ভাইদের জন্যে তা পারবে না? তুমি কি নারীর অধম?

—সন্তোষকুমারী কে?

—কমরেড নিত্যানন্দ তাঁকে দেখেছেন। নৈহাটির কাছাকাছি কোনো এক জুটমিলে বৃটিশ ফোরম্যান এক মজুরকে এমন লাথি মারে যে, ব্যাচারী মরে যায়। হাজার হাজার চটকল মজুর যায় গরিফার সন্তোষকুমারীর বাড়িতে। তিনি মজুরদের পাশে এসে দাঁড়ান। তারপর কত কাণ্ড ঘটে, যা আগে কক্ষনো ঘটেনি। আবার গঙ্গার ওপারে বাউড়িয়া জুটমিলে ১৫ হাজার চটকল মজুরদের ধর্মঘটের সময় সন্তোষকুমারী সব সময় ছিলেন তাদের মধ্যে। তিনি ছিলেন দেশবন্ধুর অতি প্রিয়। ভারতের অন্য জায়গা থেকেও এসেছিল ধর্মঘটীদের জন্যে টাকা পয়সা। শুনেছি সন্তোষকুমারী 'শ্রমিক' নামে একটা কাগজও বের করতেন। আরো অনেক অনেক কথা আছে, কমরেড নিত্যানন্দের মুখ থেকে ইচ্ছে করলে শুনতে পারো।

—যাই বলো, আমি মনঃস্থির করতে পারছি না।

মহাবীরজীর কথায় কমলজীর উজ্জ্বল মুখখানায় কে যেন কালি লেপে দিল।

সেইদিন রাত্রেই মহাবীরজী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন।

কানফাটা কান্নার শব্দ। কে কাঁদছে? স্ত্রী যমুনার গলা না? যমুনা কাঁদছে কেন? যমুনা ঐ রকমই কেঁদেছিল তার বাবার মৃত্যুর সংবাদ শুনে। এটা কোন্ জায়গা? মহাবীরজী কাঁধ থকে ভারী থলেটা নামিয়ে যমুনার দিকে এগিয়ে গেলেন। থলির মধ্য থেকে চাল, আলু, নুন গড়িয়ে পড়ল মাটিতে, সর্ষের তেলের বোতলটা কাৎ হয়ে দেয়ালে ঠেকে গেল। হুগলীর গোঁদলপাড়া বস্তি! ও হো, এখানকার চটকলেই তো কাজ করতে হয়। এখন সকাল না বিকাল? সন্ধ্যে, নিশ্চয় সন্ধ্যে, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। মহাবীরজী দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে আধো অন্ধকার এক কুঠরীতে ঢুকলেন, যমুনাকে মেঝে থেকে তুলে ধ'রে বললেন, কাঁদছ ক্যানো?

—ফাগুসর্দার আবার এসেছিল, বটি দিয়ে কাটতে গিয়েছিলাম, আমার লাথি মেরে জমিনে ফেলে দিল।

—ওকে গলা টিপে মারব আমি।

—পারবে? তোমার হাড় জিরজিরে হাত দিয়ে পারবে?

—কেন হাড় জিরজিরে হব? আমি তো পালোয়ান।

ফোঁপানি বন্ধ ক'রে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল যমুনা—পালোয়ান তো ছিলে আগের জমানায়। এখন কলে খাটতে খাটতে শরীরের কিছু বাকি আছে? ওগো, আমাকে দেশের বাড়িতে নিয়ে চলো, আমি আর টিউকলের লাইনে দাঁড়াতে পারব না, টাট্টির লাইনেও যেতে পারব না। পায়ে পাড়ি আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো। আমাদের কত বড় বাড়ি, কত বড় গোয়ালঘর, বারো তেরোটা গাই বলদ, কত জমিজমা।

—সে-সব আর এখন নেই।

—কোথায় গেল?

—মহাজন আর মজুতদারদের পেটে।

—ও মা সে কী! এত বড় বড় বাড়িঘর গিলে খাওয়া যায়?—

—যায়। আমাদের ছাপরা জেলার ভাইরা কি এমনি এসেছে চটকলে? ওদের বাড়িঘর জমিজমা গিলে খেয়েছে। থাকলে কেউ কলে খাটতে আসে?

—উঃ। ভগবান! আমি এখানে থাকলে ম'রে যাবো।

—না, বেঁচে থাকবে! বলল এক অতি সুমিষ্ট নারী কণ্ঠস্বর। মহাবীরজী এবং যমুনা দু'জনেই চমকে পিছনে ফিরে দেখল সুন্দরী এক রমণীকে, প্রথমে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে খানিকক্ষণ ওরা চেয়ে রইল সেই আকস্মিক আবির্ভূতা দেবীমূর্তির দিকে। না দেবী নয়, মনে হচ্ছে এক বাঙালিনী। এগিয়ে এসে যমুনার পীঠে হাত রেখে সেই রমণী বলল, ভয় পেয়ো না, মেয়েরাই না আদ্যাশক্তি; তুমি তোমার স্বামীকে শক্তি দাও, উৎসাহিত করো, ঘ্যান ঘ্যান ক'রে তাকে দুর্বল করে দিয়ো না।

—কিন্তু আপনি কে?

—আমি সন্তোষকুমারী। মহাবীরজী আপনাকে বলি, কে আপনাকে বলেছে মজুরবিস্তিতে থেকে কাজ করতে হবে, আমি তো নিজের বাড়ি থেকে সে মজুরদের সঙ্গে মিশতাম। আপনিও নিজের ডেরা থেকেই আসবেন।

ছাপ মিলিয়ে গেল, মহাবীরজীর স্বপ্নও ছিন্ন হল। সকলের আলোয় নিজের সারা অঙ্গে হাত বুলালেন, কই না শরীরটা তো আদৌ হাড়জিরে নয়, শক্ত পেশীগুলো যথাস্থানেই বিরাজ করছে!

এই স্বপ্নের কথা কমলকে কিছুতেই বলা হবে না। কমল খুব ভালো, কিন্তু বড্ড বেশি উপদেশ দেয়। এই তো গতকালই বলছিল, আন্দোলন করে মজুররা অনেক জায়গায় রেশনিং আদায় করে নিল, কিন্তু তার সামান্যভাগও কি দুর্ভিক্ষগ্রস্ত কৃষকদের দিয়েছিল? এইভাবে শ্রমিকরা চললে কৃষকদের নেতৃত্ব দিতে পারবে? লঙ্গরখানা চালিয়ে কটা মানুষকে বাঁচানো যায়?

কমল, একদিন তোমাকে আমিও উপদেশ দেব। বুঝবে মজা।

আঠারো

বার্লিন-পতনের সংবাদ মহাবীরজী শুনলেন গোঁদলপাড়া জুটমিলের শ্রমিকসভায় কমরেড ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের ভাষণে।

হিটলার-দানবের ধ্বংস। নতুন বিশ্বের জন্মলগ্ন! দেহমনে শিহরণ। ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের সঙ্গে ট্রেনে ফেরার সময় তাঁর ইচ্ছে করছিল দু'দিকের অপসৃয়মান জনবসতিকে চেঁচিয়ে শুনানো—আমরা জনযুদ্ধওয়ালারা জিতেছি।

সঙ্গী বললেন, চরম জয়ের এখনো একটু বাকী আছে—এখনো জাপান যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

—তার পরাজয়ের কত দেরী?

—খুব বেশি দেরী নেই। আমার মনে হয়, লালফৌজ এবার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে, অন্তত সেই রকমই সোভিয়েতের চুক্তি আছে মিত্র শক্তির সঙ্গে। লালফৌজ একবার যুদ্ধে নামলে গোটা মাঞ্চুরিয়া থেকে জাপানকে হটাতে বিলম্ব হবে না, চীনের মুক্তির দ্বার খুলে যাবে, আর জাপানও হবে অবিলম্বে খতম। আপনি বার্লিন-পতন নিয়ে গান লিখতে শুরু করুন কমরেড। আমরা শিগগিরই বিজয়োৎসব পালন করব, আপনাকে সেই সভায় বোধ হয় গান গাইতে ডাকবে।

ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের মুখে স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের মৃদু হাসি। গান-বাজনার ধারেকাছেও তাঁকে কেউ দেখেনি, এখন তিনি বলছেন গানের কথা হৃদয়ের উচ্ছ্বাস চাপতে না পেরে! স্বল্পবাক তাঁর মুখও আজ যথেষ্ট আলগা—বললেন, বেশি দিন হয়ত উল্লাসের সময় পাওয়া যাবে না মহাবীরজী। শত্রুরা ছেড়ে কথা কইবে না। সোভিয়েতের এ-হেন জয়ে ওদের হৃৎকম্প হচ্ছে নিশ্চয়ই, এত তাড়াতাড়ি লালফৌজ বার্লিন পৌঁছে যাবে, ওদের ধারণার অতীত ছিল নিশ্চয়। ওরা সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়ের মর্যাদা কেড়ে নিতে একটা কিছু বড়সড় বদমাইশী করবেই।

—কী রকম?

—তা অবশ্য জানি না।

দিন কয়েকের ব্যবধানে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বিজয়োৎসব পালিত হ'ল। মহাবীরজীকে সত্য সত্যই সেখানে গান গাইতে হ'ল। এরূপ প্রকাশ্য জনসভায় এই তাঁর প্রথম স্বরচিত গান গাওয়া। আর এই প্রথম তিনি একইসঙ্গে অনেক পার্টিনেতার মুখে বিশ্ব-পরিস্থিতির ব্যাখ্যা শুনলেন। এই প্রথম উপলব্ধি করলেন, বিশ্বরাজনীতি সম্বন্ধে কতখানি অনাশক্তি ও অজ্ঞতা তাঁর মনে বাসা বেঁধে ছিল। হঠাৎ যেন তাঁর মন ও মস্তিষ্ক ছাড়া পেল চতুর্দিকের সংকীর্ণ পরিবেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিরাট এক জগৎজোড়া সংঘাতের দৃশ্যপটে। সভা শেষ হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতে, সভায় সকলে উঠে দাঁড়িয়ে বজ্রমুষ্টি হ'য়ে বিশ্ব-শ্রমিকদের সংগ্রামে মিশে গিয়েছিলেন।

মাস আড়াই পরে। অতি প্রত্যুষে ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দারা একে একে এসে মহাবীরজীকে স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে জানিয়ে গেল—জাপানে অমেরিকা অ্যাটম বোমা ফেলেছে।

অবিলম্বে হিন্দী দৈনিকটা হাতে এল। চোখ বুলিয়ে কাগজখানা হাতে রেখে বেশ কিছুক্ষণ ব'সে রইলেন। প্রাত্যহিক কাজকর্মে বিলম্ব ঘটল। ৮ মে বার্লিন-পতন, আর তিনমাস পুরো হওয়ার আগেই জাপানে অ্যাটম বোমাবর্ষণ। বার্লিন দখলের ওরা বদলা নিল। ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ঠিকই ব'লেছিলেন বদমাইশদের কারসাজির কথা। একটা যুদ্ধ শেষ হ'তে-না-হতেই আর একটা যুদ্ধ শুরু? এত মূল্য দিয়ে নাৎসীদের পরাস্ত ক'রে-আচমকা যুদ্ধজয়ের আনন্দ ধূলিসাৎ!

আশ্চর্যের কী আছে। সোভিয়েতকে ধ্বংস করতেই তো ওরা দুধ কলা দিয়ে ফ্যাসিস্ট সাপ পুষেছিল। এখন নতুন করে সেই খেলা শুরু। তারপর জগদ্দল চটকল মজুর-সভায় ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের সঙ্গে দেখা। ফেরতা পথে তিনি সখেদে বললেন, জাপানকে ঠাণ্ডা করার জন্যে এই বোমা ফেলার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। মিত্রশক্তির সঙ্গে তো আগে থেকেই চুক্তি ছিল জাপানের বিরুদ্ধে লালফৌজ যুদ্ধে নামবে। নেমেও ছিল। ঝড়ের বেগে গোটা মাঞ্চুরিয়া থেকে জাপানী দস্যুদের তাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। লালফৌজের কাছে শিগগিরই জাপানীদের আত্মসমর্পণ করতে হ'ত। ঠিক জার্মান জয়ের মতই জাপানকেও জয় করতে যাচ্ছিল লালফৌজ। এটা ওদের কাছে অসহ্য ঠেকছিল। সোভিয়েত পশ্চিমে এবং পুবে দু'দিকেই সর্বেসর্বা হ'তে যাচ্ছিল, পুঁজিবাদের দিন ফুরিয়ে আসছিল, তাই আসলে ঐ বোমা ফেলাটা সোভিয়েতকে ঠেকাতেই। বুঝতে পারছেন মহাবীরজী? ওরা রাজনৈতিক ফয়দা তুলতেই ভয়ঙ্কর কাণ্ড করল। দুনিয়া চরম বিপদের সামনে, সোভিয়েত অতি শিগগির যদি অ্যাটম বোমা না বানাতে পারে দুনিয়ায় শিং গুতিয়ে বেড়াবে আমেরিকা। এমন গান লিখতে পারেন যাতে ওদের মুখোশ খুলে যায়?

আড়চোখে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত তাকালেন সঙ্গীর দিকে। সঙ্গীর মুখ তখন জমাট পাথর, কণ্ঠনালি শুষ্ক। বেশ খানিক পরে কথা ফুটল মুখে—সোভিয়েত অ্যাটম বোমা বানাতে পারবে না জলদি জলদি?

—হয়ত পারবে, তার আগে অনেক জল গড়িয়ে যাবে গঙ্গায়।

সঙ্গীর কপালে গভীর দুশ্চিন্তার ভাঁজ। জনযুদ্ধের এই পরিণতি? বৃটিশ রাজত্ব কি আরো জাঁকাল হয়ে বুকের উপর চেপে বসবে? ওরা নতুন উৎসাহে দমননীতি চালাবে?

সব আশঙ্কা মিথ্যা প্রতিপন্ন ক'রে যুদ্ধকালের জমে থাকা অসন্তোষ বিস্ফোরিত হ'তে লাগল দুনিয়া জুড়ে। এবং ভারতেও যত্রতত্র। মহাবীরজী দেশ থেকে চিঠি পেলেন বিহারে মিলিটারী পুলিস অনশন ধর্মঘট শুরু ক'রে দিয়েছে। বৃটিশ কর্তারা দাবিদাওয়া মেটানোর বদলে অবাধ্য বেয়াদবদের মিলিটারী এনে ঘেরাও করেছে।

যমুনার ভাই ঐ অনশনকারীদের অন্যতম নেতা। দাদার বিপদের আশঙ্কায় যমুনা খাওয়াদাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে।

পত্রপাঠে মহাবীরজীর গায়ে সরাসরি আগুনের আঁচ লাগল। কী হবে? নিদ্রাহারা

রাত কাটল। খবর এলো, মিলিটারী ধর্মঘটীদের ধরপাকড় করেছে। এবার তাদের বিচার হবে। হয়ত অর্থাৎ গুলি ক'রে মারা হবে।

বঙ্কিম মুখার্জী সান্ত্বনা-দিয়ে বললেন, অত সোজা নয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর যথেষ্ট চালাক। তারা দেখেছে আই-এন-এ-র সেনাপতিদের বিচার করতে গিয়ে কী হাল হয়েছে তাদের। ভারতে এখন আগুন জ্বলছে, তারা তাতে ঘৃতাহুতি দিতে চাইবে না। বরং আমাদেরই দূরদৃষ্টির অভাব। দেশের এই সুবর্ণ সুযোগ নিতে আমরা কতটা প্রস্তুত?

—কেন প্রস্তুত নয়, কমরেড?

—প্রস্তুতি কি যাদুমন্ত্র? চাইলেই পাওয়া যায়? অনেক আগে স্তালিনগ্রাদে হিটলারের ভরাডুবির পর আমাদের পার্টি লাইন কি চেঞ্জ করা উচিত ছিল না? আমার কথায় কে তখন কান দিয়েছিল? যুক্তি ছিল জাপান ভারতের দ্বারে। হিটলারের চরম বিপর্যয়ের পর জাপান যে একা দাঁড়াতে পারবে না বুঝা উচিত ছিল।

ক্ষোভে দুঃখে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর গলার স্বরে তিক্ততা প্রকাশ পেল।

—তবে কি এত বড় জয়ের পর আমাদের পরাজয় হবে?

—না। আবার বলছি অত সহজে বৃটিশ পার পাবে না। লালফৌজের জয়ে বিশ্বের ভারসাম্য বদলে গেছে। যুদ্ধের আগে বৃটেন ছিল বিশ্বে এক নম্বর, এখন পয়লা নম্বরে চলে গেছে আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। বৃটেনের শক্তি দু'নম্বরে বা তিন নম্বরে। তাছাড়া তার বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে—বার্মায় মালয়েসিয়ায় সে অভ্যুত্থানের সম্মুখীন। গোর্খা সৈন্য পাঠানোর পাঁয়তারা করছে। আর খোদ ইংলন্ডের ভিতরের? যুদ্ধজয়ের গৌরব যাঁর সব চেয়ে বেশি প্রাপ্য, সেই চার্চিল ইলেকশনে হেরে ভূত। বৃটিশ জনগণ আগের মত নেই, তারা এই প্রথম লেবার পার্টিকে একচ্ছত্র মেজরিটি দিয়েছে। ধুরন্ধর বৃটিশ দেখছে, তাদের সৈন্যরা যুদ্ধশেষে ক্লান্ত, দেশে ফিরে যেতে আকুল। এই সৈন্যদের দিয়ে কতদিন সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখবে? ভাড়াটে ভারতীয় সৈন্য? যাদের সংখ্যা ২৬ লক্ষ, যুদ্ধ শেষে তাদেরকে ছাঁটাই করা ছাড়া ওদের উপায় নেই, তাই সেনাবাহিনীর মধ্যে বিক্ষোভ ধূমায়িত। তারা দেখেছে আই-এন-এর বিচারের ব্যর্থতা, দেখেছে রশিদ আলী দিবস। এদিকে ডাক-তার ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। কোথায় যে বিস্ফোরণ ঘটবে কেউ জানে না। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে লোহা গরম থাকতে থাকতে ঘা দাও। দেশের স্বাধীনতার জন্য এই সুযোগ না নিতে পারলে, পরে পস্তাতে হবে মহাবীর।

বক্তা দম নিলেন। একটা পানের খিলি মুখে পুরলেন। মহাবীরজীর দিকে একটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, চলবে?

—না। খৈনীর ডিবে ভুলে এসেছি।

—আমার মনে হয়, এই অবস্থায় ওরা ব'সে থাকবে না, প্রাণের দায়ে দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে বাঁচতে চাইবে। তখন বুক চাপড়ালে কী হবে? তখন হায়েনারা হাসবে। কমরেড মুখার্জীর মুখ বেদনায় মলিন বিবর্ণ।

এলো ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারির নৌ-বিদ্রোহের খবর। বোম্বাইয়ের মজুররা তার সমর্থনে সাধারণ ধর্মঘট করতে গিয়ে চারশ'র উপর গুলি খেয়ে মরল। একজন ছাত্রনেতা মহাবীরজীকে শুনিয়ে গেল—এখনো কেন কমিউনিস্টরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ডাক দিল না?

মহাবীরজীর ভিতরটা কেঁপে উঠল ছটফটানি দ্বিগুণ বেড়ে গেল, ছুটলেন অগতির গতি তাঁর কমলের কাছে।

—আমরা কি করছি কমল?

—নেতারা নিশ্চয় ভাবছে।

—ভাবছে আর ভাবছে, করছে না কিচ্ছু। কিন্তু বৃটিশ বসে নেই, ক্যাবিনেট মিশন পাঠাচ্ছে।

—কংগ্রেস আর লীগকে ল্যাজে খেলাবে।

—তা জানি। আমরা কি ঘাস কাটছি? আমরা আর কংগ্রেস যদি গণ-বিক্ষোভে যোগ দিই, লীগ-বীগ ভেসে যাবে।

—তা যাবে, কিন্তু সেই সঙ্গে কংগ্রেসের হাত ফস্কে ক্ষমতা চ'লে যাবে আমজনতার হাতে, কংগ্রেস যে শোষকদের দল, তারা তা চাইবে কেন?

—কিন্তু আমাদের পার্টির ঝাঁপিয়ে পড়ার এই কি সময় নয়?

—কতবার তোমাকে বলব নেতারা কিছু একটা ভাবছেন।

—যাক গে, চললাম।

চললাম রয়েও আবার মহাবীরজী বন্ধুর কাছে গেলেন ডাক-তার কর্মীদের ধর্মঘটের সমর্থনে ২৯ শে জুলাইয়ের সাধারণ ধর্মঘটের পরের দিন।

—আমরা নাকি জনগণকে পথ দেখাই তারা এগিয়ে চলেছে, আমরা কোথায়? কেন এত পিছিয়ে?

—শোনো মহাবীর, কমরেড নিত্যানন্দ আমাকে কী বললেন জানো? পর্টি বেআইনী অবস্থা থেকে জনযুদ্ধের কল্যাণে আইনী হয়ে সর্বনাশ হয়েছে।

গত চার বছরে আমাদের মধ্যে আরামপ্রিয়তা ঢুকেছে, সংস্কারবাদ ঢুকেছে, সুবিধাবাদ ঢুকেছে।

—সেটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে আমরা কী করছি? দ্যাখো কমল, তুমি ভাবছ মহাবীরটা কেন এত অস্থির হচ্ছে। আমার অতি আপনজন বাঁচার দিন গুণছে।

—যমুনাদি কেমন আছে?

—একদম ভালো নেই। দেশের রক্ত-মাংসের মানুষদের যে কী হচ্ছে নেতারা কি বোঝেন না? তা'হলে কেমন নেতা?

—একটু শান্ত হও মহাবীর।

—বরং অশান্ত করে তোলো সবাইকে! নইলে ভুলের মূল্য কড়ায়গণ্ডায় শোধ করতে হবে।

—একটু বিশ্বাস রাখো, কোন্‌টা ভুল, কোন্‌টা ঠিক, তাই তো জানার চেষ্টা করছেন নেতারা।

—কোনো দিন জানবে না, এই বলে রেগে গিয়ে মহাবীরজী প্রস্থান করলেন। কমলজী জীবন এমন রাগ কখনো দেখেননি মহাবীরজীর।

উনিশ

মহাবীরজীর সামনে একটার পর একটা ঘটনাপ্রবাহ। এর বিরাম নেই। দু'হপ্তা যেতে-না-যেতেই বেধে গেল কলকাতায় দাঙ্গা। মুহূর্তে উবে গেল বিখ্যাত সাধারণ ধর্মঘটের ২৯ শে জুলাই। অনেকের কাছেই যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। মানুষ মরল হাজার হাজার, সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে বহুদিন চলল মনভেদ। আহতদের জন্য হাসপাতালে স্থানাভাব, বারান্দাগুলিতে কাতারে কাতারে যন্ত্রণাকাতরদের পাশাপাশি ঠেষাঠেষী অবস্থান। স্বল্পসংখ্য ডাক্তার নার্স গলদঘর্ম, বিনিদ্র রজনীতে তারা দিশাহারা। ওষুধপত্রের অভাব।

সহসা আক্রান্ত নগরবাসী বিভ্রান্ত, স্তম্ভিত। সহসা গুণ্ডারাজত্বের আবির্ভাব। গোটা শহর হিন্দু-মুসলিম পাড়ায় পাড়ায় বিভক্ত। যেন শতখণ্ড হিন্দুস্তান-পাকিস্তান। রাত্রির অন্ধকারে আল্লাহ আকবর এবং বজরংবলির মুহুর্মুহু হুঙ্কারে প্রাগৈতিহাসিক ভয় এবং আতঙ্কসঞ্চার। শান্তিপ্রিয় মানুষ নিদ্রাহীন। দিনের বেলাতেও সর্বত্র মানুষ যেন খাঁচায় বন্দী নিরুদ্ধনিঃশ্বাস। ট্রাম-বাস গাড়িঘোড়া বন্ধ। রাস্তা থেকে বৃটিশ পুলিশ মিলিটারী উধাও, নিরাপদ আশ্রয়ে বসে তারা হায়েনার হাসি হাসছে। অভিষ্ট ঘটনা ঘটতে দেখে তারা খুশিতে ডগমগ।

সহৃদয় নগরবাসী কেউ কেউ দাঙ্গাদুর্গতদের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বাড়িতে লুকিয়ে রাখল। দাঙ্গা স্তিমিত হ'তেই হতভাগ্যরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের আশ্রয় পেতে চেষ্টা করল। নিরুপায়দের কিছু লোক স্থান পেল মুষ্টিমেয় আশ্রয় শিবিরে। সে-সুযোগও যাদের জুটল না তাদেরকে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে বের ক'রে দুষ্কৃতীরা কুচিকুচি ক'রে কাটল।

মহাবীরজীর আখড়াটি ছিল দুই সম্প্রদায়ের বসতির বর্ডারল্যান্ডে। দাঙ্গার আচমকা ধাক্কায় দু'পাশের মুসলিম পাড়ায় দাঙ্গাপীড়িত হিন্দু এবং হিন্দুপাড়ায় মুসলিম ছুটে এল সেখানে আশ্রয়ের সন্ধানে। আখড়া এবং সংলগ্ন রাস্তা, ফুটপাত ভ'রে গেল প্রাণভিক্ষা প্রার্থী নরনারী শিশুর ভীড়ে। যেখানে একদা জুটেছিল দুর্ভিক্ষপীড়িতেরা সেখানেই এল দাঙ্গাবিধ্বস্তরা। মহাবীরজী এবং তাঁর সঙ্গীদের চালু করতে হ'ল নতুন এক লঙ্গরখানা। এবার মাইকযোগে বাজানো হল গান্ধীজীর গান প্রায় সারাক্ষণ—সব কো সুমতি দো ভগবান।

গান শুনতে শুনতে পরম বিস্ময়ের মত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাপীড়িতরা পাশাপাশি ব'সে কলাপাতা বিছিয়ে খেল ভোগের অন্ন। এটা যে বিচিত্র দৃশ্য প্রথমদিকে তা কারো মনেও হয়নি! অথচ ভারতের সব সাংবাদিকদের এবং সাংবাদিক ফটোগ্রাফারদের এখানে এসে ভীড় করা উচিত ছিল।

কঠিন সমালোচনার সামনে প'ড়ে সরকারপক্ষ নিতান্ত মুখরক্ষার জন্য নামমাত্র ত্রাণসামগ্রী বিতরণের তামাশার আশ্রয় নিল। একজন অফিসার অকস্মাৎ উদয় হলেন

মহাবীরজীর আখড়ায়। সব দেখেশুনে তাজ্জব হয়ে মহাবীরজীকে প্রশ্ন করলেন, এটা কী ক'রে সম্ভব হ'ল?

—কোন্‌টা?

—বুঝতে পারছেন না?

—না।

—আপনি শহরের অন্য কোনো ক্যাম্পে যাননি, তাই বুঝতে পারছেন না।

—দয়া ক'রে খুলে বলুন।

—অন্য কোনো ক্যাম্পেই হিন্দু মুসলিম দাঙ্গাপীড়িতদের একসঙ্গে থাকতে দেখিনি।

—ওঃ। এই ব্যাপার! এখানে এটা যা হয়েছে, তা এমনি থেকেই হয়েছে।

—এমনি থেকে কিছু হয় না কি? নিজেদের মহত্ত্ব নিজেরাই বুঝতে পারছেন না। ঢেকে রাখছেন।

—জানি না। তবে আপনাকে ধন্যবাদ, দয়া করে শিগগির কিছু চালডাল পাঠাবেন।

অন্যান্য আশ্রয়-শিবিরের সঙ্গে আখড়ার শিবিরের মৌলিক পার্থক্য শীঘ্রই প্রকাশ পেল। এটা দাঙ্গাপীড়িতদের মনের গতিবিধি কমরেডদের কাছ থেকে সেই মনস্তত্ত্বের একটা ইন্টারেস্টিং বিবরণ পাওয়া গেল। শিবিরে আশ্রয় পেয়ে প্রথমদিকে দাঙ্গা পীড়িতরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের রক্ষাকারীদের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ—তাদের মহানুভবতা, নিজেদের বিপন্ন ক'রে ক্লান্তিহীন তাদের অদ্ভুত আতিথেয়তা, এ-সবের পুনরাবৃত্তিতে অনাবিল আনন্দপ্রকাশ। কে কীভাবে দাঙ্গাকারীদের হাত থেকে বাঁচিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল, খাদ্য ও পানীয় জুগিয়েছিল, সান্ত্বনা দিয়েছিল, মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করেছিল, অবশেষে পুলিশ মিলিটারী ডেকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়েছিল এ-সব মহৎ মনুষ্যত্বের কাহিনীর অন্ত ছিল না।

কিন্তু যতই দিন গড়াতে থাকে ততই দাঙ্গা পীড়িতদের মনস্তত্ত্বের নিম্নমুখী হওয়ার গতি বেড়ে চলে, ততই তাদের স্মৃতিপথে জ্বলজ্বল ক'রে ফুটে উঠতে শুরু করে নারকীয় পাশবিক হত্যালীলা, রক্তপাত, কাটা মুণ্ডু এবং ধড়ের দৃশ্যাবলী। পশুর কবল থেকে যারা মানবিক মহত্ত্বের স্পর্শে রক্ষা পেয়েছে, তাদের-মধ্যে প্রতিহিংসার পশুত্ব জ্বালা ধরিয়ে দেয়। এতে ইন্ধন জোগানোর লোকের অভাব হ'ল না? মানবিক দৃষ্টান্তগুলি প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যায়।

কিন্তু মহাবীরজীর ক্যাম্পে এই সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন ছিল না। উভয় সম্প্রদায়ের লোক চরম দুর্ভাগ্যের দিকে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি থাকার ফলে নিজেদের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রেম ও করুণার কথা বারবার বলতে লাগল। উভয় সম্প্রদায়ের দাঙ্গাকারীদের লোভ এবং বিদ্বেষ নিন্দিত হল, তৈরী হ'ল শান্তির বাতাবরণ।

কিন্তু অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আঘাত এলো। নিজের পালোয়ান বাহিনীর মধ্যেই মহাবীরজী পচনের প্রাথমিক দুর্গন্ধ পেলেন সাম্প্রদায়িক পরিবেশে এটা দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও স্বাভাবিক। তাঁর আড়ালে আবডালে চলতে লাগল বিদ্বেষপূর্ণ ফিসফাস। মহাবীরজী প্রমাদ

শুণলেন। কী করা যায়। এদেরকে তর্ক ক'রে বুঝাতে গেলে ব্যাপারটা কেআক্র হ'য়ে হিংস্র রূপ ধারণ করতে পারে, ফাটল দেখা? দিতে পারে এতদিনের বহুকষ্টে গ'ড়ে ওঠা আখড়ার সংগঠনে, আবার নিশ্চুপ থাকলে বিষক্রিয়া ছড়াবে। মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই। ষোল কলাকে পূর্ণ হ'তে দিতে পালোয়ানদের বাহুবলই হ'য়ে দাঁড়াতে পারে পশুবল। বন্ধু কমল বহুকাল আগে বাহুচর্চার সঙ্গে আত্মিকবল বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে সেটা শুধু নিজের মধ্যে নিবদ্ধ রাখাই যথেষ্ট নয়, ছড়িয়ে দিতে হবে দেশ ও দশের মধ্যে। নইলে নিস্তার নেই। ব্যাধিটা সর্বনাশ ডেকে আনবে। আর এ তো শুধু একটু-আধটু সংশোধনের ব্যাপার নয়, দু'চার দিনের কাজও নয়। শত্রুপক্ষ যখন একবার সাম্প্রদায়িক রক্তের স্বাদ পেয়েছে, তখন মোক্ষম অস্ত্রের সাফল্য দেখে তারা আরো বেশি বেশি একে ব্যবহার করতে চাইবে। মহাবীরজী এত কিছু ভাবতে চাননি, কিন্তু অবস্থার গতিকে তাঁকে ভাবতে হ'ল। পালোয়ানদের মধ্যে যদি এই হয়, ডালহৌসীর দারোয়ান ইউনিয়নের মধ্যে কী হচ্ছে? চটকল মজুরদের মধ্যে কতটা বিষাক্ত হাওয়া বইছে? সাম্প্রদায়িক দৈত্যটাকে নির্বিঘ্নে বাড়তে দিলে তা শ্রমিক কৃষক আন্দোলনকে রসাতলে নিয়ে যাবে না? ২৯ শে জুলাইয়ের সাধারণ ধর্মঘটের পর স্বপ্নেও কি এমনটা হবে বুঝা গিয়েছিল? ডঃ ভূপেন দত্তের কথা মনে পড়ল। তিনি কী ভাবছেন? মহাবীরজী ছুটলেন ডঃ দত্তের কাছে।

তিনি যেন মহাবীরজীর আগমনের প্রতীক্ষাতেই ছিলেন। অনেক কথা বলার পর পরামর্শ দিলেন—আপাতত দু'টি সভার ব্যবস্থা করো। একটা তোমার আখড়ার লোকজনদের নিয়ে, অন্যটা দারোয়ান ইউনিয়নের মেম্বারদের নিয়ে। আমি দু'জায়গাতেই যাব। তারপর ভেবে দেখা যাবে আরো কী কী আমাদের করণীয়।

ইতিমধ্যে বণিক-পরিবারের বড়মা এবং সুনীতি দেবীর কাছ থেকে জরুরী তলব এলো। ছুটতে হ'ল সেখানে।

—আমাদের জুয়েলারী সপ লুট হয়ে গেছে, জানো মহাবীর?

—কই না।

—দাঙ্গার সুযোগে এটা করেছে শুনছি জেলেপাড়ার গুণ্ডারা। তোমার তো লালবাজারের অনেক পালোয়ান শিষ্য আছে, কিছু করতে পারো?

—দেখছি কী করা যায়, আমি বড্ড হাঙ্গামার মধ্যে আছি মাইজী।

—কী হাঙ্গামা?

সব কিছু শুনে দুই কর্ত্রী বললেন, মানুষগুলোকে আগে বাঁচাও, আমাদের যা গেছে তা মনে হয় না ফিরে পাওয়া যাবে।

চিন্তিত মুখে মহাবীরজী ফিরলেন। ফিরেই দেখলেন এতদিন পর তাঁর ঘরে বসে আছে দুই মহাত্মা—আক্রাম ও বিক্রম।

—কোথায় ছিলি তোরা এতদিন।

—আমরা নতুন কাজে মশগুল ছিলাম ওস্তাদ, দেখা করার সময় পাইনি। এখন সব পণ্ড হয়ে গেছে ওস্তাদ।

মহাবীরজীর পায়ের উপর দু'জন প্রায় উপুড় হয়ে পড়ল। দুজনকে টেনে তুলে মহাবীরজী মহাবিস্ময়ে বললেন, কী হয়েছে আগে বলবি তো।

—বলার জন্যেই এসেছি ওস্তাদ।

ওদের বৃত্তান্ত শুনে মালুম হল ওরা দুর্ভিক্ষের সময় লঙ্গরখানা চালাতে চালাতে মানসিক সুস্থতা ফিরে পায়। তারপর যুক্তি ক'রে দু'জনে নবজীবনলাভের চেষ্টা করে। অনেক সংযম, পরিশ্রম এবং স্বল্পসঞ্চয়ের কল্যাণে একটা ছোটখাট ইলেকট্রিকাল জিনিসপত্রের দোকান করতে সক্ষম হয়। সেটা মুহূর্তের মধ্যে দাঙ্গায় লুট হয়ে গেছে। আক্রামের ধড় থেকে প্রাণটাও বেরিয়ে যেত যদি না বিক্রম বন্ধুকে লুকিয়ে রাখতে পারত।

—এখন আমরা কী করব ওস্তাদ? প্রশ্নটা প্রায় করুণ রোদনের মত শোনাল।

ওস্তাদ জবাব দিলেন—আবার চেষ্টা করতে হবে।

—পারব?

—ঠিক পারবি।

আশ্বাস পেয়ে আক্রাম একটু অশ্বস্ত হয়ে এক মস্ত সংবাদ দিল—ওস্তাদ, তোমার মালিকের জুয়েলারী সপ যারা লুট করেছে তাদের আমরা চিনি।

—বল্সি কী রে!

—হ্যাঁ, ওরাই আমাদের দোকানও লুট করেছে।

এরপর ভেল্কীবাজীর মত ব্যাপারটা ঘটে গেল। পুলিশের সাহায্যে জুয়েলারী সপের অনেক কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হ'ল। হ্যাঁ, জেলেপাড়ার গুণ্ডাদেরই কীর্তি। তারা অসতর্ক ছিল, তাদের ধারণা ছিল তাদের গায়ে হাত দেওয়ার মুরোদ নেই কারো। আখড়ার পালোয়ানদের কথাটা তাদের মাথায় ছিল না।

বড়মা এবং সুনীতিদেবী বললেন, তুমি না থাকলে এটা সম্ভব হত না মহাবীর।

মহাবীরজী তখন ওঁদেরকে আক্রাম-বিক্রমের দেওয়া গোপন খবরের কথা শোনালেন এবং সেই সূত্রে দুই হতভাগ্যের জীবন-বৃত্তান্তও কিছু জানালেন।

শুনে বড়মা সহানুভূতিশীল শব্দ উচ্চারণ করলেন, আহা! সুনীতিদেবী বললেন, আমরা ওদের ভালোমত পুরস্কৃত করব।

মহাবীরজী বললেন, দোকানের যে দু'জন কর্মচারী গুণ্ডাদের সঙ্গে মিলে লুটপাট করেছে, তাদের জায়গায় ওদের কাজ দিতে পারেন?

—ওরা এ-কাজ পারবে?

—ওদের মাথা আছে।

—ঠিক আছে, তাহলে পরে কথা হবে। মহাবীরজী খুশি মনে ফিরলেন। বোধহয় আক্রাম-বিক্রমের সত্যিই এবার একটা হিল্লে হয়ে গেল।

দু'জায়গাতেই ডঃ দত্তের ভাষণ শ্রোতাদের মনে গভীর দাগ কেটেছিল। ডালহৌসি স্কোয়ারের দারোয়ানদের মিটিংয়ে অফিসপাড়ার জমাদার, পিয়ন, চাপড়াশীরাও অনেক সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল। এতদিন পর তাদের সবাইকে নিয়ে গঠিত হল বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সংগঠন—ক্লাস ফোর এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন।

কুড়ি

কলকাতার বুকে বিরাজ করতে লাগল অকল্পনীয় অবয়বহীন ভয় এবং ঘৃণা। গুমোট আবহাওয়ায় নগরবাসী শ্বাসরুদ্ধ। রাতগুলি আতঙ্কগ্রস্ত এবং অতন্দ্র। কখন অন্য পাড়ার বাসিন্দারা হানা দেয় সেই আতঙ্ক। ঘন ঘন আওয়াজ উঠতে লাগল সহসা স্তব্ধ অন্ধকারে—আল্লাহ আকবর, বজরং বলিকি জয়। জীবন জীবিকার দায়ে নির্ভীক ফেরিওয়ালাদের ভিন্ন পাড়ায় যেতে দেখা গেল। কিন্তু সবাইকে ফিরে আসতে দেখা গেল না। সেটাই শতগুণ গুজবের আকারে-কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘৃণা ও প্রতিহিংসার বাষ্প হয়ে মনের আকাশ আচ্ছন্ন করল।

সর্বপ্রথম ভয়ের দেয়াল ভাঙতে এগিয়ে এল বীর ট্রামশ্রমিক। ভ্রাতৃঘাতী নরহত্যাযজ্ঞও তাদের ঐক্য এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি বিনষ্ট করতে পারেনি। মহানগরীর মানুষের কাছে তখনো তাদের মরণজয়ী সংগ্রামের স্মৃতি অমলিন। তারা পুলিশ-মিলিটারীর সাহায্য ব্যতিরেকেই দু'টি খোলা হাত আর দুর্জয় সাহস বুকে নিয়ে পথে নামল। চলতি ট্রামগুলির দু'দিকে শুধু দু'টি ক'রে লালঝাণ্ডা বাতাসে দুলতে লাগল। ট্রামগাড়িগুলি মহানগরীর ছিন্ন গ্রন্থীগুলি জোড়া দিতে দিতে এ-পাড়া ও-পাড়া পার হয়ে ছুটল। মানুষ অবাক হ'য়ে দেখল, কিন্তু বিস্মিত হল না, এটাই যে ট্রামশ্রমিকদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল। স্থানে স্থানে পুষ্পবর্ষিত হল। মানুষ একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, চিরসহিষ্ণু মহানগরী তার স্বাভাবিকতায় ফিরে আসতে লাগল। প্রথম প্রথম যাত্রীর সংখ্যা চলন্ত ট্রামে যথেষ্ট সংখ্যায় চোখে পড়ল না, কিন্তু ট্রামগাড়ি যেন কলকাতায় অভয়মন্ত্রের জীবন্ত প্রতীক। ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত তুলে ট্রামগাড়ি থামিয়ে কিছু যাত্রীরা অফিস পাড়ায় যেতে শুরু করল এবং ঐ-রকম হাত তুলেই ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহকর্মীদের সখেদ নমস্কার ও সালাম বিনিময় করল। অফিসপাড়ায় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের অগ্রগামী ট্রাম-ভ্রাতাদের মতই সম্প্রীতির বার্তাবহ হয়ে উঠল।

তবু এল নোয়াখালির দাঙ্গা। অথচ কলকাতার দুর্লভ শান্তি ভঙ্গ হল না। পাড়াগুলো বিভক্ত রইল বটে, আতঙ্কও কালো বাদুড়ের মত সর্বত্র মনের বাতায়নে ঝুলে রইল বটে, তবু দাঙ্গা-দৈত্য বাইরে মুখ দেখাতে সাহস পেল না। তখনো কলকাতা বা শহরতলীতে কল-কারখানা-আন্দোলন শুরু করার আবহাওয়া ছিল না।

কমিউনিস্টরা গ্রামাঞ্চলের দিকে চোখ ফেরাল। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত হানার কথা ভাবতে লাগল। গ্রামাঞ্চলে আন্দোলন সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়। কেননা ঘোর অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক জটিলতা, হানাহানি, রক্তপাতের মধ্যেও চোখ জুড়ানো ধানের ক্ষেতে কচি ধানের চারা বেড়ে উঠছিল, পুষ্পিত হচ্ছিল, থোকা থোকা শীষগুলি মৃদু হওয়ায় হেলছিল দুলছিল এবং পেকে পেকে সোনার বরণ ধারণ করছিল। সেই ধানের তেভাগা চাই। দুর্ভিক্ষের কবল থেকে ছাড়া পাওয়া কৃষকদের কাছে ঘাম ঝরানো শ্রমের পাকা ধান জীবনের হাতছানি।

শহর থেকে দূরে শুরু হল নগরবাসীর অগোচরে এমন এক আন্দোলন যা একাধারে গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গার বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য দেয়াল, অন্যদিকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাঙালীর

জাতিসত্তা রক্ষার মোক্ষম ঔষধি। ধানের লড়াই তাই হয়ে দাঁড়াল বাঙালীর প্রাণের লড়াই। ক্রমে শহরেও ছড়াল সেই খবর বসন্তের বাতাসের মত।

এই বাতাস এমন সুস্নিগ্ধ সুশীতল, যে, দেশ বিভাগের ষড়যন্ত্রের মাঝখানে কারো কারো মন ও মস্তিষ্কে জাগিয়ে তুলল স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা—এমন স্বাধীন বঙ্গদেশ যা স্বেচ্ছায় স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। এ-ব্যাপারে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন, তারা কিন্তু বুঝতে পারেননি শ্রমিক এবং কৃষকের শান্তি-মৈত্রীর লড়াই এগিয়ে না-গেলে তাঁরা এ-বিষয়ে এক পা এগুতে পারতেন না।

অখণ্ড বাংলারক্ষার এই শেষ শুভচেষ্টা প্রতিক্রিয়ার সাপুড়েদের অসহ্য বোধ হল। দাঙ্গার যে কালনাগিনী অবস্থার গতিকে ঝাঁপি বন্ধ ছিল, তাকে ওরা ঝাঁপির ডালা খুলে পুনরায় ছেড়ে দিল। বাংলার কৃষক মাঠে মাঠে এবং বাঙলার শ্রমিক শহরে বাজারে মিলনের যে বাসর গ'ড়ে তুলছিল, সেই মিলন-বাসর জমে ওঠার আগেই নাগিনীরা ছিদ্রপথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। বড়সড় ধরনের ছিদ্র তৈরি হয়ে গেল ১৯৪৭-এর ২৭শে মার্চ—বেলেঘাটা অঞ্চলে শুরু হল দাঙ্গা এবং সেটা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হ'ল সারা শহরে।

গান্ধীজী যেন একটা জীবন্ত দমকল। যেখানেই দাঙ্গার আগুন সেখানেই তিনি অগ্নি নির্বাপণে ছুটছেন ঘন্টা বাজিয়ে। নোয়াখালির পর এবার এসে আস্তানা গড়লেন বেলেঘাটায়। শুরু করলেন আমরণ অনশন—দাঙ্গাবাজরা আগ্নেয়াস্ত্র তাঁর কাছে সমর্পণ না করলে মৃত্যুই তাঁর শ্রেয়।

মহাবীরজীর চেতনায় বিপরীতমুখী হাওয়া বয়ে গেল। হায় বৃদ্ধ! কেন তুমি এক বছর আগে জাগ্রত বিপ্লবী জনতার বুকে আপোষ রফার ছুরি বসিয়ে দিয়েছিলে? কেন তুমি তোমার চিরাচরিত অহিংসার শ্রেণীগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে সংগ্রামের ময়দানে এক হ'তে দিলে না? ফলে আজ দিকে দিকে দাঙ্গা, কাঁটার আগুন নেভাবে?

অথচ এই দমকলের জন্যই মহাবীরজীর বুকে কৈশোরের সেই গান্ধীপ্রীতি জেগে উঠতে চাইছে। বৃদ্ধের জন্য প্রবল সহানুভূতির আবেগ তরঙ্গ উঠছে মনে। অদ্ভুত! কতটা সামাল দিতে পারবেন তিনি? গোড়া কেটে আগায় জল ঢালছেন! তবু তিনিই যে মহাত্মা তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মহাবীরজীর এ-সব মনের কথা মনেই থেকে যেত, যদি না স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পর মুনীব-পরিবারের মেজকর্তা কলকাতায় ফিরে তাঁকে ডেকে পাঠাতেন।

সুবোধ বণিক বললেন, মহাবীর, আমাকে উদ্ধার করো, ভয়ানক মুস্কিলে পড়েছি।

—সে কী!

—হ্যাঁ, জানো তো গান্ধীজী মরতে বসেছেন। দাঙ্গাবাজরা কখনো তাঁর কাছে গিয়ে সুবোধ ছেলের মত অস্ত্রশস্ত্র জমা দেবে ভেবেছ! তা কখনো হয়, না, হয়েছে? ওনার মৃত্যুক্ষুধা জেগেছে। তোমার মাঈজীরী, মানে, বড়দি এবং সুনীতি বাই ধ'রেছে গান্ধী-দর্শনে যাবেন। তুমি ওদের নিয়ে যেতে পারবে বেলেঘাটায়?

মহাবীরজী সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকিয়ে চুপ ক'রে রইলেন। মুনীবের প্রস্তাব মানেই আদেশ।

—তুমি হয়ত ভাবছ আমি নিজে কেন ওঁদের নিয়ে যাচ্ছি না।

—হ্যাঁ, একটু ভাবছি বৈকী।

—তুমি হয়ত জানো না আমাদের ফ্যামিলি গান্ধী-ভক্ত নয়, সুভাষ ভক্ত। আমাদের রাগ গান্ধীজীই সুভাষবাবুকে দেশছাড়া করেছেন। তোমাদের মাঈজীদের ফ্যামিলি কিন্তু বরাবর অন্ধ গান্ধী-ভক্ত। সে যাই হোক, এখন গান্ধীজী যে-কাজটা করছেন তার প্রতি সবার মত আমারও সহানুভূতি আছে। আমি নিজেই তোমার মাঈজীদের বেলেঘাটায় নিয়ে যেতাম, কিন্তু ভীড়ের ভয়ে যেতে চাই না যদি আমার শ্বাসকষ্ট হয় যেটা অনেক কষ্টে কন্ট্রোলের মধ্যে এনেছি।

মহাবীরজী দিনক্ষণ জেনে নিয়ে বেলেঘাটায় কমলজীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। গান্ধীজী যেখানে অবস্থান করছেন তার কাছাকাছিই থাকেন কমলজী। দেখা গেল বন্ধুবর এক ধাপ এগিয়ে তার চটকল ইউনিয়নের কিছু লোককে কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করে পালা করে গান্ধীজীর পাহারায় লাগিয়েছে।

নির্ধারিত দিনে মাঈজীদের নিয়ে গিয়ে গান্ধী-দর্শন হ'ল বটে, কিন্তু অনেকটা দূর থেকে কেননা, অত্যাশ্চর্য এক কাণ্ড ঘটে গেছে—দাঙ্গাবাজদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে অনুতপ্ত হয়ে কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র গান্ধীজীর সামনে নামিয়ে রেখে ক্ষমা চেয়ে চ'লে যাচ্ছে, সেই খবর রটে যাওয়ায় লোক দলে দলে এসে এমন ভীড় জমিয়েছে কার সাধ্য গান্ধীজীর কাছাকাছি হয়।

প্রত্যাবর্তনের পর সুবোধ বণিক মহা সমারোহে মহাবীরজীকে ডেকে কাছে বসালেন। এই মাঈজী অন্দরমহলে ঢোকার আগে বলে চললেন—আমাদের কিন্তু দারুণ ভয় করছিল, অস্ত্র জমা দেওয়ার অছিলায় কোনো পাগল যদি গান্ধীজীকে গুলি করে কাছ থেকে।

—বুঝলে মহাবীর একেই বলে নারীজাতি, সব কিছুতেই এদের ভয়।

—আমারও কিন্তু ভয় করছিল মেজকর্তা।

—তা'হলে পালোয়ান হওয়া সত্ত্বেও মেয়েদের ভয় তোমার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল, ঠিক কিনা মহাবীর?

—সাপ নিয়ে খেলা করছেন না গান্ধীজী? অনেক সময় পাকা সাপুড়েদের প্রাণ যায় সাপের ছোবলে।

—যাক গে ও-সব। আচ্ছা মহাবীর, পাকিস্তানের বদলে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা গড়ার অনেকটা চেষ্টা চলছে, জানো তুমি?

—কানে এসেছে, কিন্তু ও-সব আমি কিছু বুঝি না কর্তা।

—বুঝবে কী করে তুমি তো বাঙালী নও।

শূলের মত বিঁধল কথাটা মহাবীরজীর বুকে। বাঙালীরা তাঁকে খোট্টা ব'লে গালি দেয় না বটে, কিন্তু আপন ব'লে কতটা মনে করে? অথচ সে তো আপন হ'তে চায়।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিলেন মেজকর্তা হয়ত কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই—বাঙালীদের ব্যাপারে সত্যিই তো তোমাদের কিছু আসে যায় না।

চুপ থাকতে না পেরে মহাবীরজী ব'লে উঠলেন, আসে যায় কর্তা। ভারত বহুজাতির দেশ, বাঙালী, মারাঠি, উড়িয়া, কত জাতি। কারো ক্ষতি হ'লে সবার ক্ষতি।

—এই যে বললে তুমি কিছু বোঝ না।

—কর্তা এ-সব আমার কথা নয়, পরের মুখ থেকে শুনেছি, সব বুঝেছি বলে মনে হয় না। তবে এ-সব বুঝতে যে হবে, তা বুঝেছি। আমরা তো আপনাদের মত লেখাপড়া জানি নে কর্তা।

—তুমি কষ্ট পেয়ো না মহাবীর, আমাদের বাঙালী শিক্ষিতবাবুরাই বা কতটা বিপদ বুঝছেন? আমারও স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমিও এ-ব্যাপারে উদাসীনই ছিলাম। কিন্তু আমার ঢাকার আত্মীয়দের চিঠিপত্র পেয়ে আমি আতঙ্কিত। এমনিতেই সেখানে নোয়াখালির দাঙ্গার পর একটা অনিশ্চিত অবস্থা, সর্বদা ওরা শঙ্কিত, তারপর জাননাম এখানে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদবাবু হিন্দুদের দরদী সেজে ওদেরকে দেশ ছেড়ে এ-দিকে চ'লে আসার পরামর্শ দিচ্ছেন। আমাদের আত্মীয়রা ভয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে রওয়ানা দিলে কোথায় যাবে তারা? এই যে আমাদের মস্ত বাড়িটা ফাঁকা-ফাঁকা দেখছ, এখানে এসে প্রথম ধাক্কায় নিশ্চয় আত্মীয়রা ভীড় জমাবে। ওদের তাড়িয়ে দিতে পারব? লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য নিয়ে খেলছে কিছু বজ্জাত। অশান্তির শেষ কোথায়?

মহাবীরজী অবাক বিস্ময়ে সুবোধ বণিকের বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। যাদের পরিবারে দুঃখদারিদ্র্য নেই, সেখানেও অশান্তি ঘনিয়ে উঠছে?

মেজকর্তা ধরাগলায় বললেন, জানো মহাবীর, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আমাদের বাড়িতে কয়েকবার অরন্ধন পালিত হয়েছিল। আর আজ? বঙ্গভঙ্গের জন্যেই কিছু বাবুলোক উঠে প'ড়ে লেগেছেন। আমরা বাঙালীরা এখন ভ্রাতৃঘাতী শুধু নয়, আত্মঘাতী। আত্মঘাতী হওয়ার পর কী হবে? অথচ বাঙালীরা নাকি এককালে ভারতকে পথ দেখাত। আত্মহননে জড়িত কোনো জাতি অন্যকে পথ দেখাতে পারে?

মহাবীরজী এ-সবের কিছুই জানতেন না। বঙ্গভঙ্গ কী বস্তু? অরন্ধন কেন? এ কী! মেজকর্তার চোখে জল!

তিনি সহসা লজ্জিত হয়ে বলে উঠলেন—তোমাকে ছুটি দিচ্ছি মহাবীর, তুমি যাও। তোমাকে বৃথাই এতক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। মহাবীর, আমি চোখ বুঁজেই বলে দিতে পারি, কংগ্রেস আর লীগের বড়কর্তারা অখণ্ড বঙ্গের প্রস্তাবটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। তারপর ভাগের মা গঙ্গা পাবে না।

একুশ

ভারত স্বাধীন হওয়ার আগের রাত। দাঙ্গার ঠিক এক বছর পর। মহাবীরজী সারাদিনের খাটাখাটুনির পর রোজকার মত স্বহস্তে ডাল রুটি পাকানোর জন্য স্নানান্তে তৈরী হচ্ছিলেন। এমন সময় বাইরে থেকে ভেসে এল এক অদ্ভুত কলকোলাহল। আবার একটা দাঙ্গা শুরু হ'য়ে গেল? শঙ্কিত হয়ে দরজা খুলে বাইরে এলেন। কিন্তু ফ্ল্যাটের ভীতসন্ত্রস্ত বাসিন্দারা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে দিল।

হাসির আওয়াজ না? ব্যাপারটা কী? গেট খুলে বাইরে এসে মহাবীরজীর বিস্ময়ের অন্ত রইল না। রাস্তায় উৎসবের দৃশ্য। কয়েকজন এসে মহাবীরজীকে জনজোয়ারে টেনে নিয়ে গেল। এমন কাণ্ড কোথা থেকে কা'রা শুরু করল কেউ জানে না। মুহূর্তের মধ্যে ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাও রাস্তায় নেমে এল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বাহ্নে রাত বারোটার ঘন্টা দুয়েক আগে কলকাতা ইতিহাস সৃষ্টি করল। বৃহন্নলা যেন এতদিনের ছদ্মবেশ ছেড়ে আত্মপ্রকাশ করল। পাড়ায় পাড়ায় ঘৃণার দেয়ালগুলো আচমকা ধূলিসাৎ। এখন রাত্রি যেন দিন, অন্ধকার যেন আলো, ভয় যেন আনন্দউচ্ছ্বাস। এ কি স্বাধীনতা প্রাপ্তির উন্মাদনা? তাই যদি হবে, সেই রাত্রেই কেন গোটা পাঞ্জাবে রক্তনদী বয়ে যাবে? পাঞ্জাবও তো বাংলার মত স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল। সেখানে দাঙ্গার ফলে হয়ে গেল কার্যত লোক-বিনিময়। বাংলায় গণআন্দোলনে রক্ষা পেল বাঙালীর জাতিসত্তা। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর আগমন সত্ত্বেও শ্যামাপ্রসাদ বাবুদের আকাঙ্ক্ষিত লোক-বিনিময়ের চক্রান্ত ভেসে গেল। মহাবীরজী মনে মনে বললেন, এতকাল কমরেডদের মুখে শুনে এসেছি, জনগণই ইতিহাসের স্রষ্টা, এবার পোড়া চোখে প্রত্যক্ষ করছি! ইচ্ছে করছে দৌড়ে গিয়ে নিরানন্দ মেজকর্তাকে ব'লে আসি—আপনার বাংলাই আবার ভারতকে দেখাবে পথ।

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট। ভোরবেলা। মহাবীরজী অধিক রাত্রে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেও অতি প্রত্যুষে জেগে উঠলেন কিসের এক তাড়নায়। কোনোমতে চোখেমুখে জল দিয়ে অমোঘ আকর্ষণে আবার গিয়ে নামলেন রাস্তায়। তারপর আর ঘরে ফেরা হ'ল না। রওয়ানা দিলেন সোজা বন্ধুর বাড়ির দিকে। বন্ধুরও একই দশা। তিনিও যাত্রা ক'রেছিলেন প্রাণের বন্ধুর সান্নিধ্যলাভের আশায়। পথে দুই বন্ধুর দেখা কলকাতার এক পরম শুভক্ষণে। উভয়ে হলেন আলিঙ্গনাবদ্ধ। অন্য সময় লোকে হয়ত চোখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখত, আজ এঁদের দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না। কেননা এই দৃশ্য, এই কোলাকুলি আজ পুজো ও ঈদের কোলাকুলিকেও সহস্রগুণে হার মানিয়েছে। যত্রতত্র অচেনা অজানাদের মধ্যেও চলছে আলিঙ্গন।

পশুত্বের আওতা থেকে ছাড়া পেয়ে মানুষ আবার নিজেকে ফিরে পাচ্ছে। মানুষ আবার মানুষ হচ্ছে। তাই মানুষে মানুষে এত মিলনের হুড়োহুড়ি। পৃথিবীর আর কোথায় এমন একটা দিনের উদয় হয়েছে? জয় কলকাতা! জয় কলকাতার মানুষের!

দুই বন্ধু হাত ধরাধরি ক'রে ফিরে গেলেন নিজেদের কৈশোরের দিনগুলিতে। সেই স্বদেশী প্রচারের গ্রামে গ্রামে। সেই মাঠের পর মাঠ পাড়ি দেওয়া পায়ে হেঁটে! সেই গ্রামের মানুষের অচেনা অজানা ছোঁয়াচ! সেই গরীবের ঘরে-ঘরে রাত্রি যাপন। সেই প্রাণ ঢেলে গান গেয়ে বেড়ানো মানুষকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াসে।

শিক্ষক বন্ধুই প্রথমে মুখ খুললেন—তুমি একদিন না কুস্তিতে জিতে এই কলকাতার মানরক্ষা করেছিলে। মনে আছে? আজ এই শহরের প্রত্যেকটা মানুষ জিতছে। প্রত্যেকে কলকাতার মানরক্ষা করছে! প্রত্যেকে আজ বিজয়ী। প্রত্যেকে আজ পালোয়ান। তাই না? বলো।

—যে আনন্দে আজ ঢাকা প'ড়ে গেছে দেশের সব ব্যর্থতা, সব যন্ত্রণা, দেশ-ভাগের সব কান্না, সব রক্ত অশ্রু, তার আয়ু কতক্ষণ কমল?

—আজ সে-সব হিসেবনিকেশ শিকেয় তুলে রাখ মহাবীর। এসো আজ একদিনের জন্য সব দুর্ভাবনা সব ব্যথা ভুলে যাই। কালকের ভাবনা কাল ভাবব, কিন্তু আজকের অগ্রগতি কালকের পাথেয় জোগাবেই।

—বেশ, চলো আজ তা'হলে সারা শহর ঘুরে বেড়াই।

প্রথমেই ওঁরা পৌঁছালেন এসপ্ল্যানেডে। তখন একটা ট্রাম গুমটি ছিল সেখানে, তার চতুর্দিক ঘুরে ট্রাম ফিরত উল্টো গতিপথে। সেখানে কাঠের টুলের উপর দাঁড়িয়ে সোল্লাসে বক্তৃতায় বলছেন এক ট্রামনেতা—হাম আজাদ হো গয়া। অথচ কয়েকমাস পরেই এই নেতার মুখে শোনা গিয়েছিল—এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। তার প্রতিধ্বনিও যে কিছুটা শোনা যায়নি এমন নয়।

তারপর ওঁরা পৌঁছালেন লাট-ভবনে। পিল পিল ক'রে লোক ঢুকছে খোলা গেট দিয়ে, এতদিন যা জনগণের সামনে ছিল বন্ধ। ক্ষমতার ঐ ভবনের কক্ষে কক্ষে কী আছে তা দেখার অদম্য কৌতূহল জনতার চোখে মুখে।

সেই সকালে চোখের সামনে প্রাসাদ ভবনের ছাদ থেকে নেমে গেল দু'শো বছরের গোলামীর প্রতীক ইউনিয়ন জ্যাক, উঠল জাতীয় পতাকা ব্যান্ডবাদনের তালে তালে।

কিছু যুবক প্রাসাদের কুশনগুলির উপর দিব্যি ব্রেড চালিয়ে সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চাইছে। তাদের নিবৃত্ত করতে গেলেন মহাবীরজী, তারা তাঁকে ঘেরাও ক'রে ফেলল—ভালোয় ভালোয় চ'লে যান। নইলে এই ব্রেড চালিয়ে দেব আপনার কাপড় চোপড়ে, রক্ত বেরিয়ে গেলে আমরা কিছু জানি না। কমলজী বন্ধুকে টেনে নিলেন।

পাড়ায় পাড়ায় ময়রারা মিষ্টি বিতরণ করছে ভ্রাম্যমান ভিন্ন পাড়ার লোকদের মধ্যে। অন্যত্র বিনামূল্যে সরবতের অঢেল সাপ্লাই। মানুষজন ঘুরছে আর ঘুরছে, আর কীভাবে দিনটাকে উপভোগ করা যায় ভেবে কূল পাচ্ছে না।

অবশেষে ক্লান্ত বন্ধুযুগল যে যার ডেরায় ফিরলেন। মহাবীরজীর হাত চেপে ধরলেন এক প্রৌঢ়া—সেই থেকে আপনাকে খুঁজছি, টেবিলে আপনার খাবার ঢেকে অপেক্ষা করছি।

মহাবীরজীকে অগত্যা আজ ফ্ল্যাটের এক প্রবীণা গুজরাটির আতিথ্য গ্রহণ করতে হল। কমবেশি সব ফ্ল্যাটের লোকেরাই আজ নিজ নিজ খোপ থেকে বেরিয়ে অন্যদের ডাকে অন্য খোপে গিয়ে আপ্যায়িত হচ্ছেন, যা এতকাল পাশাপাশি বাস করেও সম্ভব হয়নি।

সন্ধ্যার পর পার্শি ভদ্রলোক তাঁর ফুটফুটে সুন্দর কিশোরী মেয়েটিকে নিয়ে মহাবীরজীর সংকীর্ণ ঘরটিতে এসে হাজির। কোনো ভণিতা না ক'রে সরাসরি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে বললেন—পরশুদিন এই রেবেকার জন্মদিন।

—বেশ তো, সোহ্‌রাবজী।

—আপনাকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে।

—রক্ষা করুন! অসম্ভব।

বাবার পিছন থেকে রেবেকা ব'লে উঠল, আব্বল, প্লীজ ডোণ্ট সে 'নো'।

এরাও কলকাতার ফূর্তির জোয়ারে গা ভাসাতে চায়? মহাবীরজীর মনে মনে ভাবলেন। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।

—রেবেকা, আগে তোমার জন্মদিন তো কখনো পালন করতে দেখিনি।

—ঠিক তাই। সোহরাবজী ব'লে উঠলেন। তারপর এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা ব'লে গেলেন—আমি আর ক'দিন কলকাতায় থাকি, আপনিই তো আমাদের ফ্যামিলিটার গার্জেন। ঠিক কিনা বলুন। সংসার করা আমি প্রায় ভুলেই গেছি। কেন যে আমি নেভাল ইঞ্জিনিয়ার হ'তে গেলাম! বছরের পর বছর তো জাহাজে জাহাজে জলের উপর-ঘুরে বেড়াই। এতবড় যুদ্ধ গেল, ভাবলাম জাহাজ ডুবি হ'লে ভব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব। কিন্তু কী আশ্চর্য! বেঁচে রইলাম। রেবেকার জন্মদিন কী ক'রে পালিত হবে? মা-মেয়ের মন খারাপ, এতকাল কখনা রেবেকার জন্মদিনে আমি হাজির থাকতে পারিনি, ওরাও মনের দুঃখে জন্মদিন পালন করেনি। এবারই ওর জন্মদিনে আমি ডাঙায় থাকব। আমার মেয়ে জানেন তো লরেটোর ছাত্রী, ওর কত বন্ধুবান্ধব, তাদের কত জন্মদিন হয়, ওকে সেখানে উপহার হাতে ক'রে যেতেই হয়, তারা রেবেকাকে বলে—হ্যাঁ রে, তোর জন্মদিন নেই? মেয়ে মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখে। ওর ধারণা, ওর আব্বল সবকিছুর ব্যবস্থা ক'রে দেবে।

তবু মহাবীরজী সহজে সাড়া দিতে পারলেন না, তাঁকে যে কাল সকাল থেকেই আবার শতকর্মের ভার বইতে হবে। মুখে একটু হাসির ভাব ফোটাতে চেষ্টা ক'রে বললেন, মাস্টার সোহরাবজী, এবার যখন আপনি রয়েছেন, আমাকে রেহাই দিন।

—আপনাকে আগেই বলেছি অনভ্যাসের ফলে অসাংসারিক হয়ে গেছি। আপনার সাহায্য চাই। আপনি দয়া ক'রে 'না' বলবেন না। এক বছর পরে আপনাকে আমরা একেবারে ছুটি দিয়ে দেব।

—তার মানে?

—সামনের বছর আমরা আর এ-দেশে থাকছি না।

এই কথায় ঝিমিয়ে পড়া মহাবীরজী প্রায় গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলেন—থাকছেন না! কোথায় যাচ্ছেন?

—আমেরিকায়। সেখানে একটা মেরিন কলেজে শিক্ষকের কাজ পেয়েছি। আর সম্বৎসর জলের উপর ভেসে বেড়াতে হবে না। আপনি আমাদের হাত থেকে রেহাই পাবেন। আমার শেষ অনুরোধটা রাখুন।

মহাবীরজীর মুখখানা অতি ম্লান দেখাল। এ যে প্রায় আত্মীয় বিচ্ছেদ! আজকের দিনটা শুরু হয়েছিল ভালোয় ভালোয়, কিন্তু...

—আমার একটা শর্ত আছে সোহরাবজী।

—বলুন কী শর্ত।

—আপনার যে ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে সামনের বছর চ'লে যাচ্ছেন, তা কোনোদিন কারো কাছে ফাঁস করতে পারবেন না। অন্যেরা জানতে পারলে এখন থেকেই আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলবে।

—আচ্ছা রাজী। এ আর এমন কি কঠিন কাজ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনার অসুবিধে আমি বুঝেছি।

বাইশ

গান্ধীজীকে গুলি ক'রে হত্যা! না, না, অসম্ভব, যাঁর আমরণ অনশনে কলকাতার দাঙ্গাবাজরা স্বেচ্ছায় গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সমর্পণ করে, তাঁকে দিল্লীতে কোনো নির্দয় গুলি করতে পারে। যারা তাকে জাতির পিতা বলে, তারাই তো এখন দিল্লীর মনসদে। সেই দিল্লীতে তাঁরা তাঁদের পরম প্রিয়কে রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেনি! কেন? কেন? না কি তাঁদের কাছে এখন গান্ধীজীর জীবনের আর কোনো মূল্য নেই? ওঁদের কাছে গান্ধীজীর প্রয়োজন ফুরিয়েছে? রাজনীতি কী ভয়ঙ্কর।

অল্পক্ষণের মধ্যে মহাবীরজীর মনের আকাশে ঘন ঘন রঙ বদল হ'তে লাগল। হতভম্ব ভাব হ্রাস পেতেই এলো আতঙ্কের ছায়া। যদি সংখ্যালঘুদের কেউ গুলি ক'রে থাকে? ভেবেই শিউরে উঠলেন মহাবীরজী। তা'হলে তো দেশে রক্তের নদী যাবে। গান্ধী-হত্যার চেয়ে সেটা হবে দেশের পক্ষে আরো দুঃসহ। সারা দেশ কি পাঞ্জাবে পরিণত হবে।

সান্ধ্য দৈনিকের খবরে যখন জানা গেল হত্যাকারী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোক, তখন আবার মহাবীরজীর মনের আকাশে রঙ বদল। যাক্ বাঁচা গেল। গণহত্যার আতঙ্ক থেকে ছাড়া পেয়ে মহাবীরজীর মনের আকাশে আনন্দের রামধনু। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের জন্য। মনের আকাশ ছেয়ে গেল এবার গভীর শোকের মেঘে। এতক্ষণে মন হাহাকার ক'রে উঠল। যাঁকে নিয়ে এত সমালোচনা তাঁর জন্যই চোখে উদগত অশ্রু টলমল করতে লাগল।

কিন্তু সে পর্যায়ও বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। কেন জানি ধীরে ধীরে বজ্রসম কঠিন বিচারক এসে হাজির। তিনি তো আসলে নিজের ভুলেরই শিকার। অহিংসার অজুহাতে যিনি রক্তপাতের ভয়ে বিপ্লব থেকে পিছিয়ে এলেন, প্রতিবিপ্লব এসে রক্তের শোধ তুলবে না? হাজার গুণ রক্ত? প্রাণ দিয়ে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল। হায় রে। গান্ধীজীর বিপ্লব বিরোধী অহিংসাই কি দেশে ডেকে আনেনি হিংসার রক্তস্রোত। এমনিতে অহিংসা মহৎ, কিন্তু তা যদি বৃহত্তর হিংসার বাহন হয়ে ওঠে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে?

ভেজানো দরজা একটু ফাঁক হ'ল। স্যুটকোট টাই পরা এক জন উঁকি দিয়ে দেখলেন। এবং প্রশ্ন করলেন— মনে আছে তো?

চকিতে মহাবীরজী চোখ তুলে তাকালেন, একটু হাসতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। শুধু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি কাল সকালে আসছি। মানুষটি চলে গেলেন। মহাবীরজী কাছে এও এক অভিজ্ঞতা, এই মানুষটি গান্ধীজীর মৃত্যু-সংবাদ একদম এড়িয়ে গেলেন। অথচ উনি তো কম সংবেদনশীল নন, পাড়ার নাম করা পরোপকারী, ডাক্তার, দুর্ভিক্ষ এবং দাঙ্গার দিনে সদা সর্বদা তাঁকে মহাবীরজীর পাশে দেখা গেছে, পাড়াশুদ্ধ লোকের অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। কয়েকদিন আগে ইনি মহাবীরজীকে প্রশ্ন করেন, দুর্ভিক্ষ

এবং দাঙ্গার চেহারা তো অনেক দেখেছেন, কিন্তু ঘরছাড়া ছন্নছাড়া হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের কি আপনি দেখেছেন?

—হ্যাঁ, দেখেছি শিয়ালদহ স্টেশনে। আমাদের মেজকর্তার আত্মীয়দের খোঁজে প্রায়ই আমাকে স্টেশনে যেতে হয়।

—হুঁঃ। ও তো বিন্দুবৎ, কুপার্স ক্যাম্প দেখেছেন?

—না, সে কোথায়?

—আপনি সেখানে আমার সঙ্গে যাবেন?

—যাব।

রবিবারে ডাক্তার বীরেশ্বর মোতিলালের চেম্বার বন্ধ থাকে। তিনি সেদিন ভোরবেলা ওষুধপত্র ভর্তি গাড়ি নিয়ে রওয়ানা দেন কুপার্স ক্যাম্পের উদ্দেশে।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই একখানা জীপ এসে দাঁড়াল মহাবীরজীর দরজার সামনে। হর্ণ শুনে মহাবীরজী দ্বার খুলে বেরিয়ে এলেন। তিনি গিয়ে উঠলেন জীপে, বসলেন বীরেশ্বর মোতিলালের পাশে।

উভয়ের মধ্যে একটিও বাক্যবিনিময় হল না। বীরেশ্বর স্বল্পবাক। নিবিষ্টচিত্তে তিনি নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করছেন, ড্রাইভারটি পিছনের সীটে উপবিষ্ট।

নৈহাটির কাছাকাছি এসে বীরেশ্বরের মুখ থেকে নির্গত হল—খিদে পায়নি?

—না। যাদের দেখতে যাচ্ছি তাদের জন্যে ক্ষুধাতৃষ্ণা পেতে নেই।

জীপ এসে একটা খাবারের দোকানের সামনে থামল। দোকানদার দেয়ালঘড়ি দেখে ব'লে উঠল—কী ক'রে ডাক্তারবাবু একেবারে ঘন্টা মিনিট মেপে আসেন।

কুপার্স ক্যাম্পের লোকেরা সেই একই কথা বলল।

—আজ ক'টা মিথ্যা প্রেস্‌ক্রিপসন চাই?

—নইলে ম'রে যাব ডাক্তারবাবু, কয়েকজন শীর্ণ কঙ্কালসার মানুষ প্রায় একসঙ্গে কথাটা বলল।

—সত্যমেব জয়তে বলে ডাক্তারবাবু মিথ্যা-প্রেসক্রিপসন ক'রে দিলেন। গোটা সাতেকের পর বললেন, আজ এই পর্যন্ত।

ক্যাম্পে যক্ষাগ্রস্তদেরই শুধু আধসের ক'রে দুধ দেওয়া হয়। কাজেই বীরেশ্বরবাবুও কৃপায় উপস্থিত কয়েকজন যক্ষামুক্ত ব্যক্তি শিশুদের মত একটু দুধ পাবেন।

জুটমিল ওয়ার্কার্সদের কদর্য আস্তানাগুলি মহাবীরজীর হাতের তালুতে, কিন্তু কুপার্স ক্যাম্পের হালহকিকত তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দিল। অতি লম্বা লম্বা ব্যারাকে পাটকাঠির বেড়া দেওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোপের মধ্যে উনুনে যখন আগুনের চেয়ে ধোঁয়া বেশি বের হয়, তখন কেন মানুষগুলির দম বন্ধ হয় না? তার চেয়েও মহাবীরজীর বিস্ময়—কেন এতদিনেও পাটকাঠিতে আগুন লেগে এক একটা ব্যারাক মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়নি? যে নরকে সব কথা থেমে যায়, সেখানে মহাবীরজীরও মনের কথা মনেই রয়ে গেল।

ফেরার সময় হ'ল সন্ধ্যায়। চতুর্দিকে চলন্ত জীপের হেডলাইট ছাড়া সব কিছু গাঢ়

অন্ধকারে আচ্ছন্ন। চারদিকের অস্তিত্ব যদি রোদ্রে ঝলমল করত, তবু বোধ হয় মহাবীরজীর মস্তিষ্কে তাদের প্রবেশাধিকার থাকত না। সেখানে উদ্বাস্তু ছাড়া বিশ্বের আর কোনো কিছুর প্রবেশ নিবিদ্ধ ডাক্তারবাবু মুখ নিসৃত বাক্যবাণ ঢুকল মহাবীরজীর কর্ণে—গান্ধীজী যে বলেছিলেন আমার মরা লাশের উপর দিয়ে দেশ-ভাগ হবে, কেন তিনি কথা রাখেননি? সেটা হ'লেই কি ভালো ছিল না?

ডাক্তারের কথার প্রচণ্ড উত্তাপে মহাবীরজী চমকে উঠলেন। ব্যারাকের সম্ভাব্য আগুন-লাগাকেও হার মানাল। যেন উদ্বাস্তুদের ক্ষোভের তপ্ত লাভাস্রোত এতক্ষণে নির্গত হ'ল বীরেশ্বর মোতিলালের কণ্ঠ দিয়ে।

ব্যারোমিটারে তাপপ্রবাহ কোথায় যে গিয়ে থামবে। অহিংসার পূজারী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ পশ্চিম বাংলার মসনদে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তপ্ত বুলেট গিয়ে ঢুকল বেচারী শিশির মণ্ডলের বুকে। অপরাধ? কিছু লোকের সঙ্গে দাবিদাওয়া জানাতে এসেছিল, ভাবেনি তাকে স্বাধীন দেশে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শহীদ হ'তে হবে। কলকাতায় বৃটিশ আমলে এমনটা ঘটলে শহরের চেহারা অন্যরকম হত। কিন্তু সদ্য স্বাধীন দেশে প্রতিবাদের আহ্বানে সাড়া মিলল সামান্য। বেশিরভাগ মানুষ শিশুরাষ্ট্রকে সময় দিতে চায়। তাদের মোহভঙ্গের জন্য অনেক অনেক গুলি বারুদের প্রয়োজন। কিন্তু সচেতন স্বল্পসংখ্যকের বুকে শিশির মণ্ডল যেন তপ্ত লৌহ শলাকা। তারা বুঝতে নারাজ গবর্নমেন্টের উপর ধনিকবণিকের কব্জা মজবুত হচ্ছে। শ্রমিকদের অগ্রণী অংশ সরব ও সক্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। মহাবীরজী তার প্রমাণ পেলেন কয়েকদিনের মধ্যেই। চটকল মজুরদের বার্ষিক সম্মেলন। প্রকাশ্য সমাবেশের বক্তারা সমবেত। সভাস্থলের পাশের বাড়ির একটা ঘরে তাঁরা আলাপ-আলোচনারত। সেখানে প্রবেশ ক'রে মহাবীরজীর চক্ষু জুড়িয়ে গেল—এর আগে একসঙ্গে তিনি কখনো দেখেননি ডঃ ভূপেন দত্ত, বঙ্কিম মুখার্জী, নিত্যানন্দ চৌধুরী এবং ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে। তাঁর কানে এলো ডঃ ভূপেন দত্তের প্রশ্ন—বঙ্কিম, তুমি জানো গুলি চালিয়েও প্রফুল্লবাবু গদীরক্ষা করতে পারবেন না? তাঁর জায়গায় না কি একজন 'স্ট্রংম্যান' খোঁজা হচ্ছে? লোকটি কে?

—আপনি যাঁকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন-না।

—বিধান ডাক্তার?

—হ্যাঁ, মুখে ধীরে সুস্থে একটা পানের খিলি গুঁজে দিয়ে বঙ্কিম মুখার্জী মৃদু হাসলেন।

—অনেক কাল তো কাটালে গান্ধী-জিন্না এক হও ব'লে, গান্ধীজী তো এখন পরপারে আর জিন্না সাহেব পাকিস্তানে, এখন তোমরা কী বলবে?

—আমরা বলব চটকল মজুর এক হও, আপনিও তাই বলবেন, তাই না? বঙ্কিম মুখার্জীর হো-হো-হাসিতে ঘর ভরপুর।

বাইরে থেকে মিছিলের আওয়াজ আসছে—দুনিয়ার মজুর এক হও। ঘর্মাক্ত কলেবরে ঘরে এসে ঢুকল এক তরুণ। বোধহয় কোনো মিছিলের পুরোভাগে ছিল; দু'হাত তুলে নেতাদের নমস্কার জানিয়ে বলল, এই যে আপনারা সবাই এখানে। আপনারা বলতে পারেন

এই যে চটকলে বৃটিশ মালিকদের জায়গায় আসছে সিঙ্ঘানিয়া, বাজোরিয়া, কানোরিয়ারা, এবার আমরা তাদের গোলামী করব? এই আমাদের আজাদী?

ডাঃ দত্ত হেসে বললেন, ইন্দ্রজিৎ, একেই আজ মিটিংয়ে সর্বপ্রথম মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে দাও।

এবং সত্যিই দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তরুণের মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল আগুনের হলকা—সাচ্চা আজাদীর জন্যে লড়তে হবে মরতে হবে, যেমন লড়ছে ওরা ইন্দোনেশিয়ার মালয়েশিয়ায়, বার্মায়, ফিলিপাইনে। অগ্নিকোণে ওরা লড়ছে বন্দুক হাতে, আমরা কী করছি, আমরা বলছি দুনিয়ার মজুর এক হও, কিন্তু আমাদের জগদ্দলে বাজোরিয়ারা মালিক হয়ে দালাল দিয়ে শুরু করেছে পাল্টা ইউনিয়ন, গঙ্গার ও-পারে গৌদলপাড়ায় কাল থেকে চলছে লক আউট, আমরা কী করব? আজাদীর চুষিকাঠি চুষব? অন্যভাবে ভাবতে হবে না? কমনওয়েলথের মধ্যে থেকে আজাদী আর আমরা...

অদূরে দাঁড়িয়ে একদল লোক স্লোগান দিচ্ছিল তখন—কমিউনিস্টরা দেশদ্রোহী দেশদ্রোহীরা নিপাত যাক।

মাস দুইয়ের মধ্যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। মাস যদিও ফেব্রুয়ারি, তবু কংগ্রেসকে ঘিরে উত্তপ্ত আবহাওয়া। গরম গরম বক্তৃতা। তেলেঙ্গানা থেকে তপ্ত হাওয়া আসছে। মহাবীর ডেলিগেট। পাশে সৌভাগ্যক্রমে ইংরেজি জানা কমরেড। তাঁর কাছে থেকে বক্তৃতাদির সংক্ষিপ্তসার মহাবীরজী শুনতে লাগলেন। যতই শুনছেন ততই হৃৎপিণ্ডে খিল ধরার উপক্রম। মাঝখানে বিড়বিড় করলেন—ভুল, সব ভুল।

পার্শ্ববর্তী কমরেড সতর্ক ক'রে দিলেন—চুপ। চুপ।

অগত্যা তিনি চুপ ক'রে গেলেন। সভামঞ্চ আলো ক'রে যাঁরা ব'সেছিলেন তাঁদের জানার কথা নয় কোন এক অখ্যাত অজ্ঞাত কুলশীলের মেরুদণ্ড বেয়ে হিম শীতল প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে গরম গরম বক্তব্য শুনে।

মসনদে আসীন বি টি রণদীভে অনায়াসে ব'লে গেলেন—গণতান্ত্রিক বিপ্লব এখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে একেবারে একই গ্রন্থীতে জড়িয়ে গেছে। এ-সব মহাবীরজী অনুধাবন করতে না পারলেও তাঁর মনে হল—নতুন এক অপরিচিত পার্টি লাইন তাঁর হৃদয়ের দরজায় এসে কড়া নাড়ছে। কিন্তু হৃদয়ে কে যেন সজোরে খিল এঁটে দিয়ে পাগলা মেহের আলির মত বলছে, সব ঝুটা হ্যায়।

তেইশ

এই প্রসঙ্গে এসে গেল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম। তাঁর ইতিবাচক কাজের সংখ্যা সবাই জানেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রের নির্মম দিকগুলি কজন জানেন? সাম্রাজ্যবাদের উত্তরসূরী হিংস্র শাসক অতি সন্তর্পণে নখদন্ত লুকিয়ে লক্ষ্য রাখছিল মুক্তিকামীদের ভ্রান্ত পদক্ষেপের দিকে। একটা অছিলা পাওয়ামাত্র তারা শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডাঃ রায়ের কৃপায়

জেলগুলি ভ'রে উঠল স্বাধীন দেশে বেপরোয়া ধড়পাকড়ের ফলে। বহু পরিবারের উপার্জনশীল মানুষকে ছিঁড়ে নিয়ে সুদূর বক্সায় বন্দী শিবিরে পাঠানো হল, পিছনে যারা প'ড়ে রইল তাদের ক্ষুধার অন্ন হঠাৎ উধাও। সর্বত্র ভয় এবং সন্ত্রাস।

অথচ বিপ্লবী কার্যক্রম তখনো শুরু হয়নি! অপরাধ করার আগেই অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে গেল নিরীহ মানুষ। গণতন্ত্রের ঢক্কা নিনাদের মধ্যে চাপা প'ড়ে গেল একটা স্বচ্ছ সত্য—আইন তো অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারে অপরাধের মূল্যায়নের ভিত্তিতে। বাংলার বিখ্যাত 'রূপকার' কিন্তু বিনা অপরাধেই বেআইনিভাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা ক'রে দিলেন। বলা বাহুল্য বাংলার এই রূপকারই পরবর্তীকালে বাঙালীর জাতিসত্তাটাই মুছে দিতে চেয়েছিলেন বঙ্গ-বিহার-একীকরণের মারফত, যাতে অগ্রগামী পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চাদপদ বিহারের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গণ-আন্দোলনকে পিষে মারা যায়। জনরোষে তা সম্ভব হয়নি অবশ্য, যেমন সম্ভব হয়নি কমিউনিস্ট পার্টিকে শেষ পর্যন্ত বেআইনী ক'রে রাখা। কলকাতার হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়, আড়াই বছর পরে বাংলার রূপকারকে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেছিল—কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

কিন্তু ততদিনে এই আড়াই বছরের মধ্যে কত যে রক্ত-অশ্রু ঝরেছে! কত যে মৃত্যু এসে এক-একটা পরিবারের হৃৎপিণ্ড ভেঙে চূর্ণ করেছে! কারাগারে কত কমরেড যে সুদীর্ঘ অনশন-ধর্মঘটে প্রাণ দিয়েছেন, পঙ্গু হয়েছেন। লাঠিগুলিতে কত যে নিহত বা আহত হয়েছেন! এর মানবিক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কে করবে। যারা দেশভাগ, দাঙ্গা এবং ভিটেমাটিছাড়া লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু সৃষ্টির জনক, তারাই অচিরে আত্মপ্রকাশ করেছিল নিপীড়ন-নির্যাতনের নায়ক রূপে। নারী-হন্তারূপেও তাদের হাতে রক্তের দাগ।

আমাদের নায়ক কী করছিলেন এই নারকীয় দিনগুলিতে? তিনি কি ভ্রান্ত পার্টিলাইনের অজুহাতে দায়মুক্ত হয়েছিলেন? সুখের জীবন বেছে নিয়েছিলেন? তাঁর দেহমনের উপর দিয়ে ঝড় ব'য়ে যায়নি? পুলিশের বেড়াজালে যখন চেনা-অচেনা মানুষগুলি ধরা প'ড়ছিল, চোখের সামনে পার্টি অফিসগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, পার্টির দৈনিক মুখপত্র সংবাদপত্রের স্বাধীনতাটুকুও হারাল, চারপাশের সব গ্রন্থী একে একে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, তখন কুস্তিগীর কি মুণ্ডহীন কবন্ধ হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন?

তাঁর বুকের ভিতর যে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল তা বাইরে থেকে কারো চোখে পড়েনি, বরং আখড়ার শিষ্যসামন্ত দেখল তাদের গুরুজী যেন নতুন উৎসাহে মনপ্রাণ ঢেলে সবাইকে কুস্তিচর্চায় উৎসাহিত করছেন। ওস্তাদের এই পরিবর্তনের তারা খুশি। কিন্তু যাঁর চোখে কিছু ফাঁকি দেওয়া যায় না, সেই ডঃ ভূপেন দত্ত একদিন এসে ব'লে গেলেন—সহ্য ক'রে যাও, যে সয় সেই রয়। অনাবশ্যক ক্ষয় ক্ষতির মধ্যে যেয়ো না।

বন্ধু কমলজীর কিন্তু বিপরীত দাবি। একদিন রাত্রে এসে দেখা দিলেন—কেন চটকলের কাজ করতে চাও না? তোমার মতামত যাই হোক, পার্টির মেজরিটির সিদ্ধান্ত মানতে তুমি বাধ্য।

—যে ক্ষয়ক্ষতি চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে, তাতে আমি ঘৃতাহুতি দিতে পারব না কমল। তুমি নিশ্চয় ভুলে যাওনি, দু'বছর আগে আমি তোমার নরম-নরম কথায় রেগে আগুন হয়েছিলাম। বিপ্লবের সেই স্বর্ণমুহূর্ত চ'লে গেছে। এখন মানুষের একটা বড় অংশ তখনকার মত নেই, তারা শিশুরাষ্ট্রকে সময় দিতে চায়। তুমি দেখতে পাও না? তুমি অন্ধ? এই অবস্থায় শত্রুর পাতা ফাঁদে কেন পা দেবে? দু'বছর আগে যখন বৃটিশ রাজত্ব ছিল, তখন যদি এই লাইন আসত, অন্যরকম হ'ত। তোমাকে তো এই কথা আমি বারবার বলেছি কমল।

কমলজীর মুখে কোনো সদুত্তর জোগাল না। বিমর্ষ মুখে শুধু বলতে পারলেন—তবে চুপচাপই থাক, তা-ছাড়া কী বলতে পারি।

—এ-কথার মধ্যে রাগের ভাব আছে। কিন্তু চারদিকে আমি যা দেখছি তাতে মনে হয় না পার্টি আমাকে মাপ করবে। দু'দিন পরেই আমাকে বলবে বেইমান, কাপুরুষ, ট্রেটার। আমাকে পার্টি থেকে হয়ত বহিষ্কার করবে। বেশ, তাই করুক।

—অত সহজ নয়, কমলজী প্রায় ঢোক গিলে কথাটা বললেন।

—তুমি সাবধানে থেকো কমল, আমার ভাবনা বেঘোরে তোমার প্রাণটা না যায়।

একটা বোবা কান্না ঠেলে উঠছিল কমলজীর বুকে। বন্ধুকে নীরবে আলিঙ্গন ক'রে বিনা বাক্যব্যয়ে বিদায় নিলেন।

চব্বিশ

আশেপাশের তোলপাড় কাণ্ডের মধ্যে মহাবীরজীর জীবন মামুলি গতানুগতিক ধারায় ধীর মন্থর গতিতে প্রবাহিত হ'তে লাগল। এখন জীবননদীতে উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ের হাওয়াতে তরঙ্গ নেই। মনে স্বপ্ন আছে, উদ্দীপনা নেই, প্রাণে লোক-প্রেম আছে আবশ্যকীয় ছোটাছুটি নেই। ক্রমে যেন চলমান স্রোতস্বিনীকে শক্তমাটি ঘিরে ফেলে মস্ত সরোবরের মত কিছু সৃষ্টি করতে চলেছে। এমন সময় স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ সরসীবক্ষে এসে পড়ল আস্ত একখানা ইষ্টক খণ্ড। ছলছলিয়ে উঠল জল। শতদল ফুটে ওঠার তর সইল না।

রাত্রে পুরোদস্তুর সাহেবী পোষাক পরা এক ফর্সা ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন ঘরে। পরিষ্কার বাংলাভাষায় প্রশ্ন করলেন—মহাবীরজী ভালো আছেন?

স্তম্ভিত মহাবীরজীর পাল্টা জিজ্ঞাসা—গলার স্বর চেনা-চেনা, কে আপনি?

—ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত নামক একজনকে চেনেন?

—তাই বলুন! আপনার ছদ্মবেশ চমৎকার। কিন্তু আমাকে ডেকে পাঠালেই হত।

—কোথায় ডাকব? সে-রকম জায়গা এখনো গ'ড়ে ওঠেনি। আর যা শুনছি, তাতে আমি ডেকে পাঠালেই কি আপনি আসতেন?

—আপনি কী শুনছেন?

—নিজেই তার উত্তর জানেন। যখন আপনি বলছেন, আমি ডেকে পাঠালেই আপনি যেতেন, তখন যে-কারণে আপনাকে আমি ডাকতাম, সেই কারণটা বলব?

—স্বচ্ছন্দে বলুন, এত ঘুরিয়ে কথা বলেছেন কেন? আমি সেই মহাবীরই আছি।

—আছেন? তা হ'লে প্রশ্ন করি—আপনার এই বাড়িতে তো অনেক ফ্ল্যাট, কোনোটা খালি আছে?

—একটা হয়ত শিগগিরই খালি হতে পারে, কিন্তু কেন বলুন তো?

—বুঝতে পারছেন না? এখন আমাদের অনেক গোপন ডেরা দরকার।

—এক পার্শি পরিবার কয়েক দিনের মধ্যে আমেরিকা চলে যাবে।

—তাদের ফ্ল্যাটটা পাওয়া যাবে?

—যাবে।

—বাঁচালেন, কিন্তু সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারবেন?

—মহাবীর প্রসাদ সিংকে আপনারা কী ভাবেন?

—এত সহজে আপনি একটা সুরাহা করতে পারবেন ভাবিনি।

—আমি নিজেও তা আগে হ'লে কল্পনা করতে পারতাম না। এটা কার্যত একটা আশ্চর্য যোগাযোগ—আপনারা বাঙালীরা একে যেন কী বলেন? কাকতালীয়, তাই না?

—হ্যাঁ, বলে যান।

—শুনুন না...

হঠাৎ মহাবীরজী থেমে গেলেন। তাঁর কণ্ঠনালিতে কী একটা যেন দলা পাকিয়ে স্বরগ্রামকে বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। আসলে তিনি বাইরে কুস্তিগিরদের নিয়ে নতুন ক'রে মেতে উঠলেও, ভিতরে কী একটা যেন তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, ভিতরে-ভিতরে নির্জীব বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। যিনি পার্টির কাজে অত্যধিক সক্রিয় ছিলেন, তার পক্ষে সহসা নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যাওয়া মর্মান্তিক। মহাবীরজী নিজেও তা বুঝতে পারছিলেন না এমনটা নয়। তবে উদ্ধারের পথ খুঁজে না পেয়ে আঁকুপাঁকু করছিলেন। এখন আশ্চর্যজনকভাবে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ হাতে আসার সম্ভাবনায় স্বতঃস্ফূর্ত চাপা উল্লাস জেগেছে মনে। এ এমন একটা কাজ যা অতীব বিপজ্জনক হ'লেও এ-কাজে জন-সংযোগ নেই, জন-সংযোগের দায়দায়িত্ব নেই, সচেতনভাবে পার্টির ভুলভ্রান্তিজনিত ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার সম্ভাবনা নেই। বরং কিছু কমরেডকে রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব পালন করা যাবে। এ কমরেডদের বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া নয়, জননীর মত সদাসতর্ক দৃষ্টি রেখে রক্ষা করা।

—হঠাৎ কেন থেমে গেলেন? ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত প্রশ্ন করলেন।

একটু গলা খাঁকারী দিয়ে দলাপাকানো পিণ্ডটা কণ্ঠনালির নীচের দিকে ঠেলে দিয়ে মহাবীরজী লাজুক হাসি হাসলেন।

—এক পার্শী ভদ্রলোক শিগগিরই ফ্যামিলি নিয়ে আমেরিকা চ'লে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, সারা বছর জাহাজে জাহাজে ঘোরেন, আমাকেও তাঁর ফ্যামিলির সব কিছু দেখাশুনা করতে হত কার্যগতিকে। তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দেওয়ার কথা কাকপক্ষীকেও জানাবেন না, কারণ আমি তাঁকে বলেছিলাম লোকে তাহলে

আমাকে ফ্ল্যাটপাওয়ার জন্যে নাস্তানাবুদ করবে। একেই আমি বলছি কাকতালীয়। তা'ছাড়া ওদের ফ্যামিলিকে যেভাবে আমি হাটবাজার এবং সব কিছু ক'রে দিতাম, তেমনি আমার কমরেডদের জন্যেও করতে পারব, কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।

—খাসা। খাসা। এ যেন হাতে স্বর্গ পাওয়া। শুধু একটা মস্ত 'কিন্তু' আছে।

—বলুন।

—আপনি আপনার নিকট বন্ধুদেরকে ঘুণাক্ষরে কিছু বলতে পারবেন না, এমন কি আপনার প্রাণের বন্ধুকেও কিছু জানাতে পারবেন না।

—প্রাণের বন্ধু। কে সে।

—আপনি বিলক্ষণ বুঝেছেন—আপনার বন্ধু কমলজী।

মহাবীরজীর বাকস্ফূর্তি হল না, সত্যিকারের থতমত খেয়ে ক্ষণিক বেদনাভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। জীবনে এমন কোনো ঘটনা তাঁর মনে পড়ল না যা কমলের কাছে তিনি গোপন করেছেন।

—কী, আঁতে ঘা লেগেছে?

মহাবীরজী মৌন। তাকেই সম্মতি ধ'রে নিয়ে আগন্তুক বললেন, আর একটা কথা আছে। আপনাকে কিছু লোক তো কমিউনিস্ট বলে জানে, সেই দোষটা কাটাতে হবে এবং যত শীঘ্র সেটা দূর হয় তত মঙ্গল। অর্থাৎ আপনাকে আপাতত নিজেকে কমিউনিস্ট বিদ্বেষী বলে প্রচার করতে হবে।

—নিজের মুখে?

—তা'ছাড়া উপায় কী। সেই যে একটা খারাপ কথা আছে না, সেই রকম করলে বেশি ফল পাওয়া যাবে।

—কী খারাপ কথা?

—ঠিক মনে পড়ছে না। বস্তিটস্তিতে যে প্রায়ই শোনা যায়।

—খিস্তি করা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খিস্তি। কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কয়েকদিন খিস্তি ক'রে দেখুন না।

—আমি পারব না। ও আমি কোনোদিন করিনি, করব না, ও আমার ধাতে সইবে না।

—তা'হলে তো মুস্কিল। ওতেই লোকে রাতারাতি আপনাকে কমিউনিস্ট বিদ্বেষ ঠাওরাবে। গোপন আস্তানাটা সুরক্ষার জন্যে আপনাকে ভোল পাল্টাতেই হবে।

—লোকে আমাকে সুবিধাবাদী বলবে।

—তা বলবে, আপনি যশমান সব খোয়াবেন।

—না হয় সবই খোয়ালাম, কিন্তু খিস্তি করতে পারব না।

ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের মুখে সহসা কথা জোগায় না। একটু থেমে থেকে বললেন, যাকগে, আপনাকে দিয়ে কিছু হবে না। চলি।

—না, একটু বসুন কমরেড। আজ অনেক ভদ্রলোকও তো কমিউনিস্টদের গালাগালি

দেয়। সে-ই রকম করলে হবে না? এই যেমন, কমিউনিস্টরা দেশদ্রোহী, রাশিয়ার চর, বৃটিশের টাকা খায়, নেতাজীকে ফ্যাসিবাদ বলে...

—ব্যস, ব্যস, ওকেই আমি খিস্তি বলছিলাম।

—না কমরেড, খিস্তি আরো খারাপ, মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা যায় না, কানে আঙুল দিতে হয়। আপনি উপরতলার মানুষ, তাই জানেন না।

—আমি উপরতলার মানুষ।

—হ্যাঁ, কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আপনি আমাদের মত নিচুতলার মানুষের কমরেড।

মৃদু হেসে অনাহূত অতিথি বিদায় নিলেন

পঁচিশ

কে জানত মহাবীরজী ঘি'য়ের ব্যবসা শুরু ক'রে দেবেন। চিরকালই ছাপরা জেলার দারোয়ান এবং পালোয়ানরা অল্পবিস্তর দেশের বিশুদ্ধ খাঁটি ঘি এনে কিছুটা বিক্রি করে থাকে এবং কিছুটা দেহের পুষ্টি সাধনের অঙ্গ করে তোলে। কিন্তু মহাবীরজীর ব্যবসা তেমন নয়। নিয়মিত ডজন ডজন টিনভর্তি ঘৃত আমদানি হয়ে শহরের বিশুদ্ধ ঘি-ব্যবসায়ীদের দোকানে দোকানে প্রেরিত হ'তে লাগল। ধনিক পরিবারের কল্যাণে তাদের বড়লোক আত্মীয়স্বজনের রন্ধনশালায়ও অবাধে প্রবেশপত্র পেয়ে গেল। বিশুদ্ধ ঘি-লোভীরা ব্যবসাটাকে স্ফীত থেকে স্ফীততর করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল।

আর একটা ব্যাপারও কম অভিনব নয়। ফ্ল্যাট বাড়ির প্রশস্ত অঙ্গনের একপাশ থেকে হাম্বা-হাম্বা রব উত্থিত হল। দেশ থেকে বড় বড় তিনটি দুবলা গাই গরু আমদানি করা হয়েছে। তাদের শ্রুতিমধুর নাম—ধবলী, সবালা এবং কমলা। তাদের পরিচর্যার জন্য দেশ থেকে আনা হয়েছে এক বৃদ্ধ যাদবকে। ঘি'য়ের পাশাপাশি দুধের ব্যবসাটাও জমে উঠেছে।

এরই মধ্যে একদিন সোহরাবজীর কন্যা রেবেকা সাশ্রুনয়নে এসে বলল, আঙ্কল, আমরা কাল চ'লে যাচ্ছি। তুমি আমাদের কথা মনে রাখবে? ভুলে যাবে না? আমি কিন্তু মনে রাখব।

সোহরাবজী পিছন থেকে বললেন, নিমন্ত্রণ রইল। রিটার্ন টিকিট পাঠিয়ে দেব। একবার আসবেন কিন্তু।

মহাবীরজীর বুকটা ব্যথায় টনটন ক'রে উঠল। অথচ তিনি এদের বিদায়ের দিনই গুণছিলেন। শূন্যস্থান পূরণের লোকেরা বারবার জানতে চাইছিল—কবে ফ্ল্যাট খালি হবে। তবু আজ কেন হৃদয় কাঁদছে।

যথারীতি সবই সম্পন্ন হ'ল। এমন সময় একদিন কমলজীর অভ্যুদয় এবং ভণিতাবিহীন প্রশ্ন—এ-সব কী শুনছি মহাবীর?

—কী শুনছ আমি কী ক'রে জানব।

—তুমি কথা দিয়েছিলে চুপচাপ থাকবে, এখন কমিউনিস্টদের গালিগালাজ ক'রে বেড়াচ্ছ।

—জল কখনো এক জায়গায় থেমে থাকে? কিছুই দুনিয়ায় এক জায়গায় থেমে থাকে না, কেবল চলে, কেবল চলে, আমিও চলছি। গালিগালাজের মত কাজ করলে গালিগালাজ করব না?

—যখন তেলেঙ্গানায় কমরেডরা লড়াইয়ের ময়দানে হাজারে হাজারে প্রাণ দিচ্ছে, তখন তারা গালিগালাজের মত কাজ করছে? যখন কাকদ্বীপের কৃষক কমরেডরা বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছে, তখন তারা গালিগালাজের মত কাজ করছে? যখন বন্দরায় জেলে কমরেডরা এক মাসের উপর অনশন ধর্মঘট করে চলেছে, তখন—

—তখন মহাবীর পাষাণ হ'য়ে গেছে।

—তার থেকেও খারাপ, পিশাচের অধম...

কথাটা কমলজী শেষ করার প্রয়োজনবোধ করলেন না। ক্ষণিক মহাবীরজীর মুখখানা বিবর্ণ পোড়াকাঠের মত দেখাল। কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

—তবে আমার কাছে এসেছ কেন?

—শেষ বারের মত বন্ধুকৃত্য করতে। তোমার উপর মারাত্মক বুর্জোয়াপ্রভাব পড়েছে, এই কথাটা বলতে এসেছি। সেটা ঝেড়ে ফেলে আগের মত হ'তে পার না?

—আমি যা আমি তাই। আমি আসলে দাঁড়কাক, আমার ময়ূরপুচ্ছ এতদিনে খ'সে পড়েছে।

এই কথা বলে মহাবীরজী মৃদু হাসলেন। সেই হাসি দেখে জ্বলে উঠে কমলজী বলে উঠলেন—তুমি মরো, মরো, মরো। আমি চললাম।

—আচ্ছা মরব। একটু দাঁড়াও। তোমার গানের একটা ছোট্ট বই ছেপেছ, কমল? আমি খুশি। একটা গানের সুর দিয়েছি আমি, শুনে যাও :

নাহি ধনী, নাহি নির্ধনিয়াঁ, কালা পানৈয়ব ন রহা
যা হাথিয়ার বাঁস পত্তর কে পিছড়েঁ রহে গুনী,
রোজৈ শের বাঘ ভালুক স বাগড়াঁ রহতি ঠনী : কালা...
বিনা গিরোহ কাম ন বনিহৈঁ সবকৈ মনহি ঠনী,
য়হী রিবাজ কুতুম্ব ভাইয়াঁ পহলে পহল রনী। কালা...
নাও মকান বগীচে কথা থা কোই ন কহী ধনী,
ইনহে ন চীজ মানতা কোই থা অপনী অপনী। কালা...
রাজা রহে ন হুকুমত পিছে সভী বনী,
'কোমল' তব তক থী বুড়বন কৈ ভাই খুব থাক বনী,
কালা পানৈ য়ব ন রহা।

মহাবীরজী তন্ময় হ'য়ে গাইছিলেন। গান শেষে বন্ধুর দিকে তাকালেন সপ্রশংস দৃষ্টিলাভের আশায়। কিন্তু বন্ধুর মুখ কালো থমথমে।

—তুমি কার্যত যা করছ, তাতে আমার এ গানের অপমান করছ, এই ব'লে বেদনাতুর বিরসবদনে কমলজী চলে গেলেন।

ছাব্বিশ

নারীর রক্তে রাজপথ ভেসে গেলেও যে পুরুষের রক্তে পৌরুষের উম্মাদনা জাগে না সে কেমন পুরুষ।

সেই রক্ত যখন সহসা মহাবীরজীর স্বভাবজাত পৌরুষে এসে ধাক্কা দিল, তখন তাঁর এতদিনকার রাজনৈতিক মূল্যায়ন, শৃঙ্খলাবোধ, সংযমের বাঁধ এবং অধুনাপ্রাপ্ত বিরাট দায়িত্ব সবই কূলপ্লাবী আবেগের স্রোতে প্রায় ভেসে যেতে বসেছিল।

সেদিনের তারিখটা ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৯। স্থান কলকাতার বহুবাজার স্ট্রীট। বিনা প্ররোচনায় চলে পুলিশের গুলি মহিলা মিছিলের উপর। মারা যান লতিকা-প্রতিভা-অমিয়া-গীতা। ঘটনাক্রমে ফ্ল্যাটের একটি পরিবারের অনুরোধে মহাবীরজী ফুল কিনতে এসেছিলেন বৌবাজারে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। ফুলের দোকানগুলি বন্ধ, রাস্তায় চাপ-চাপ রক্ত। রাস্তা প্রায় জনশূন্য। একটু আগে কী তাণ্ডব ঘটেছে এখানে? ধীরে ধীরে মহাবীরজী এগিয়ে গেলেন মেডিক্যাল কলেজের দিকে, ধীরে ধীরে মানুষজনের মুখ থেকে ব্যাপারটা অবগত হ'লেন। মুহূর্তের তরে ভয়ার্ত পরিচিত একজন দৌড়ে এসে তাঁকে বললেন—পালান। পালান। পুলিশ যাকে পাচ্ছে গ্রেপ্তার করছে, গোয়েন্দা ঘুরছে চতুর্দিকে।

হুঁশিয়ারি দিয়ে ভদ্রলোক দিলেন লম্বা ছুট। মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে ঢুকতেই মহাবীরজীকে দেখে এক ছাত্র-কমরেড ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে চ'লে গেল। লোকমুখে মহাবীরজী শুনলেন—লতিকা সেন নামক এক মহিলা গুলি খেয়ে মরেছে। তাঁর বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। ইনি নিশ্চয় সেই লতিকা সেন যিনি অনেক সময় অনেকবার তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন স্বহস্তে প্রস্তুত গরম চায়ের কাপ! সেই লতিকা সেন যিনি বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মহিলা সদস্যা। সেই লতিকা সেন যিনি কমরেড রণেন সেনের জীবনসঙ্গিনী। বাংলার রূপকার ডাক্তারী করে মানুষ বাঁচান, আর রাজনীতি করে নারীর রক্তে হোলি খেলেন।

ইদানীংকালে প্রকাশিত সেই দিনের মর্মান্তিক ঘটনাসম্বলিত একটি পত্র (২রা জুন, ২০০৪, গণশক্তি) পরিপূর্ণ উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে :

"গত ২৭শে এপ্রিল শহীদ দিবস উপলক্ষে গণশক্তি পত্রিকায় দু'টি উত্তর সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। একটি রচনায় ১৯৪৯ সালের ২৭শে এপ্রিলের ঘটনাবলীর বর্ণনায় প্রত্য-দর্শী হিসাবে দু'জনের উল্লেখ রয়েছে। প্রথমজন মহিলানেত্রী প্রভা চ্যাটার্জি এবং অপর[illegible] শিক্ষা আন্দোলনের নেত্রী অনিলা দেবী। সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এঁরা দু'জনেই উল্লেখ করেছেন—রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের সংগঠিত মিছিলটির উপর পুলিশের নির্বিচার গুলি বর্ষণে চারজন মহিলা গুলিবিদ্ধ হ'য়ে মারা যান। এই চারজন শহীদ হ'লেন লতিকা সেন, প্রতিভা গাঙ্গুলি, অমিয়া দত্ত এবং গীতা সরকার। পঞ্চমজন আমি, মৃণালিনী দেব, সেদিন গুলি খাওয়ার পরেও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই ক'রে বেঁচে গিয়েছিলাম। চিকিৎসার জন্য তিনমাস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। 'দি নেশন' সহ বিভিন্ন কাগজে আমার ছবিও বের হয়েছিল। পরবর্তীকালে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সৌজন্যে পাঁচজনের ছবিসহ একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়।

"আমার জন্ম অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে। এই নয়াপাড়াতেই জন্ম হয়েছিল কবি নবীন সেন এবং স্বাধীনতা-যোদ্ধা সূর্য সেনের। আমার বাবাও ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাই রাজনৈতিক মতাদর্শের উপস্থিতি গোড়া থেকেই আমার মধ্যে ছিল। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি কারমাইকেল হস্‌পিটালে (বর্তমান আর জি কর) নার্সিং প্রশিক্ষণ নিতে ভর্তি হই। শহীদ গীতা সরকারের সঙ্গে আমি 'ডিউটি' করতাম। রাজনৈতিক মতাদর্শেও আমরা সমমনস্ক। তাই নৈকট্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়নি। ১৯৪৯ সালেই নিবর্তনমূলক আইনে আটক রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি একটি সভার আয়োজন করে ভারতসভা হলে। আমি ও গীতাদি ও অন্যান্যরা সমাবেশে যোগ দিই। বক্তব্যের শেষে শুরু মিছিল। শুরু শ্লোগান। শুরু শ্লোগান তুলে সামনে, আরো সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা।

"বৌবাজার-কলেজ স্ট্রীটের সংযোগস্থলে শ্লোগানমুখর মিছিলটি বাধা পেল সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর কাছে। প্রথম সারির কয়েকজন পুলিশবেষ্টনী ভেদ ক'রে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলেন। তারপরই শুরু হ'ল নির্বিচার গুলি বর্ষণ। আমার গুলি লেগেছিল কোমরের নীচে। যন্ত্রণাবিদ্ধ আমি তখন প'ড়ে আছি রাস্তার মাঝখানে, প্রায় জনহীন পথের মাঝে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। যন্ত্রণার আড়াল থেকে দেখছি, অনুভব করছি দু'জন মানুষ রক্তে ভেসে যাওয়া আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন একটি ঘরের দিকে। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা আমাকে নিয়ে গেলেন একটি গীর্জাতে। সেখানে দু'টি ইনজেকশন দেওয়া হ'ল। গুলি লাগার পরেও আমি সংজ্ঞাহীন হইনি। কিছুক্ষণ পরে অমিয়াদি ও আমাকে অ্যাম্বুলেন্সে ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'ল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। পাশের স্ট্রেচারে দেখলাম অমিয়াদি জ্ঞান হারা। তাঁর মাথায় গুলি লেগেছে। তাঁর মাথা থেকে কী সব বের হচ্ছে! দেখেই মনে হলো, তিনি আর জীবিত নেই।

"মেডিক্যাল কলেজে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমার জ্ঞান ছিল। পরে আর কিছু মনে নেই। অপারেশনের পরেও বাঁচার আশা প্রায় ছিলই না। হাসপাতালের চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মীদের চেষ্টায় বেঁচে উঠলাম। আমার দিদি সে সময় নার্সদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যাও ছিলেন। তিন মাস পরে ছুটি পেলেও সম্পূর্ণ সুস্থ হলাম না। বারে বারে আউটডোরে যেতে হতো। তৎকালীন ক্যাম্পবেল হাসপাতালে আরো দু'বার অপারেশনও হয়।

"এ-রকম চড়াই-উৎরাই পার হ'য়ে ১৯৫৭ সালে পাতিপুকুর বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করি। ১৯৭১ সালের কংগ্রেসের অত্যাচারে সময় এ বি টি এ করার 'অপরাধে' স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হয়। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ১৯৭৮ সালে কাজে পুনর্বহাল হই। ১৯৯৩ সালে অবসর গ্রহণ করি।

দীর্ঘ এই পত্রকে আর দীর্ঘতর করব না আমি শুধু একটিমাত্র কথা জানাতে চাই— প্রতি বছর গণশক্তিতে ১৯৪৯ সালের ২৭শে এপ্রিল স্মরণে যেসব রচনা প্রকাশিত হয় তা পূর্ণ বিবরণে সমৃদ্ধ নয়। সেদিন যাঁরা গুলিবিদ্ধ হননি, অথবা গুলি খেয়েও কোনো

রকমে বেঁচে গেছেন বা অন্যভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, তাঁদের অনুল্লেখ আসলে রচনাগুলিকে পরিপূর্ণতা দেয় না। সেদিনের অমর শহীদদের কথা তো থাকবেই। সেই সঙ্গে বলা যেতে পারে তাঁদের কথাও যাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গেছেন।

মৃণালিনী নাগদেব, মিলন পার্ক,
বিধানপল্লী, মধ্যমগ্রাম,
উত্তর চব্বিশ পরগনা।"

লোকচক্ষুর অন্তরালে যাঁরা ছিলেন, কোনো গবেষকই কোনোকালে তাঁদের তালিকায় মহাবীর প্রসাদ সিংয়ের নাম নক্ষত্র খুঁজে পাবেন না। তবু এ-ব্যাপারে তাঁর নেপথ্যের কাহিনী অনুল্লেখ থাকলে বোধ হয় সেদিনের সেই মহা ট্র্যাজেডির ভয়ঙ্কর চিত্র অপূর্ণ থেকে যাবে।

মাত্র কিছুকাল আগে অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু কমলজী তাঁকে শুনিয়েছিলেন ভারতের নানা জায়গার কমরেডদের প্রাণপণ সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, মৃত্যুবরণের কত না কাহিনী। কিন্তু তাতে শ্রোতার মন টলানো যায়নি। কিন্তু আজ প্রত্যক্ষভাবে চোখের সামনে যখন দেখলেন চাপ-চাপ রক্ত এবং শুনলেন সে-রক্ত অবলা সরলা নারীদের, এবং যে নারীরা এসেছিলেন শুধু তাঁদের আত্মীয় পরিজনের মুক্তির অতি সরল স্বাভাবিক দাবি নিয়ে, আর সেই সঙ্গে যখন দেখলেন চতুর্দিকের মানুষের ভয়বিহ্বল মুখচ্ছবির পাশাপাশি ক্রোধের অভিব্যক্তি, তখন তাঁর এত দিনকার চাপা আবেগ মনের অন্তঃস্থল থেকে সহসা ছাড়া পেয়ে বলে উঠল—চুলোয় যাক সংযম নামক গুরুমশায়ের অনুশাসন, চুলোয় যাক রাজনৈতিক মতভেদ, চুলোয় যাক বর্তমানের যাবতীয় নতুন গুরু দায়দায়িত্ব, চুলোয় যাক বাঁচামরার ভেদ রেখা। তাঁর লালবাজারের অতিভক্ত অতি বোকা অতি স্বল্পবুদ্ধি প্রিয় শিষ্যদের কি বুঝিয়ে বলা যাবে না—তোমাদের বন্দুক ঘুরিয়ে ধরো?

টগবগ ক'রে ফুটছে রক্ত, টনটন করছে বুকে অজানা ব্যথা, জ্বালা ধ'রেছে সর্বাঙ্গে। মহাবীরজী অকারণে পায়চারী করলেন রাস্তায় রাস্তায়। উন্মত্ত না হ'লেও প্রায় মত্ত অবস্থা। কখনো এমন হয়নি আগে। এক সময় মন ব'লে উঠল—শান্ত হও, নিজেকে হারিয়ে ফেলো না। রাত ক'রে ফিরলেন ঘরে।

সেখানে উপবিষ্ট কমলজীর চেহারা দেখে তাঁর মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হ'ল—আমি কি ভূত দেখছি?

—হ্যাঁ, আমি ভূত। তুমিই আমাকে ভূত বানিয়েছে। তোমার বেইমানির বিষে আমার অন্তর জ্বরজ্বর। যে আমাকে দেখছে সেই আঁতকে উঠছে। বলছে তোমার কী অসুখ? কী জবাব দেব?

মহাবীরজী থ। এতদিনের মনের গতি অন্য দিকে ঘুরে গেল। দেখা দিল ক্রোধের বদলে করুণা, বিক্ষোভের বদলে প্রেম।

—পৃথিবীতে কা'কে বিশ্বাস করব, মহাবীর, বলতে পারো?

—আমি তো বলেইছিলাম আমার আশা ছেড়ে দাও, বলিনি?

—তা বললে তো হয় না মহাবীর, বাল্যবন্ধু তুমি, চিরকাল একসাথে এক পথে এক

মতে চলেছি। হঠাৎ এ কী হ'ল। তুমি না ছিলে পরদুঃখে কাতর, ছিলে সৎ, সত্যবাদী, স্বার্থহীন। সেই তুমি এমন বদলে গেলে রাতারাতি মতভেদের কারণে! আমার পাঁজরের হাড়গুলো কি লোহা দিয়ে তৈরি যে আস্ত থাকবে!

—আমি এতটা ভাবিনি, বুঝিনি কমল, বিশ্বাস করো। আমার জন্যে তুমি শুকিয়ে আধখানা হ'য়ে গেলে। আশ্চর্য!

—মহাবীর, হয় তুমি আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলো, না হয় তোমার বাহুবল দাও আমাকে, আমি তোমাকে খতম করি।

কমলজীর ভাবাবেগ অন্যপথে ঘুরানোর জন্যে মহাবীরজী বললেন, আজকের ঘটনার কথা শুনেছ?

তাতে হিতে বিপরীত হ'ল, কমলজীর ক্রোধের আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—শুনেছি বলেই তো আজ হেস্তনেস্ত করতে ছুটে এসেছি। একা এত ভার বইতে পারছি না...

কমলজী সহসা থেমে গিয়ে হাতের ইশারায় মহাবীরজীর দৃষ্টি দরজার দিকে আকর্ষণ করলেন। এক সাহেব দরজার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে।

ব্যাপারটা বুঝে মহাবীরজী বাইরে এলেন। ফিসফিস ক'রে সাহেবের সঙ্গে কথা বললেন। সাহেব অতঃপর প্রশ্ন করলেন—ওখানে কমলজী না? দেখলে হঠাৎ চেনাই যায় না। গুরুতর অসুখ করেছে?

সব শুনে সাহেব ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত গম্ভীর হলেন। মহাবীরজীর মুখেও রা নেই।

অবশেষে সাহেব মৃদু হেসে বললেন, এ যে রীতিমত নাটক। দিন একটু খৈনী দিন।

—আমি ছেড়ে দিয়েছি।

—আমি সিগারেট ধরেছি। ধীরে সুস্থে পকেট থেকে সিগারেট বের ক'রে সাহেব আবার সেটা যথাস্থানে রেখে দিলেন।

—কী হ'ল, দেশলাই নেই? আমি আনছি।

—না, নারী শহীদদের সম্মানে আপাতত সিগারেট খাওয়া কিছুকাল বন্ধ থাক। শুনুন, আমার মনে হয়, কমলজীকে সব কথা বলা যায়। বন্ধুর হঠাৎ কমিউনিস্ট বিরোধী হ'য়ে যাওয়ায় যে মানুষ শুকিয়ে আধখানা হ'য়ে যেতে পারে, তাকে সব ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায়। প্রাণ গেলেও সে বিশ্বাসভঙ্গ করবে না। এই আমার ধারণা। তবু আপনি আমার সঙ্গে উপরে আসুন, কর্তারা কী বলেন দেখি।

একটু পরে মহাবীরজী নীচে নেমে এলেন এবং কমলজীর মানভঞ্জনের ব্যবস্থা করলেন।

সব শুনে কমলজীর চোখে নামল অশ্রুধারা, ধরা গলায় বললেন, কা'রা কা'রা এখানে আছেন?

—অনেক জ্বালিয়েছ, এবার স'রে পড়ো।

তবু নাছোড়বান্দার প্রশ্ন—বি-টি রণদীভে ই-এম-এস নাম্বুদিরিপাদ, রাজেশ্বর রাও...তাই না?

—থামো, দেয়ালের কান আছে। তুমি ভিতরে ভিতরে একদম ছেলে মানুষ, এই ব'লে কমলজীকে একটা হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর টানতে টানতে নিয়ে গেলেন আঙিনার দিকে। কমলজী বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে দেখলেন একটা খোলামেলা ছাউনির নীচে কয়েকটি বিরাটবপু দুধেলা গাই, একটি প্রৌঢ়া মহিলা দুগ্ধ দোহনে ঘর্মাক্ত কলেবর। তার দু'হাঁটুর মধ্যেকার বালতিটি সফেন দুগ্ধে প্রায় পরিপূর্ণ।

পাশের রান্নাঘরটির মধ্যে বন্ধুকে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, এই টিনগুলোর মধ্যে কী আছে?

—ঘি'য়ের গন্ধ পাচ্ছি।

তারপর বন্ধুকে ঘরে নিয়ে গিয়ে মহাবীরজী বললেন, এই খাতাগুলো একটু দেখবে? আমার ব্যবসার হিসাবপত্র লেখা আছে। দেখে যাও মহাবীর ইচ্ছে করলে ভালো ব্যবসায়ী হ'তে পারে।

—সব বুঝেছি, এই সবের আড়ালে তুমি নেতাদের জন্যে একটা দুর্গ বানিয়েছ। তোমার দুর্গ যাতে অক্ষত থাকে, সে-জন্য আমি এরপর আর এখানে আসব না। বরং বেশি বেশি রটিয়ে দেব মহাবীরপ্রসাদ সিং জেল যাওয়ার ভয়ে কমিউনিস্টদের বাপান্ত করছে। লোকে আমার কথা সহজেই বিশ্বাস করবে।

—হ্যাঁ। আমার মুণ্ডুপাত করতে লেগে যাও। দয়া ক'রে বিদায় হও, আর শরীরের দিকে নজর দাও।

এবার কমলজী মুচকি হেসে বিদায় নিলেন।

রাত গভীর হল। ক্লান্তি এবং অবসাদে যখন শক্তিমান দেহটি ঘুমের কোলের আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে তন্দ্রাভিভূত, সেই সময় উপর থেকে তলব এলো।

একটু আগে উপরের দপ্তরে এসে পৌঁছেছিল তেলেঙ্গানা থেকে কিছু রত্নসামগ্রী। মহাবীরজী ডালাখোলা সুটকেশে দেখলেন অলঙ্কারাদি ছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু সোনার মূর্তি, এমন কি দেব-দেবীর মূর্তি। সবই প্রায় শিল্পবস্তু গোত্রের।

ওঁর জানালেন, তেলেঙ্গানার ওদের তর সইছে না। তাঁরা চাইছেন এ-গুলি গলিয়ে সোনা বিক্রি ক'রে অবিলম্বে টাকায় পরিণত করতে। সে-টাকায় কী প্রয়োজন সিদ্ধ হবে, সেটা অবশ্য গোপনীয়।

তবু মহাবীরজী আন্দাজে বুঝলেন। নেতারা জানতেন, মহাবীরজীর সঙ্গে বণিক-পরিবারের জুয়েলারী সপের সংযোগ আছে, যদিও তাঁরা আক্রাম বিক্রমের কথা জানতেন না।

এইসব সুন্দর সুন্দর মূর্তিগুলির কী হবে? ভাবতেই কেন জানি মহাবীরজীর বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল। সে-ভাব প্রকাশ না ক'রে মহাবীরজী নেতাদের সতর্ক ক'রে দিয়ে বললেন, আমাকে দিয়ে এ-কাজ করালে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না?

ওঁরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। একজন নরম সুরে বললেন, আপনাকে অনর্থক 'ট্রাবল' দিলাম। আপনি আসুন।

মহাবীরজী হাঁফ ছেড়ে বাঁচালেন। সহজে ঘুম এলো না। ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলেন

কানের কাছে কে যেন বলছে—সোনা গলিয়ে চাই ফায়ার আর্মস। কেননা এই সোনার গায়ে রক্ত।

রক্তের স্রোত বইতে লাগল মহাবীরজীর দুঃস্বপ্নে।

সাতাশ

প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও কালক্রমে যখন পার্টির লাইন পরিবর্তিত হল, তখন দুঃস্বপ্নের শেষে মহাবীরজীর তো যথেষ্ট স্বস্তি হওয়ার কথা। কিন্তু একটা ব্যাপারে তা হ'ল না এবং সে-ব্যাপারটা অদ্ভুত। বাইরের কারো তা চোখে পড়ার মত ঘটনাও নয়।

পরিবর্তিত অবস্থায় মহাবীরজীর কাছে ঘি এবং দুধের ব্যবসার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। দুধেলা গাভী তিনটি গ্রামের বাড়িতে স্থানান্তরিত হল। আর সেটাই মহাবীরজীর মনে সাময়িকভাবে নিয়ে এল মহা শূন্যতা।

—গরু তিনটে বিদেয় করার দুঃখটা তুমি বুঝবে না কমল।

—বুঝিয়ে বলো তা'হলে।

—সে বুঝানো যাবে না, কৃষক-পরিবারে জন্মালে হয়ত বুঝতে, কিন্তু তুমি হ'লে শিক্ষক-পরিবারের লোক।

—তবু ব'লেই দেখো না।

—আমিই কি আগে বুঝেছিলাম কমল? ঐ যে তিনটে গাই গরু, ওরা যখন বাছুর ছিল, তখন থেকেই আমার সঙ্গে ওদের পরিচয়। আমি ওদের জন্যে ঘাস কেটে আনতাম, নিজের হাতে খাওয়াতাম। আমাদের বাড়ির অন্যান্য গরুর চেয়ে ওদের সঙ্গে আমার ভাব ছিল বেশি। চোখের সামনে ওরা বড় হ'তে শুরু করল, ওদের ফেলে কলকাতায় চ'লে আসতে আমার কষ্ট হয়েছিল। ছুটিতে বাড়ি ফিরে ওদের কাছে গেলে ওদের সে কী চোখের চাউনি। ওদের যখন কলকাতায় নিয়ে এলাম, তখন ওদের কাছাকাছি পেয়ে মনে হত আমি দেশের বাড়িতেই আছি।

মহাবীরজী একটু থামলেন, উদগত অশ্রু মুছলেন, তারপর ভারী গলায় বললেন, কমল, তুমি তো ওদের চাউনিটা একবার দেখেছিলে, তাই না? আমি কখনো একটু বেশি রাতে বাড়ি ফিরে ঘরে আলো জ্বাললেই ওরা বুঝতে পারত। নানা রকমের শব্দ ক'রে জানান দিত। আমি জামা খুলেই ওদের কাছে গিয়ে অপার আনন্দ পেতাম। আমাকে দেখে কী খুশিই না হ'ত। তিনজনই একসঙ্গে গলা বাড়িয়ে দিত, জিভ দিয়ে আমাকে স্পর্শ করত। ওদের গলা চুলকে দিলে আরামে চোখ বুঁজত। আমি বিচালি কাটতে ব'সে যেতাম। জাবনা মাখতাম। জাবনার গামলায় মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ তুলে আমার দিকে কৃতজ্ঞতাভরে তাকাত। কে বলবে ওরা অবোলা জীব। আমি শোওয়ার আগে ওরা শুতো না। আমি ঘুমাতাম, ওরাও ঘুমোত। ওদের পাঠিয়ে দেওয়ার পর রাতে ঘরে ফিরলে আমার মনে কী যে শূন্যতা বোধ করি কমল। কতদিন হয়ে গেল তবু এই শূন্যতা গেল না। এখন আর এ বাড়িতে আমার জন্যে কেউ অপেক্ষা ক'রে থাকে না। ঘর থেকে ওদের জাবর

কাটার শব্দ শুনতে পাই না, গভীর রাতে ওদের দীর্ঘশ্বাস কানে আসে না, ওদের গায়ের গন্ধ না পেয়ে মনটা হাহাকার করে ওঠে। ওদের অভাবে ঘরটাকে শ্মশান ব'লে বোধ হয়।

কমলজী বন্ধুকে বৃথা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন না, বরং আগের চেয়ে আরো বেশি উপলব্ধি করলেন বন্ধুর কৃষক-আন্দোলনের জন্য দেশে প্রত্যাবর্তনের বাসনার গভীর উৎস কোথায়।

মহাবীরজী শূন্যতা পূরণের জন্য আগেকার কাজকর্ম নতুন উদ্যমে শুরু করলেন। সেখানে ভাঙা জোড়া দেওয়ার কাজে মহাবীরজীকে পেয়ে সহকর্মীরা আনন্দিত।

কিন্তু কোনো কিছুতেই মহাবীরজীর মন ভরছে না আগের মত। আরো কী যেন চাই, আরো কী যেন করতে হবে।

এও এক ধরনের নতুন উপলব্ধি। ইতিপূর্বে যে ঝড় বয়ে গেছে, ঘটনাক্রমে উপর স্তরের নেতাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ যত সমস্যা সংঘাতের কথা শুনতে হয়েছে, তাতে আগেকার জীবনে, আগেকার চেতনা, আগেকার কর্মে আগের মত ফিরে যাওয়া অসম্ভব। একটা উত্তরণ চাই। কী সে বস্তু? কেমন ক'রে তা সম্ভব? সারাদিনের কর্মশেষে প্রত্যহ নিদ্রার আগে মহাবীরজীকে রাত জেগে নিজের মুখোমুখি হ'তে হল।

হ্যাঁ, এখন আর সরলরেখায় কোনো কিছুর যোগাযোগেই মন ভরছে না। একটা সর্বাঙ্গীণ কিছু চাই। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, তাত্ত্বিক...মনে পড়ল, রাজনৈতিক জীবনের সূচনায় হাতে এসেছিল লেনিনের 'কী করিতে হইবে'। সর্বাগ্রে সেই বইখানার কথাই মনে পড়ছে। যা ছিল তখন আলোছায়া, তাই এখন স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সব কাজকেই একসূত্রে বাঁধার জন্য চাই একটি সংবাদপত্র। নতুন ক'রে কমরেডরা দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকা পুনঃপ্রকাশ শুরু ক'রে দিয়েছেন, কিন্তু যে হিন্দী ভাষাভাষীরা মহাবীরজীর কর্মস্থলের কেন্দ্রে, তাঁদের জন্যে পার্টির বার্তা বহনের মত তো নেই কোনোই পত্রিকা—এমন কি একখানা সাপ্তাহিকীও নেই। এ কেমন কথা?

আচ্ছা, কিছুকাল আগে যে-সব নেতার আশ্রয়দাতা সাজতে হয়েছিল, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করলে কেমন হয়? তাঁরা তো একই মতের একই পথের পথিক। তাঁর চিন্তাকে উট্‌কো ব'লে ওঁরা উড়িয়ে দেবেন না নিশ্চয়।

একটু টোকা দিতেই চৈতন্যের তারগুলি একই সুরে বেজে উঠল। বাস্তবের কঠিন ধাক্কা খেয়ে তাঁরাও শক্ত মাটির উপর পা ফেলে চলতে চাইছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে অনেক কথাই জানা গেল। বহু যুগব্যাপী পার্টি-পত্রিকা প্রকাশের সংগ্রাম-কাহিনী। সেইসব সাপ্তাহিক পত্রিকার কঠিন ধারাবাহিকতার পথ ধরেই দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকায় উত্তরণ।

মহাবীরজী সকর্ণে সহর্ষে শুনলেন নেতাদের আত্মসমালোচনা : অনেক আগেই আমাদের যে কথা ভাবা উচিত ছিল, যে-কাজ করা উচিত ছিল, সেই দায়িত্বই আপনি স্মরণ করিয়ে দিলেন কমরেড। এখানে সব চেয়ে বড় যে শিল্প, সেই চটশিল্পের বেশিরভাগ শ্রমিকই তো হিন্দীভাষী এবং আমরা তো এই শ্রমিকশ্রেণীরই পার্টি। যে বাহাদুর ট্রাম

শ্রমিকদের নিয়ে আমরা গর্ব করি, তাঁদেরও মেজরিটি হিন্দীভাষী, তাঁদের সার্বিক চেতনাবৃদ্ধির সব চেয়ে বড় হাতিয়ারই আমরা তৈরী করতে চেষ্টা করিনি। গোটা শ্রমিকদের একটা বড় অংশই হিন্দীভাষী, আমরা নিজেদের শ্রেণীর মধ্যে একটা হিন্দী পত্রিকা ছাড়া দৃঢ় অবস্থান কী ক'রে সৃষ্টি করব?

মহাবীরজী এতটা আশা করেননি। তাঁর মনে নতুন উৎসাহ সঞ্চার হ'ল। তিনি লক্ষ্য করলেন দৈনিক 'স্বাধীনতা' অফিস থেকেই হিন্দী সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশের কাজ শুরু হয়ে গেছে। বাংলা ছাপাখানার একপাশে হিন্দী হরফে মুদ্রণের ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ। এ যেন না-চাহিতে করি দান। মহাবীরজী মনেপ্রাণে নতুন কাজে লেগে গেলেন। তাঁর প্রধান দুই সঙ্গী—ডাঃ মহাদেব সাহা এবং অযোধ্যাপ্রসাদ সিং। সম্পাদনায় প্রধান দায়িত্ব তাঁদের। অন্যান্য সব কাজের ভার পড়ল মহাবীরজীর শক্ত স্কন্ধে। একাধারে তিনি ম্যানেজার, প্রচার-সচিব, হিসাব-রক্ষক। অথচ আগেকার দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতেও তিনি লিপ্ত। সেই সঙ্গে স্বহস্তে 'খানা' পাকানো।

যখন তাঁর কাজের এই চরকীবাজী চলছে, সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। 'স্বাধীনতা'র একই ছাদের তলায় আমাদের কাজ করতে হত। তবে ওঁরা যেন আমাদের গরীব আত্মীয়। করিডরের সরু লম্বা একখানি টেবিলের দুদিকে দু'খানা চেয়ার। ওটাই ওঁদের পত্রিকার সম্পাদনার কার্যালয়। একখানা আস্ত ঘর ওঁদের জোটেনি। তবু কী কর্ম-ব্যস্ততা, সব সময় প্রায় উল্লাস। করার মত একটা কাজ পেয়ে প্রত্যেকেই যেন নতুন জীবনের আস্বাদ পাচ্ছেন।

মহাবীরজী একটা স্বাভাবিক অথচ আশ্চর্য কথা জানালেন—আজকাল শ্রমিক-আন্দোলনে যেখানেই যাই মনে হয় আমি ছাড়াও আমার সঙ্গে আর কে যেন আছে। সে আমাদের হিন্দী সাপ্তাহিকী। আমাদের হয়ে পত্রিকা সব সময় কথা বলছে। সব রকমের কথা।

কাগজের শনৈ শনৈ উন্নতি, প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধি, এবং ক্রমেই মানোন্নয়ন থেকে নব আশার উন্মেষ হ'ল—কবে আমাদের কাগজ দৈনিক কাগজে রূপান্তরিত হবে? দৈনিক 'স্বাধীনতা'র দপ্তরে কাজ করতে করতে হিন্দী পত্রিকারও দৈনিকে পরিণত করার চিন্তা স্বাভাবিক।

এক ঝড়ের রাত। মেঘডম্বরু, হাওয়ার গর্জন, বজ্র-বিদ্যুতের খেলা। ট্রেড্ল মেসিনে হিন্দী পত্রিকা ছাপার পর মহাবীরজীর বাড়ি চ'লে যাওয়ার কথা। কিন্তু ঝড়ে আটকে গেলেন। আর আমি একা নাইট-ডিউটিতে। রোটারী মেসিনে কাগজ ছাপার ফলে অনেক রাতে শেষ খবরটুকু সকালের পাঠকদের দ্বারে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত। এক সময় সেকাজও শেষ হ'ল। এবার দু'জনের অফিসের টেবিলের উপর কাগজ বিছিয়ে শোওয়ার পালা। কিন্তু সেদিকে আমাদের নজর নেই। ঝড়ের রাতে মুখোমুখি ব'সে যেন প্রাণের কথা বলার সময়। মহাবীরজী হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করলেন :

কমরেড, আমাদের এই কলকাতা শহরে চার-চারটে হিন্দী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় মধ্যবিত্তদের জন্য। আমার মনে হয়, শুধু বাংলা দৈনিক চালিয়ে শ্রমিকের পার্টি

যেন এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেদিন পাশাপাশি হিন্দী দৈনিক প্রকাশিত হবে, সেইদিন আমার মনে হয় শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি পুরো দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে। আপনার কী মনে হয়?

আমার কাছ থেকে কিছু শোনার অপেক্ষা না ক'রেই মহাবীরজী বললেন, যদি দৈনিক হিন্দী পত্রিকা প্রকাশিত হয়, আমি সেই কাগজটা নিয়েই থাকব, গ্রামে কৃষক আন্দোলনের জন্য ফিরে যাব না।

আটাশ

পার্টির ভুলভ্রান্তিতে যিনি অবিচলিত ছিলেন, তিনি পার্টির ভাগাভাগিটা মেনে নিতে ব্যর্থ হলেন। তাঁর পায়ের তলার জমিটা কেঁপে উঠল। দেশভাগের উদ্বাস্তুদের তিনি দেখেছেন, এবার ভাগাভাগিতে পার্টির মধ্যে নিজেকেই উদ্বাস্তু ব'লে উপলব্ধি করলেন, কেননা মতামতের বাদবিসম্বাদে তিনি কোনো পক্ষই অবলম্বন করতে পারলেন না। তাঁর হিন্দী-পত্রিকাটির বন্ধুদের টানে অবশ্য তিনি তাঁদের সঙ্গেই থেকে গেলেন, যদিও দৈনিক পত্রিকাটির মতই সাপ্তাহিক হিন্দী পত্রিকা আপাতত বন্ধ হয়ে গেল।

কিছুকাল পরে সেই নতুন পক্ষের সদ্য প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিকী পত্রিকার ম্যানেজারীর পদে তাঁকে ডেকে বসানো হ'ল। কিন্তু এতে তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা আগের মত পরিলক্ষিত হল না। কিছুকাল যেতে-না যেতেই মনের মধ্যে জেগে উঠল গ্রামে ফিরে গিয়ে কৃষক-আন্দোলন করার সুপ্ত বাসনা। মহাবীরজীর কুষ্ঠিতে মনমরা কাজের কথা লেখা নেই। যথেষ্ট টানাপোড়েনে তিনি মনস্থির করে ফেললেন।

এই সময়টা সমমনোভাবাপন্ন আমি এবং মহাবীরজী বিভেদনদীর দুই তীরে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলাম। খেয়াপারাপারের অবশ্য অভাব ছিল না।

শুনেছিলাম মহাবীরজীর গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা শুনে কিছু তরুণ ডাক্তার তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন—গাঁয়ে ফিরে গেলে তাজা শাক-সবজি আলোবাতাস পাবেন, আপনার এই বয়সে খুব দরকার। মহাবীরজীর কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধু তাতে রেগে গিয়ে জবাব দিয়েছিলেন—ছোকরা ডাক্তারবাবুরা নিজেরা গাঁয়ে যাক না, তা যাবে না, গাঁয়ে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে নারাজ, কিন্তু অন্যকে গায়ে প'ড়ে উপদেশ দিতে ওস্তাদ।

দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত বৃদ্ধ দপ্তরী রহমান সাহেব বোধ করি মহাবীরজীর নতুন সঙ্কল্পের কথা শুনে সব চেয়ে আহত হলেন। কাতর হয়ে অনুরোধ করলেন, মহাবীরজী, আপনারও তো কম বয়স হ'ল না, এই বয়সে আমাদের ছেড়ে নতুন ক'রে কিছু করতে যাবেন না, আপনার পায়ে ধরতে পারি।

—এমন কথা বলবেন না। এই বলে উল্টে মহাবীরজী বৃদ্ধের পায়ে নত হয়ে প্রণাম করলেন।

—শুনুন, আমার তো অনেক বয়েস হল, অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আপনার এই বয়সে নতুন জায়গায় গিয়ে একেবারে নতুন কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না, আমি ঠকেছি

বলেই বলছি। সারাজীবন যাদের মধ্যে কাটালেন, আচমকা তাদের ছেড়ে যাওয়া ঠিক নয়, মন খারাপ হ'য়ে যাবে, পস্তাবেন।

—জানি না, হয়ত প্রস্তাব। কিন্তু আমার মনে হয় কি জানেন রহমান সাহেব? সব বয়সেই মানুষের নতুন ক'রে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত। নইলে মরার আগেই মরা। দুনিয়া সারাক্ষণ নতুন হচ্ছে। আমদেরও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন হ'তে হবে। যা অনবরত নতুন হচ্ছে না তা আঁকড়ে থাকার মানে নেই।

—তা ব'লে একটু বুঝেসুঝে চলার দরকার নেই?

—সে তো হাজার বার, বুঝে সুঝেই তো যাচ্ছি।

মহাবীরজীকে কিছুতেই টলানো যাবে না বুঝে রহমান সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তখন মহাবীরজী তাঁর বাহুটি রহমান সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে হাসলেন—একবার টিপে দেখুন। মাস্‌লগুলো লোহার মত শক্ত আছে কিনা।

ফোলানো পেশীগুলিতে হাত দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ টিপে রহমান সাহেব মুচকী হাসলেন—সত্যি! আপনি জোয়ানদের চেয়েও জোয়ান। কিন্তু মনের পেশীগুলো?

—সে তো আর খুলে দেখানো যায় না, মহাবীরজী হো হো ক'রে হাসলেন।

রহমান সাহেব তবু ব'লে উঠলেন—আমার যে মন মানছে না।

মহাবীরজীর বিদায়-সংবর্ধনার কথা আমার কানে এসেছিল। দিনক্ষণও জেনেছিলাম। প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে সভায় যাইনি সাতপাঁচ ভেবে। সংবর্ধনার ছবি ফলাও ক'রে ছাপা হয়েছিল পার্টির ইংরেজী সাপ্তাহিকের শেষ পৃষ্ঠায়। দেখেছিলাম স্বয়ং জেনারেল সেক্রেটারী ই-এম-এস নাম্বুদিরিপাদ মহাবীরজীর গলায় মালা পরাচ্ছেন। শুনেছিলাম উপস্থিত কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। কী কাণ্ড। একজন দারোয়ানকে নিয়ে এত মাতামাতি।

এক নেতার কাছ থেকে অবশ্য তাঁরা ধমক খেয়েছিলেন—কমিউনিস্ট পার্টির কাজকামের কতটুকু খবর রাখেন? কমিউনিস্ট পার্টি এমনতরো শত শত অজ্ঞাত পরিচয় কমরেডদের স্বার্থত্যাগেই আজ বড় হয়ে উঠেছে।

কথাটা শুনে তরুণ কেউ কেউ পুলকিত চিত্তে ব'লে ওঠেন—এমন একজন সাধারণ কমরেডকে সোভিয়েতের দালালরা সম্মান জানাতে পারত?

প্রতিবাদ আসেনি।

পরদিন অতি ভোরে গিয়েছিলাম মহাবীরজীর ডেরায়।

এ কী! ঘরময় ফুল! রাশি রাশি পুষ্পস্তবক এবং নানা ধরনের ফুলমালা। ঘরে ঢোকার আগে এই দৃশ্য কল্পনাও করতে পারিনি। সংবর্ধনা যখন হচ্ছে তখন কিছু ফুলের আগমন অবশ্যম্ভাবী। তাই বলে এত ফুল।

আমি বললাম, আপনি কি ভেবেছিলেন মহাবীরজী এত ফুল পাবেন?

—এ্যাত্তাত নয়, ফুলটুল আমাকে দেবে, তাও ভাবিনি।

—তবেই দেখুন কত মানুষ আপনাকে ভালোবাসে! মালার গায়ে জড়ানো কাগজে দেখছি কত রকম ইউনিয়নের নাম। এত ইউনিয়নের সঙ্গে আপনি জড়িত ছিলেন?

—যাদের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না, তারাও দিয়েছে, কেন তো জানি না।

—তাদেরও প্রিয় ছিলেন।

—ফুলটুল ঘরে আনতে চাইনি। কিন্তু রহমান সাহেব নাছোড়বান্দা। ঘাড়ে ক'রে এইসব নিয়ে এসে ট্যাক্সি ভর্তি করলেন, আমার সঙ্গে এসে আবার ঘরে সাজিয়ে দিয়ে গেলেন। এ-সব কি আমার ঘরে মানায়? কে তাঁকে বুঝাবে?

—তিনি ঠিকই করেছেন।

—কিন্তু রাত্রে আমার ঘুমোনো মুস্কিল হয়েছে। ফুল তো কেউ কোনো দিন আমাকে দেয়নি, সারারাত ফুলের গন্ধে ঘুম হ'ল না।

আমি হেসে ফেললাম—ভাগ্যই আপনার খারাপ? আমার একটা বাংলা কবিতার কথা মনে হচ্ছে। তবে ঠিক বলতে পারব কিনা জানি না : একটি শিশু তার কাজলা দিদিকে হারিয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না দিদির মৃত্যু হয়েছে। কবি মেয়েটির মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন—

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ,
এমন দিনে মাগো আমার শোলকবলা কাজলা দিদি কই?
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না একলা জেগে রই।

আপনার হয়েছে ঐ বাচ্চাটার দশা। তার মত ফুলের গন্ধে আপনার ঘুম আসেনি এ যেমন ঠিক, তেমনি তার মত—ওর মতই নিজের প্রিয়জনদের হারানোর বেদনা আপনাকে জাগিয়ে রেখেছে। ঠিক বলিনি? ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে যায়নি কলকাতার এতদিনের বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার ব্যথা? যারা ফুল দিয়েছে তাদের আপনি হয়ত চিরতরে ছেড়ে যাচ্ছেন, এ কি কম কষ্ট।

—হ্যাঁ, আমিও তো মানুষ।

মহাবীরজী আরো কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ফুলের খবর পেয়ে ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা হাসি-হাসি মুখ নিয়ে হাজির হ'তে লাগলেন।

প্রথমে দর্শন দিলেন স্বর্ণকার সমিতির প্রেসিডেন্ট ছ'তলার বাসিন্দা বিশ্বেশ্বর বণিক। তিনি সবজান্তার ভাব নিয়ে বললেন, আমাকে বলতে হবে না, আমি বুঝেছি। আপনি চ'লে যাচ্ছেন শুনে আপনার আখড়ার লোকেরা ফুল দিয়ে গেছে। ঠিক বলিনি?

—একদম ঠিক! আশ্চর্য আপনার অনুমান ক্ষমতা।

নিজের তারিফ শুনে বিশ্বেশ্বরবাবু আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন—আপনি যাওয়ার দিন ব'লে যাবেন কিন্তু।

অতঃপর এলেন পাঁচতলার বিধবা মিসেস ফার্গুসন। তাঁর স্বামী কফিন নির্মাতা ছিলেন। সেইসঙ্গে ফুলও বেচতেন।

তিনি বললেন, আমরা মৃতকে অনেক ফুল পেতে দেখেছি, কিন্তু জীবিত কাউকে এত ফুল পেতে দেখেনি। কী ব্যাপার বলুন তো?

মহাবীরজী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—ইনি জানেন।

আমি নিরুপায় হয়ে বললাম—জানেন তো মহাবীরজী কুস্তিবীর, এই বয়সে লড়াই ক'রে কিস্তিমাৎ করেছেন। দেশ বিদেশের লোকেরা দেখতে এসেছিল, এবার বুঝেছেন?

—আই সি। তারাই এত ফ্লাওয়ার দিয়েছে। আপনি ধন্য। আমরাও আপনার সুখে সুখী। যাই, মার্কেটে যাই।

এইভাবে কিছুক্ষণ পুষ্প বিভ্রমের পর প্রায় নাচতে নাচতে এল ঝাঁকড়া চুল মাথায় বছর এগারোর গুজরাটি মেয়ে সুচেতা। লরেটোতে পড়ে, পীঠে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকেই বলল—আঙ্কল, হাও ওয়ারন্ডারফুল! মা-কে বলেছি, আঙ্কল ইস এ গ্রেট ম্যান। জানো আঙ্কল, আমি গল্পের এক বই পড়েছি তার নাম—গ্রেটম্যান ইন ডিজগাইজ। তারা লুকিয়ে থাকে বলে তাদের লোকে চেনে না। তুমিও ঠিক তাই আঙ্কল, আই অ্যাম সিয়োর। এসবই গিয়ে আমাদের ম্যাডামকে বলব। অনেকে তোমাকে দেখতে আসবে।

মেয়েটি নাচতে নাচতেই চ'লে গেল। এক সময় ভ্রান্তি বিলাসের শেষ হ'ল। লোকের আনাগোনা বন্ধ হ'ল। তখন মহাবীরজী এবং আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম।

মহাবীরজী রহমান সাহেবের অনুরোধের কথা না ব'লে থাকতে পারলেন না। এবং মন্তব্য করলেন, এই রকম কথা যদি পার্টির লোকেরা বলতে থাকত, তা'হলে কী যে হ'ত বলতে পারি না। কিন্তু কমরেডরা অনেক বেশি সচেতন।

আমি মনে মনে বললাম, একটু অচেতন হয়ে মহাবীরজীকে ধ'রে রাখার চেষ্টা হ'লে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত। হৃদয়াবেগ থাকা কি অন্যায়? আমার মধ্যে কাতরতা দেখা দিল। আমি বললাম—রহমান সাহেবের কথাগুলো কিন্তু ফেলে দেওয়ার মত নয়। আপনি দ্বিতীয়বার চিন্তা ক'রে দেখুন।

মহাবীরজী চিন্তিত মুখে বললেন—হয়ত আমার এই বয়েসের সিদ্ধান্ত ভুলও হ'তে পারে। কিন্তু বন্ধন ছিন্ন করতে না পারলে মুক্তি আসবে কোথেকে? যদি দেখতাম দলে দলে কমরেডরা গ্রামে যাচ্ছেন, তা'হলে আমার যাওয়ার হয়ত প্রয়োজন হ'ত না। আমি অনেক ভেবে দেখেছি সামান্য একজন মানুষ হ'য়ে গ্রামে গিয়ে যদি যৎসামান্য কিছু করতে পারি তা'লেও লেনিনের কথা জীবনে সার্থক হবে। ঐ যে তিনি বলেছেন শ্রমিক-কৃষক ঐক্যই বিপ্লবের মূল শক্তি। শহরে এখন শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার অনেক লোক পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু বিহারের গ্রামে, যেখানে জাতপাতের এত ভেদাভেদ, সেখানে সামান্য কিছু করতে পারলেই মনে করব আমি সাধ্যমত আমার কর্তব্য করেছি। আমার ছাপরা জেলায় এখনো কোনো কৃষক-সংগঠন নেই বললেই চ'লে।

এ-সব শোনার পর আমার মুখে অনুরোধের ভাষা বন্ধ হয়ে গেল। মহাবীরজী স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

হাওড়া স্টেশনে চোখে পড়ার মত লোকের আগমন ঘটেছিল। বেশিরভাগই কুস্তির আখড়ার নওজোয়ান সাগরেদ। ভীড় দেখে যাত্রীদের কেউ কেউ কৌতূহলবশত কোনো ভি-আই-পি যাচ্ছেন মনে করে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু ম্যানবরকে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠতে দেখে দ্রুত পা চালিয়ে দিল।

মহাবীরজী হাতের ইশারায় জানালার ধারে আমাকে ডাকলেন।

—কোনো দিন যদি আমাদের হিন্দী দৈনিক বের হয়, দেখবেন আমি ঠিক ফিরে আসব।

—যমুনাদি রাগ করবেন।

—তবু আবার ফিরে আসব।

ফেরার পথে কানে বাজতে লাগল আবার ফিরে আসব।

পুনর্মুদ্রণ : শারদীয় কালান্তর ১৪১১

PARICHAYA November'06–April '07. No. 13273 WB/EC—265
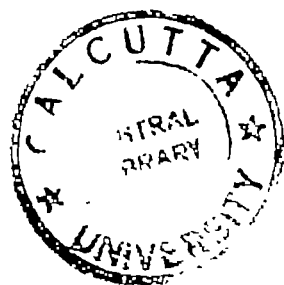
সম্পাদনা দপ্তর ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর ঃ ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭

রিচয়

দাম ঃ ষাট টাকা

পরিচয়

বাসব সরকার

ইঙ্গমার বার্গমান

মিকেলেঞ্জেলো আন্তোনিওনি

মৃগাঙ্ক রায়

পরিচয়

বৈশাখ-শ্রাবণ ১৪১৪
মে-আগস্ট ২০০৭
১০-১২ সংখ্যা ৭৬ বর্ষ

প্রবন্ধ

অনুবাদ কবিতা

গল্প

কবিতা গুচ্ছ

নাটক

পুস্তক পরিচয়

নাট্য সমালোচনা

স্মরণলেখ-১

স্মরণলেখ-২

প্রচ্ছদ
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক
অমিতাভ দাশগুপ্ত

যুগ্ম সম্পাদক
বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

কর্মাধ্যক্ষ
পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

সম্পাদকমণ্ডলী
কার্তিক লাহিড়ী
শুভ বসু অমিয় ধর

সম্পাদনা সহায়তা
অজয় চট্টোপাধ্যায়

দপ্তর সচিব
দুলাল ঘোষ

উপদেশকমণ্ডলী
রাম বসু সিদ্ধেশ্বর সেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় শঙ্খ ঘোষ

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯/এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

একটি বিষণ্ণ প্রতিবেদন

'পরিচয়ের অন্যতর যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক বাসব সরকার সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আটাত্তর। অধ্যাপক সরকার 'পরিচয়ের' দীর্ঘদিনের সঙ্গী, এর অগ্রগতির অন্যতম অংশীদার। 'পরিচয়ের' বিশেষ সংখ্যাগুলির পরিকল্পনায় তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। আমৃত্যু কমিউনিস্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই কৃতি অধ্যাপক পত্রিকা-পরিচালনার ব্যাপারে পরিচয়ের চিরকালীন উদার ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছেন, কোনোরকম গোঁড়ামিকে নয়।

পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি, সংসদের মুখপত্র 'আন্তর্জাতিক' পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন বেশ কিছুদিন। সর্বভারতীয় শান্তি ও মৈত্রী সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বেশ কিছু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। অধ্যাপনায় তাঁর কৃতিত্বের জন্য জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৭-এর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁকে তাঁর বিষয়ে একজন 'বিশিষ্ট শিক্ষক' হিসেবে সম্মানিত করা হয়।

'পরিচয়' তাঁর বই দীর্ঘদিনের সহযাত্রীকে হারিয়ে বিষণ্ণ বোধ করছে। এর ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল তা সহজে দূর হবার নয়।

সম্পাদক মণ্ডলী

এবারের বঙ্কিম পুরস্কার

এবারের বঙ্কিম পুরস্কার পেলেন স্বপ্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও রামকুমার মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে তাঁদের 'সহিস' এবং 'দুখে কেওড়া' উপন্যাসের জন্য। দুজনকেই অভিনন্দন। স্বপ্নেশ্বরের গল্প লেখার সূচনা পরিচয়ের পৃষ্ঠাতেই, রামকুমারও পরিচয়ে একাধিকবার লিখেছেন। এই দুই লেখকই মূল বাণিজ্যিক ধারার বাইরে বিচরণ করেন, তাঁদের সেরা লেখাগুলি অনায়াসে ছোটো বা অ-বাণিজ্যিক পত্রিকায় দিয়ে দেন কিন্তু তা তাদের স্বীকৃতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। বোঝাই যায় যে, এখন পুরস্কারের ক্ষেত্রে লেখক বা লেখাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পত্রিকাকে বা প্রকাশককে নয়।

ইলা চন্দ স্মৃতি পুরস্কার

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর ১১৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এবারের ইলা চন্দ স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তরুণ কথাসাহিত্যিক অনিল ঘোষকে। অনিল 'পরিচয়'-এর দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ ও নিয়মিত লেখক। তাঁর এই সম্মানে 'পরিচয়' আনন্দিত।

প্রসঙ্গত তেতাল্লিশের আবেদিন এবং তারপর

মতলুব আলী

১.

বিষয়টি খুবই চমকপ্রদ এবং একই সঙ্গে সবিশেষ গুরুত্ববাহী যে বিগত শতাব্দীর ত্রিশ-চল্লিশের দশকে ব্রিটিশ যুগের ভারতীয় শিল্পকলাঙ্গনে আবেদিনের মতো একজন অগ্রগামী চিত্রশিল্পীর সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছিলাম, যাঁর আগমন ঘটেছিলো তৎকালীন পূর্ববঙ্গের এক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবার থেকে—যে মুসলিম সমাজ-পরিবেশ খুব স্বাভাবিক কারণেই চারুশিল্প বিকাশের অনুকূল ছিলো না।

জয়নুল আবেদিন ও তাঁর শিল্প-কর্মকাণ্ড যে ক্ষেত্রে আমার বর্তমান উপজীব্য-বিষয়, তখন গোড়াতেই এরকম একটি হোঁচট খাওয়ার মতো দশাসই বাক্যের ব্যাখ্যাত দিকটি আপতদৃষ্টিতে নেতিবাচক ও অপ্রতিষ্ঠ মনে হতে পারে। তথাপি এই রচনায় এর উত্থাপন অনিবার্য যে আবেদিনের উত্থান তথা তাঁর বিকাশ-উত্তরণ কতোটা সামগ্রিক অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ এবং সংগ্রামিক শক্তিসম্পন্ন ছিলো তার ইঙ্গিত এখানে সুস্পষ্ট। জয়নুল আবেদিনকে জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে একথার মূল সুর অনুধাবন করাটা মনে করি অপ্রয়োজনীয় নয়।

একথা সুবিদিত যে বাংলাদেশের মাটিতে উন্নততর প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের ধারাবাহিক চারুশিল্পচর্চার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত দেশ-বিভাগের পর ১৯৪৮ থেকে—অর্থাৎ আজ প্রায় ষাট বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক ঘটনার। এরই মধ্যে এখানে সৃজনশীল শিল্পচর্চাক্ষেত্রে যে বিশাল চারুশিল্পী সম্প্রদায়ের সমাবেশ ও সম্মিলন ঘটেছে, রাজধানী ঢাকা-কেন্দ্রিকতা ছাড়িয়ে বিভাগীয় নগরী চট্টগ্রাম-রাজশাহী-খুলনাসহ প্রায় সারাদেশে তার বিস্তার লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে—তার মধ্যে মুসলিম পরিবার থেকে আগত শিল্পীর সংখ্যাই সমধিক। কিন্তু সূচনালগ্নের পথিকৃৎ পর্যায়ে যাঁরা আলোর দিশারী ছিলেন তাঁদের সামগ্রিক ভূমিকাটা কী ছিলো, সে-কথা সঠিকভাবে বুঝতে হলে তখনকার সামাজিক পটভূমি বা পরিবেশগত চালচিত্রের দিকগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। আবেদিনের জন্ম পূর্ববঙ্গে, তিনিই প্রথম এবং একমাত্র পাইওনিয়ার চিত্রশিল্পী যিনি কোলকাতায় গিয়েছিলেন আর্ট স্কুলে পড়তে এবং লেখাপড়া শেষ করে কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্ট নিয়ে অতঃপর শিল্পী-শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেখানে একটি শিল্পী-সমাজ প্রতিষ্ঠায়। বিষয়টি সর্বজনবিদিত এবং প্রণিধানযোগ্য।

মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় আনুগত্যের দিকগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় যে দিকটি তা হচ্ছে ধর্ম-চেতনার দিক থেকে অর্থাৎ ধর্মীয় প্রেক্ষিতে মূর্তিপূজক সম্প্রদায় ও বহুদেবতায় বিশ্বাসীদের বিপরীতে অবস্থান নেয়া। কারণ, ইসলাম একেশ্বরবাদী ধর্ম আর

তার সঙ্গে দেব-দেবীর পুজো-আর্চার কোনো সম্পর্ক নেই। সেই প্রেক্ষিতেই 'ইমেজ' বা প্রতি-আকৃতি গড়ার বিষয়টি সবসময়েই নিরুৎসাহিত হয়ে এসেছে মুসলিম-অধ্যুষিত পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে, যখন তা পূর্ব পাকিস্তান নামাঙ্কিত ছিলো—এমনকি এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার চৌত্রিশ বছর পরেও, এই তৃতীয় সহস্রাব্দেও, আমরা দেখতে পাই সেই পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণার প্রভাব-প্রতিফলন বেশ ভালোভাবেই কিছু সাধারণ মুসলিম পরিবারে রয়ে গেছে-মূর্তি ইত্যাদি তো দূরের কথা মানুষ ও জীব-জন্তুর ছবিরও প্রবেশাধিকার যেখানে সংরক্ষিত। বিষয়টি অধিক মাত্রায় লক্ষণীয় মফস্বল শহরগুলিতে, বিশেষত গ্রামের দিকে আরও বেশি। তবে তা নিয়ে ব্রাত্যজনের মধ্যে কোনো বাকবিতণ্ডা নেই; শিক্ষিত অথচ শিক্ষার আলো প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যারা পরিপূর্ণতা পায়নি তাদের মধ্যে এ নিয়ে এখনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ হতে দেখা যায়। আমি সাধারণ মুসলিম পরিবারের কথা বলতে বোঝাতে চেয়েছি সরল ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের নিয়ে গড়ে ওঠা সাধারণ পরিবারগুলির কথা। ইসলাম নিয়ে ধর্মীয় উশকানীমূলক রাজনীতি কিংবা উগ্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর লালনকারী যারা, এবং জলঘোলাকারী সুযোগসন্ধানী-গোষ্ঠী বলতে যাদের বোঝানো যাবে তাদের নিয়ে আপাতত আমার ভাবনা নেই—কেননা তাদের প্রতিপক্ষ বা বিপক্ষশক্তি এখন সদা-সক্রিয় বাংলার ঘরে ঘরে দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা-চেতন বাঙালিদের মধ্যে। বাংলাদেশ এলাকায় আলোকিত পরিবার গড়ে ওঠার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের—পাকিস্তানী, আফগানিস্তানী, কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশের মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে বাংলা ভাষাভাষী একজন মুসলমানের অনেক দূরত্ব-পার্থক্য রয়ে গেছে। আমি এক্ষেত্রে বৃহত্তর বঙ্গভূমির পূর্বাঞ্চল (বর্তমানের বাংলাদেশ) ও পশ্চিমবঙ্গ দুদিকের বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের কথাই বলছি। আর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালিয়ানার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশীল বাংলাদেশের যে মুসলিম-সম্প্রদায়, তাদের আইডেনটিটি স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করার যথেষ্ট সুযোগ রয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, একদিকে রাজধানীশহর মহানগরী ঢাকা-কেন্দ্রিক বাংলাদেশের লোকজ-ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্প-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের নিয়ন্ত্রণ ওই সম্প্রদায়ের হাতে, আবার অন্যদিকে সুশীল সমাজ কেন্দ্রীভূত ,পরিশীলিত শিল্প-সংস্কৃতির যে চর্চা ও আবহ এখানে সমাজ-প্রগতির অনুকূলে দৃঢ়তায় গ্রথিত মূলধারার সঙ্গে, তাও নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে ঐতিহ্যের স্বরূপে। আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা না করেও বলা যায় এই শুভবাচক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাঙালি-মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশের অগ্রগণ্য বাঙালিদের মধ্যে হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্তদের এবং বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের অবস্থানও উল্লেখযোগ্য। তাদের অবদানও এক্ষেত্রে কম নয়। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিক্ষেত্রে, শিক্ষকতা-ডাক্তারি আইনে-অর্থনীতিতে এবং সাংবাদিকতা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্বত্র একটা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সবার ভূমিকার কথা এখানে স্বীকৃত।

জয়নুল আবেদিন নিঃসন্দেহে ছিলেন উপর্যুক্ত ও ব্যাখ্যাত ওই সচেতন শিল্প-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম। রক্ষণশীল মুসলমান বংশোদ্ভূত তিনি, নিজেকে গড়ে তুলেছেন কু-সংস্কার আর কূপমণ্ডুকতার চলমান স্রোতের মুখোমুখি আলোক-সন্ধানব্রতী

শক্তির প্রতীক হিসেবে আপনাকে দাঁড় করিয়ে, যা পরিণতিতে বাংলাদেশের আধুনিক শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ-অগ্রগতি ক্ষেত্রে মূলধারার নিয়ামক শক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। অথচ একদিন এই আবেদিনকেই ছবি আঁকার কারণে নানান কটূকথা ও গঞ্জনা সইতে হয়েছিলো—শোনা যায় তাঁদের ময়মনসিংহ শহরের আকুয়া মাদ্রাসা কোয়ার্টার্স এলাকায় বাসার কাছের মসজিদ-সংলগ্ন পুকুরঘাটে কিশোর আবেদিনকে ওই মসজিদের ইমাম নাকি বলেছিলেন, "এসব করলে তুই বেহেশ্‌ত পাবি না" এমন কথা।[১] আর তাঁর ঢাকায় আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে এ ধরনের প্রতিবন্ধকতার সীমা ছিলো না, এমনকি জনশ্রুতি এই যে তাঁর উপর পুরাতন ঢাকা এলাকার লোকেরা সংগঠিত হামলাও চালিয়েছিলো।[২] আজ জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট (তৎকালীন আর্ট কলেজ/চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়) শাহবাগ এলাকায় কাজী নজরুল ইসলাম সরণিতে অবস্থিত এমন এক রুচিবান ও সমৃদ্ধ স্থান যেখানে সাম্প্রদায়িকতার ঠাঁই নেই, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ব্যবস্থা যেমন মসজিদ ইত্যাদি গোড়া থেকেই পরিকল্পনায় রাখা হয়নি। এখানকার যাঁরা নিয়মিত নামাজী মানুষ আছেন তাঁরা পার্শ্ববর্তী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে নামাজ আদায় করতে যান; কোনো অনুষ্ঠান এখানে কখনো কোনোরকম ধর্মীয় বাণী পাঠের মাধ্যমে আরম্ভ হয় না। শুরুতে কখনো দেশাত্মবোধক গান হয়, অথবা হয় না—এগুলোই এ স্থানের ট্রেডিশন। তবে এসব নিয়ে কখনো কোনো খুট-ঝামেলা এখানে বাঁধেনি।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, এ সমস্ত দিক নিয়ে কেউ কখনো এভাবে আলোকপাত ইতিপূর্বে করেননি যে আবেদিন তাঁর ব্যক্তিগত শিল্পচর্চার পাশাপাশি, চারুকলা শিক্ষায়তন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা কর্মকাণ্ডের সমান্তরাল যেমন স্বদেশভূমিতে মননশীলতায় আত্ম-নিবেদিত শিল্পী-সমাজ গড়ে তোলার বুনিয়াদ রচনা করে গেছেন, সমগতিতেই এ দেশের রুচিবান সাংস্কৃতিক আধার রচনার ভিত্তিতেও আরও অনেকের সঙ্গে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নাম স্মরণযোগ্য। আর এসব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রথম সারির একজন, একথাটি বিস্মৃত হওয়ারও কোনো অবকাশ নেই।

২.

জয়নুল আবেদিনের জীবনকালের সন-তারিখ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। আর সেদিক থেকে তাঁর কোলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে গমন ও শিক্ষাকোর্স সম্পন্ন করার সময়কাল ইত্যাদি নিয়েও লক্ষ্য করা যায় তথ্যবিভ্রাট এবং সেহেতু নীরব বিতর্কও রয়েছে, সুতরাং বর্তমান রচনার সুযোগে প্রসঙ্গটির উপস্থাপন জরুরি মনে করছি। যার যেমন ইচ্ছে, যিনি যেভাবে যে তথ্য পাচ্ছেন—ব্যক্তি ও সৃজনশিল্পী আবেদিনের জীবন ও কর্মের উপর নির্বিধায় লিখে যাচ্ছেন ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে যথেষ্ট উদাসীন থেকে। এই অস্বীকৃতিমূলক প্রবণতাকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেয়া চলে না, এভাবে চলতে দেয়া আর ঠিক নয় মনে করি। তাই আজ এ প্রসঙ্গের অবতারণা, নিতান্তই আন্তরিক তাগিদ থেকে।

১৯৫৮ সালে ঢাকা থেকে ইংরেজিতে পাকিস্তান পাবলিকেশন্‌স্‌ প্রকাশিত বিচিত্রবর্ণ 'জয়নুল আবেদিন' এ্যালবাম-এর পরিচিত অংশে জালাল উদ্দীন আহমেদ তাঁর জন্মসাল উল্লেখ করেছেন ১৯১৭ এবং লিখেছেন কোলকাতার আর্ট স্কুলে তিনি পড়তে গেছেন ষোল বছর বয়সে(অর্থাৎ সে হিসেবে সাল হয় ১৯৩৩)। ১৯৮৪তে কমল সরকার প্রণীত কোলকাতার যোগমায়া প্রকাশনীর 'ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী' গ্রন্থেও এভাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সর্বত্রই আবেদিনের কোলকাতায় অবস্থান আর আর্ট স্কুল থেকে ফাইন আর্টে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করার শেষ বছর চিহ্নিত হয়েছে ১৯৩৮। আবেদিনের সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তাঁর মতোই ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে কোলকাতায় যাওয়া দিলীপ দাশগুপ্ত, যিনি অল্প কয়েক বছর আগে কোলকাতায় মৃত্যু বরণ করেছেন। কমল সরকারের গ্রন্থটিতে তাঁর পরিচিতিতে বলা হয়েছে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত পড়াশুনা করে শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন তিনি। পাশাপাশি আবেদিনের সমকালীন আরেকজন চিত্রশিল্পী পাবনার রথীন মৈত্র (জন্ম ১৯১৩) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার পর (১৯৩১) মুকুল দে-র অধ্যক্ষতাকালে কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে প্রবেশ (১৯৩২) এবং বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের অধীনে ফাইন আর্টে অনুশীলন সমাপ্ত করেন (১৯৩৮)।' প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন জয়নুল আবেদিন আর্ট স্কুলে শিক্ষার্থী থাকাকালীন শিক্ষক হিসেবে যাঁদের পেয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন বসন্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় মহাসমারোহে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নব্বইতম জন্মবার্ষিকী (২৯ ডিসেম্বর, ২০০৪) পালন উপলক্ষ্যে তাঁর একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিলো। ওই প্রদর্শনীতে আবেদিনের কোলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষার্থী পর্যায়ের কাজ থেকে নিয়ে ঢাকার বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে সম্প্রাপ্ত মোট ৫৭৪টি ছোট ও বড় চিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে আবেদিনের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের এমন একটি জলরঙ চিত্র প্রদর্শিত হয় যার গায়ে আবেদিনের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট এবং সন-তারিখ সংযুক্ত (১৯৩৩)। ছবিটি ক্যাটালগেও মুদ্রিত হয়েছে (প্রদর্শন নং-৮১)। শিল্পী ইংরেজিতে তাঁর নাম স্বাক্ষরের সঙ্গে 'Art school 2nd Year' লিখে রেখেছেন দেখতে পাই—ক্যাটালগেও যা উল্লেখ করা হয়েছে। তো সাধারণ হিসাব অনুযায়ী যিনি নিজেকে ২য় বর্ষের ছাত্র বলে বর্ণনা দিয়েছেন, আবার সাল লেখা হয়েছে ১৯৩৩—তার অর্থ হচ্ছে ১৯৩২-এই কেটেছে তাঁর ১ম বর্ষ। এখানে আরেকটি জরুরি তথ্য এই যে, যতোদূর জানি কোলকাতার সেই সরকারি আর্ট স্কুলে তৎকালে ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন হতো ছয় বছরে। সেদিক থেকে প্রত্যেকেরই উল্লেখকৃত শেষ বছরটি ১৯৩৮ হলে কোনো অবস্থাতেই ১৯৩৩ সাল প্রথম বছর হতে পারে না।

১৯৬৫ সালে ঢাকায় তৎকালীন চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ১৬ জন শিক্ষক শিল্পীর গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রদর্শনী হয়েছিলো। তখনকার অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন এবং সিনিয়র শিক্ষক আবেদিনের কোলকাতা আর্ট স্কুলের সহপাঠী শফিকুল আমীনের ছবি

প্রদর্শনীতে ছিলো। সেই সময় তাঁরা যে ক্যাটালগ প্রকাশ করেছিলেন সেখানে জয়নুল আবেদিনের জন্মসাল ১৯১৪ এবং শফিকুল আমীনের আর্ট স্কুলে অধ্যয়নের সময়কাল উল্লেখ করা হয়েছে সুস্পষ্টভাবে ১৯৩২ থেকে ১৯৩৮। এই তথ্যাবলি সঠিক মনে করার যৌক্তিকতা অনেক দিক থেকেই আছে। প্রসঙ্গত আরও নির্ভরযোগ্য তথ্য হচ্ছে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের শিল্পান্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্মৃতিচারণমূলক রচনায় প্রবীণ শিল্পী শফিকুল আমীন (জন্ম-১৯১২) জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের প্রাথমিক পর্যায়ের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন : "১৯৩২ সনের ৭ই জুলাই কলকাতায় Govt. School of Arts-এ ভর্তি হলাম। প্রথম দিন জয়নুলের সঙ্গে আলাপ হল। 'শিল্পাচার্য' তখনও শিল্পাচার্য হন নাই—জয়নুল আবেদিন ভর্তি হয়েছিলেন ৪/৭/৩২।"[৩]

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের দীর্ঘদিনের সহযাত্রী শফিকুল আমীন আজ জীবনসায়াহ্নে উপনীত। তার লিখিত বক্তব্য নির্ভরযোগ্য মনে করি। এর আগেও তিনি এ বিষয়ে লিখেছেন। এখানে উত্থাপন করা হলো সবদিক বিবেচনা করে।

৩.

পার্টিশন-পূর্বকালে জয়নুল-জীবনের উল্লেখযোগ্য সময়কাল প্রথম পর্যায়ের তাঁর কোলকাতায় আর্ট স্কুলে শিক্ষার্থী থাকাকালীন অবস্থানকালে এবং দ্বিতীয়ত ছাত্রজীবন শেষে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হওয়ার পর থেকে তেরোশ পঞ্চাশের আকালের বছর, অর্থাৎ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আবেদিনের কৃতিত্বপূর্ণ চারুকলার শিক্ষার্থী জীবন সম্পর্কে কমবেশি অবহিত সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে সম্পর্কিত যাঁরা। শিল্পী জীবনের শুরু থেকেই জয়নুল প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিলো সবার। ময়মনসিংহের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক চিন্তাহরণ মজুমদার যাঁকে বলা চলে শিল্পী আবেদিনের আবিষ্কর্তা, তিনিই নবীন আবেদিনের ভেতরে যে সৃজনশীল কর্মীর কর্মস্পৃহা ও শৈল্পিক চেতনার অঙ্কুরোদগম হতে দেখেছিলেন এবং যাঁর মধ্যে বিস্তর সম্ভাবনার ছাপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে তাঁর পরিবারের কর্তা-ব্যক্তিদের উৎসাহ জুগিয়েছিলেন তাঁকে কোলকাতার আর্ট স্কুলে পাঠানোর জন্য। কোলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুল দে-র তিরিশের দশকের প্রথমার্ধে সেই মেধাবী ছাত্রটির প্রতি সহানুভূতিশীল গভীর মনোযোগের বিষয়টি ছিলো পূর্বোক্ত ওই ঘটনারই ধারাবাহিকতা। জানা যায় প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন ময়মনসিংহ জেলাবোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত পনেরো টাকার ছাত্রবৃত্তি যে জয়নুল আবেদিন পেতেন তার অনুকূলে অধ্যক্ষ মুকুল দে-র প্রশংসাপত্রের ভূমিকা ছিলো—যা তিনি অনেকটা নিয়ম ভেঙেই (প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্য অপেক্ষা না করে, আগেভাগেই) জেলাবোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রদান করেছিলেন। উল্লেখ্য, সেই সময় কোলকাতার আর্ট স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলিতে স্বনামধন্য ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা ছিলেন, বিভিন্ন শ্রেণীতে যাঁরা পড়তেন তাঁদের মধ্যেও ভালো ছাত্র বা মেধাবী শিল্পকর্মীর অভাব হয়তো ছিলো না—জয়নুল আবেদিন তাঁর নিষ্ঠা ও কর্মগুণে তাঁদের সবার নজর কাড়লেন; শিক্ষকদের স্নেহধন্য

হলেন এবং সমকালীন নবীন-তরুণ শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত হলেন অল্পদিনের মধ্যেই।

কোলকাতায় গিয়ে আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার এবং ক্লাশ শুরু করার আগে থেকেই আবেদিন অধ্যক্ষ মুকুল দে-র সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তৎকালে স্বনামধন্য সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন কোলকাতায় 'দৈনিক আজাদ'-এ কাজ করতেন। পরে তিনি আবেদিনের স্থানীয় অভিভাবক হয়েছিলেন। আর্ট স্কুলে ভর্তির জন্য যোগাযোগ তাঁর মাধ্যমেই হয়েছিলো, তিনিই জয়নুল আবেদিনকে সঙ্গে নিয়ে (এবং তাঁর আঁকা কিছু ছবিসহ) অধ্যক্ষ মুকুল দে-র সঙ্গে মিলিত হন। সদ্য পূর্ববঙ্গের মফস্বল শহর থেকে আসা সাধাসিধে হালকা-পাতলা গড়নের লম্বা ছেলেটি, যে কিনা তখনও বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার পালা শেষ করেনি—তাঁর হাতের কাজ দেখে অধ্যক্ষ অভিভূত হয়েছিলেন, আর প্রথম দর্শনেই আঁচ করেছিলেন যে তাঁর মধ্যে চিত্রশিল্পী হিসেবে বেড়ে ওঠার এবং সাফল্য লাভের বিস্তর সম্ভাবনা রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রখ্যাত শিল্পী মুকুল (চন্দ্র) দে ছিলেন পূর্ববঙ্গের মানুষ, ঢাকা জেলার শ্রীধরখোলা গ্রামে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি হয়েছিলেন ১৯০৭ সালে। সেখানেই ব্রহ্মচারী ওঙ্কারানন্দের কাছে চিত্রাঙ্কনের হাতেখড়ি হলেও তাঁর প্রকৃত অনুশীলন সম্পন্ন হয় অবনীন্দ্রনাথের কাছেই, এবং অসিতকুমার হালদার ও নন্দলাল বসুর কাছেও তাঁর চিত্রকলা অনুশীলন চলে (১৯১১-১৬)। বলাবাহুল্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার দুই অগ্রণী শিল্পী ছিলেন অসিতকুমার ও নন্দলাল। অতএব মুকুল দে-র গভীর সম্পৃক্ততা ছিলো তখনকার প্রচলিত ওই নব্যবঙ্গীয় চিত্রধারার সঙ্গে। তিনি আবেদিনের সৃজনশীল হাত ও মেধার পরিচয়ে অধিক আশান্বিত হয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন প্রাচ্য-শিল্পধারা বিভাগে তথা ইন্ডিয়ান পেইন্টিং বিষয়ে চারুকলার শিক্ষা গ্রহণ করতে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাকোর্স সম্পন্ন হওয়ার পর যখন বিভাগ নির্বাচন করতে হবে তখন দেখা গেলো মুকুল দে-সহ প্রিয় শিক্ষকবৃন্দের অনেককেই আবেদিন হতাশ করলেন। প্রচলিত ভারতীয় চিত্ররীতি শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ তেমন ছিলো না, অর্থাৎ আবেদিনের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-বিরুদ্ধ ছিলো তা, ফলে ফাইন আর্ট ডিপার্টমেন্টে তাঁর শিক্ষাগ্রহণ চলে অবারিতভাবে-যা ছিলো প্রকৃতপক্ষে ড্রইং ও পেইন্টিং কেন্দ্রিক ইউরোপীয় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প-শিক্ষাধারার সাথে সম্পৃক্ত।

ঘটনাটি অবধানযোগ্য এই কারণে যে, অধ্যক্ষ মুকুল দে-র মতো একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন প্রভাবশালী শ্রদ্ধাভাজন আপনজনের পরামর্শকে পাশ কাটিয়ে কেরিয়ারের শুরু থেকেই আবেদিন মূলত্য নব্যবঙ্গীয় ধারা কিংবা ভারতীয় চিত্ররীতি নিরপেক্ষ শিল্পদীক্ষা গ্রহণে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। অর্থাৎ শিল্পী জীবনের প্রস্তুতি পর্বেই আপনার দুর্দমনীয় মনোভঙ্গীর প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর আত্মবিশ্বাসী দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ও শিল্পী সত্ত্বার পরিচয় প্রত্যক্ষ করি আমরা। অত্যন্ত নির্বিরোধী ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন জয়নুল আবেদিন-কিন্তু চিত্রশিল্পী হিসেবে বড় হওয়ার উদগ্র বাসনায় তিনি অত্যন্ত একরোখা আপোসহীন

মনোভাব প্রকাশ করেছেন সব সময়। আর এখন আমরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে না গিয়েও বেশ বুঝতে পারি যে তাঁর বিভাগ নির্বাচনের নিজস্ব সিদ্ধান্ত ভুল ছিলো না; ওই সিদ্ধান্তের বদৌলতে তৎকালীন ভারতীয় তথা পশ্চিমবঙ্গের চিত্রশিল্পীদের ব্যাপক অংশে যে চিত্রধারার প্রচলন ছিলো, স্বাভাবিক কারণেই তা থেকে আপেক্ষিক অর্থে দূরত্বে অবস্থান করার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিকশিত করার লক্ষণ ইত্যাদি তাঁর মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। জয়নুল আবেদিন যদি সেদিন ভারতীয় চিত্ররীতির দীক্ষা নিয়ে সেই নিরঙ্কুশ ধারাপথে শিল্প-অভিযাত্রায় অবতীর্ণ হতেন তাহোলে তাঁর পরিচিতি আজ হতো ভিন্ন। কারণ ওই প্রেক্ষিতে তাঁর চিত্র-সম্ভারে স্বকীয়তার গুণ-বৈশিষ্ট্য বা মিলতো তা আবেদিন অনুসৃত রীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর নিপুণতা বা কারিগরিতার গুণে হয়তো সমৃদ্ধ হতো ঠিকই (তাঁর আঁকা ওই রীতির একটি কাজ প্রদর্শিত হয়েছে ৯০তম জন্মবার্ষিকীর প্রদর্শনীতে, প্রদর্শন নং-৩৫৬) কিন্তু অনিবার্যভাবে দরদী মানবপ্রেমিক, মৃত্তিকা-সংলগ্ন ও স্বদেশানুগ জীবন-বাস্তবের রূপকার শিল্পস্রষ্টা আবেদিনকে হয়তো আমরা না-ও পেতে পারতাম।

আর্ট স্কুলে আবেদিনের সরাসরি শিক্ষক ছিলেন ১ম বর্ষে (১৯৩২-৩৩) বলাইচন্দ্র দাস, ২য় বর্ষে (১৯৩৩-৩৪) রিসেন মিত্র, ৩য় বর্ষে(১৯৩৪-৩৫) মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত এবং ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ বর্ষে (১৯৩৫-৩৮) বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।[৪] তাঁদের মধ্যে বসন্ত গাঙ্গুলীর কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, যাঁর অনুপ্রেরণা ও শিল্পাদর্শের প্রভাব জয়নুল আবেদিনের ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মাঙ্গনে দীর্ঘস্থায়ী ছায়া ফেলেছিলো। পূর্ববঙ্গে ঢাকা-বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণকারী বসন্ত গাঙ্গুলী (১৮৯৩-১৯৬৮) ফাইন আর্ট বিভাগে ইউরোপীয় প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় চিত্রবিদ্যা গ্রহণ করলেও ডিপ্লোমা লাভের পর অবনীন্দ্রনাথের কাছে 'ওয়াশ' ও টেম্পেরার কলাকৌশল শিখেছিলেন। তিনি প্রধানত প্রতিকৃতি শিল্পী ছিলেন। আর্ট স্কুলে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন দীর্ঘদিন (১৯৩০-৫৬)। শিল্পাচার্য জয়নুল তাঁর কথা স্মরণ করতেন সব সময়—ঢাকায় আর্ট কলেজে শিক্ষকতাকালে ছাত্রদের কাছে তাঁর কথা বলতেন। মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৮৯৮-১৯৬৮) ছিলেন ঢাকা-বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণকারী পূর্ববঙ্গের মানুষ, তিনি ১৯৩১ সালে যোগদান করেছিলেন কোলকাতা আর্ট স্কুলে শিক্ষকতায় এবং বাইশ বছর নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর শিক্ষা গ্রহণও শান্তিনিকেতনে অসিতকুমার হালদার ও নন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে। 'তিনি জল রঙের শিল্পী এবং তাঁর চিত্রকলায় পৌরাণিক ও ধর্মীয় আখ্যানের আধিক্য থাকা সত্ত্বেও দৃশ্যচিত্রে তাঁর কৃতিত্ব ছিল সর্বাধিক। উডকাট, লিনোকাট ও প্লেট এনগ্রেভিং-এও তিনি পারদর্শী ছিলেন। টেম্পেরা মাধ্যমেও তাঁর চিত্র আছে।"[৫] অধ্যক্ষ মুকুল দে-কেও সরাসরি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন জয়নুল, তিনি স্কেচ্-খাতা ইত্যাদি দেখতেন। আরেক স্বনামধন্য শিক্ষক-শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর (১৯০২-৫৫) কাছে ছাপচিত্র বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তিনি। তাঁর জন্মস্থান ত্রিপুরার চাঁদের চর গ্রাম। কোলকাতায় আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন ১৯১৯ সালে কিন্তু দুবছর পর শান্তিনিকেতনের কলাভবনে প্রবেশ করেন (১৯২১) এবং পূর্বোক্ত শিল্পীদের মতোই অসিতকুমার হালদার ও নন্দলাল বসুর ছাত্র হয়েছিলেন। তাঁর পারদর্শিতা

ছিলো ছাপাইছবির নানা শাখায়। ১৯২৬-এ কোলকাতায় আর্ট স্কুলে হেড এসিস্টেন্ট টিচা
পদে যোগদান করেছিলেন, মাঝখানে কিছুদিন লন্ডনের স্লেড স্কুলে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণস
১৯৪৬ সাল পর্যন্ত আর্ট স্কুলেই যুক্ত ছিলেন ধারাবাহিকভাবে। চাকুরিজীবনের শেষদিকে
(১৯৪৯) পুনরায় কোলকাতায় সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলে ১৯৫১তে
তাঁর অধ্যক্ষতাকালেই স্কুলটি কলেজে রূপান্তরিত হয়ে 'গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট এ্যা
ক্র্যাফট' নামাঙ্কিত হয়েছিলো।* জয়নুল আবেদিনের শিল্পীজীবনে এবং ঢাকায় চারুকলা
উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংগঠনে কোলকাতার আর্ট স্কুল এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ শিল্পী
শিক্ষকবৃন্দের ভূমিকার কথা অনস্বীকার্য। প্রথম অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটির নাম রাখা হয়েছিলে
Government Institute of Arts', পরে তা পূর্ণ ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত হলে না
হয় 'College of Arts and Crafts'–এও যেনো কোলকাতার আর্ট কলেজের সর্বশে
নামেরই প্রতিফলন। তবে আবেদিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত সেই প্রতিষ্ঠানটি আজ অগ্রস
হয়েছে আরও অনেকদূর—সেখানে এখন স্নাতক-কোর্স ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাকোর্স চা
আছে এবং আশির দশক থেকে তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। সেখানে সাত
শিল্পকলাবিদ্যা-শাখার পাশাপাশি একটি 'শিল্পকলার ইতিহাস' শাখাও রয়েছে। বাংলাদেশে
শিল্পকলাঙ্গন এগিয়ে চলেছে এশিয়ার অন্যতম প্রধান কলাকেন্দ্র হিসেবে, আন্তর্জাতি
ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য বিস্তৃতি ঘটেছে তার। এ সমস্ত সাফল্যের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলে
জয়নুল, ধারাবাহিকতা চলেছে তারইধারায় তাই শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশে
শিল্পাঙ্গনে প্রাতঃস্মরণীয়।

৪.

ছাত্রজীবনে গড়ে ওঠার বিষয়ে সর্বতোভাবে নিজের আরাধ্য ক্ষেত্রে জয়নুল আবেদি
ধারাবাহিকভাবে এমন আনুকূল্য পেয়েছিলেন যা তৎকালে ভারতীয় শিল্পকলাঙ্গনে প্রচলি
গতানুগতিক অথবা সাধারণ প্রবণতাসমূহের বাইরে একক-বিশিষ্টতায় বিকশিত হওয়া
সুযোগ করে দিয়েছিলো তাঁকে। যেমন ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের মধ্যে দেব-দেবীসহ পৌরাণি
কাহিনী ইত্যাদি বিষয়বস্তু-নির্ভর শিল্প সৃষ্টির একটা ঐতিহ্য ছিলো। এমনকি দেখা গেছে
আব্দুর রহমান চুঘতাই-এর মতো শিল্পীও ওই পথে পদচারণা করেছেন; যিনি মুসলিম
মোগল ঘরানার শিল্পী-স্থপতিদের বংশধর হয়েও নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার আদর্শ উপেক্ষা
করতে পারেননি এবং অবনীন্দ্রনাথের কাছে অনুশীলন করে অতঃপর 'হিন্দুর দেব-দেবী
রামায়ণ-মহাভারত, কৃষ্ণলীলা' প্রভৃতি বিষয়ের উপর চিত্রাঙ্কন করেছেন। অবশ্য মুসলি
বিষয়-উপজীব্যের পাশাপাশিই তিনি এসব বিষয়বস্তু অবলম্বন করে চিত্রাঙ্কন করেছে
যেমন তাঁর কয়েকটি কাজের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে : নটরাজ, সরস্বতী, প্রে
(রাধাকৃষ্ণ), হোলি, ঈদের চাঁদ, দরগা হইতে, রামজান, ইত্যাদি এবং ওমর খৈয়াম
হাফিজের রচনাবলি আর গালিব ও ইকবালের কাব্য ইত্যাদি অনুসরণেও তিনি ছবি
এঁকেছেন।

আবেদিনের চিত্রকর্মজীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই হিন্দু-পৌরাণিক বিষয়াদি কিংবা ইসলাম ধর্ম সম্পৃক্ত বিষয়াদি তাঁর সৃজনশীল কর্মাঙ্গনে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। প্রথম জীবনে কর্মাশিয়াল কাজ হিসেবে হয়তো কখনো কখনো তিনি বই বা পত্র-পত্রিকার প্রচ্ছদ কিংবা রেখাচিত্র নয়তো অলঙ্করণের উদ্দেশে ওই ধরনের কাজ করে থাকতে পারেন।[১] সেজন্য তাঁর সৃজনশীল কর্ম-সত্তার সম্পর্কে উল্লেখকালে কেউই সে-সব নিয়ে বলেননি। তাহোলে আবেদিন-শিল্পভুবনে 'ক্রিয়েটিভ' পেইন্টিং হিসেবে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর উদাহরণ প্রায় বিরল একথা দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকার করে নেয়া যায়। বিষয়টি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যবাহী।

কর্মজ্ঞ মানুষের ব্যক্তিজীবনের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে শুধুই কর্মের খতিয়ান লিপিবদ্ধ করাটা আমার মনে হয় অযৌক্তিক। কারণ মানুষটিকে উপেক্ষা করে তার মানবিক গুণাবলির ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করলে তা একধরনের কষ্টকল্পনাই হবে। সুতরাং কারুর কাজের মূল্যায়ন-পর্যালোচনায় তার জীবন-কাহিনীর খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ আসাটা হবে স্বাভাবিক। তাই জয়নুল আবেদিন সম্পর্কে যখন কথা বলছি তখন তাঁর ব্যক্তি ও শিল্পী সত্তা দুইয়ের উপস্থাপনাই আমি মনে করি গুরুত্বপূর্ণ।

আবেদিনের চিত্রশিল্পী হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনে খুব দীর্ঘ প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়ে চড়াই-উৎরাই পেরোনো সংগ্রামী-জীবনের দিকটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। শিল্প-জগতের মহান কীর্তিমানদের জীবনেতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি অধিকাংশ শিল্প-স্রষ্টাই কাটিয়েছেন কষ্টকর জীবন—একদিকে ব্যক্তিজীবনের অর্থনৈতিক সংকট কিংবা অস্বচ্ছলতা, আর অন্যদিকে, শিল্পচর্চাক্ষেত্রে কিংবা দীক্ষা-অর্জন পর্যায়ের, আশা-হতাশার দোলায় দোদুল্যমান নানামুখী স্ট্রাগল অথবা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সংগ্রাম। সেই প্রেক্ষিতে আবেদিনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়টি হলো : তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত সরলপথে তাঁর অগ্রযাত্রা এবং শিল্পকীর্তিক্ষেত্রে অগ্রসরমানতার দিকটিও বেশ মসৃণ গতিপথের মধ্য দিয়েই অতিক্রান্ত হয়েছে। সাফল্যের সোপান অতিক্রমণের ব্যাপারে বিচিত্র পথে ছুটোছুটি তিনি করেননি, শিল্পচর্চার বৈচিত্র্যমণ্ডিত বিশালায়তন কর্মাঙ্গনের নানাদিকে তিনি পদচারণা করেননি-দক্ষতা অর্জন কিংবা অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যও তিনি ব্যাপক মাধ্যমের বহুভঙ্গিম শিল্পধারায় দীক্ষা গ্রহণের জন্য আপেক্ষিক অর্থে প্রচলিত প্রথায় সময় ব্যয় করেননি; আবার শিল্পসৃষ্টির আপন ভুবনেও অন্তত চিত্র-সম্পাদন ক্ষেত্রে গতানুগতিক কোনোরকম বন্ধন তিনি মেনে চলেননি। সর্বতোভাবে ক্রিয়েটিভ-কোয়ালিটির মাত্রা যাকে বলে তা কার্যকর ছিলো তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায়। আর তা ছিলো বলেই ভারতীয় শিল্পকলার শতধা-বৈচিত্র্যমণ্ডিত বিশাল আলোকিত অঙ্গনে যার উত্থান, প্রাচ্য শিল্প-ঐতিহ্যের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটের পুরোভূমি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারীদের উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্যে প্রভাবশীল থাকা সত্ত্বেও তার প্রতিফলন এড়িয়ে যাঁর উদ্ভাবন স্বকীয়তার অন্বেষণে, সেই জয়নুল আবেদিন কোনও বন্ধন-বেড়ি জড়াতে দেননি তাঁর পায়ে কিংবা মননে। হয়তো তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো একান্ত নিজস্ব এক সত্তারূপ পরিচয়ে আপনার শিল্পকলা-ভুবন গড়ে তোলা।

আবেদিনের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প-দীক্ষা ইউরোপীয় ধারার অন্তর্ভূত ছিলো। বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গী এবং চিত্রকাঠামো ও গড়ন-গঠনে, প্রকৃতি বিষয়ে বিজ্ঞান-সম্মত পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান এবং অবস্থানগত সন্নিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষায় পরিপূর্ণতা অর্জন করেছিলেন তিনি। ছাত্রজীবনে তাঁর জলরঙে পারদর্শিতা অর্জিত হয়েছিলো সম্পূর্ণ রূপে ব্রিটিশ একাডেমিক পদ্ধতিতে। অথচ তাঁর পরিপক্ব বয়সের চিত্র-সম্ভারে ওই সমস্ত গুণের সমন্বয়ে পাশ্চাত্য-আঙ্গিকের প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যের সকল বৈভব সবসময় সঙ্গী করেছে একথা বলা যাবে না।

অন্যদিকে নব্যবঙ্গীয় শিল্পধারা কিংবা ভারতীয় চিত্ররীতি, যা প্রাচ্যশিল্প-আঙ্গিকের প্রাচুর্যমণ্ডিত শৈল্পিক কুশলতা ও ঐতিহ্যের সারাৎসার আশ্রয় করার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিলো—সেই কলাকৌশলের সঙ্গে আবেদিনের সম্পর্ক ছিলো না যে শুধু তাই নয়, ক্ষীণ পর্যায়েও ছিলো না বলা চলে (যদিও একথাটা অংশত মিথ্যাই বলা হবে যদি বলি যে, তিনি কখনোই ওই চিত্র-আঙ্গিকের ছায়াও মাড়াননি)। তেলচিত্র কিংবা জলরঙের ছবিতে রেখার গুরুত্ব অস্বীকৃত পাশ্চাত্য শিল্পাঙ্গনে, প্রাচ্যে রেখার সম্পর্ক যেক্ষেত্রে গভীর থেকে গভীরতর। একথা কখনো সত্য নয় যে, জয়নুল আবেদিনের ছবি শুধুই রেখার বলিষ্ঠ প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় বহনকারী এবং তাঁর বিখ্যাত চিত্রপট সকল কেবল রেখায়নের দীপ্তিতেই ভাস্বর। গভীর ভাব-বিন্যস্ত প্রাচ্যানুগ শিল্পরীতি জয়নুল আবেদিন অনুসৃত পাশ্চাত্যবর্গী বাস্তব-অন্বিষ্ট ঘরানার অনুকূল নয়। অন্যদিকে বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকশিল্পের বর্ণিল নকশীরূপ ও ক্ষীপ্র গতিসম্পন্ন রৈখিকবিন্যাস সমৃদ্ধ লোকজ-রীতির চিত্ররূপ উৎসারিত সরল প্রকাশভঙ্গীর আকর্ষণ আবেদিনের শিল্পীমনে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলো, একথা অস্বীকার করা যাবে না। ফলে তাঁর সৃজিত চিত্রাবয়বে এমন এক শিল্পরূপ অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হলো যা গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শিল্পধারা-আঙ্গিকের সম্মিলনেই নিজস্ব রূপ-চারিত্র্যে উদ্ভাসিত হলো। এভাবে আবেদিনের চিত্র-চর্চার প্রধান অবলম্বন জলবাহিত মাধ্যম-উপকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত হলো একদিকে, খুবই সংক্ষিপ্ত প্রয়োগ-বিন্যাস সত্ত্বেও ত্রিমাত্রিক মডেলিং বিষয়টি উপেক্ষিত হলো না, এমনকি ওই চিত্রগুণে তাঁর বলিষ্ঠ রেখার টানটোনেও প্রতিষ্ঠা পেলো অবলীলায়। আর সবচেয়ে বড় যে দিকটি লক্ষণীয় হয়ে উঠলো তা হচ্ছে তাঁর ছবির বিষয়বস্তুতে নিছক ভাবের কিংবা কল্পিত রূপের আশ্রয় প্রায় নির্বাসিত হয়ে সেখানে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন-বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বিষয়াদি সরাসরি আসন করে নিলো। যে-কারণে পৌরাণিক বিষয়াদিসহ ভাবালুতা ও কল্পনাবিলাসের সঙ্গে দূরত্ব রচিত হলো। আর সেই হেতু আবেদিনের শিল্প-ভাণ্ডারের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়ালো বাস্তব জগতের মানুষ; জীবনসংগ্রামে সদালিপ্ত মাঠ-ঘাটের মানুষ ও শ্রমজীবী আদম সন্তান দুর্যোগপীড়িত, জীবন্মৃত কিংবা অসহায় গ্রামীণ নর-নারীর পাশাপাশি আশাবাদের প্রতীক স্বরূপে দুঃখজয়ী-মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষের সন্ধানও দিয়ে গেলো তাঁর চিত্রপট। আর মানুষ-কেন্দ্রিকতার যোগসূত্রেই মৃত্তিকা-সংলগ্নতা বা স্বদেশভূমির প্রতি তাঁর টান ও দরদের মাত্রাটি ছিলো অসাধারণ তীব্রতা ও গভীরতা সঞ্চারী; প্রকৃতি ও সমাজ-পরিবেশ, গবাদি পশু, পাখি ইত্যাদি মানুষের সঙ্গে জুড়ে বসলো জয়নুল-চিত্রের অনুষঙ্গ হয়ে। জয়নুল-চেতনায় দৃঢ়-

গ্রথিত এ জাতীয় তাবৎ উপসর্গ বা সূচকের অবস্থিতিই তাঁর শিল্পকর্মকাণ্ডে স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্যজনিত অসাধারণত্ব প্রতিষ্ঠাকে অনিবার্য করে তোলে। অর্থাৎ শিল্পচর্চাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের প্রায় শুরু থেকেই জয়নুল আবেদিন চিহ্নিত হয়েছেন একক পরিচয়ে নিজের কৃতকীর্তির দৃষ্টি আকর্ষণীয় ভিন্ন ও নবতর এক সত্তা-স্ফুরণের মধ্য-দিয়ে যা এতদঞ্চলের শিল্পাঙ্গনে নবীনতা ও নতুনত্বের স্বাদবৈচিত্র্য স্থাপন করেছে।

৫.

বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে আবেদিনের যে-সমস্ত ছবি সাধারণত আমাদের নজরে পড়ে, এমনকি বিভিন্ন সময় ক্যাটালগ, পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ ইত্যাদিতে প্রকাশিত এবং পোস্টার হিসেবে কিংবা আকারে মুদ্রিত যে ছবিগুলি আমরা সচরাচর দেখি তার মধ্যে তাঁর ছাত্রজীবনের প্রথম দিকের ছবি কিছু পাওয়া গেলেও ওপরের শ্রেণীর কাজ তেমন দেখা যায় না। এমনকি কোলকাতা আর্ট স্কুলে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করার পর ওই প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষক পদে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত হওয়ার পর থেকে ১৯৮৪৩-এর আগে পর্যন্ত তিনি যে-সমস্ত চিত্রাঙ্কন করেছেন তাদের খোঁজও খুব কমই পাওয়া যায়। এর কারণ অজ্ঞাত। জয়নুল আবেদিন ছিলেন কর্মনিষ্ঠ সৃজনশিল্পী; সক্রিয় ছিলেন তিনি, তৎপর ছিলেন শিল্পসৃষ্টিতে যতোদিন তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো ততোদিন। নিজের ইচ্ছেয় সৃজনকর্মে বিরতি দিয়েছেন কখনো, এমনটি মনে করবার অবকাশ নেই। ঢাকায় শাহবাগে পিজি হাসপাতালের কেবিনে (১৯৭৬ সালের মে মাসের থেকে ২৮ তারিখ) থাকাকালীন যখন তাঁর শেষ চিকিৎসা চলছিলো—জীবনের সেই অন্তিমাবস্থায়ও তাঁর সৃষ্টিশীল হাত থেমে থাকতে চায়নি, শেষ ছবিটি এঁকেছেন গুরুতর অসুস্থাবস্থায়—আর সে-ও ছিলো মানব-মানবী : তরুণ-তরুণীর মুখ। তাহোলে ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ-চিত্রমালা সৃষ্টির আগে পর্যন্ত প্রায় সাত-আট বছরের সম্ভারের হদিস তেমন একটা সুস্পষ্ট সংখ্যায় মিললো না কেনো? ওই সমুদয় কাজের খোঁজ পাওয়া গেলে আমার বিশ্বাস তাঁর সৃজিত শিল্পকর্মের সংখ্যা তিন থেকে চার হাজার হওয়া বিচিত্র নয়। অথচ জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্মের সংগ্রহ সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং বেসরকারি গ্যালারি ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে ঢাকা-ময়মনসিংহসহ বাংলাদেশে যা আছে তার পরিমাণ জানামতে দেড় থেকে দুহাজার হতে পারে; কোলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতের অন্যান্য স্থান ছাড়াও পাকিস্তানে কিছু আছে—আর প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অন্যান্য স্থানেও সংগৃহীত রয়েছে বলে শোনা যায়; একটা আনুমানিক সংখ্যা বিবেচন করা হয়েছে যে জয়নুল আবেদিনের চিত্র-সংখ্যা ছোট-বড়-মাঝারি সব মিলিয়ে আড়াই হাজারের কিছু বেশি বা কম হতে পারে।

৬.

১৯৩২ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কোলকাতায় সরকারি আর্ট স্কুলে ছাত্র থাকাকালীন তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনটি দিকে : এক প্রতিষ্ঠানিক রুটিন-ওয়ার্ক এবং তার অতিরিক্ত ভালোভাবে শেখা ও শিল্প-মাধ্যম ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা অর্জনের

জন্য নিয়মিত ঘরে-বাইরে চিত্রানুশীলন; দুই, আউটডোরে নিজের পছন্দমতো নিসর্গদৃশ্য
প্রকৃতি-পরিবেশ ও তদ্‌সম্পর্কিত ছবি আঁকা; এবং তিন, উপার্জনের জন্য কিছু কমার্শিয়
কাজ করা। এসবের পাশাপাশি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দেয়া এবং গ্রামবাংলার নদীতীে
পথেঘাটে ও ক্ষেতের আলে ঘুরে বেড়ানো তাঁর স্বভাব ছিলো, জেলে-কৃষকসহ সাধার
মানুষদের সঙ্গে মিশতে বা সময় কাটাতে ভালোবাসতেন জয়নুল। মাটি আর মানুষ ছি
তাঁর প্রেরণার উৎস, তাঁর শিল্পপ্রেমিক মন উৎসর্গিত ছিলো মানবপ্রেমে; মানুষের সামগ্রি
কল্যাণ হোক, এটা তিনি চাইতেন। ধীরস্থির শান্ত স্বভাবের জয়নুলের পর্যবেক্ষণ করব
ক্ষমতা ছিলো অসাধারণ, তাঁর সেনসিটিভ মনের মতোই দৃষ্টিভঙ্গীও ছিলো সূক্ষ্ম, অ
গ্রহণক্ষমতা তথা আত্মস্থ করবার শক্তি এবং স্মরণশক্তিও ছিলো প্রখর। স্বনামধন্য সৃজনশি
জয়নুল আবেদিনের চিত্র-চর্চাক্ষেত্রে আত্ম-নিবেদিত হওয়ার সূচনাপর্ব বা তাঁর গড়ে ওঠ
দিনগুলি উপযুক্ত অনুষঙ্গ ইত্যাদির পূর্ণ সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়েছিে
আর তাঁর অর্জনের গভীরতা নিয়ে খোলাখুলি মন্তব্য করতে চাইলে একটা কথাই ক
যাবে, যে-কথায় কোনো বিকল্প নেই যে, শিল্প-সাধনার কীর্তিও পথ বেয়ে শিল্পী
আবেদিনের উত্তরণ সুনিশ্চিত যাত্রাপথের সন্ধান লাভ করেছিলো সেদিনই, যেদিন ত
অভিষেক ঘটেছিলো কোলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের কীর্তিমান ছাত্র হিসেবে। অ
তা বলাবাহুল্য শুরু থেকেই। ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া, সেই সুবাদে অধ্যক্ষ মুকুল (
র প্রশংসাপত্র-সুপারিশের বদৌলতে নির্ধারিত সময় আমার আগেই ময়মনসিংহ জে
বোর্ডের বৃত্তি পাওয়া, প্রথম হয়ে দ্বিতীয় বর্ষে ওঠা এবং ওই শ্রেণীতে থাকতেই অ
স্কুলের বার্ষিক প্রদর্শনীতে 'বাঁশের সাঁকো' জলরঙের জন্য উচ্চ-প্রশংসিত হয়ে 'High
commended' সম্মাননা পাওয়া ইত্যাদি থেকে শুরু করে আর্ট স্কুলের ডিপ্লোমা কোর্সে
শেষ পরীক্ষায় (১৯৩৮) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া; আবার ওই বছরই কোলকাত
একাডেমী অফ ফাইন আর্ট আয়োজিত নিখিল ভারত প্রদর্শনী-প্রতিযোগিতায় (গ
পুরস্কার জলরঙের 'On and over the Buriganga' চিত্র-মালার জন্য) 'গভর্নরস গো
মেডাল' লাভ করা সবই ছিলো শুধুই সাফল্যের ধারাবাহিকতা। পাশাপাশি শেষব
অধ্যয়নকালে আবেদিন ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, ‍
স্বাভাবিক অস্থায়ী বা সাময়িক একটা ব্যবস্থা ছিলো তা—পরবর্তীতে ১৯৩৯ সালে শিক্ষ
আব্দুল মঈনের অকালমৃত্যুর পর ওই শূন্য পদটিতে তাঁকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দে
হয়েছিলো। আর যে-মানুষটি শিক্ষার্থী পর্যায়ে কিশোরবেলায় ও তরুণ বয়সে শিক্ষকদে
প্রিয় ছিলেন, শিক্ষকতাকালেও শুরু থেকেই তাঁর বিপুল সমাদর প্রাপ্তি ঘটে আপন ছা
ছাত্রীদের কাছ থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশের চিত্রাঙ্গনে শিল্পের শিক্ষাগুরু হিসে
তিনি ষাটের দশকের শেষার্ধে 'শিল্পাচার্য' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন, সে-ও তাঁর গুণমু
শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা উৎসারিত প্রাণের টান থেকে, তাদের উদ্যোগেই।[৮]

আবেদিনের ত্রিশের দশকের যে-সমস্ত চিত্র উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের তীে
শম্ভুগঞ্জের পেন-স্কেচসহ, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি এবং মাছধরা ও নৌকার ছবি ছাড়াও নদী

ঘাট, নদীতীর ও গ্রামবাংলার দৃশ্য, সাঁওতাল ও গ্রামীণ মানুষের প্রতিকৃতি ইত্যাদি। জীব-জন্তু, গবাদিপশু ও পাখির অনুশীলনধর্মী কাজগুলিও স্মরণযোগ্য। ফিগার-স্টাডি ছাড়াও এ্যানিমাল-স্টাডি ও বার্ডস্টাডি হিসেবে ছাত্রজীবনে সম্পন্ন সমুদয় কাজসহ তাঁর স্কেচগুলি অসাধারণ মেধার পরিচয়বাহী এবং সাবলীল সৃজন-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর। এ সমস্ত কাজের অধিকাংশই ঢাকার বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। ১৯৩৮-এ ছাত্রাবস্থা পেরোনোর পর তেতাল্লিশের স্কেচমালা অঙ্কনের আগে পর্যন্ত যে-সমস্ত কাজ করেছেন তার মধ্যে তাঁর জুনিয়র এবং দীর্ঘকালের সহকর্মী আনোয়ারুল হক-এর কলমে আঁকা অসাধারণ প্রতিকৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের প্রতিকৃতি তিনি সে-সময় আরও এঁকেছিলেন। পেন্সিল, জলরঙ ও তেলরঙে আঁকা দুমকা অঞ্চলের জনজীবন ও প্রকৃতি-পরিবেশ সম্পর্কিত দৃশ্যসমূহ, কিছু লিনোকাট ছাপাইছবি, 'দুটি হরিণ', 'দুটি কাক' আর কিছু প্রতিকৃতিসহ ওই সময়কালের মধ্যে আবেদিন প্রতিষ্ঠান-পর্যায়ে অর্জিত শিল্পদীক্ষা তথা ইউরোপীয় অনুশীলনধর্মী বাস্তববাদী ধারার সঙ্গে প্রতিচ্ছায়াবাদী শিল্প ধারার নিকটত্বে শিল্প-সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। তারই সাথে স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গীর জলরঙ ওয়াশ, যা ব্রিটিশ-পদ্ধতির নিকটতর না হয়ে বরং জাপানী ওয়াশ-টেক্‌নিকেরই নাগাল ছোঁয়া বেশি এবং তা অধিকমাত্রায় তাঁর অনুসৃত প্রকাশ-আঙ্গিকে তখন প্রভাবশীল। আবেদিনের রেখাঙ্কনের জোর কন্ট্যুর-প্রতিষ্ঠায় ভীষণ শক্তিশালী মাত্রা স্থাপন করেছিলো, তাই তাঁর স্কেচ্ তা পেন্সিল-কলম, কন্টি বা চারকোল-ক্রেয়ন যে মাধ্যম-উপকরণেই হোক একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপবন্ধ গড়ে তোলার সহায়ক ছিলো। আর তাঁর সৃজন-দক্ষতা অর্জনের ভিত্তিমূলে যেহেতু বাস্তবসম্মত পরিপ্রেক্ষিত আর ত্রিমাত্রিক গুণ-সমৃদ্ধ আলোছায়া সন্নিবেশিত মডেলিং বা ডৌল উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ঘনত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ছিলো, তাঁর তখনকার যে-কোনো কাজেই বিশেষ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিলো ওই সব চিত্রগুণ। ফলে যে-কোনো মাধ্যমে আঁকা তাঁর ছবির একটি সাধারণ অঙ্কনরেখাও যেনো মনে হয় অঙ্কিত বস্তুবিশেষ কিংবা মানবাকৃতি-পশুপাখি-গাছপালা প্রবলভাবে বাস্তবানুগ রূপাকৃতির অনুসন্ধানী। যার মধ্যে দেখা যায় অনায়াসে ফুটে উঠেছে গভীরতা এবং যা পরিণতিতে বাস্তব জীবন-সন্ধানী হয়ে ওঠে।

৭.

পঞ্চাশের মহামন্বন্তর ছিলো মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। ১৩৫০ বঙ্গাব্দ বা ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিলো—কারও মতে ৩০, কেউ বলেন ৫০ লক্ষ। সেদিন পশ্চিমবঙ্গে কোলকাতা মহানগরী পরিণত হয়েছিলো এক হাহাকারের শহরে। একমুঠো ভাত, খাবারের একটি টুক্‌রোর জন্য আহাজারি নিরন্ন মানুষের-দ্বারে দ্বারে হাত পাতে মানুষ। 'ফ্যান দাও' 'ফ্যান দাও' বলে কাত্‌রায় তারা। অথচ কোনো প্রতিকার নেই, সম্ভাবনাও যেনো নেই কারুর দয়ার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসার। ফলে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে যাত্রা তাদের।

গ্রামবাংলার অবস্থা সর্বত্র এক, শুধুই অসহায় ক্ষুৎপীড়িত দরিদ্র জনমানুষের মরণদশা। সুতরাং, বাঁচতে যেহেতু হবে, তাই শহরপানে ছোটার তাগিদ। আর গ্রাম থেকে, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছুটে গিয়েছে মানুষ কোলকাতায় দলে দলে, সার বেঁধে। অথচ সেই স্বপ্নের কোলকাতার তারা তাদের আশা পূরণ করতে পারেনি, সঙ্গী হয়েছে তাদের মৃত্যুযন্ত্রণা। আর তাই একদা কোলাহল কলকাকলিতে পরিপূর্ণ কোলকাতার রাজপথে অনাহারি মানুষের করুণ আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে, কোলকাতা মহানগরী হয়ে উঠেছে অমানবিক যন্ত্রণাবিদ্ধ এক অভিশপ্ত শহর। রাজপথে পড়ে থেকেছে মানুষ, ফুটপাথে লাশ—মা-শিশু-অবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, পরিধানে স্বল্প বস্ত্র অথবা প্রায় বস্ত্রহীন—আর এই হচ্ছে অবমানিত মানবসত্তার বাস্তব-চিত্র : শুধুই বাঁচার তাগিদে, খাদ্যের প্রয়োজনে, কোলের শিশু, স্ত্রী-কন্যা বিক্রি হলো কতো যে; নারী অবাধে বিকিয়ে দিলো তার সম্ভ্রম; ডাস্টবিনে খাবারের সন্ধানে হিংস্র কুকুরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে দুর্বল-শরীর আদমসন্তান, মানুষ-কুকুর-কাকের কাড়াকাড়ি উচ্ছিষ্টের ঠোঙা কিংবা লঙ্গরখানার পরিত্যাক্ত কলাপাতাটি নিয়ে।

তেরোশ পঞ্চাশের মন্বন্তর আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক ঘটে যাওয়া এক দুর্যোগকাল বলে মনে হলেও মোটে তা সত্য নয়। দীর্ঘসূত্রী মানব-বিরোধী আস্ফালনেরই তা প্রতিফল, আর তার জেরও চলেছে বাংলার বাঙালির উপর লম্বা ছায়ার দীর্ঘদিন। এ-বিষয়ে সমর্থিত মতটি হচ্ছে '১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে জার্মানি যখন পোলান্ড আক্রমণ করে' প্রকৃতপক্ষে তখনই সূত্রপাত ঘটেছিল ওই মহাসঙ্কটপূর্ণ অবস্থার। জড়িয়ে পড়ে তার সাথে ভারতও। আর সেই নারকীয় তাণ্ডবের মধ্যে কোলকাতার ঠিকানাও যেনো খেই হারিয়ে ফেলেছিলো। কারণ রাজধানী কোলকাতা তখন সেজেছে যুদ্ধসাজে, পরিণত হয়েছে এক নরক-কুণ্ডে। বিশ্ব যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় স্বাভাবিক জীবন যাত্রার চরম-অবনতি ঘটে, খাদ্যাভাব চরমে ওঠে। বাংলার গ্রামাঞ্চল জুড়ে সেই মনর্ঘটার বিস্তার—তারই চূড়ান্ত পরিণতি দৃশ্যনীয় হয়ে ওঠে তেতাল্লিশে।[৯]

'দায়' গ্রন্থে দীপাঙ্ক বর্ণনা দিয়েছেন : "১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ এবং তার পায়ে পায়ে আসা মহামারীতে অন্তত ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিলেন মানুষেরই সৃষ্টি এই দুর্ভিক্ষে। তাদের অধিকাংশই গাঁয়ের গরিব মানুষ। ভূমিহীন কৃষক, ছোট বা প্রান্তিক চাষী, গরিব গৃহস্থ, কারিগর, জেলে, ছোট দোকানি, মাঝিমাল্লা এবং যাঁরা ধান ভেঙে পেট চালাতেন তাঁরা।"[১০] বলাবাহুল্য এই বর্ণনায় যাদের কথা বলা হয়েছে সেই গ্রামবাংলার অতিসাধারণ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ; প্রকৃতপক্ষে শ্রমজীবী শ্রেণীর বা পেশাজীবী ও স্বল্প আয়ের মানুষই ছিলো হৃদয়বান জয়নুল আবেদিনের ভালোবাসার মানুষ। জয়নুল আবেদিন গ্রামে যেতেন শুধুই যে নদী আর নিসর্গের টানে একথা যদিবা সত্য হয়, আসলে তিনি হৃদয়ের টান অনুভব করতেন ওই গ্রামীণ মানবগোষ্ঠীর জন্যই—যাদের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদতো সবসময়; তিনি তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, প্রাণঢালা দরদ উজাড় করে দিতেন তাদের। সুতরাং অনুমান করে নেয়া খুবই সহজ যে, কোলকাতার রাজপথ জুড়ে যখন তাঁর ভালোবাসার ধন সেই একদিকে বাঙালি আর সর্বোপরি বঞ্চনার শিকার প্রিয় মানবকুল, অবহেলায়-অনাদরে হাড্ডিসার হয়ে ভাসমান—কিংবা নির্জীব অবস্থায় ভূ-লুণ্ঠিত, আবেদিনের মানসিক

পরিস্থিতি তখন কোন পর্যায়ে যেতে পারে; সহজেই অনুমেয় তাদের এসব দৃশ্য চোখের সামনে দেখে জয়নুল আবেদিনের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাঁর জীবন-বীণার দুটি তার, একটি ব্যক্তি-সত্তা আরেকটি শিল্পী-সত্তা—দুটি তারই কেঁপে উঠেছিলো, অনুরণিত হয়েছিলো সেই দুঃসহ দৃশ্য অবলোকনে। আন্দোলিত হয়েছিলো একই স্বরকম্পনে ব্যক্তি-জয়নুলের মন আর শিল্পী-আবেদিনের হাত। সুতরাং তার সরাসরি ফল যা হওয়া অনিবার্য ছিলো তাই ঘটে গেছে তৎকালীন ভারতীয় শিল্পাঙ্গনে যে শুধু তাই নয়, বিশ্ব-শিল্পভুবনেই ঘটেছে এক নব-বিস্ফোরণ। অশোক ভট্টাচার্যের ভাষায় : "অসহায় আর আর্ত মানুষের এমন ছবি পৃথিবীর দীর্ঘ শিল্প ইতিহাসে এতো একাত্মায় এতো ঋজুতায় আর কখনও আঁকা হয়েছিলো বলে জানা যায় না। এই দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা, অসহায় গ্রাম-মানুষের দুর্দশা, এক ধাক্কায় জয়নুলকে প্রকৃতি-প্রেমীর অবস্থান থেকে সমাজ বাস্তবতার রূঢ়জগতে পৌঁছে দিল। তিনি দুর্ভিক্ষের কারণ বুঝলেন; চিনলেন শোষণের রূপকে; অচিরেই সভ্য হলেন ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের। তখন কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র দি পিপলস্ ওয়ার-এর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ২১ জানুয়ারী সংখ্যায় তাঁর তিনটি দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল; এবং সেই সঙ্গে ছিল তাঁর ওপর বিশেষ একটি নিবন্ধ। তাতে এই বিশ্বাস ব্যক্ত করা হয় যে, জয়নুল সব সময়েই সাধারণ মানুষের সংকটে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াবেন। এই আশা জয়নুল তাঁর সারা শিল্পীজীবনে কখনও ব্যর্থ হতে দেননি।"[১১]

'ভারতের নাইটিঙ্গেল' সরোজিনী নাইডু আবেদিনের ওই সমস্ত কাজ দেখে তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে, ব্যথাতুর আবেদনের পরিপূর্ণব্যাখ্যায় এরা সমৃদ্ধ। প্রখ্যাত কলাসমালোচক ও ঐতিহাসিক অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ও সি গাঙ্গুলি) মূল্যায়ন করেছিলেন এভাবে যে, বঙ্গদেশীয় শিল্পীদের কাজের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না এমন নানাগুণে এরা গুণান্বিত। তিনি এসব চিত্রকে আধুনিকতার নবতর অবস্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১২]

আবেদিনের দুর্ভিক্ষ-চিত্রমালা এমন এক শক্তির যোগান দিয়ে গেলো শিল্পকলার ভুবনে যা গুরুত্বে ও অভিনবত্বে সাফল্যের শিখরস্পর্শী। এমন ঘটনা বিশ্বশিল্পের ইতিহাসে খুব কমই ঘটেছে যে, ছবি আঁকা হলো আর অমনি তা প্রশংসিত হয়ে স্বীকৃত হয়ে গেলো জাতীয় পর্যায়ের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত। জয়নুল আবেদিনের এসমস্ত ছবির ক্ষেত্রে তাই সত্য হয়েছিলো। আসলে পুরো ব্যাপারটাই ঐতিহাসিক তাৎপর্যে ছিলো সমুন্নত। সে কারণেই তার ঐতিহাসিক মূল্যও সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হতে পেরেছিলো। সম্পূর্ণ পরিস্থিতি ছিলো বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ঘটনাবলির সঙ্গে সম্পর্কিত। দুর্ভিক্ষ ছিলো তারই ফল। আর সেই সূত্রপথেই আবেদিন দুর্গতি-আক্রান্ত অবমানিত মানবজাতির অসহায়ত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর ভেতরের সুপ্ত ক্ষোভ ও পুঞ্জিভূত বেদনার আর্তি তাকে প্রাণিত করেছিলো প্রতিবাদ জানাতে ওই মর্ম-বিদারক ঘটনার পেছনে যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে। তাঁর প্রাণমন উচ্চকিত হয়েছিলো এবং তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁর সে-সময়ের করণীয় সম্পর্কে-তাই কর্তব্যের তাগিদে উপযুক্ত পদক্ষেপ প্রদানের বিষয়টি নিয়ে তাঁর ভাবতে হয়নি। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে তাঁর কালক্ষেপ করতে হয়নি। আগেই

বলেছি আবেদিনের কমিটমেন্ট ছিলো মানুষের প্রতি, বিশ্ব-মানবতার প্রতি—মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবসা ও দরদ যে অপরিসীম। আর তাঁর সৃজনশিল্পী-সত্তার কাছেও তো তাঁর আবাল্যের প্রতিশ্রুতি। ওই প্রবঞ্চিত, পরিস্থিতির শিকার, অসহায় দুর্বল নর-নারী—ওরা যে তাঁর একান্ত আপনার জন, অবহেলায় পড়ে থাকবে ওরা পথের ধুলায়। তবে কি নিঃশেষিত হয়ে যাবে ওরা। তা হতে পারে না। আবেদিন তড়িৎ সিদ্ধান্তে নিজের সাধনার সঙ্গী করলেন তাদের। ধরা থাকলো ওই বঞ্চিত মানবগোষ্ঠীর তাঁর চিত্রপটে, অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে; আজও কতো জীবন্ত, প্রাঞ্জল তাঁরা। আজও প্রতিবাদমুখর এবং প্রতিনিধিত্বশীল।

ওই চিত্রমালার উদ্ভবই হলো একটা আন্তর্জাতিক চরিত্রের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে। প্রদর্শনী হলো, তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে; একদিকে পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত হলো সে-ছবি, ভারতের বাইরেও হলো—ফরিয়াদ জানিয়ে বেড়াতে লাগলো ছবিগুলি বিশ্ববিবেকের দরবারে; আর অন্যদিকে, শোনা যায় এক ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজের ক্যাপ্টেন কৌশলে আবেদিনকে নানা প্রলোভন দেখালো সেসব হস্তগত করার জন্যে।[১০] আবেদিন ওই চিত্র-সম্ভারের একটি ছবিও বিক্রি করেননি—বুকের ধন করে আগলে রেখেছিলেন নিজের কাছে সারাজীবন। এ তথ্য আজ আর কারুর অজানা থাকার কথা নয়।

আবেদিনের তেতাল্লিশের স্কেচমালায় যে শিল্প-শৈলীর উদ্বোধন ঘটেছিলো, এবং সমাজে বসবাসরত একজন শিল্পী-ব্যক্তির মানবিক গুণের অংশ হিসেবে দায়বদ্ধতার যে অসামান্য প্রতিফলন ঘটেছিলো তাঁর মধ্যে, আর ওই শিল্প-সম্পদে সমাজবাদী ও জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর যে নবতর স্ফুরণ ঘটেছিলো সেসব দিক লক্ষ্য করলে তাদের প্রতি কোনোভাবেই সংকুচিত দৃষ্টি দেয়া চলে না। আর অন্যদিক থেকে ওই চিত্র-সৃষ্টিতে আবেদিনের সূক্ষ্ম জীবনবোধ ও মানবতাবোধের প্রকাশসহ তারই পাশাপাশি যে রুচিবান শৈল্পিক-সৃজনশক্তি এবং সুদক্ষ হাতের নিপুণ প্রয়োগ-বিন্যস্ত শিল্পরূপ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা মানুষের বিশাল কর্মাঙ্গনে শিল্প-স্রষ্টার ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের সজাগ করে তোলে। ওই চিত্রাবলি তাই এখন আর স্কেচ্ বা ড্রইং কিংবা শক্তিমান শিল্পীর হাতে উঠে আসা স্রেফ রেখাচিত্রের প্রেক্ষিতে বিবেচিত হওয়ার অবকাশ নেই। অসাধারণ শিল্পগুণে গুণান্বিত চিত্রশিল্পের স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ-বৈশিষ্ট্য ধারণীয় তা। আর সবচেয়ে বড় কথা অন্যায় ও শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধবাদী, সমাজবিরোধী চক্রান্তকারীগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার আবেদিনসৃষ্ট তেতাল্লিশের চিত্রমালা মানবজাতির প্রতি দরদ বা মায়ামমতা জাগরিত করার প্রেরণা হিসেবেও অবশ্যই দীপ্তকীর্তি।

৮.

আবেদিনের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় একটা অদ্ভুত ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যায়। যাঁরা তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন বলেছেন, তাঁরা সব সময়ই দেখা যায় সামান্য ভূমিকামাত্র দিয়ে বঙ্গাব্দ তেরোশ পঞ্চাশের মন্বন্তরে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের ঘটনায় মনোযোগী হয়ে পড়েন।

তাঁদের লেখনিতে উঠে আসে একজন করিৎকর্মা তরুণ শিল্পী ও শিক্ষক জয়নুল আবেদিনের নাম। যিনি বাংলার দুর্ভিক্ষ পীড়িত, জীবন্মৃত ও অনাহারক্লিষ্ট অসহায় মানুষ কিংবা রাজপথে-ফুটপাতে পড়ে থাকা মৃত কিংবা অর্ধমৃত গ্রামীণ মানুষের অজস্র ছবি এঁকে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। আর সেই শক্তিমান শিল্প-স্রষ্টার শিল্পীজীবনের গতি যেনো সেখানেই থেমে গেলো। বিশেষ করে তাঁর সেই দুর্ভিক্ষের স্কেচ-ড্রইং চরিত্রের ছবিগুলি সম্পর্কে ভারতীয় শিল্প সমঝদার আর কলা-সমালোচক কিংবা পাশ্চাত্যের শিল্পী ও শিল্প-সমঝদার-তাত্ত্বিকেরা যে-সমস্ত কথা বললেন তা-ই যেনো হয়ে গেলো জয়নুল আবেদিনের গুণকীর্তনের একমাত্র মাপকাঠি। আর তাই নিয়ে ধারাবাহিকভাবে চর্বিতচর্বণ করে চললেন পরবর্তী সময়ের কলাবিশারদেরা বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সবাই মূলত যেনো ওই বাস্তবতাকেই একক অবলম্বন ঠেয়ে আঁকড়ে ধরে থাকলেন; এমনকি পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের মধ্যেও অনেককেই দেখা গেলো একেবারে সীমিত একটা পরিধির মধ্যে ফেলে সঙ্কুচিত সময় এবং সংক্ষিপ্ততার প্রেক্ষিতে আবেদিনের মূল্যায়ন-পর্যালোচনা তাঁরা করে থাকেন। মনে হয় যেনো শুধু একথাগুলো বলাই যথেষ্ট যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষভাগে বিশ্বযুদ্ধের ফলে এবং তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকারের দূরদর্শিতার অভাব ও চরম ঔদাসীন্যের ফলস্বরূপ একটা দারুণ আকাল পড়েছিলো বাংলায়, তাই গ্রামবাংলা থেকে রাজধানী কোলকাতা মহানগরীর দিকে বাঁচার জন্য ছুটে আসা বুভুক্ষু গ্রামীণ মানুষ, ব্রাত্যজনেরা খাদ্যাভাবে হাড্ডিসার হয়েছিলো, এবং সেই জীবন্ত নর-কংকালদের বাঁচার আকুতি, হিংস্র কুকুর ও ধূর্ত কাকের সঙ্গে ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট পঁচা-পচা খাবার নিয়ে সৃষ্টির সেরা জীব সেই মানবসন্তানের কাড়াকাড়ি—এসব ঘটনা ঘটে যাচ্ছিলো অহরহ; তখন কিছু চিত্রশিল্পী সেই সমস্ত করুণ মর্মবিদারক দৃশ্য দেখে অনুপ্রাণিত হন এবং চিত্রাঙ্কন করেন। একথা ঠিক, দুর্ভিক্ষের বাস্তবানুগ দৃশ্যাবলি-নির্ভর চিত্র-প্রকাশে জয়নুল আবেদিন ছিলেন সবচেয়ে অগ্রণী চিত্রকর—এ বিষয়ে দ্বি-মত কেউ করেননি; কারণ সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আর একইসঙ্গে মানবতাবোধে উদ্দীপ্ত ও সৃজনশীল আবেদনে পরিপূর্ণ প্রতিবাদী স্বরূপে উদ্ভাসিত ছিলো তা—সেদিক থেকে সাফল্যের মাপকাঠিতেও সংবেদনশীল ও শিল্পগুণী বৈভবে সমৃদ্ধ চিত্র-সম্ভার তিনি উপহার দিয়েছিলেন একথাটিও স্বীকৃত। জয়নুল মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁর তেতাল্লিশের অবস্থানকেই চিহ্নিত করে একজন শক্তিধর ড্রইংবিদকে উপস্থাপনের প্রবণতা লক্ষ্য করি অধিকাংশ ক্ষেত্রে। বিষয়টির স্বাভাবিকতা মেনে নেয়া চলে, কিন্তু অনিবার্য বলে মনে করতে পারি না। কথাশিল্পী শওকত ওসমান স্মৃতিকথায় যথার্থই উল্লেখ করেছেন : "জয়নুলের দুর্ভিক্ষের স্কেচগুলো তাঁর খ্যাতির ব্যারোমিটারের পারদ হয়ে দাঁড়ায় ক্রমশঃ ঊর্ধ্বসীমায়।"[১৪] কথাটি একশোভাগ খাঁটি। কিন্তু তেতাল্লিশের আবেদিন ছিলেন প্রাক-ত্রিশ বয়সী এক কর্মিষ্ঠ প্রতিশ্রুতিশীল যুবক-শিল্পী, যাঁর চেতনায় ছিলো এক গভীর সংবেদী মন-মানসের অভিসরণ—এজন্য কোলকাতার রাজপথের সেই মানবিক আহ্বান উপেক্ষা করা দূরের কথা, তিনি ঐ পরিস্থিতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, নিমজ্জিত-হয়ে গিয়েছিলেন

তার মধ্যে—অর্থাৎ সমার্থে সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন মহানগরী কোলকাতার সেই ভয়াবহ দুর্দিনের অসহনীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে; ওই দুঃসহ উপলব্ধির ভার তিনি পথপার্শ্ব থেকে তুলে এনে ১৪ নং সার্কাস রো-র আবাসস্থল ভরিয়ে ফেলেছিলেন এবং এভাবেই অতঃপর তাঁর শিল্পভুবনে স্থায়ী ঠাঁই দিয়েছিলেন। আগেও বলেছি যে, জয়নুল আবেদিন শত প্রলোভনেও ওই ছবিগুলো বিক্রি করেননি বা হাতছাড়া করেননি—আর সবসময়ই সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও সেগুলি রক্ষা করতে তিনি যতোদূর সম্ভব সদাতৎপর ছিলেন। এতো কথার পরও ওই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজাটা আমার কাছে জরুরি হয়ে দেখা দিচ্ছে যে, আবেদিন বয়সের স্বাভাবিক গতিতে যৌবনকাল পেরিয়ে বার্ধ্যক্যে উপনীত হয়েছিলেন এবং অনিবার্যভাবে অধিকতর পরিপুষ্ট হয়েছিলেন দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায়—সেই পরিণত বয়সকালের তাঁর নিজস্ব শিল্পভুবন একদিকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিলো, অন্যদিকে শিল্পরসজনিত চিত্রগুণের মাপকাঠিতে তা প্রাচুর্যময় হয়ে উঠেছিলো একথা ভুললে চলবে না। বলিষ্ঠ অঙ্কন-রেখার গুণ থেকে তথা ড্রইং-ভিত্তি থেকে উৎসারিত আবেদিন-শিল্প ক্রিয়েটিভ পেইন্টিং কোয়ালিটির সমধিক মাত্রা স্পর্শ করেছিলো একথাটি স্বীকার করতেই হবে। আর ওই স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হলে তেতাল্লিশখ্যাত-আবেদিনের ভিত্তিমূলের নাগাল ছুঁয়ে শিল্পী যে বিশাল ইমারত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন তার দিকে ঘোলা চোখে নয়, সম্পূর্ণ খোলা দৃষ্টিতেই তাকাতে হবে। আবেদিনের চল্লিশের দশকের কাজ বিশেষত তার তেতাল্লিশের অর্জন সম্পর্কিত বিষয়াদি বিদেশী এক্সপার্টদের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে যেভাবে মূল্যায়িত হয়েছিলো সেভাবে পরবর্তী সময়ের কাজ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য নজরে পড়ে না। ফলে আমরা যখন তাঁদের পুরানো বক্তব্যগুলিই রেফারেন্স হিসেবে টানি তখন পরিপূর্ণ আবেদিন উপস্থাপিত হন না, আমার বলবার বিষয় এক্ষেত্রে সেটাই।

জয়নুল আবেদিনের তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ বিষয়ক চিত্রাবলি অঙ্কন সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি বা পাওয়া যায় সেসব নানারকম সমর্থনযোগ্য ও অসমর্থিত কাহিনীতে পরিপূর্ণ প্রথম সমস্যাটি যেক্ষেত্রে হয় তা হচ্ছে, ছবিগুলি ছোট ছোট খসড়া বা লে-আউট করে এনে তা থেকে ইম্প্রভসহ বড় করে এঁকেছেন? নাকি কোনো এক বা একাধিক দৃশ্য তাঁর মনে দাগ কেটেছিলো যা থেকে পরে তিনি মেমোরি-ড্রইং করেছিলেন? তো জয়নুলে এ সবই সম্ভব ছিলো। অসামান্য প্রতিভার ও অসাধারণ মেধার অধিকারী এই সৃজনশীল মানুষটির স্মরণশক্তি ছিলো প্রখর। বিশেষ করে মানুষের রূপাকৃতি বা চেহারা মনে রেখে পরে তা অবিকল স্কেচ্ করার কিংবা চিত্রে উপস্থাপন করার ক্ষমতা তাঁর আগাগোড়াই ছিলো।

১৯৪১ সালে কোলকাতায় থাকতে যখন আবেদিন আর্ট স্কুলে শিক্ষকতায় নিয়োজিত তিনি ট্রামে-বাসে যাতায়াত করতেন। তখনকার কিছু (তেইশটির সন্ধান পাওয়া গেছে) ট্রামের টিকিটের খালি পিঠ আবেদিনের মূলত মেমোরি-নির্ভর স্কেচ্-প্রতিকৃতি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলো অনায়াসে, সংগৃহীত ছিলো কবি বেগম সুফিয়া কামালের কাছে—সেগুলি তাঁর

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও নিপুণতার পরিচায়ক।[৮] একথা মেনে না নিয়ে উপায় নেই যে, এসবই ছিলো আবেদিনের প্রাক্-তেতাল্লিশ পর্যায়ের প্রস্তুতিপর্ব। তাঁর মন্বন্তর কেন্দ্রিক উত্থান আকস্মিক ছিলো না কোনোভাবেই।

জয়নুল আবেদিন তখন কোলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকার বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন ১৪নং সার্কাস রো-তে। বাসাটি ছিলো এককক্ষ বিশিষ্ট, রাস্তার দিকে একটিমাত্র দরজা থাকলেও তা ছিলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। জয়নুলের তেতাল্লিশের স্কেচমালার "আতুরঘর ওই চৌদ্দ নম্বরের ড্রইং-ডাইনিং-কাম-স্টুডিওর চত্বর"।[৯] সম্প্রাপ্ত তথ্যটি হলো, কোলকাতা শহর ও শহরতলির বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিনি স্কেচ্ করেন প্রাথমিক খসড়া হিসেবে। পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর কথিত আবাসস্থল বা স্টুডিও ঘরে বসেই সাধারণত তার চূড়ান্ত রূপ দিতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তরুণ শিল্পী জয়নুল আবেদিন প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এবং তার রূপকার হিসেবেই মূলত এগিয়ে চলেছিলেন রোমান্টিক চিত্রকর পরিচয়ে। গ্রামবাংলা এবং শহর ও শহরতলির সমাজ-পরিবেশ ও নিসর্গ ছিলো তাঁর প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ তাঁকে সচকিত করে, জয়নুল আবেদিনের শিল্পদৃষ্টিতে পরিবর্তন আসে। যিনি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না অথচ তারই মধ্যে এক মানবপ্রেমিক সচেতনতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে গিয়ে রীতিমতো একটা প্রতিবাদী সত্তার স্ফুরণ ঘটে গেলো। তার দুর্ভিক্ষ-চিত্রমালা ওই জাগরণেরই বহিঃপ্রকাশ। মাটির মানুষ আবেদিনের মনের মধ্যে যে ক্ষোভের-বিদ্রোহের-প্রতিবাদের আগুন সুপ্ত ছিলো তাই যেনো প্রকাশ পেলো অবলীলায়।

আবেদিনের শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে বা যদি বলি তার চিত্রপটে প্রায় সবসময়ই এক ধরনের সর্বাঙ্গসুন্দর সৌম্য রূপ লক্ষ্য করা যেতো। যার অবস্থান ছিলো বিকটত্ব কিংবা বীভৎসতার বিপরীতে। রুচির 'কু' আর 'সু' নিয়ে তার ভাবনা ছিলো সবসময়। বলতেন, দুর্ভিক্ষ হচ্ছে 'রুচির দুর্ভিক্ষ' আর তা মানুষের সৃষ্টি—আমাদের সংগ্রাম ওই রুচির দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে। বিষয়টির প্রতিফলন তাঁর মধ্যে এমনই স্থায়ী কার্যকর ছিলো যে, ষাটের দশকে একদিন কথায় কথায় তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মানুষ আর পশ্চিম পাকিস্তানের রুচির পার্থক্য চিহ্নিত করতে গিয়ে বন্ধু-সুহৃদ লোক-গবেষক তোফায়েল আহমেদ-এর কাছে ক্ষোভের সঙ্গে বলেই ফেলেছিলেন : "ওরা চাঁদ আর গোলাপ ফুলের ছবি আঁকে। ওদের কাছ থেকে কি আর আশা করা যায়?"[১১] তাঁর ওই বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে জয়নুলের জীবন-দর্শন ও শিল্প-দর্শনের প্রতিফলন। আবেদিনের সম্পর্ক মাটির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে। তার শিল্পদৃষ্টিতে সর্বদা কার্যকর এক আধুনিক শিক্ষিত রুচিবান মানস। চাঁদ আর গোলাপ দুয়ের অবস্থানই আপেক্ষিক অর্থে তা থেকে অনেক দূরে।

জয়নুল আবেদিনের ব্যক্তি-জীবন ও শিল্পী-জীবনের দর্শন কিংবা সামগ্রিক অর্থে তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর রুচি-অভিরুচির দিকটাতেই আমি জোর দিচ্ছি এজন্য যে, তাঁর সৃজনশিল্পী সত্তায় যে-বোধ সদাজাগ্রত ছিলো তার নাম সুস্থ-সুন্দর

জীবনচেতনা। তিনি ছিলেন মানবপ্রেমিক ও জীবনবাদী চিত্রশিল্পী। সেই হেতু কর্ম-শৃঙ্খলার সৌন্দর্য-প্রতিষ্ঠার আদর্শেই তিনি প্রাণিত ছিলেন, এবং এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে ছিলেন স্ব-দীক্ষিত। জীবনভর শিল্প-সাধনা যা করে গেছেন সে ছিলো ওই বাস্তবতার অনুকূল। তাঁর ছবিতে একধরনের অনাড়ম্বর সারল্যের প্রকাশ-আঙ্গিক যেমন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, ঠিক একইভাবে চিত্রপটের জমিন সর্বদাই বাহুল্য-বর্জিত হয়ে শুধু তাই নয়—অসতর্কতা হেতু ওয়াশআঙ্গিক কিংবা পটভূমিতে যে কখনো কোনো বাড়তি স্পট বা অনাকাঙ্ক্ষিত এফেক্ট জুড়ে বসবে তেমনটি অয়নুলে সচরাচর ঘটেনি। ছোটবেলা থেকে খেয়ালিপনার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা মানুষটি কতোখানি মেথোডিকাল ছিলেন ব্যক্তি-জীবনে সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে উত্তর নেতিবাচকই হবে, কারণ ওই নেতিবাচকতার প্রমাণ নানাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাঁর জীবনেতিহাসে; কিন্তু শিল্পসৃজনক্ষেত্রে উত্তর হবে শতকরা একশোভাগ ইতিবাচক, কেননা সেক্ষেত্রে তিনি কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব মিলিয়েই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

শিক্ষার্থী জীবনে প্রাচ্যকলাকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা কিংবা (সমার্থক নয়) নব্যবঙ্গীয় ধারা তথা ভারতীয় চিত্ররীতি নিরপেক্ষ ইউরোপীয় প্রাতিষ্ঠানিকতাকে বরণ করেছিলেন আপন ইচ্ছায়—বিজ্ঞানসম্মত পরিপ্রেক্ষিত চিন্তা আর প্রকৃতি ও বস্তু ইত্যাদির ত্রি-মাত্রিক গড়ন-গঠন সম্পর্কিত বাস্তববাদী জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে নিজের শিল্পচিন্তাকে শাণিত করে বেড়ে উঠেছেন তিনি, আবার এমন এক প্রকাশ-আঙ্গিক অনুসরণ করলেন শেষ পর্যন্ত যা পুরোপুরি পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পধারার দাসত্ব করেনি যেমন, আন্তর্জাতিক চারিত্র্যরূপে অভিষিক্ত হয়েও তা আবার স্বদেশানুগতাকে অস্বীকার করেনি। এভাবেই তাঁর ছবিসকল রূপ-স্বাতন্ত্র্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়নি; বরং স্বকীয়তার প্রখর উজ্জ্বলতা বিস্তার করার মধ্য দিয়ে তা একক আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। আর তিনি স্বীকৃতিও অর্জন করেছেন এই পথে অগ্রসর হয়ে। এই সমগ্র বিষয়টি তাঁর হিসাব মেলানো শিল্প-সৃষ্টির ফল, সেকথা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে না গিয়েও মেনে নেয়া যায়। পাশ্চাত্যের প্রাজ্ঞ কলা-সমালোচক যখন জোর দিয়ে বলেন আবেদিনের সৃজন-দৃষ্টিতে রয়েছে প্রাচ্যানুগ ভাবের দ্যোতনা, আবার সৃজনশীল নিপুণতা প্রকাশক্ষেত্রে হাতের দক্ষতায় পুরোপুরি খেলে যায় পাশ্চাত্য-ধারার অভিজ্ঞতা-চিত্রমালার মাধ্যমে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন পাশ্চাত্য শোষককুলের বিরুদ্ধে, যাদের কারণেই মূলত পঞ্চাশের আকালের সময় ৫০ লক্ষ আদমসন্তান দুর্গতির শিকার হয়েছিলো। এই হলো আবেদিনের পরিচয়, আর এই তার অক্ষয় কীর্তি।

১.

আবেদিনের শিল্প-চর্চার বাস্তববাদী শিল্পদৃষ্টিভঙ্গী কার্যকর ছিলো শুরু থেকে শেষাবধি। আর 'মানুষ' ছিলো তাঁর শিল্পভুবনের কেন্দ্র জুড়ে আবর্তিত এক বহ্নিমান সত্য। তাঁর শিল্প-সাধনা প্রকৃত অর্থে মানবের আরাধনাতেই অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলো। এখন একথা বলতে কোনোরকম দ্বিধার উদ্রেক হয় না।

আবেদিনের কাজের মূল বিষয়বস্তু মানুষ—মানুষের রূপময় দেহাবয়ব, তার গড়ন-কাঠামো, তার মুখাকৃতি, তার জীবনযুদ্ধ বা বাঁচামরার লড়াই এবং তার দৈনন্দিন জীবন। আর তারই সঙ্গে মানুষ যার অংশ বলে স্বীকৃত, সেই প্রকৃতি-পরিবেশ। দেশ-বিদেশের নর-নারীর ছবি এঁকেছেন জয়নুল আবেদিন, শ্রমিক-কৃষক-জেলে ও মুক্তিযোদ্ধা-গেরিলাসহ বিভিন্ন পেশাজীবীর দেখা মেলে ওই সমৃদ্ধ চিত্রাঙ্কনে। বিষয় হিসেবে মা ও শিশু, স্নান, প্রসাধন, শ্রম, বিশ্রাম ও চলমানতা এসবই প্রাধান্য পেয়েছে, দুর্যোগাক্রান্ত অসহায় মানুষের কথাও আছে তার মধ্যে। আবার মানুষের কাছাকাছি থাকা জীব বা পশু-পাখি এঁকেছেন যখন, সে-সময়ও মানুষেরই প্রতিনিধিত্বশীল প্রতীকী রূপে তার উপস্থাপন ঘটেছে। দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা অঙ্কনের সময় মানুষ আর কুকুরে পার্থক্য দেখতে পান না তিনি—বাঁচার তাগিদ উভয়েরই; একটি চতুর কাকের ছবি যখন আঁকেন তখন তা সুযোগ-সন্ধানী ধূর্ত সমাজবিরোধী মানুষের প্রতীক; আবার যখন দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টারত গাভীর গল্প বলেন তখন তা বাঙালি জাতির বিদ্রোহের কাহিনী হয়ে দাঁড়ায় এবং কাদায় দেবে যাওয়া আটকে পড়া গরুর গাড়ির চাকা ঠেলে ওঠানোর চেষ্টায় মানুষ এবং গরুর যৌথ-প্রচেষ্টা একাত্ম করে ফেলে তাদের, ছবিটার নাম হয়ে যায় সংগ্রাম— যেনো বাঙালির জাতীয় দুর্যোগ থেকে আত্ম-রক্ষার লড়াই চলে; আবার ওই যেখানে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস কিংবা প্রবল ঝড়ে আক্রান্ত মানুষের লাশ ভাসে পানিতে, জলের কিনারায় দেখা যায় লাশের সারি, তার সাথে গবাদি পশুও এক কাতারে শুয়ে থাকে।

আপনার ত্রিভুবনে মানুষের চিত্রায়ণে আবেদিন যে রেখার প্রবহমানতা ঘটিয়েছেন, যে বর্ণিলতার বিচিত্র স্বাদ জুগিয়েছেন এবং সর্বোপরি যে গড়ন ও গঠনের খেলায় মেতেছেন, সবসময়ই তাতে শিল্পরূপ স্থাপন করতে গিয়ে মানুষের রূপ-সৌন্দর্যের বিস্তার ঘটিয়েছেন তিনি। আলোকচিত্রগত সাদৃশ্য নিয়ে তিনি ভাবেননি যেমন, তেমনই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সমমর্মী হয়ে কখনোই কুৎসিতের বা অসুন্দরের ধ্বজা ওড়াননি। তিনি শিল্পস্রষ্টা, তাঁর অঙ্গীকার শিল্প-ভাণ্ডারে রুচির রসদ জোগানো—সে ব্যাপারে তিনি এতোখানিই সচেতন ছিলেন সারাজীবন যে ব্যক্তি-জীবনের আচরণ কিংবা শিল্পী-জীবনের কর্মশৃঙ্খলায় কখনোই বিকৃতির আঁচড় পড়তে দেননি। তিনি খুব আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন, ভাবপ্রবণতা ছিলো তাঁর মধ্যে—আর আত্মমগ্নতার দিকটি ছিলো নিবিড়; কিন্তু তার পরেও তিনি নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকতে চাননি কখনও, সকলের সঙ্গে সবার মধ্যে নিজের অবস্থান থাকুক সেটাই চেয়েছিলেন, আর এজন্যই লৌকিক-সমাজের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ ছিলো। ছাত্রজীবনের তাঁর যে কর্মকাণ্ড সেখানে আমরা দেখেছি কিভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশের চেনা ঠিকানায় পরিভ্রমণ করে তিনি সেখান থেকে ছেঁকে তুলে এনেছেন জীবনের রসদ তাঁর সৃজন-ভাণ্ডারে, শিল্প-পুষ্প-বিকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর শিল্পোদ্যানে। আবার তারই ধারাবাহিকতায় যখন দেখলেন মানবতার প্রতি চরম অবমাননা ঘটছে, ক্ষুধার জ্বালায় মরছে মানুষ যত্রতত্র—সেই মর্মবিদারক দৃশ্যাবলি দেখে শোকাহত হলেন তিনি; তখন ওই যন্ত্রণাকাতর বুভুক্ষু ও জীবন্মৃত মানুষই হলো তাঁর শিল্প-সৃষ্টির মূল প্রতিপাদ্য। আর

তেরোশ পঞ্চাশের তাঁর সেই সৃষ্টির স্বাক্ষর আজও মানুষের প্রতিবাদী সত্তাকে উশকে দিয়ে যাচ্ছে অহরহ, ঘৃণ্য-অমানবিক সুযোগসন্ধানী চক্রের বিরুদ্ধে। এতোদিন পরেও সেই মানব-অবমাননার দুর্বিনীত কাল, সেই বিভীষিকাময় কোলকাতা মহানগরী আমাদের চোখে ভাসে আর আমরা সংক্ষুব্ধ হই। সাংবাদিক-সাহিত্যিক রণেশ দাশগুপ্ত যথার্থই লিখেছিলেন : "কোন ছবি দেখলেই মনে হয়েছে তেতাল্লিশের কলকাতা তো রয়ে গিয়েছে জয়নুল আবেদিনের আঁকা ছবিতে। তখন ঢাকাতেও কেউ জয়নুল আবেদিনের নাম করলে চোখের সামনে মনের সামনে ভেসে উঠতো তেতাল্লিশের দেখা গ্রামীণ মানুষের কলকণ্ঠে নিনাদিত কলকাতা।"[১৮] আর একথাটি আজও সত্য-স্বরূপে উদ্ভাসিত, এই সমকালেও।

সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পর জয়নুল বেঁচে ছিলেন আরও প্রায় তিন যুগ। শিল্প-কর্মাঙ্গন থেকে অবসর গ্রহণের আগেই দুরারোগ্য ব্যাধি নিভিয়ে দিয়েছিলো তাঁর জীবনপ্রদীপ। আর মাঝখানের ওই নাতিদীর্ঘ সময়ে আমরা পেয়ে যাই সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ এক মহান শিল্পী জয়নুল আবেদিনের মহৎ হৃদয় উৎসারিত মানববাদী সৃজনশিল্পের সম্ভার। আবেদিন ছিলেন আবহমান বাংলা ও বাঙালির জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ দেশ-দরদী সংস্কারক-সত্তার অধিকারী মানবপ্রেমিক ব্যক্তিত্ব। অন্যায়ের প্রতি ক্ষুব্ধ দৃষ্টি ছিলো তাঁর, কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশের ভঙ্গীটি কখনোই উগ্র ছিলো না। সর্বতোভাবেই শৈল্পিক রুচির অনুকূলে তাঁর প্রতিবাদী সত্তা প্রতিক্রিয়াশীল ছিলো। ১৯৭০ সালে তাঁর নেতৃত্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'নবান্ন উৎসব' প্রদর্শনী ছিলো এরকমই একটি প্রতিবাদী আয়োজন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ (স্কেলচিত্র : 'নবান্ন' 'আবহমান বাংলা' ১০২ ×১৯৮২ সে.মি.) ছবিটি তিনি সেই উপলক্ষেই এঁকেছিলেন। মধ্য-চল্লিশ থেকে সত্তরের মাঝামাঝি পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত সুস্থাবস্থায় কাজ করা সম্ভব হয়েছিলো তাঁর পক্ষে। কারণ শারীরিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছিলো; ছিয়াত্তরে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান (২৮ মে তারিখে)।

ঢাকার চারুকলা শিক্ষায়তন গড়ে তোলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জয়নুল আবেদিন ১৯৪৮ সালে, একথা সুবিদিত। তেতাল্লিশের প্রকাশবাদী চিত্রমালা রচনার পর মাত্র কয়েক বছর কোলকাতায় ছিলেন, অতঃপর পার্টিশনোত্তরকালে, অব্যবহিত পরেই জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। কোলকাতায় অবস্থানের শেষ বছরগুলিতে আঁকা আবেদিনের কয়েকটি উজ্জ্বল চিত্রকর্ম : জলরঙ ময়ূরাক্ষী, শস্য কাটা ও মাছধরা প্রভৃতি, এবং তেলচিত্র চেয়ারে বসে পাঠরত নারী এসব ছবি—যার মধ্যে এক প্রসন্নচিত্ত—রোমান্টিক চিত্রশিল্পীর পরিচয় মেলে; প্রকৃতি ও জীবন-বাস্তবতা ঘিরে যে মানুষটির কর্মাঙ্গন। পঞ্চাশের দশকে আমাদের সামনে উপস্থিতি ঘটে ভিন্ন এক আবেদিনের। নিরীক্ষাধর্মী নতুন এক শিল্পস্রষ্টা প্রগাঢ় সৃজনশীল শিল্পরূপের সম্ভার নিয়ে আসেন যিনি আমাদের সামনে।[১৯]

জয়নুল আবেদিন কমনওয়েলথ্ স্কলারশিপের অধীন সরকারি বৃত্তিতে ব্রিটেনে গিয়েছিলেন ১৯৫১ সালে। তিনি লন্ডনে স্লেড স্কুল অব আর্টে জন বাকল্যান্ড রাইটের তত্ত্বাবধানে ছাপাইছবি ও চিত্রকলায় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। পুরো একটি বছর অতিবাহিত করেন দেশের বাইরে এবং তারই মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ

ঘুরে জাদুঘর গ্যালারি ইত্যাদি ঘুরে দেখান। আর একাধিক একক প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয় তাঁর লন্ডনে এবং অন্যত্র। এই ভ্রমণের এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুবাদে জয়নুলের চিত্রসাধনার অঙ্গন নতুন মোড় নেয়। এসময় আধুনিক নিরীক্ষাধর্মী কাজের দিকে তার গভীর মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়। একই সঙ্গে একদিকে অনুসৃত মাধ্যম উপকরণের ক্ষেত্রে আবেদিনের বৈচিত্র্য আসে আর অন্যদিকে তাঁর প্রকাশভঙ্গীতেও ঘটে যায় রূপান্তর। বাস্তববাদ, প্রতিচ্ছায়াবাদ ও প্রকাশবাদী শিল্পধারা-আঙ্গিক পেরিয়ে যে সৃজনশিল্পীর হাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো প্রকৃতি, মানুষ ও পরিবেশ থেকে নেয়া আলোছায়া ঘোর জীবন-বাস্তবতার সহজ ও সাধারণ প্রতিরূপ—যাতে এমন এক মানসসম্মত শিল্পিত রূপধার চিহ্নিত বা প্রস্ফুটিত হয়েছিলো যার মধ্যে প্রতিবিম্বিত মূলত জয়নুল আবেদিনের প্রগাঢ় সৌন্দর্য-সচেতন শিল্পদর্শন। এই কথাটি জয়নুল-জীবনের সমাদৃত তেতাল্লিশ পর্বের পূর্বাপর সময়কালের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যার বিস্তৃতি ছিলো ১৯৫০ সালের তাঁর অনুসৃত কর্ম-প্রক্রিয়া পর্যন্ত। প্রশ্ন উঠতে পারে তেতাল্লিশের স্কেচ-মালা প্রকাশবাদী শিল্পধারার অনুসরণ, সেক্ষেত্রে আবেদিনের পূর্বতন ও ১৯৫০ সালের কাজের সঙ্গে মিলিয়ে সব এক করে দেখা হচ্ছে কেনো? উত্তর তার একটাই যে, আকস্মিকভাবে সামান্য সময়ের মধ্যে সেদিন ভিন্ন একটা ভয়াবহ করুণ পরিবেশ-আবহ সৃষ্টি হয়েছিলো কোলকাতার রাজপথে, শহর ও শহরতলিতে; যার আকর্ষণ ছিলো তীব্র বিশেষ করে একজন মানবপ্রেমিক চিত্রশিল্পীর জন্য। হৃদয়বিদীর্ণ আর্তকাতর সেই দৃশ্যাবলি আবেদিনের মর্মবাতনার কারণ হয়েছিলো, আর তাঁর শিল্পীসত্তায় তা নাড়া দিয়েছিলো প্রচণ্ডভাবে—আলোকিত বর্ণিল ভুবন যেনো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো তাঁর চোখের সামনে থেকে। আর তাই তাঁর শোকাহত শিল্পী-হৃদয় উৎসারিত তাগিদ থেকে তাঁর হাতে অনায়াসে উঠে এসেছিলো কালো রেখায় সহজ ভাষায় দৃশ্য-বর্ণনার স্বরূপ। যতোই বলি না কেনো একে প্রকাশবাদী উচ্চারণ, তথাপি একথাটি ভুললে চলবে না যে, একজন চৌকশ বাস্তববাদী দ্রুইংবিদ ছিলেন এই চিত্রমালার জনক—জীবনবাদী শিল্পরূপের অনুসরণই এখানে প্রতিষ্ঠিত, শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে এবং প্রকাশ—আঙ্গিকের সারল্যে যে বেদনা-বিধুর চিত্র-অভিব্যক্তি এখানে উপস্থাপিত হয়েছে তার মধ্য দিয়েই এর রূপ-চারিত্রিক বিভিন্নতা; এবং সার্থকতাও সেই অবারিত পথ ধরেই এসেছে। আর এ ছবির আরেকটি দিক হচ্ছে তারতের তৎকালীন চিত্রাদর্শে তা এনেছিলো ভিন্নতর স্বাদ—উন্মোচিত করেছিলো শিল্প-বৈচিত্র্যের দিগ্‌দর্শী নবদিগন্ত। তার পরেও আমার মনে হয় পঞ্চাশের দশকের আধুনিক নিরীক্ষাবাদী শিল্পী জয়নুল আবেদিনের সমগ্র শিল্প-কর্মকাণ্ডের নিরিখে যথাযথ মূল্যায়ন করতে হলে পূর্বের দুটি দশকের কাজগুলিকে যদি একই মলাটের অন্তর্ভুক্ত না করা যায় এবং বিশেষ করে তেতাল্লিশের স্কেচ-মালার তীব্র উজ্জ্বলতার প্রতি পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে একটুখানি সংযত না করা যায় তাহোলে তাঁর প্রতি হয়তো অবিচার করাই হবে। কেননা জয়নুল আবেদিনের পরিণত বয়সের চিত্রসৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো জীবন ও শিল্পের এমন এক সংবেদী তাৎপর্য যা ছিলো শিল্পস্রষ্টা আবেদিনের শক্তি ও গুণ-মাহাত্ম্যের নিরঙ্কুশ প্রতিভূ।

১০.

আবেদিনকে 'সমাজবাদী-বিপ্লবী শিল্পী' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কেউ বলেছেন 'সমাজবাস্তববাদী শিল্পী'[১০]—এসবের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিনি তাঁর দুর্ভিক্ষ বিষয়ক ছবির মধ্যে অভিনব এক শিল্প প্রকাশভঙ্গীর সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। আর একথা সুবিদিত, তাঁর প্রকাশভঙ্গী ও আঙ্গিকের প্রেক্ষিতে এই রচনায় আগেও উল্লেখ করেছি যে, পাশ্চাত্যের কলারসিক সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাঁর কর্মে সম্মিলন ঘটেছে প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের এই বলে।[১১] প্রকৃতপক্ষে জয়নুল আবেদিন যে পরিপূর্ণ মাত্রায় গভীর আত্মবিশ্বাসে অনড় একজন স্বাধীনচেতা সৃজনশিল্পী, সর্বত্র প্রমাণ করেছেন তিনি সেটাই। এ বিষয়ে আবেদিনের কৃতী ছাত্র ভারতের বিশিষ্ট শিল্পী বিজন চৌধুরী স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, আবেদিন বলতেন : "দেখ শিল্পকলায় অনুকরণ বর্জন করার দিকে প্রথমেই চেষ্টা করতে হবে। স্ব-সৃষ্টির প্রচেষ্টাই সৃষ্টিমূলক শিল্পকলার জন্ম সম্ভব করে। শিল্পগুণ বিভিন্নতা নিয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে।"[১২] এ থেকে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনে বেগ পেতে হয় না যে, জয়নুল আবেদিন তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পর্বের কর্মকাল থেকে নিয়ে শিক্ষক পর্যায়ে এবং লন্ডনে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণকালে বা বাকি জীবনে কখনোই শিল্পচর্চাক্ষেত্রে নিজেকে বাঁধাধরা ছকে চলতে দেননি। একথায় বিশ্বাস আনতে এখন আর দ্বিধান্বিত হওয়ার অবকাশ নেই যে, শিক্ষার্থী পর্যায়ে 'ভারতীয় চিত্ররীতি'র বন্ধনে আবদ্ধ হতে তিনি চাননি সঙ্গত কারণেই। পাশ্চাত্যের একাডেমিক শিক্ষাপদ্ধতি তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন, হয়তো তাঁর নিজের প্রতি এ-বিশ্বাসে তিনি অটল ছিলেন যে ওই অনুসৃত প্রাতিষ্ঠানিকতার মাত্রাও তাঁকে বাঁধা গতের মধ্যে বেশিদিন আটকে রাখতে পারবে না।

বাস্তবে ঘটেছেও তাই। কারণ তিনি তাঁর বাস্তবানুগ শিল্পদীক্ষা, তাঁর বিজ্ঞান সম্মত পরিপ্রেক্ষিত ও এ্যানাটমি জ্ঞান, যা ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণালব্ধ ছিলো তারই ভিত্তি ধরে অগ্রসর হওয়ার কালে এমন এক চিত্রশিল্প-আঙ্গিক গড়ে তুললেন যা সেখান থেকে সরে গেলো না বটে, কিন্তু নিঃসন্দেহে ইতিবাচক 'বাইপাস-রুটে' পরিভ্রমণ করলো। যার সঙ্গে চিরসঙ্গী হয়ে রইলো আবেদিনের প্রাচ্যানুগ ধ্যানমগ্নতা বা অবারিত ভাবের আদর্শে গড়ে ওঠা স্বদেশী লৌকিক ঐতিহ্য উৎসারিত মানবসত্তা; আর সকল প্রকাশভঙ্গীসহ আধুনিকতায় উদ্বুদ্ধ গঠন-আঙ্গিক সমৃদ্ধ রেখাশ্রিত ও ছায়-সন্নিবিষ্ট চিত্রশিল্প-প্রবণতা।

মহান শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে অনিবার্য জীবন-ঘনিষ্ঠতা ও মৃত্তিকা-সংলগ্নতা, অনন্য সৃজনশীল নিপুণতা ও সুদক্ষ কারিগরিতা এবং প্রয়োগশৈলী ও প্রকাশ আঙ্গিকের সারল্য—এ-সবেরই সমন্বয় ঘটেছিলো জয়নুলে। তাঁর অমর সৃষ্টি তেতাল্লিশের চিত্রমালা, তার মধ্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত করলে 'ম্যাডোনা : ১৯৪৩', পঞ্চাশের দশক ও তার পরবর্তী সময়কালের পাইন্যার মা, সংগ্রাম, আবহমান বাংলা, মনপুরা-৭০, ইত্যাদি সকল চিত্রশিল্প নিদর্শনের প্রেক্ষিতেই কথাটি প্রযোজ্য। বলাবাহুল্য, অনিবার্যভাবেই তা কালিক সত্য প্রতিষ্ঠা করেছে, এবং জীবনের সুন্দরও। আর ওই অনিবার্যতার মধ্য দিয়েই জয়নুল আবেদিনের

কালচেতনায় উদ্বুদ্ধ চিত্রাবলি আজ প্রাচুর্যমণ্ডিত কালোত্তীর্ণ শিল্প-সম্পদের উত্তরাধিকার-সন্ধান দিয়ে চলেছে সমাজ ও শিল্প সচেতনা মানবজাতির সামনে।

তথ্য-নির্দেশ

১। তথ্য-সূত্র—'আমাদের জয়নুল'; সুরুচি প্রকাশনী, ঢাকা; ১৯৮৫ পৃ. ৪৫

২। তথ্য-সূত্র—আবুল মতিন : 'জয়নুল আবেদিন'; আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা; ১০৭৮ পৃ. ২৯

৩। শফিকুল আমীন : 'ইতিহাস থেকে কালি', রূপকল্প (সংকলন); মানব প্রকাশন, ঢাকা; ১৯৯৮ পৃ.১৪৫
[আবুল মতিন প্রণীত প্রাগুক্ত গ্রন্থের 'কলকাতায় জয়নুল' অধ্যায়ে সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয়েছিলো : শিল্পাচার্যের জীবনে কলকাতা এক বিস্তৃত সময় জুড়ে রয়েছে। ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭—সুদীর্ঘ পনেরো বছরের বহু স্মৃতিবিজড়িত এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।]

৪। তথ্যসূত্র—সৈয়দ আজিজুল হক : 'জয়নুল আবেদিন', নিসর্গ ও মানবের গাথা : জয়নুল আবেদিনের চিত্রভুবন; বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, ঢাকা; ২০০৪ পৃ. ১৪

৫। কমল সরকার : 'ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী'; যোগাযোগ প্রকাশনী, কোলকাতা; ১৯৮৪ পৃ. ১৫৫

৬। কমল সরকার : তদেব পৃ. ১৮৩

৭। শ্রীশাহ্ : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর : শিল্পীর দায়', 'দায়'; পুনশ্চ, কোলকাতা; ১৯৯৪ পৃ. ১৮
[জয়নুল আবেদিন তাঁর প্রতিভালয়ে ব্যঙ্গচিত্র, বুক-ইলাস্ট্রেশন ও প্রচ্ছদ-নকশা ইত্যাদি কাজের সঙ্গে কমবেশি জড়িত ছিলেন। শ্রীশাহ্ তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন : 'মনে পড়ে, ১৯৪৭ সনে ধর্মের নামে দেশ বিভাগের মিলওয়াটেই কী পরম যত্নে ভোটদের জন্য পয়সায় কাঁচ কল্যাণী দলের কৃতিত্বশালী সামাদদের জন্য প্রমকথা চিত্রিত করেছিলেন তিনি। এখানেও দেখি তাঁর সেই বলিষ্ঠ তুলিত নিশ্চিত রেখা।']

৮। তথ্যসূত্র—'আমাদের জয়নুল'; তদেব পৃ. ৫৪

৯। তথ্যসূত্র—শ্রীশাহ্ : তদেব পৃ. ১০

১০। শ্রীশাহ্ : তদেব পৃ. ১২-১৩

১১। অশোক ভট্টাচার্য : 'জয়নুল আবেদিন', 'কালচেতনার শিল্পী'; সারস্বত লাইব্রেরী, কোলকাতা : ২০০৩ পৃ. ২০–২১

১২। তথ্যসূত্র—আবুল মতিন : তদেব পৃ. ১০৮

১৩। তথ্যসূত্র—'আমাদের জয়নুল'; তদেব পৃ. ৩১

১৪। শওকত ওসমান : 'বিশ্বে ব্যাপ্যমান প্রাণ্যজন জয়নুল আবেদিন', 'জয়নুল স্মৃতি-১মখণ্ড'; মানব প্রকাশন, ঢাকা; ১৯৯৪ পৃ. ৪০

১৫। তথ্যসূত্র—হাশেম খান : 'তেইশটি ট্রামের টিকেট', 'মানুষ জয়নুল আবেদিন শিল্পী জয়নুল আবেদিন'; ইতিহাস-ঐতিহ্য-৪, সিরিজ সম্পাদক : মুনতাসীর মামুন; আগামী প্রকাশনী, ঢাকা; ১৩৯৯ পৃ. ১৭

১৬। শওকত ওসমান : তদেব; পৃ. ৩৯

১৭। তথ্যসূত্র—তোফাজ্জল আহমেদ : 'শিল্পাচার্য ও একটি লোক নকসার প্রচলন'; ঈদের চিত্রালী উপহার; ঢাকা; ১৯৮৭ পৃ. ১৯৩

১৮। রমেশ দাশগুপ্ত : 'জয়নুল আবেদিনকে দেখা'; 'জয়নুল স্মৃতি-১ম খণ্ড'; তদেব পৃ. ২১

১৯। তথ্যসূত্র—Zainul Abedin; Editing-Dr. Muhammad Sirajul Islam, Introduction–Nazrul Islam; Bangladesh Silpakala Academy, Dhaka; 1977

২০। তথ্যসূত্র—অশোক ভট্টাচার্য : তদেব পৃ. ৩১

২১। তথ্যসূত্র—New Values; Editor : Sarwar Murshid, Volume-4 No 2 & 3; 1952 Page 15

২২। বিজন চৌধুরী : 'নিজের কিছু কথা'; নান্দনিক, বিজন চৌধুরী সংখ্যা; ১৯৯৬ পৃ. ২১

মৃত্যুদণ্ড : এক দীর্ঘ (সামাজিক) 'অস্বস্তি'?

দূর্বা বোস

["যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও লোককে বধদণ্ড না দিয়েও রাজা কোন উপায়ে প্রজাশাসন করতে পারেন? ভীষ্ম বললেন, 'আমি এক পুরাতন ইতিহাস বলছি শোন। দ্যুমৎসেনের আজ্ঞায় বধদণ্ডের যোগ্য কয়েকজন অপরাধীকে সত্যবানের নিকট আনা হলে সত্যবান বললেন, 'পিতা, অবস্থা বিশেষে ধর্ম অধর্মরূপে এবং অধর্ম ধর্মরূপে গণ্য হয়, কিন্তু বধ কখনই ধর্মরূপে গণ্য হতে পারে না।"]

—মহাভারত : শান্তি পর্ব

রাজশেখর বসু (পৃ : ৫৮১,' ৮২)

যে সভ্যতার ভাণ্ডারে এতকাল আগেই মৃত্যুদণ্ডের নৈতিকতা তথা বৈধতা সম্পর্কে এমন স্পষ্ট মত ব্যক্ত করা আছে, সেই সভ্যতায় আজ এতযুগ পেরিয়ে আবার কিছু বিতর্কের ঝড় উঠবে তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে, বরং প্রশ্ন করা যেতে পারে মহামতি ভীষ্মের এমন নিশ্চিত যুক্তি অগ্রাহ্য করে। মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যাবতীয় সামাজিক গঠনের ছোট বড় বিবর্তন-পরিবর্তন ইত্যাদিকে পাশ কাটিয়ে 'আইনী প্রথা' হিসেবে 'মৃত্যুদণ্ড' টিকে রইল কী করে? অস্বীকার করলে চলবে না, বিপুল সংখ্যক মানুষের আজও প্রবল আস্থা 'বধদণ্ড'-এর যুক্তিতে। কিন্তু কেন? এবং বেশির ভাগই তো সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে হিংসাকে এড়িয়েই চলায় বিশ্বাসী, সামান্য অপরাধে কেউ কারুর 'চোখ উপড়ে ফেলতে' আগ্রহী নন। আসলে একটু আধটু মানসিক অস্বস্তি সত্ত্বেও মৃত্যুদণ্ডকে এঁরা মেনে নিয়েছেন জীবন বাস্তবতার বিচারে বা 'ফ্যাক্ট অব লাইফ' হিসেবে। অনেকটা বাধ্য হয়ে তেতো ওষুধ গেলার মতোই। তাই মনে হয় বিষয়টা দেখতে হবে নিরপেক্ষ চোখে 'র‍্যাশনালিটি' বা বাস্তবসম্মত যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। 'মর‍্যালিটি' বা নৈতিকতার প্রশ্নও সম্ভবত উঠে আসবে সেখান থেকেই। 'গণতন্ত্রের গলদ' জাতীয় যুক্তিও ধোপে টেকে না। শুধু তো ইরান বা তুরস্ক নয়, ইউরোপ বাদ দিলে আমেরিকা, এমন কি ভারতীয় গঠনতন্ত্রেও মৃত্যুদণ্ড-এর বিধানকে বজায় রাখতেই হয়েছে। যদিও মানতেই হবে যে আমেরিকার তুলনায় এখানে এর ব্যবহার সীমিত।[১] তথাপি এ বিষয়ে সংশয়ও প্রতিদিন গভীরতর হচ্ছে। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে "ডেথ পেনাল্টি" বা মৃত্যুদণ্ড এক অদ্ভুত সামাজিক অস্বস্তি। একে না যায় গেলা, না যায় ফেলা। গণতন্ত্রের মূল নিয়ম কানুন, মানবিক অধিকারের যাবতীয় প্রশ্ন—সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। সব যুক্তি তর্ক, গুছিয়ে নিয়ে একে ঘোষণা করতে গিয়েও থমকে যেতে হয়। একদিকে সমস্যা আধুনিক গণতন্ত্রের বোধে একে বাঁধব কী করে? অন্যদিকে, যারা সমর্থন করেন তাদের মর‍্যালিটি (Morality)-র যুক্তিকে অগ্রাহ্যই বা করা যায় কেমন করে? বিশেষ করে যখন পৃথিবী জুড়ে ছোট বড় মারণাস্ত্রের চালাও সমারোহ, হত্যা, হিংসা প্রদর্শনের নিত্যনতুন পন্থা ঠেকানোর উপায় কী তা নিয়ে কোনও নিশ্চিত ইঙ্গিত এখনও মিলছে না। যুক্তিহীন সন্ত্রাসে নিহত মানুষদের নিকটতম আত্মীয়দের হাহাকারের মুখে দাঁড়িয়ে কোন স্পর্ধায় বলা যায় যে 'না, ফাঁসি কোনও ক্ষেত্রেই নয়'।

কিছুকাল আগে ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হয়েছিল, পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকারেরই শাসনকালে। বামফ্রন্ট এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে সচেনতভাবে কোনও নৈতিক স্খলনকে মেনে নিয়েছে এমন অভিযোগ আদৌ করা উদ্দেশ্য নয়। বরং এ ধরনের 'ক্রাইম' (Crime)-এর ইতিহাস থাকলে যে জটিলতা দাঁড়ায় তাকে বিন্দুমাত্র লঘু করে দেখাটা যে ভুল সে কথা মানতেই হবে। তবে মনে আছে, খবরেই পড়েছি ধনঞ্জয়ের ফাঁসির দিন ১৫ আগস্ট সারা কলকাতা থমকে ছিল। এ-ও জানি যাঁরা ফাঁসি সমর্থন করেছিলেন তাদেরও যাওয়া হয়নি কোনও 'আনন্দযজ্ঞে'। ভারতীয় সংসদ ভবনে হামলায় মূল অভিযুক্ত আফজল গুরুর প্রাণদণ্ডের প্রশ্নেও জাতীয় মন নিঃসংশয় নয়। প্রশ্নটাকে তাই মনে হয় সত্যিই বোধহয় পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন 'র‍্যাশনালিটির' (rationality) মাপকাঠিতে। 'মর‍্যালিটি'র প্রশ্নকে আপাতত সরিয়ে রেখে। আর তাই 'ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট' (capial punishment) কে 'লাস্ট রিসর্ট' (least resort) হিসেবেও ধরে রাখব কিনা তাও শেষ পর্যন্ত যাচাই করতে হবে সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির বিচারে। অর্থনৈতিক, সামাজিক লাভক্ষতির হিসেব নিকেশ আর একটু নিরপেক্ষভাবে করা একান্ত প্রয়োজন।[৮] গোটা বিষয়টি ইতিহাসের আরেকটু ছড়ানো চালচিত্রে ফেলে দেখা যেতে পারে। অন্যান্য সমাজের ভেতরেও এ নিয়ে কমবেশি লড়াই চলছে। এক্ষেত্রে হয়তো খানিকটা সাহায্য করবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট-এর সাম্প্রতিক ঘটনাবলি। আমেরিকার দুর্ভাগ্য 'বুশ'-এর ইরাক অভিযান সমাজটার 'ডেমোক্র্যাসী'র ঐতিহ্যের গর্বে আপাতত গভীর চুনকালি লাগাচ্ছে। কিন্তু খানিকটা ভেতরে বসে আছি, তাই দেখতে পাচ্ছি এখানকার বৃহত্তর সমাজে গণতন্ত্রের সুস্থ স্রোত ক্ষীণ হলেও নানা খাতে বইছে, একেবারে থেমে যায়নি। এমন ভরসাটুকু পাচ্ছি কোথা থেকে পরের বিবরণে হয়তো তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

অল্প কিছুদিন আগে (২০০৩ সালে) ইলিনয়-এর তৎকালীন গভর্নর জর্জ রায়ন পদত্যাগের মুহূর্তে তাঁর বিশেষ ঘোষণায় এক ঐতিহাসিক কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন "ইলিনয়"-এর জেল-এ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সব বন্দীকে অপরাধ নির্বিশেষে প্রাণভিক্ষা (এ্যামনেস্টি) দিয়ে। আন্তর্জাতিক স্তরে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। খবরে পড়েছি, অভিনন্দন জানিয়ে প্রথম কোন কলটা এসেছিল নেলসন ম্যান্ডেলার (Nelson Mendela) কাছ থেকে। আমেরিকার ভেতরে প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত না হলেও মিশ্র এবং জটিল। ভারতীয় সংবাদ মহলে (বা অন্যান্য স্তরেও) এ নিয়ে তেমন কোনও উত্তেজনা লক্ষ করেছি বলে মনে পড়ে না। যাই হোক জর্জ রায়ন-এর সেদিনের ঘোষিত রায় এখনও ওল্টানো যায়নি, ইলিনয়-এ মৃত্যুদণ্ডের 'মোর‍্যাটোরিয়াম' বা স্থগিতাদেশ এখনও বহাল আছে। হাস্যকর হলেও সত্যি, আপাতত 'চুরির দায়ে' বৃদ্ধ রায়নকেই জেলে পাঠানোর প্রবল আইনি প্রচেষ্টা চলছে। ঘটনার "আয়রনী" বা পরিহাস শুধু এইটুকুতেই সীমিত নয়। জর্জ রায়ন রাজনৈতিক বিশ্বাসে একেবারে কট্টর রিপাবলিকান। তাই মৃত্যুদণ্ডের বৈধতা নিয়ে তার কোনও সন্দেহ থাকা তো দূরের কথা, মাথা ঘামানোরও কোনও অবকাশ ছিল না। শীতল "মিডওয়েস্ট"-এর 'রিপাবলিকান' চিন্তাধারায় সিক্তি মন নিয়ে জীবনের দিনান্তে এমন একটা ক্ষ্যাপামি

ঘটিয়ে বসলেন কেমন করে, সে বিস্ময় আজও পুরোপুরি কাটেনি। এই আপাত বিচ্ছিন্ন ঘটনাটি আসলে ইলিনয়-এর ইতিহাসে একটা দীর্ঘ আন্দোলনের পরিণতি, যদিও জর্জ রায়ন-এর ব্যক্তিগত কৃতিত্ব তাতে ম্লান হয় না।

১৯৭৭ সালে ইলিনয়-এ মৃত্যুদণ্ডকে আইনি ব্যবস্থা হিসাবে নতুন করে কায়েম করা হয়। এর পরেই বারো (১২) জন অপরাধীর ক্ষেত্রে 'ডেথ পেনাল্টি' বা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। কিন্তু এই একই সময়ে অন্য তেরোজন (১৩) বন্দীর ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড রোধ করতে হয়, অপরাধ প্রমাণের প্রক্রিয়ায় কিছু ত্রুটি নজরে পড়ায়। নম্বরের অনুপাতটার অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ায় সেদিন সেদিন শিউরে উঠেছিলেন রায়ন এবং তাঁর সহকর্মী কিছু আইনজীবী। আরেকটু মনোযোগ দিয়ে তথ্য নাড়াচাড়া করতেই ধরা পড়ল এক সাংঘাতিক গাফিলতি। এঁরা দেখতে পেলেন 'ইলিনয়'-এর গোটা 'ডেথ পেনাল্টি' ব্যবস্থাটাই ভুলে ভরা। অর্থাৎ নিরপরাধ ব্যক্তিকেও 'লিথাল ইনজেকশন' বা মারণ বিষ প্রয়োগের ঘটনা একেবারেই বিরল নয়। রায়ন আর তাঁর সহকর্মীদের রাতের ঘুম চলে গেল। জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে শুরু হল এক নতুন পর্বের। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক লাভক্ষতির হিসেবকে পাশে রেখে সম্পূর্ণ এক বিপরীত পথে হাঁটা শুরু করলেন বৃদ্ধ জর্জ রায়ন। বিশেষ সাহায্য মিলেছিল শিকাগো অঞ্চলের নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখি তখনও ডেথ পেনাল্টির ভুল প্রয়োগ বন্ধ করতেই সমস্ত চেষ্টা সীমিত ছিল। "মৃত্যুদণ্ড" প্রথাটির বৈধতা নিয়ে কখনও কোনও দ্বিধা তাঁদের ছিল না। রায়ন-এর এই হৈ চৈ-এর পরে আরও বিভিন্ন মামলায় একের পর এক অভিযুক্ত অপরাধীকে মুক্তি দিতে হয়। গবেষণার ফলে দেখা গেল বহুক্ষেত্রে "অভিযুক্ত" ব্যক্তির আইনজীবীটি অক্ষম হওয়ায় অপরাধ নির্ভুল বা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না। জেল-এর ভেতরের যেসব খবরাখবরের ভিত্তিতে অপরাধ প্রমাণিত বলে, দাবি করা হয় সেগুলো নেহাতই টুনকো, গালগল্প (hearsy) অবস্থায় অযোগ্য এমনকি "আই উইটনেস" বা অপরাধের প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রেও অজস্র ত্রুটি। তাছাড়াও আছে "রেস্" (race) বর্ণ বা জাতিবিদ্বেষ জনিত বৈষম্যমূলক বিচার বা পক্ষপাতিত্ব (bieas), যা সমাজটার গোটা কাঠামোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজও গাঁথা। জর্জ রায়ন টের পেলেন 'ডেথ পেনাল্টি অক্লেশে কার্যকরী হয় চামড়ার রং তামাটে কিংবা কালো হলে, বলাই বাহুল্য দরিদ্র হলে রায় দেওয়া আরও সহজ হয়ে পড়ে। মার্কিন দেশের 'মিডওয়েস্ট (midwest)-এর কনকনে ঠাণ্ডায় বসে কট্টর দক্ষিণপন্থী রাজনীতি (জীবননীতিও) লালিত মনের জর্জ রায়নের হঠাৎ 'হৃদয় বদল' এবং তারই জেরে এতকাল ধরে চলে আসা র‍্যাশনালিটির মারাত্মক ত্রুটি ধরা পড়ল 'ফ্যাক্ট' অব লাইফ' যাচাই করে দেখতে গিয়েই। তাই আশা বুদ্ধ থেকে গান্ধী যে দেশের ঐতিহ্যের অঙ্গ, নানা কঠিন সমস্যা সত্ত্বেও গণতন্ত্রে আস্থাবান ভারতের মানুষের কাছে এক্ষুনি না হলেও "ডেথ পেনাল্টি" বা মৃত্যুদণ্ডের অযৌক্তিকতা ধরা পড়বেই। কারণ, এ ব্যাপারে "এগোন" ঠেকে আছে একাধিক বিভ্রান্তির জেরে, নৈতিক বোধের অভাবে নয়।

আধুনিক যুগের ভীষ্মপ্রতীম নেলসন ম্যান্ডেলা সময়ের সুযোগে উঠে আসতে পেরেছিলেন 'শরশয্যা' থেকে। আর তারপর শুধু মুখের কথায় নয়, তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা হাতেনাতে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিলেন "আই ফর এন আই" (eye for an eye)-এর বিকল্প সত্যিই কী হতে পারে। ম্যান্ডেলা ডেসমন্ড টুটু প্রমুখদের উদ্যোগে "ট্রুথ এ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন" (Truth and Reconciliation)-এর নিরীক্ষায় "এ্যাপারথেড" বা বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থার পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকা বেঁচে গিয়েছিল সেই মুহূর্তের আত্মবিনাশী হিংসা ও ধ্বংসের হাত থেকে। যারা হেতালদের মায়েদের মুখ ভেবে দ্বিধা কাটিয়ে ধনঞ্জয়ের ফাঁসিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন তাঁদের কাছে অনুরোধ, একবার "ইনটারনেট" খুলে দেখে নিন দক্ষিণ আফ্রিকার "ট্রুথ রিকনসিলেয়শন" -এর বিবরণ। হেতালদের মায়েদের বসতে হয়েছিল ধনঞ্জয়ের মুখোমুখি। খুনির নিজের মুখে শুনতে হয়েছিল সন্তানের, প্রিয়জনের শেষ মুহূর্তের যন্ত্রণার 'ডেসপারেশন'-এর বিস্তারিত বর্ণনা। শুধু তাই নয়, অপরাধীর নিজের মা-বাবা, পরিবার পরিজন তখন সেই ঘরেই উপস্থিত।

"রিকনসিলিয়েশন" (Reconciliation) শব্দটির অর্থ "টু হারমোনাইজ" (to harmonise) অথবা "টু মেক কমপ্যাটিবল" (to make compatible)। অর্থাৎ এটা একটা 'প্রাগম্যাটিক এ্যাপ্রোচ' (Pragmatic approach) বা বাস্তবতার সিঞ্চিত পথ, যার ভিত্তি অবশ্যই বৃহত্তর মানবিক বোধে। ম্যান্ডেলা চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে সহজ সত্যকে তা হল এই যে র‍্যাশনালিটি আর হিউম্যানিটিকে প্রত্যেক ধাপেই জড়িয়ে নিয়ে চলতে হবে। আর তা না হলে যে 'পার্ল হারবার' থেকে 'হিরোশিমা', কিংবা 'নাইন ইলেভেন' (9/11) থেকে 'ইরাক' বারবার ইতিহাসে বৈধ বলে পার পেয়ে যাবে। একটি সাদ্দাম হুসেনকে খাঁচায় পোরা গেলেও সারা দুনিয়ায় বুশ, চেনী, হেনরী কিসিংগারেরা বহাল তবিয়তে ছড়ি ঘুরিয়ে যাবে।

কেবলমাত্র রাজনীতিতেই তো নয়, সাহিত্যতেও তো "ডেথ পেনাল্টি"-এর প্রশ্ন বারে বারেই এসেছে। কেমন করে ভুলে যাই ফিয়োডোর ডস্টয়েভস্কির 'দি ইডিয়ট'-এ প্রিন্স-এর দ্বিধাহীন উক্তি—

"টু কিল ফর মার্ডারস ইজ এ পানিশমেন্ট ইমমেসারেবল গ্রেটার ক্রাইম ইটসেলফ। মার্ডার বাই লিগ্যাল সেন্টেনস ইজ ইমমেসারেবলি মোর টেরিবল দ্যান ব্রাইগ্যানডলি মার্ডার। এ পার্সন মার্ডারড্ বাই ব্রাইগ্যানডস স্ট্যাবড্ অ্যাট নাইট ইন দ্য উডস্ অর সামথিং, নো ডাউট স্টিল হোপস্ টু বি সেভ্ড আনটিল দ্য ভেরি লাস্ট মোমেন্ট...*

কিংবা

"হোয়েন দে রিড্ দ্য সেন্টেনস্। গেট দ্য মেশিন রেডি, বাইন্ড দ্য ম্যান, নীভ হিম আপ দি স্ক্যাফোল্ড—দ্যাটস্ হোয়াট হরিবল্!**

ডস্টয়েভস্কির সময়ে 'গিলোটিন' ব্যবহার হত। ইদানীং আমরা শিখেছি "লিথাল ইনজেকশন"-এর ব্যবহার, গিলোটিনের মেস্ (mess) টা এড়াতে।

সকলের নিশ্চয়ই মনে আছে যে 'দি ইডিয়ট'-এর মূল কাহিনীর জটিলতা ইত্যাদি

প্রায় প্রত্যক্ষভাবে উঠে এসেছিল ডস্টয়েভস্কির ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে, স্বয়ং লেখককেই ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হল নির্মম ও হিংস্র অপরাধীদের সমাজ সামলাবে কী করে? এদের জনসমাজে ছেড়ে দেওয়া তো সত্যিই সম্ভব নয়। এ বিষয়েও নানা আলোচনা চলছে, নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল ও নানা সুপারিশ জমা হচ্ছে। এমন কি আমেরিকাতেও বহু সংখ্যক মানুষ (সংখ্যালঘু হলেও নগণ্য নয়) বিশ্বাস করেন মৃত্যুদণ্ডের বদলে ওইসব বিশেষ অপরাধীদের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আরোপ করা উচিত। তবে তাঁদের দাবি তা করতে হবে যথাযথভাবে 'পেরোলে'র অবকাশ ভুলে গিয়ে। এ বিষয়ে যাঁরা কৌতূহলী তাঁরা সি-ইউ-এ-ডি-পি (CUADP-Citizen's United Alternaties to the Death Panalties) জাতীয় সংগঠনগুলির 'ওয়েবসাইট' একটু উঁকি দিয়ে দেখতে পারেন। এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিই যে আমেরিকা ইরাক কিংবা আবু গ্রাইব' ঘটাচ্ছে সেই আমেরিকারই বহু কোনে 'প্রিজন রিফর্ম (Prism Reform) নিয়ে বিতর্ক ও আন্দোলন চলছে। দাবি উঠছে জেলখানাকে শাস্তির দোহাই দিয়ে শারীরিক মানসিক অত্যাচারের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার না করে সত্যি সত্যিই 'কারেকশন ফেসিলিটি' বা সংশোধনাগারে পরিণত করার। এ বিষয়ে হলিউড-এর অভিনেতা অভিনেত্রী, কলাকুশলী ও পরিচালকদের একাংশ রীতিমতো সোচ্চার।

টিভির পর্দায় যখন "আবু গ্রাইব"-এর ছবি দেখি হঠাৎ মনে পড়ে যায় কলকাতার রাস্তার দেখা একটা ছোট্ট অভিজ্ঞতা। বাসে চেপে ন্যাশনাল লাইব্রেরি যেতে অনেক সময় চোখে পড়েছে, আলিপুর জেল-এর কয়েদিদের খোলা রাস্তায় হাতে পায়ে শেকল বেঁধে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। কোনও রাখঢাক নেই, কোনও সংকোচ নেই, কারুর কোনও ভ্রূক্ষেপও নেই বলে মনে হত। অনেকেই হয়তো ভ্রূ কুঁচকে বলবেন দাগী আসামীর আবার 'প্রাইভেসী' কী। আবার কিছু সংখ্যক নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন "আবু গ্রাইব কি কেবল ইরাকেই ঘটছে?" দাগী আসামীর "প্রাইভেসী" ইত্যাদির দাবি তথা গোটা "প্রিজন রিফর্ম"-এর ইচ্ছেটাকেই অনেকেই হয়তো স্রেফ 'ইউটোপিয়ান' বা বিলাস বলে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু একটা ইউটোপিয়া (utopia) বোধহয় সব ব্যাপারেই ধরে রাখতে হয়, নইলে সামনে এগোব কী করে?

বলা বাহুল্য, এসব প্রশ্নের একটাও কোনও নতুন ভাবনা নয়। তবুও মহাভারত থেকে ডস্টয়েভস্কি, ম্যান্ডেলা ইত্যাদি (একেবারে ভুলে গেছি চার্লস চ্যাপলিনকে জুড়তে—'মশিয়ে ভের্দ্যু' ছবির সেই বিখ্যাত উক্তি "ওয়ান মার্ডার মেক্স্ আ ম্যান মার্ডারার...এ্যান্ড দ্য নাম্বার স্যাঙটিফাই") এক জায়গায় জড়ো করার তাড়া এল কেন? পশ্চিমবাংলার এক প্রবাসী নাগরিক এবং একজন সামান্য সংবাদ পাঠক হিসেবে দূরে বসে মনে হচ্ছিল 'ডেথ পেনাল্টির পক্ষে বিপক্ষে যুক্তিতর্কে শেষ পর্যন্ত যেন একটা 'সংগতির' অভাব থেকে যাচ্ছে, যাকে কিছুতেই 'মেলানো' যাচ্ছে না। কী যেন আমরা মিস (Miss) করে যাচ্ছি।

ঘুরে ফিরে একটা কথাই কেবল মনে হচ্ছে—'র‍্যাশনালিটি' আর 'হিউম্যানিটি'কে যে করেই হোক এক জায়গায় বাঁধতেই হবে। এখানে বোধহয় কোনও গোঁজামিল চলে না।

উদ্ধৃতি/ইংরেজি অনুবাদ থেকে ব্যবহৃত

The Idiot / Fydor Dostoevesky
The Modern Library-New York /2003

To kill for murder is a punishment immeserable greater than the crime itself. Murder by legal Sentence is immeasorably more terrible than brigly murder. A persons murderer by brigands, stabbce (?) at night in the woods or something, no doubt still hopes to be saved untill the very last moment. [pg. 23]

"When they need the sentence, get the machine ready, bind the man, leave him, up the scaffold–that's what horrible. [pg. 22]

টীকা

১. বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে 'মৃত্যুদণ্ড' সমাজের দৈনন্দিন জীবনের খুন-হিংসার প্রকোপকে কোনওভাবেই লাঘব করে না। —নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর একটি সার্ভেতে দেখা যাচ্ছে খুনের হার যুক্তরাষ্ট্রের সেই 'স্টেট' গুলোতেই বেশি যেখানে 'ডেথ পেনাল্টি' বহাল। অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে খুনোখুনির হার কম সেইসব স্টেট-এ যেখান থেকে 'ডেথ পেনাল্টি' তুলে নেওয়া হয়েছে।

২. বেশকিছু গবেষণাপ্রাপ্ত ফল ইঙ্গিত করছে 'ডেথ পেনাল্টি' কার্যকর করতে সমাজকে/সরকারকে অনেক বেশি অর্থ সম্পদ ব্যয় করতে হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জন্য বিচারের খরচ সে তুলনায় অনেক কম।

রুশ ভাষা থেকে

কবিতার অনুবাদ : সঞ্জয় চন্দ্র

'পরিচয়' ১৪১১ থেকে কিছু রুশ কবিতার অনুবাদ রাখা হয়েছিল। এখানে সংযোজিত হল চারটি ভিন্ন ধরনের কবিতা, সবগুলোই অন্য প্রজন্মের দিকে বাড়ানো।

লেরমন্তভের কবিতাটি সমসাময়িক আলোচক বেলিনস্কির প্রিয়, বিশেষ করে এ চরণগুলো 'ঘৃণা করি মোরা....রক্তে' লেনিন ১৯০১ সালে উদ্ধৃত করেন শেষ চরণদুটি একটু বদলে।

এরেনবুর্গের কবিতাটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে লেখা। তখন তাঁকে রুশভাষায় সব থেকে সম্ভাবনাময় কবি মনে করা হত।

ভূবিদ-পিতার সঙ্গে সাইবেরিয়ায় ভূতত্ত্বসমীক্ষায় ভাগ নিতেন ইয়েভ্‌তুশেংকো—তাই চলে যাওয়া ভুবন মনে দাগ কাটে।

ভারতীয় দর্শনে অন্যদিকে ভিনকুরভ যুগ টপকান আর্তি বাদেই।

ভাবনারা

মিখাইল লেরমন্তভ, ১৮৩৮

বিষাদে তাকিয়ে থাকি আমাদের প্রজন্মের মুখে।
ভবিতব্য তার, হয় ফাঁকা, নয় অন্ধকার,
তার মাঝে, বিদ্যার ভারে আর সন্দেহে ঝুঁকে,
          কিছু না করেই বুড়িয়ে যাওয়া সার,
          ধনী আমরা, অথচ জন্মকাল থেকেই,
পিতাদের ভুলে আর বিলম্বিত স্বীকারেতে,
জীবন তো আমাদের পেষে, সোজাপথ যেন দিশা নেই,
          সামিল অন্যের উৎসব-ভোজেতে।
          ভালোতে মন্দতে লজ্জাকর নির্বিকার,
শুরুতেই তো আমরা মুড়িয়ে যাই বিনা লড়াই;
বিপদের মুখে নিয়ে ক্ষুদ্রাশয়ের ধিক্কার
কর্তাদের কাছে পাই দাসের প্রাপ্য ঘৃণাই।
    যেন অকালে পাকা ক্ষীণতনু ফলের গাঁট,

না স্বাদে, না রূপ খুশি করে আমাদের,
ফুলেদের মাঝে ঝুলে থাকে, অতিথি অনাথ,
আর ওদের সৌন্দর্যের প্রহর—ওর পতন-প্রহর।

চিন্তা শুষেছি মোরা বন্ধ্যা সে জ্ঞানের অভ্যাসে,
বন্ধু ও নিকটজনের কাছে তো ঈর্ষায় লুকিয়ে
পরম সে আশাদের আর সুজাত স্বর সে
অবিশ্বাসে বেঁধা আবেগে মিশিয়ে,
মাধুর্যের পাত্রে আমরা চুমুক সবে দিতে গিয়ে
তারুণ্যের বল বাঁচানোর প্রয়াস করি নি;
প্রতিটি আনন্দে, হারানোর ভয়ে,
শ্রেষ্ঠ রসটুকু আমরা একেবারে ছেঁচে নি।

কবিতার স্বপ্নেরা, সৃষ্টিরা চারুশিল্পের
খুশির আমেজে চিন্তা আমাদের নাড়ায় না;
বুকে আঁকড়ে থাকি বাকিটুকু অনুভবের
কৃপণের গুপ্তধন, যা কোনো কাজে আসে না।
ঘৃণা করি মোরা, ভালোবাসি অকারণ,
কিছুই পণ না রেখে রাগে বা প্রীতিতে,
গুপ্ত কোনো হিম অন্তরে করে শাসন,
যখন আগুন ফুটতে তাকে এ রক্তে।
পূর্বজদের জাঁকজমক আমাদের ক্লান্ত করে,
ছেলেমানুষী সদিচ্ছায় কেলেংকারী ওদের।
কবরের পানে দ্রুত চলি বিনা সুখ, কীর্তি আড়ে,
পেছনে তাকানো বিদ্রূপের।

ত্বরায় ভোলা বিষণ্ণ ভিড়ে
ধরা থেকে মুছে যাই নিঃশব্দে চিহ্ন না রেখে,
চিন্তার ফসল কালের পানে না ছুঁড়ে,
কিংবা আরব্ধ কাজের প্রতিভাকে।
বিচারকের, নাগরিকের নিক্তিতে মোদের অবশেষ,
লুটোবে পরপ্রজন্মীর প্রহসনভরা পদ্যে,
প্রতারিত সন্তানের ব্যথাভরা শ্লেষ
জালেতে জড়ানো পিতার নৈবেদ্যে।

সেদিন

ইলিয়া এরেনবুর্গ, ১৯১৯

পাঠ্যপুস্তকের পাতা উলটিয়ে
নাতিরা রবে বিস্ময়ে;
"চোদ্দ সনে...সতেরোতে...উনিশেতে
কেমন করে কাটাতো ওরা?...বেচারা! বেচারা!"
নতুন শতকের প্রজন্মী পড়ে নেবে সংগ্রাম
মুখস্থ করবে সব নেতাদের বক্তাদের নাম,
মৃতদের সংখ্যা
আর দিনক্ষণ।
ওরা জানবে না, কেমন সুবাসে ভরা ছিল রণভূমিতে গোলাপ,
কেমন কামানের গোলার মাঝেও রণিত হতো পতংগ-আলাপ,
কেমন সুন্দর ছিল সে সময়ে.
জীবন,
এতো খুশিতে সূর্য কখনো হাসত না, কখনো না,
যেমন বিধ্বস্ত সেই নগরীর ওপর,
যখন মাটির তলা থেকে বেরিয়ে মানুষেরা
অবাক চোখে চাইত; এখনো আছে সূর্য!...
ঝংকৃত হতো বিদ্রোহীর ভাষা,
মরতে থাকতো রুখে-দাঁড়ানো সেনা,
তবে তারা জেনে যেত, ঘ্রাণ কেমন বরফের তলার ফুলের,
আক্রমণের একঘণ্টা আগে।
ভোরেই নিয়ে যেতো, গুলি করে মারতো,
তবে ওরাই শুধু জানত এপ্রিলের সকালের অর্থ।
বাঁকা রশ্মিতে জ্বলত দেউল-চূড়া,
আর বাতাসে ভরা থাকত আর্তি : একটু থামো। এক মিনিট। আর এক মিনিট।...
চুম্বনকালে সরতে পারত না বিবশ ঠোঁট থেকে,
আলগা করত না জোরে-জড়ানো হাত,
ভালবাসত—মরব! মরব!
ভালবাসত—জ্বলতে থাকো, স্ফুলিংগ, হাওয়ায়!
ভালবাসত—তুমি কোথায় গো? কোথায়?
ভালবাসত—যেমন ভালবাসা যায় শুধু এখানেই, এই ঝঞ্ঝাকোমল গ্রহে।
সেদিন ছিল না সোনালি ফলে ভরা বাগান,
তবে ছিল ক্ষণিকের ফুল, নিঃসঙ্গ ছোটর নিশ্চিত প্রয়াণ।

সেদিন বলা হত না "দেখা হবে",
শুধু শোনা যেত সংযত "বিদায়"।
আমাদের কথা পড়ো—আশ্চর্য হও।
আমাদের কালে তো ছিলে না—তাই বিবাদে ভরো।
ধরার অতিথি আমরা শুধু এক সন্ধ্যার।
ভালবেসেছি, ভেঙেছি, বেঁচেছি আমাদের নির্দিষ্ট কাল,
তবে আমাদের ওপরেও চমৎকাত অনন্ত তারা,
আর তারি তলে শুরু করেছি তোমাদের চাল।
তোমাদের চোখে আজো জ্বলে আমাদেরি ব্যথা।
তোমাদের কথায় আজো বলসায় আমাদেরি দ্রোহ।
দূরে রাত্রিতে যুগযুগান্তে ছড়িয়ে তো গেছে
আমাদেরি সেই নিভে-যাওয়া জীবন।

লোকেরা

ইয়েভগেনি ইয়েভ্‌তুশেংকো, ১৯৬১

মনে দাগ কাটে না এমন মানুষ নেই।
ভাগ্য ওদের গ্রহ—ইতিহাসের আদলেই।

প্রত্যেকে বিশিষ্ট, সব নিজ ধরন,
নেইকো গ্রহ, একে অন্যের মতন।

আর যদি কেউ চুপে দিনটি কাটালি
চুপিসাড়ের সংগে করলি মিতালি,

মানুষের সারে তো রয়ে গেল দাগ
নজর-না-কাড়ায় জুড়ে নিজ ভাগ।

প্রত্যেকের আছে শুদ্ধ নিজস্ব ভুবন,
আর সেখানে মুহূর্তের সেরা স্পন্দন।

সে ভুবনে আছে কিছু ত্রাসের প্রহর,
আমাদের কাছে তারা অচেনা আঁচড়।

আর যদি মারা যায় মানুষ একটা,
সংগেই মনে প্রথম তুষারপাতটা,

প্রথম চুম্বন তার, প্রথম সংগ্রাম....
সব কিছু নিয়ে সে যে ছাড়ে ধরাধাম।

হ্যাঁ, রয়ে যায় শুধু বই আর সেতুরা,
যন্ত্রেরা যত এবং শিল্পীর পটেরা।

হ্যাঁ, অনেক কিছুকেই থেকে যেতে হয়,
তবে কতক তো হতেই হয় বিলয়।
অকরুণ এ খেলার নিয়ম এমন;
মানুষ তো মরে না, চলে যায় ভুবন।

পাপী আর তাপী, মানুষ স্মৃতিতে থাকে,
সত্যই কিছু কি জানি ওদের সম্পর্কে?

অন্তরংগদের, ভায়েদের কিছু জানি,
একমাত্র প্রেয়সীকে কিছুই কি চিনি?

এমনকি নিজের পিতাকেই ধরি না
সবকিছু জেনেও কিছুই তো জানি না।

চলে যায় মানুষ...ফেরানো অসম্ভব।
ওদের নিজ ভুবন না পুনর্ভব।
প্রত্যেকবার তো তাই বদ্ধমুঠি
এই না ফেরায় চিৎকার করে উঠি।

ভারতীয় দর্শন

ইয়েভগেনি ভিনকুরভ, ১৯৬৮

ভারতীয় দর্শন,—
পশুতে লতায় বন ভরা;
পাতা শিল্পীর আসন,
রঙিন পটে আঁকেন ধরা।
ভারতীয় দর্শন—
মন্দিরে কারুকাজ
বেগনি ফিরোজের বণ্টন
সবখানে করে রাজ।
মহাভারতের শ্লোকে,

রামায়ণ, উপনিষদ....
যেন ঠাণ্ডা প্রলেপে ঢাকে
গরম কর্ণপট।
ভারতীয় দর্শন—
সরল তোমার স্বতঃসিদ্ধেরা।
চাপবদ্ধ যুগ-প্রবাহন,
যেন স্তরের ওপর স্তর পলিরা
তোমার গীত আর রোদনে মেলে
জটিল চিন্তার সারি।
মাথার নাড়া দিয়ে চলে
যেন যূথবদ্ধ করী।
লাজুক ভারতীয়া দাঁড়িয়ে থাকে,
টেকার মত, কপালে বিন্দু।
পুনর্জন্মে বিশ্বাস রাখে,
যুগ টপকায় হিন্দু।
বেকার ইতিহাস-চিন্তক,
অজানা দেশের চারু—
কী ওর ভবিষ্যৎ? শশক?
কী ওর অতীত? সজারু?
শ্বেত উত্তরীয় বসন,
নেমে ঘিরে ছোঁয় পাদ।
অনন্তের চক্র-আবর্তন
ত্বরিত জলপ্রপাত।
পানের বাটায় গোলাপি আভা না..।
ঘ্রাণেতে এটাই কি নয় মৌন?
দার্শনিকের কাছে তো ধূপধূনা
শাস্ত্রকে করতেই পারে গৌণ।
আর ঐ ভেঙে শক্ত খোলস,
আর্তি : 'আর আমিই তো পূর্ণ'।
বেরল জাত পুরুষ
চিন্তার অণ্ড করে যে চূর্ণ।
ভারতীয় দর্শন—
স্রোতস্বিনী, যা প্রপাতে ভরা....
..যেন কোরে আফিঙ সেবন,
ব্রাহ্মণ ঢুলতে থাকে পুষ্পধরা।

পুরাবৃত্ত

অশোক বিশ্বাস

ইন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকে ফোলিও-ব্যাগ রাখল। এ্যাটাচ-বাথ-এ গিয়ে চোখেমুখে জল দিয়ে এসে শার্টপ্যান্ট খুলে পাঞ্জাবি পাজামা পরল। তারপর খুলে দিল উত্তরের জানালা।

বিকেলের পড়ন্ত রোদ বেলগাছটার কচি পাতায় ঝিলিক দিচ্ছে। রোদের আভা ঘরের মধ্যেও এসেছে। দেখতে পেল ঘরের এক কোণে রাখা প্রোন চেয়ারটা ঝকমক করছে। অর্থাৎ মউ শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে। এখন সে যে কদিন থাকবে রোজই ঝাড়মোছ হবে চেয়ারটা; শুধু চেয়ারটাই বা কেন, এক-স্ট্যাণ্ডের ওপর দাঁড়ানো এলোমেলো ডালপালার অদ্ভুত চেহারার আসনটা, ওয়ার্ড্রোব আর সেক্রেটারিয়েট টেবিলটাও। চেয়ারটার আবলুস কাঠের, আলনাটা মেহগনির, অন্য দুটো বার্মাটিকের। যদিও ইন্দ্রনাথ এর কোনোটাকেই ব্যবহার করে না।

তার ঘরের খাট, লেখাপড়ার টেবিল, চেয়ার আরামকেদারা এসব নিত্য মোহামুখি হলেও ওই বিশেষ ফার্নিচারগুলোর গায়ে হাত পড়ে না। মাসের পর মাস ঘরের ওই কোণটায় ধুলো জমা হয়ে পড়ে থাকে। ওগুলো তার ঘরে থাক, চায়নি সে; কিন্তু বাড়ির মধ্যে যেহেতু তার ঘরখানাই সবচেয়ে বড়, এবং আগের কর্তারা অর্থাৎ ঠাকুর্দা, পরে বাবা, বরাবর এ ঘরেই থেকে এসেছেন এবং এই বস্তুগুলো আমদানিও করে গেছেন, সুতরাং তার অনীহা সত্ত্বেও ওগুলোর ঠাঁই হয়েছে এ ঘরেই; তাছাড়া বড় কথা সে অকৃতদার অতঃপর সাংসারিক বিবেচনায় তার ঘরে বাড়ির বাড়তি কিছু জিনিসপত্র থাকতেই পারে।

পুব-দক্ষিণমুখী ইংরিজি 'এল' প্যাটার্নের দোতলা বাড়ি। সাবেক আমলের। একতলাটা ঠাকুর্দার পিতৃদেবের পত্তনি। ঠাকুর্দার আমলে দোতলার বর্ধন।

সে থাকে দক্ষিণমুখী ব্লকে। পুবমুখীতে দাদা মৌলিনাথ। ওপর নিচে সব মিলিয়ে খান আষ্টেক ঘর। ঘরের সামনে চওড়া বারান্দা। অথচ এতবড় বাড়িতে লোক মাত্র তিনজন—সে, দাদা, আর বৌদি। নিচের তলাটা ফাঁকা পড়ে থাকে বলে দুজনকে এমনিই থাকতে দেওয়া হয়েছে। মথুরা আর মুন্সী। দুই ভাই। বিহারের লোক। বউ বাচ্চা নিয়ে থাকে। আগে এখানকার জুটমিলে কাজ করতো। মিল উঠে যেতে নির্জন ধাওড়ায় টিকতে না পেরে এসে জুটেছে। দাদা বা তার দিক থেকে কোনো আপত্তির কারণ হয়নি। কখন কী দরকার পড়ে, ডাকতে হাঁকতে লোক দরকার; ওরা থেকে ভালই হয়েছে। মিল থেকে বেকার হয়ে যাওয়া অনেকের মতোই ওরা রিক্সা চালিয়ে খায়।

ক্রাউন ব্যাকরেস্ট চেয়ারটার চেহারা না লক্ষ্য করলে ইন্দ্রনাথ বুঝতেই পারতো না মউ এসেছে, কারণ ডোরবেল বাজতে মুন্সীর বউ এসে সদর দরজা খুলে দিয়েছিল।

ফ্যান খুলে ইন্দ্রনাথ দরজার পরদা উঠিয়ে দিয়ে ইজিচেয়ারে লম্বা হল। উঠোনে জামরুল গাছটার ফল আসছে। দক্ষিণের হাওয়া শরীর জুড়িয়ে দিয়ে গেল। সবগুলো জানালা খুলে দিলে ফ্যান চালাবার দরকার হয় না। উঠোনটা এত বড়, পাশাপাশি দুটো টিম অনায়াসে লন্-টেনিস খেলতে পারে।

বছর দুয়েক আগের ব্যাপার। জার্মান ছোকরা অটো প্যাটমেয়ার। পেশায় এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার। কিন্তু ডাক্তারির দিকে তার যত না ঝোঁক, তার থেকে বেশি ন্যাক হিস্ট্রি, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মহাকাশ, অকাল্টসায়েন্স। পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে, এ দেশের ছেলেদের মতো বন্ধন নেই; দুনিয়া দেখতে বেরিয়ে পড়েছে।

এ-বংশের লোকেদের নানাদিকে নানা কর্মকাণ্ড আছে। ফুলকাকু যদিও সাধারণভাবে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিশ করেন, কিন্তু ডিগ্রিতে ডক্টর অফ সায়েন্স। চিকিৎসাবিজ্ঞানে। বিশেষ করে মনোরোগ, স্পন্ডিলাইটিস, আর্থরাইটিসে নতুন এক প্যাথি নিয়ে বহুদিন ধরেই নাড়াচাড়া করছেন। যদিও প্যাথির উদ্ভাবন ফুলকাকু নিজে নন, ফুলকাকুর বাবা মেজঠাকুর্দা। সূত্রটা তিনিই দিয়ে গিয়েছিলেন। ফুলকাকু ডেভালপ করে চলেছেন। এ ব্যাপারে কাকুর লেখা বইপত্রও আছে। অনেকবার এই সংক্রান্ত আলোচনার ডাকে বিদেশও গেছেন। পদ্ধতিটার নামকরণ রেডিওপ্যাথি। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। সূর্যের আলো জেম্‌সের মধ্যে দিয়ে রোগীর ছবির ওপর ফেলে কাজ করা। মনোরোগীদের ক্ষেত্রে নাকি দুর্দান্ত কাজ হয়। পেসেন্টকে ছাড়া শুধু তার ছবির ওপর এই চিকিৎসা পদ্ধতি কী করে কাজ করে বুঝতে পারে না ইন্দ্রনাথ। কিন্তু ফলাফল সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। তার এক বন্ধু, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তার আত্মহত্যার ইচ্ছে জাগত। যেখানেই কেউ আত্মহত্যা করেছে বলে শুনত, ছুটে যেত দেখতে। রোজই একবার করে স্টেশনে জি.আর.পি থানার সামনে বেলা বারোটা নাগাদ পাক খেয়ে যেত, কারণ ওই সময়ই রেলে কাটা পড়া লাশ লোকাল ট্রেনে পোস্টমর্টেমের জন্যে কলকাতায় যেত। —সেই বন্ধু ফুলকাকুর চিকিৎসায় একদম ভাল হয়ে গেল। এর ব্যাখ্যা ইন্দ্রনাথ বুঝতে না পারলেও, প্যাটমেয়ার বুঝেছিল, যেজন্যে সুদূর জার্মানি থেকে ছুটে এসেছিল এখানে; শুধু প্যাটমেয়ার কেন, আমেরিকার মাইক স্টার্ন, সুইডেনের ক্যাথিলি, অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড...এরকম অনেকেই এসেছে। আসে বিষয়বস্তুর সম্যক অনুধাবনের জন্যে দু-মাস চারমাস থেকেও যায়। তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা কখনও ফুলকাকুর বাড়িতে কখনও তাদের নিজেদের পছন্দমাফিক হোটেলে। তবে থাকা-শোওয়ার জন্যে নির্ধারিত বংশের আদি বাড়ি এখানেই। তিন-তলার ছাদের ওপর এ্যাটাচ-বাথ মাঝারি মাপের যে ঘরখানা আছে, তাতে। এ বাড়ির অনেক ঐতিহ্যের মধ্যে একটি হল, দেশবিদেশের লোকজনের আসা যাওয়া। যার শুরু ঠাকুর্দার পিতৃদেবের আমল থেকেই। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের গবেষক এবং পণ্ডিত। বৌদ্ধধর্ম চর্চার জন্যে তখন জাপান কম্বোডিয়া থেকেও লোক এসেছে।

ফুলকাকুর অতিথিরা থাকলে স্নান সেরে বেরিয়ে যায়, ফেরে সন্ধের পর। তারপর ঘরে। ভদ্রতা খাতিরে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ পরিচয়টুকু হয়। হয়তো কিছু দিন চিঠি

চালচালিও। তারপর থেমে যায়। কিন্তু যাকে বলে ঘনিষ্ঠতা সেটা গড়ে উঠল গ্যাটমেয়ারের সঙ্গে। এর কারণ হয়তো তার মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা ব্যাপারটাই একেবারেই ছিল না। উপরন্তু আলাপী, দিলখোলা সমবয়স্ক। সপ্তাহ খানেক এ-বাড়িতে থাকার পর একদিন সন্ধের পর যখন ইন্দ্রনাথ বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে লো ভয়েজে টি.ভি দেখছিল, সেইসময় দরজায় পরদার ওপাশ থেকে ভরাট স্বর ভেসে এল, আর য়্যু অ্যালোন ইনসাইড মিস্টার? মে আই কাম ইন?

ইন্দ্রনাথ উঠে বসে টি.ভি অফ্ করল, ইয়েস কাম ইন।

সুতির ড্রেসিং গাউন পরেছে মাঝারি গড়নের মানুষটা। স্নান সেরেছে একটু আগে। শরীরে সহনীয় সুবাস। জার্মানদের চুল অতটা লালচে হয় না। ঘন ভুরুর নিচে একজোড়া উজ্জ্বল সমুদ্ররঙা চোখ। মানানসই গোঁফ।

—তুমি এই ঠাণ্ডার মধ্যে স্নান করেছ!

—অসুবিধে কী। এ্যান্ড নাউ ফিলিং ভেরি প্লেজেন্ট। নিজেই চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল, তুমিও ব্যাচেলর, আমিও। সন্ধের পর কী করো?

ইন্দ্রনাথ ভাবল, তাকে মদ্যপানের আহ্বান করছে গ্যাটমেয়ার। তার অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো ছুঁৎবাই নেই, কিন্তু রক্তচাপের ঊর্ধ্বগতির দিকে খেয়াল রাখতে হয়। বলল, সিম্পল পাস টাইম, কিছু পড়াশুনোও হয়তো। কেন, তুমি কি বিশেষ কিছু করতে চাও?

গ্যাটমেয়ার ইঙ্গিতটা ধরে নিয়ে হাসল, নাথিং স্পেশাল। ড্রিঙ্কিয়ে আমি এ্যাডিকটেড নই। তবে ইচ্ছে হলে মাঝে মধ্যে খাই বৈকি, এ্যান্ড দ্যাট—, ইউ নো, জার্মান লাইক পট্যাটো এন্ড বিয়ার।

এবং এই প্রথম ইন্দ্রনাথ জানল, শ্বেতাঙ্গরাও নিরামিষাশি হয়। গ্যাটমেয়ার মাছ মাংস ছোঁয় না।—তাহলে খাও কী, শুধুই পট্যাটো?

—কেন, স্যুপ আর পাল্‌সেস এ্যান্ড ভেচ্চেস। গ্রেন্‌স্। বীন্‌স। ব্রকালি। এ্যান্ড, বেটা বলল, তা হচ্ছে লিলি বা রজনীগন্ধা ওইজাতীয় একরকম গাছ হয় ওদের দেশে তার ডাঁটির গায়ে ফুলের বদলে ছোট ছোট বাঁধাকপির মতো একরকমের ভেজ, কারি হিসেবে ভেরি প্যালেটেব্‌ল্। হেসে বলল, পট্যাটো ছাড়াও আরও অনেক ভাল ভাল খাওয়ার জিনিস আছে হে। এই তো সেদিন তোমার ফ্লাওয়ার আঙ্কেলের বাড়িতে ডেট-ট্রির জুস খেলাম, ফাইন, পরপর চার গ্লাস খেয়ে দুপুরে আর খাওয়ার ইচ্ছেই থাকল না।

গ্যাটমেয়ার ফুলকাকুর বাড়িতে ওলকপির ডালনা দিয়ে ভাত খায়। মুলোর অম্বল খেতে ভালবাসে। বড়ি ধনেপাতা দিয়ে লাউয়ের তরকারি তার প্রিয়। এমনকি সে মোচার ঘন্টও খেয়েছে। তবে হাত দিয়ে খেতে পারে না। চামচ।

একদিন সেই গ্যাটমেয়ারই ফার্নিচারগুলোর প্রসঙ্গ তুললো। ব্যাখ্যা দিল ইন্দ্রনাথ।—এই চটকল শহরে ঠাকুর্দা ছিলেন একজন বড় ব্যবসাদার। প্রতিদ্বন্দ্বীরা নাম দিয়েছিল ভেণ্ডারিস্ট। বহুরকমের ব্যবসা ছিল তাঁর। তার মধ্যে ন্যারো লুম, হেসিয়ান, সার্কুলার লুম, লুমের যন্ত্রাংশ এবং হিবার্ট, ব্যাচিং প্রভৃতি নানারকম মেশিনের টুকিটাকি সাপ্লাই

ছিল অন্যতম ব্যবসা। এর সঙ্গে বাবা যোগ করেছিলেন পাটের জোগানদারি। মিলের সায়েক বড়কর্তাদের সঙ্গে দহরম-মহরম আর সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এক এক সায়েব যখন হোমে ফিরে যেতো, সঙ্গের লটবহর কমাতে চেনাজানা কাছের লোকদের ওটা এটা দিয়ে যেতো। এভাবেই এগুলোর আমদানি।

প্যাটমেয়ার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফার্নিচারগুলো দেখল।

—ভেরি নাইস। তবে চেয়ারটা বড্ড ভারি। এগুলোর বয়স কত হল বলে তোমার মনে হয়?

—বলতে পারি না, একসঙ্গে তো আসেনি।

—আমার অনুমান একশো বছরেরও বেশি। আরও একশো বছরেও কিছু হবে না। পরম স্নেহে আলনাটার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, এই ডালপালাগুলো কেন জানো, কোনটার ডগায় হ্যাট খুলে রাখা যায়, কোনটায় কোট, কোনটায় ছাতি, কোনটায় গাউন। কোনো ফার্নিচারটাই ব্যবহার হয় না, কেন ব্যবহার করো না ইন্ডার।

ইন্দ্রনাথ কথার জবাব দিল না। শুধু মুখখানা একরকমের করে নিচের ঠোঁটটা চেতালো।

পলক না ফেলে প্যাটমেয়ার কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মুখের দিকে। তার চোখে একটা ছায়া খেলা করে গেল। তারপর হেসে উঠল। এসে বসল মুখোমুখি চেয়ারটায়।—তুমি ইংরেজদের ঘৃণা করো, এই তো? আচ্ছা শুধু ইংরেজদের প্রতিই ঘৃণা কেন? তুমি তো ইতিহাসের অধ্যাপক, ভাল করে ভেবে দেখ তো, তোমাদের দেশের কিছু বড়লোকদের সাহায্য ছাড়া ইংরেজরা কি এতদিন ধরে তোমাদের দেশে শাসন শোষণ আর বাণিজ্য চালাতে পারতো? তারপর যখন তারা চলে গেল, ধর্মের ইটে পাঁচিল তুলে তোমাদের ভূখণ্ডটি দু-ভাগে ভাগ করে দিয়ে গেল, এবং তৈরি করে দিয়ে গেল এক পারপিচুয়াল প্রব্লেম, এ্যাজ ওয়েল এ্যাজ এ্যান ইনভায়োলেবল্ হিসট্রি অন্ দি ওয়ে অফ্ প্রোসপারিটি অফ্ দ্য কান্ট্রি। কিন্তু এত কি পারতো যদি না তোমাদের মূল ভূখণ্ডের কিছু ক্ষমতালোভী, স্বার্থপুরুষক, লম্পট নেতা, আর বড়লোকরা তাদের সহায় হতো? তবে শুধু ইংরেজদের প্রতিই তোমার ঘৃণা হবে কেন। অন্য ভাবে নিও না, আমার এক শিকারি বন্ধুর কাছে শোনা একটা বিষয় বলছি—যখন কোনো ভল্লুক আক্রমণ করতে আসে তখন তার দিকে একটা গাছের ডাল বা ওই জাতীয় কিছু ছুঁড়ে দিলে ওইটাকেই সে আক্রমণের অবজেক্ট ভেবে নিয়ে সেটাতেই কামড়া-কামড়ি করতে লেগে যায়, আর এই ফাঁকে পলায়নপর লোকজন নিরাপদ সেন্টার খুঁজে নেয়। আসলে মানুষের অ্যাবহরেন্স্-এর টার্গেটটা পারফেক্ট এবং টু-দ্যা-পয়েন্ট হওয়া দরকার।

মাত্র দু-মাসের আলাপেই কাউকে এভাবে বলা যায় কিনা কিংবা এই বলার মধ্যে কতদূর সীমারেখা লঙ্ঘিত হল, হয়তো সেই ভাবনাতেই আক্রান্ত প্যাটমেয়ারকে একটু বিশেষ্যাক্রান্তই মনে হল, তারপরই স্বভাবগত ভাবে বলে উঠল, কিছু মনে কোর না, আসলে তোমাদের ইন্ডিয়ানদের আমরা খুবই নিকটজন মনে করি। এ্যানথ্রপলজিক্যাল এ্যানালিসিসে

দেখা গেছে তোমাদের করোটির গঠনের সঙ্গে আমাদের করোটির গুণগত সাদৃশ্য আছে। নর্দান ইয়োরোপে ওদের করোটির গঠন উপরদিকে একটু চাপা-চাপা। সরু। তোমাদের বা আমাদের সঙ্গে তার মিল নেই। তোমাদের বাড়িতে পুজোতে যে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা হয়, সেটা আমাদেরও চিহ্ন। তফাত শুধু, তোমরা আঁকটা টানো বাঁদিক থেকে, আমরা ডানদিক থেকে। কেন এমন হল, কখনও কি ভেবে দেখেছ?

সে যতদিন ছিল আড্ডা জমতো সন্ধেবেলা। এখন সপ্তাহে সপ্তাহে ফোন করে। ওদের সঙ্গে এখনো সময়ের তফাত পাঁচ থেকে ছ' ঘন্টার মতো। রাত দশটায় ফোন করলে বুঝতে হবে ওদের ওখানে তখন বিকেল চারটে কি পাঁচটা। লাস্ট ফোন করেছিল গত সপ্তায়, বলল, মায়া সভ্যতার ব্যাপারে তার খুব আগ্রহ, কিছুদিনের মধ্যেই দক্ষিণ আমেরিকা পাড়ি দেবে।

বিকেলের চা নিয়ে মউ এল।

কাকুন—! সেই আদুরে ডাক ওর গলায়। চোখেমুখে এখনও দিবানিদ্রায় ঘোর। প্রণাম করে খাটে গিয়ে বসল। হাই তুললো। কিন্তু পা দোলালো না, যা কিনা মউয়ের সহজাত উচ্ছলতার প্রকাশ।

ইন্দ্রনাথ প্রিয় ছোট ভাইঝিটির মুখের দিকে তাকাল। ওর সুন্দর মুখ চিন্তাচ্ছন্ন। কৌতুক-চঞ্চল চোখদুটো আত্মমগ্ন। এমন হতেই পারে। ওদের পরিবারের ওপর বিরাট ঘা এসেছে। টাটারা মোটরগাড়ির কারখানার জন্যে সিঙ্গুরকেই বেছে নিল। জন-মজুর দিয়ে নিজ হালে চাষ করা ওদের কুড়ি বিঘের মতো জমি চলে গেছে। আরও গেছে কোল্ডস্টোরেজটা। যখন ভয়ানক গণ্ডগোল ওখানে, প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা, জামাই দেবাশীষ সেসময় মউকে নিয়ে এখানে চলে এসেছিল। স্বাধীন দেশে এক নির্বাচিত সরকার, জনগণের স্বার্থে নয়, এক শিল্পপতির স্বার্থে তার বাহানা মেটাতে, নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বলাৎকার করার মতো যে চণ্ড ধর্ষকের ভূমিকা নিল তাতে মরমে মরে গেছে প্রগতিশীল চিন্তার দেবাশীষ, তার নামের চেক পড়ে আছে সরকারের খাজাঞ্চীখানায়—দেবাশীষ নেয়নি।

শুধু দূরভাষে খবরাখবর নয়, কাগজ, দূরদর্শন মারফৎ সবই জানা, তবু, কিছু যেন কথা নেই, বলেই হয়তো ইন্দ্রনাথ প্রশ্নটা করল, এখন খবরাখবর কী সব? তুই বোধহয় মাস তিনেক পরে এলি?

মউ বলল, হ্যাঁ, প্রায় তিনমাস পর। তারপর পায়ের বুড়ো আঙুল মেঝের ঘষতে ঘষতে বলল, আমরা বলরামবাটি চলে আসছি। ওখানে তোমার জামাইদের একটুকরো জমি ছিল, সেখানেই কিছু একটা করে নিতে হবে। কথা বলতে বলতে মুখ নিচু হয়ে গেল।

—কেন! এ ছাড়া কিছু কথা জোগাল না ইন্দ্রনাথের।

—ওখানে থাকা যাবে না কাকুন! বলে, ঝটিতি উঠে পড়ল মউ, তোমার জামাই এসেছে, সব বলবে।

দাদার দুটো মেয়ে। মউ আসার খবর পেয়ে পিউ আর তার স্বামী সত্যব্রত সন্ধের দিকে এল। দেবাশীষ চাষিবাসী ব্যবসাদার হলেও বড়জামাই সত্যব্রত চাকুরিজীবী। তবে টকের জ্বালায় দেশান্তরী তেঁতুলতলায় বাস। তার নামজাদা রং-ফ্যাক্টরির গেটে তালা ঝুলছে। ভবিষ্যৎ দশ বাঁও জলে। সেইজন্যেই ক্ষেপে গিয়ে বলল, হেলে ধরতে পারে না কেউটে ধরতে যায়। যত নষ্টের গোড়া এই পাতি মধ্যবিত্ত ঘর থেকে উঠে আসা মন্ত্রীগুলো। এদের না আছে ব্লু-ব্লাডের মস্তিষ্ক, না আছে ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টি। আর মরছি গিয়ে আমরা। একে একে কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারে কিছু করার মুরোদ নেই, তার ওপর আবার নতুন করে খুঁচড়ে ঘা। আজ খোলা, কাল বন্ধ—শিল্পপতিদের ইচ্ছেই যদি শিরোধার্য হয়, তাহলে মাঝখানে লোক খাটানো করার দরকার কী তোদের? ঘরে গিয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকগে যা না।

ইন্দ্রনাথ দেবাশীষের দিকে তাকালো, বলরামবাটি চলে যাবে কেন?

—উপায় নেই, ওখানে চাষবাস তো আর হবে না। জুলকিয়া, ঘিয়া দুটো নদীরই দখল টাটাদের হাতে। বসছে বারোটা স্লুইস গেট। দশটা ডিপটিউবওয়েল। এক একটা গাড়ি তৈরিতে চব্বিশ কিউসেক জলের দরকার। লকগেট বন্ধ করে দিয়ে নদীর জল নেওয়া ছাড়াও মাটির তলার জল তুলবে। একেবারে নিচের স্তরে থাকে আর্সেনিক। জল তুলতে তুলতে আর্সেনিক স্তর ছুঁতে বেশি দেরি হবে না। মরণ খোঁয়াড়ে বাস করার কী দরকার?

দেবাশীষের কথা শুনতে শুনতে ইন্দ্রনাথের চোখের সামনে ভেসে উঠছিল আম জাম কাঁঠাল ঘেরা ওদের নিরিবিলি বাড়িটার কথা। বাগানের নিস্তরঙ্গ পুকুরটার ছবি। মউয়ের বিয়ে হয়েছে চার বছর। এরমধ্যে বার তিনেক ওর বাড়ি গেছে ইন্দ্রনাথ। গাছগাছালি ফসলে সমৃদ্ধ হুগলির মতো এমন মনোরম পল্লীশ্রী পশ্চিমবঙ্গে বোধহয় আর কোথাও নেই।

দাদা মৌলিনাথ কড়িকাঠে চোখ রেখে বসে ছিলেন; বললেন, তিনপুরুষের মধ্যে এই নিয়ে তোমাদের দু-বার অন্নপ্রাসন ছাড়তে হল। প্রথম, তত্রেশ্বরে জুটমিল যখন হয় তখন, আর এবার সিঙ্গুর ছেড়ে বলরামবাটি, তারপর কোথায়?

কেউ কোনো কথা বলল না। মৌলিনাথ সেইভাবেই উর্ধ্বমুখ হয়ে এক চিলতে ম্লান হাসলেন, হায় সিঙ্গুর! তুমি সিংহবাহুর সীহপুর। অতীত ঐতিহ্য।

মৌলিনাথের হাঁটুতে হাত রেখে মউ বলল, কীসের ঐতিহ্য বাবা?

মৌলিনাথ মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন, পালিগ্রন্থ দীপবংশ অনুসারে দেখা যায় যিনি সিংহল জয় করেন সেই বিজয় সিংহের পিতা সিংহবাহু সীহপুর মানে আজকের সিঙ্গুরে রাজধানী স্থাপন করে ভাগীরথীর উত্তর তীরে অনেক দূর পর্যন্ত শাসন করতেন।

পানের ডাবর তুলে রেখে এসে বৌদি বসল। বলরামবাটির পর কোথায় বলছিলে না? রাজনীতির মার দুনিয়ার বার। ওখান থেকেও হয়তো শিগগির উঠতে হবে। তোরা এ পারে চলে আয় বাপু। এতবড় বাড়ি, এখানেই চলে আয়, তারপর বুঝে শুনে দেবু

একটা কিছু শুরু করুক। সত্যও ওর সঙ্গে যোগ দিক। আমি বেশ বুঝছি, রং কল আর খুলবে না। যেটা বন্ধ হয়ে যায় সেটা আর খোলেই না। চোখের সামনেই তো দেখলাম এখানের চার-চারটে মিল বন্ধ হয়ে গেল। সে কতবছর হয়ে গেছে। মিলের তাবদ জিনিস ভেঙেচুরে সের দরে বিক্রি হয়ে গেল, শুনেছি কারখানার বিল্ডিংগুলোর ভিতের তলায় মোটা মোটা তামার থান শোয়ানো ছিল, সেগুলোও। ইট কাঠ পর্যন্তও। বিহারি মাদ্রাজি লোকগুলো দেশে ফিরে গেল। মরে গেল। এতবড় বাজার কানা পড়ে গেল। ধাওড়াগুলো ভূতের আড্ডা আর নরক। আর শ্রমিক নেতাদের বউদের নামে কৃষাণ-বিকাশ কেনার ঠেলায় পোস্টাপিসের আর সব কাজ কিছুদিনের জন্যে লাটে উঠে গেল।

দোতলায়ও কুড়ি ইঞ্চির গাঁথনি। জানলার ধারিতে বসে ছিল ইন্দ্রনাথ। বাইরে তাকালো। আকাশ ভরতি তারা। নতুন বাড়িঘর আর উঁচু উঁচু গাছে আড়াল পড়ে গেলেও কাছেই গঙ্গার অবস্থিতি মালুম হয় প্রাণজুড়নো হাওয়ায়। ওপারের টেলিফোন টাওয়ারের ওপরে লাল আলোটা স্পষ্ট।

সত্যব্রত বলল, চটকল হওয়ার জন্যে গঙ্গার দু-পার থেকেই একসময় কাঁড়ি কাঁড়ি লোক উচ্ছেদ হয়েছিল। রুজি রোজগার হারানো জেলে মালো চাষি সব সরে গিয়েছিল গ্রাম সাইডে। রেল কল আর বারাদল। মলেও ওমুখো যাব না, এই ছিল যাদের পণ তারা ছাড়া যারা আসতে চেয়েছিল তারা কাজ পেয়েছিল কলে। আমাদের এই এখানকার চটকলেই তিনটে শিফ্‌ট-এ দশহাজার লোক কাজ করতো; এগুলো ছিল শ্রমনিবিড় শিল্প। কিন্তু এখন তিনচারফসলি জমি থেকে চাষিদের কাঁটার মুগুর মেরে উৎখাত করে যা পত্তন হচ্ছে তা শ্রমবিরল শিল্প। ক'জন লোক কাজ পাবে? যারা না পাবে খাবে কী? যাবেই বা কোন্ চুলোয়? এ তো দেখছি অন্ধকূপ হত্যা! নিজের দেশে নিজের খরিদা মাটিতে মানুষের হক্ নেই। পরাধীনতার চাইতেও অধম অবস্থা।

দেবাশীষ বলল, চটকল হওয়ার সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাওয়া জমিদাররা ছাড়াও তাদের অধস্তন নায়েব গোমস্তারাও মিল মালিকদের কাছ থেকে মোটা মোটা টাকা খেয়ে কুলপতি পাট্টাকে ফালতু করে দিয়ে কেড়ে নিয়েছিলেন জমিজমা...।

কথার মাঝখানে মউ কথা বলল, কিন্তু সেই জমি আগলাবার জন্যে জমিদাররা গাঁট খরচা করে নিশ্চয়ই টাকা ঢালতো না।

তার কথার খেই ধরে নিয়ে সত্যব্রত বলল, ঠিক বলেছিস ভাই, রাজকোষের টাকা শূন্য করে দিয়ে এক শিল্পপতির তালুক রক্ষা করা হচ্ছে, এখন তাতেও কুলোচ্ছে না দেখে কাবলিওয়ালার কাছে ফসল বন্ধন দিয়ে টাকা এনে ঢালছে। একেই কি বলে ভীমরতি, মানে ভীমের রতি জাগ্রত হলে যা হয়?

সত্যব্রতর দিকে পিউ কটমট করে তাকাতে সে থেমে গেল। দেবাশীষ এদের কথার মাঝখানে চুপ হয়ে গিয়েছিল, এবার তার কথার সূত্র তুলে নিয়ে বলল, এই জমি কেড়ে নেওয়ার খেয়ালখুশি আর ফাটকা খানিকটাও যাতে রোধ হয়, চাষি যেন একেবারেই বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকরা ১৮৯৪-তে ল্যান্ড

এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট বলে একটা আইন প্রণয়ন করে যদিও সেটা খুবই গোলমেলে। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশের একটা নিজস্ব সংবিধান তৈরি হয়েছে, সংবিধান দিয়েছেন মানুষকে কতগুলো মৌলিক অধিকার। এখন ১১৩ বছরের পুরোনো ব্রিটিশের উপনিবেশ-শোষণ যন্ত্রে তৈরি এক অবৈধ আইন ধুলো ঘেঁটে বের করে এনে সংবিধানের গলা টিপে মানুষের ন্যূনতম অধিকারগুলোও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এ যে কী লজ্জার আর কতবড় ঘৃণার—। অশ্রুরুদ্ধ দেবাশীষের গলা বুজে গেল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর খুশিতে হেসে মৌলিনাথ বললেন, যে যার জন্যেই কাজ করুক, কে কাকে দিয়ে যে কী খেলা খেলছে, খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেটা বুঝতে পারবে না বাবা। সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। সিরাজের ছিল হাজারটা দুয়ার, আর এখানে তো দুশো না কত যেন...।

লোড-শেডিং হল।

সাবেক কালের পেটা ঘড়ি জানালো রাত হয়েছে।

সকালে বৈঠকখানায় বসে কাগজ পড়ছিল ইন্দ্রনাথ।

রাস্তার ধারেই বৈঠকখানা।

একটা টাটাসুমো এসে দাঁড়াল। গাড়িতে একজনই মাত্র লোক। সে-ই চালিয়ে এল। গাড়ি থেকে লোকটা নামতে ইন্দ্রনাথ একটু বিস্মিতচোখে তাকালো। ছ-ফুটের ওপর লম্বা, মধ্যবয়স্ক; যাকে বলে রোবাস্ট হেল্‌থ, তা-ই; মঙ্গোলীয় ধাঁচের চৌকোনো মুখ, থুত্‌নিতে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চুল ধূসর, খাবার-ধরা শরীর অনুযায়ী ট্যোব্যাক্কো পাইপ, বয়সের কুঞ্চন নেই চামড়ায়। শুধু মুখের জমিতে নরম পলি-স্তরে চিতি-কাঁকড়ার হেঁটে যাওয়ার মতো আঁকাবাঁকা কিছু রেখা।

কপালে ভাঁজ তুলে লোকটা বাড়িটাকে জরিপ করল। দেখে নিল সদর দরজার পাশে পণ্ডিত শিরোমণি ঠাকুর্দার পিতৃদেবের নামাঙ্কিত শ্বেতপাথরের বেদীতে স্থাপিত ফলকটা। তারপর গাড়ি লক্ করে মোটা ফেল্টের দামি জুতোর বাঘের নিঃশব্দ বলিষ্ঠ পদসঞ্চারে এসে দাঁড়াল দরজায়। কলিং বেলের বোতামে হাত দেওয়ার আগেই ইন্দ্রনাথ সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

—কাকে চান?

মুখ থেকে পাইপ সরালো লোকটা। হাতঘড়িটা দর্শনীয়। পাঁচশো গ্রামের বাঁটখারা। লাল কালো দু-হাতে দুটো নকল পলার বালা। আকৃতি কব্জির সঙ্গে সমতা রেখেই। তার একটাতে বসানো ইন্‌কারাজার মুখ, একটায় মড়ার খুলি। ধাতু সম্ভবত রুপো। লোকটা জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলল, এটা নিশ্চয়ই একনম্বর পণ্ডিত রোড।

—বলুন।

—আপনি ইন্দ্রনাথ...দাদা মৌলিনাথ।

—বলুন।

—আপনার সঙ্গে কথা আছে। ইন্দ্রনাথের কোনোরকম আহ্বানের পরোয়া না করে সোজা ঘরে গিয়ে ঢুকল। পাপোসের পাশে যে জুতো খোলার নিয়ম, ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রমাণ মাপের চেয়ার কিন্তু শরীর আঁট হয়ে যেতে পারে বুঝে পা লম্বা করে একপেয়ে হয়ে বসল। চেয়ারের হাতলে পাইপ ঠুকল। বের করে পাউচ দেশলাই। ভ্যানগগ ফ্রেঞ্চ-কাট।

—কী কথা বলুন।

—আমি একটা এজেন্সির তরফ থেকে আসছি। আমাদের কাছে খবর আছে আপনাদের বাড়িতে কতকগুলো ফার্নিচার আছে, এ্যান্ড দোজ রিমেন্ড্ আন্‌ইউজড্। ওগুলো চাই। পুরোনো জিনিস সংগ্রহ করা আমাদের নেশা।

—আপনারা জানলেন কী করে?

এই প্রথম হাসল লোকটা। গোলাপি মাড়ির ওপর নিঁখুত ঝকঝকে দাঁত। —যাক, আপনার প্রশ্নই বলে দিল আমাদের জানাটা ঠিক আছে। দেখুন, আমরা এমন অনেক কিছুই জানি যা আপনারা ভাবতেও পারবেন না, এবং জানাটা সঠিকও।

—যেমন?

পাইপে টোব্যাকো ভরতে লাগল লোকটা। —ওয়েল, এখান থেকেই শুরু করি তাহলে। যেমন আমরা জানি আপনাদের এই বাড়িতে শুধু ওই পুরোনো ফার্নিচারগুলোই না, গণ্ডারের শিংয়ের তৈরি রক্তাভ গোমেদ রঙের একসেট কোষাকুষি আছে, কুমিরের চামড়ার খাপে রাখা একটি সোনার নেপালি কুক্‌রি আছে, হাতির দাঁতের একটি বুদ্ধমূর্তি আছে, একটি কাছিমের খোলা আছে যার গায়ে বুদ্ধের বাণী খোদাই করা....আর বলব?

ইন্দ্রনাথ শুধু হতবাকই না, স্তম্ভিতও।

একটু নড়েচড়ে অন্যপাশে ফিরল লোকটা।—এ সমস্ত কিছুই আপনাদের পরিবারের মর্যাদা আর কৌলীন্যের ঐতিহ্যবাহক। আমরা ওসব চাই না। শুধু আপনাদের বাড়িতে পড়ে থাকা ফার্নিচার....বিশেষ করে হেভিওয়েট চেয়ারটা...অবশ্য যদি আপনারা দেন। আজই কিন্তু শেষ কথা নয়, আমি আবার আসব, ফোন করব....।

—আমার ফোন নম্বর আপনি পেলেন কীভাবে?

— ফোন নম্বর তো তুচ্ছ, কোন্ কোন্ ব্যাঙ্কে কী কী একাউন্ট নম্বরে আপনার কত কত টাকা আছে তাও আমাদের জানার বাইরে নয়। আজকালকার ইন্‌ভেস্টমেন্ট প্ল্যানিংয়ের পেটি দালাল কোম্পানিগুলোও এসব অনায়াসে জোগাড় করে নিতে পারে; এমনকি সে জাতের সময়সেবী হলে আপনার এ.টি.এম. কার্ডের সিক্রেট নম্বরটিও। এসব কোনো ব্যাপার না। মোদ্দা কথা, আপনি জানতে আগ্রহী আপনাদের ঘরের ভেতরের এত গুপ্ত বিষয় আমরা জানলাম কী করে, এই তো? জানেন, আমাদের নেটওয়ার্ক অনেক বড়। স্ক্রীনের সামনে বসলে যাঁর সম্পর্কে আমরা জানতে চাইছি তাঁর সমস্ত কিছুই পেয়ে যাই—সে কোনো ব্যক্তিবিশেষ হোক, কোন পরিবার হোক, প্রতিষ্ঠান হোক, দেশ হোক, সব, স-অ-ব, এমনকি যদি চাই, তার ভবিষ্যৎও।

এ বাড়ির রীতি কোনো অভ্যাগত এলে যেন শুধু মুখে না ফেরে।

মথুরার বউয়ের হাতে চা পাঠিয়েছে বৌদি। ঠোঁট ছোঁয়ানো যায় না এমন গরম। আস্ত একখানা টোস্ট বিস্কুট একগালে পুরে দিয়ে কাপের চা আধখানি করে ফেললো লোকটা।—যাক, আপনারা চিন্তা ভাবনা করুন। উঠব এবার। এই মুখেই এখন আমায় বর্ধমান ছুটতে হবে।

কাপের দিকে দেখিয়ে ইন্দ্রনাথ বলল, আপনার চা।

—ও হ্যাঁ। বাকি চা আর-এক চুমুকে শেষ করে লোকটা পাইপ ধরাবার উপক্রম করল।

—বর্ধমান কেন? আগ্রহ অবদমিত ইন্দ্রনাথের।

কথার জবার দেওয়া উচিত কি উচিত-না হয়তো ভাবল লোকটা। মনে হল চোখের মণি এ-পাশ ও-পাশ করল, কিন্তু যার চোখই দেখা যায় না, ধূমল কাচে ঢাকা, তার সঙ্গে কথা বলার বিস্তর বিড়ম্বনা। ইন্দ্রনাথ ভাবল, অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ না করলেই হতো।

পাইপে অগ্নিসংযোগ করে লোকটা বলল, ওখানে দু-জায়গায় দুটো দুষ্প্রাপ্য জিনিসের সন্ধান আছে। এক জায়গায় লর্ড লিটনের ব্যবহার করা মলাক্কা বেতের ছড়ি; আর এক জায়গায় লেফটেনান্ট গভর্নর অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের উইলো কাঠের লাঠি।

খাড়া হয়ে বসল ইন্দ্রনাথ। কী বলে লোকটা। ভারতের বড়লাট লর্ড লিটনের শাসনকাল ১৮৭৬-৮০, আর ফ্রেজার ছিল মধ্যপ্রদেশের গভর্নর, তাকে লর্ড কার্জন বাংলার গভর্নর করে পাঠায় ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গ পিরিয়ডে, কারণ কার্জনের কর্মনীতির একনিষ্ঠ অনুগামী ছিল সে। ওদের জিনিস ওরা দেশে ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে গেল না এ কখনও হতে পারে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় ওইসব টুকিটাকি ভুলবশত থেকে গিয়েছিল, এতদিন পর সেসব কি অক্ষয় থাকতে পারে।

লোকটা আশ্চর্যরকম মনের কথা বোঝে। খানিকটা ধোঁয়া ছড়িয়ে বলল, জিনিস দুটো যেমন ছিল তেমনিই আছে, যেমন যথাযথ আছে আপনাদের বাড়ির ফার্নিচারগুলো। ব্রিটিশরা সবকিছু নিয়ে যায়নি; তাদের অনেককিছুই এদিক ওদিক থেকে গিয়েছে, এবং প্রয়োজনে সেসব ব্যবহারও হচ্ছে। আপনারা ব্যবহার করেন না, স্বতন্ত্র কথা।

পাইপে টান দিল লোকটা। যেমন, আপনাকে বলি, ইতিহাসের অধ্যাপক বলেই এই মুহূর্তে আপনার মনে একটি নাম ঘোরফেরা করছে, নামটা লর্ড কার্জন, রুলিং পিরিয়ড ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫, ঠিক আছে? তো ওই মহোদয়ের একপেয়ার জুতো হিল্লি দিল্লি বহু জায়গা ঘুরে এদিকে এসেছে; রয়েছে কলকাতার একটা ঠিকানায়।

—জুতো। একশো বছরের পুরোনো। অক্ষত অবস্থায়!

—ইয়েস। এবং সেটার ব্যবহারও হয়েছে সম্প্রতি। শুনুন, প্রিজার্ভ করার বিদ্যে জানা থাকলে মরাদেহও অক্ষত রাখা যায়। মিশরীয়রা রাখতো না? আর এ তো জুতো, তার ভাল ট্যান্ করা কাফ লেদারের, বানানোটাও বিলেতে। ভেতরে বাইরে গ্রিজ আর কড্‌লিভার অয়েলের কোটিন্ দিয়ে রাইস্‌ব্রান্ অয়েলে ভিজোনো ছিল।

বুক উজাড় করে ইন্দ্রনাথ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

চেয়ারের দু-পাশে হাত দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে ঘরের কড়িবরগার দিকে চেয়ে লোকটা বলল, এসব পুরাতত্ত্ব সামগ্রী এক্সরে-রেডিওগ্রাফি, কার্বন-ডেটিং, তাপ-সংদীপ্তি এরকম কিছু জটিল পরীক্ষার দ্বারাই জিনিসের আসল নকল, বয়স, চেনা যায়; তবে আমাদের এক্সপার্ট ইনফরমেটিভ ব্যুরো জিনিসগুলোর সম্বন্ধে এতই ডেফিনিট, প্রাথমিক রিপোর্টেই তারা জানাচ্ছে ওসবের দরকার নেই, সবই আসল, কেবল সামান্য বয়সের তারতম্য হতে পারে।

'একদম কোনোরকমের কৌতূহল না' ভেতরে ভেতরে জপবিদ্ধ হয়েও ইন্দ্রনাথ সম্ভবত নিজেকে সংবরণ করতে পারছিল না, জানতে ভীষণ ইচ্ছে, ভবিষ্যৎ বলতে লোকটা কী বলতে চাইছে...কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করল লোকটা, কিছু জানতে চান আর? বলুন। কীসের সংকোচ?

মস্তিষ্ক সঞ্চালনে ইন্দ্রনাথ জানালো সে কিছুই জানতে চায় না।

এই দ্বিতীয়বার হাসল লোকটা, ভবিষ্যৎ জানতে চান? কার? নিজের, না আপনাদের পরিবারের?

ইন্দ্রনাথ নিরুত্তর।

মাথা ঝুঁকিয়ে এক মুহূর্ত লোকটা ভূমিলগ্ন করল দৃষ্টি, তারপর এলায়িত বিলম্বিত স্বরে বলল, খুব খারাপ। খুবই খারাপ। শুধু আপনাদেরই নয়, সবায়ের। আবার আসছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এবার মাথায় কানাত-তোলা টুপি নয়, গায়ে রেশমি জামার ওপর লম্বা ঝুলের কোট নয়, হাঁটু অব্দি চামড়ার পা ঢাকা জুতো নয়; আসছে নতুন সাজে। ভোল বদলে। অন্য নামে। সনদের জোরে ছোট ছোট জায়গির প্রথমে নিলেও অচিরেই সাম্রাজ্য গড়বে তারা। দখল নেবে সমস্ত কিছুরই।

সামনে বসা লোকটা কিন্তু তবু যেন সামনে নেই। কেমন এক আচ্ছন্ন স্বরে বলল, আবার। হ্যাঁ আবার। আবার হবে সিপাহী বিদ্রোহ। দাঁত দিয়ে বুলেটের খোসা ছাড়ানোর প্রতিবাদ থেকে নয়, মর্যাদার দংশনে। গা থেকে দীর্ঘদিনের ক্লীবত্ব আর দাসত্বের ছাপ মুছে দেওয়ার গ্লানিতে। আরও অনেক, অনেক কিছুই ঘটবে। ইউ নো মাই ফ্রেন্ড, হিস্ট্রি রিপিট্‌স এগেইন। বাই।

লোকটা চলে যেতে তারপর খেয়াল হল ইন্দ্রনাথের আশ্চর্য, লোকটা এতক্ষণ থাকল কথা বলল, অথচ তার নাম ধাম পরিচয় কিছুই জানা হয়নি।

রাত দশটা বেজে গেছে। গরমে ঘুম আসছে না। ঘরের আলো নিভিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ। জানলার ধারে চেয়ার টেনে বসল। উষাদির বাড়ির ছাদে সারারাত আলো জ্বেলে রাখার কী মানে হয় কে জানে। রিকশার প্যাঁক প্যাঁক এত অসহ্য! শহরে রিকশার সংখ্যাও খুব বেড়ে গেছে। সেইসঙ্গে মোটর সাইকেল। আসলে ইন্দ্রনাথ কিছু ভাবতে চাইছিল। কিন্তু

কিছুই ভাবতে পারছিল না। এমন সময় ফোন বেজে উঠল। উঠে গিয়ে রিসিভার ধরল। প্যাটমেয়ারের ফোন।

—তুমি কথার খেলাপ করেছ। চুক্তি অনুযায়ী আজ তোমার ফোন করার কথা। করলে না বলেই—যাক, কাইন হবে আর কী বলে হাসল। তারপর বলল, কেমন আছ?

—এমনি সব ঠিক আছে, কিন্তু আজ সকালে বাড়িতে একটা ব্যাপার ঘটেছে।

—কী! ব্যস্ত-শঙ্কিত শোনালো প্যাটমেয়ারের গলা।

—একটা লোক এসেছিল জানো, বলল একটা এজেন্সির তরফ থেকে এসেছে, খবর পেয়েছে আমাদের বাড়িতে কতকগুলো পুরোনো ফার্নিচার আছে, সেগুলো চায়।

—তাতে কী হয়েছে। ওরা কিউরিও ক্যালেক্টার। ওসবের বিজনেসও থাকতে পারে। তোমাদের বাড়িতে যারা আসা-যাওয়া করে হয়তো তাদের কাছেই খবর পেয়েছে। যদি ভাল দামটাম দেয়, এই তালে জিনিসগুলো বিদেয় করো।

—আর সেকথা তো পরে, আগে ব্যাপারটাই শোনো সব। ফার্নিচারগুলো ছাড়াও এমন কতগুলো জিনিস আমাদের বাড়িতে আছে যার ব্যাপারে আমি আর দাদা ছাড়া বাইরের কেউ কিছু জানে না, এমনকি বৌদিও না; লোকটা দেখলাম সেগুলোর সন্ধানও জানে; শুনলে অবাক হবে, জিনিসগুলোর হুবহু বর্ণনাও সে দিয়ে দিল। শুধু তা-ই নয়, প্রসঙ্গক্রমে সে এমন অনেক কথাও বলল যা শুধু অদ্ভুতই নয় অভাবিতও বটে।

—ইন্টারেস্টিং। একটু খুলে বলো।

লর্ড লিটনের ছড়ি থেকে কার্জনের জুতো সমস্ত কিছুই বলে গেল ইন্দ্রনাথ, এমনকি ফিউচার রিডিংও।

ও-প্রান্তে প্যাটমেয়ার চাপা শ্বাস নিল, তারপর ইন্দ্রনাথের কথা শেষ হওয়ার পরও পাঁচ-সাত সেকেন্ড নীরব থেকে প্রশ্ন করল, লোকটার নাম জিজ্ঞেস করেছিলে?

—নাম?

—হ্যাঁ; নাম, কোথায় থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি।

—ওটাই ভুল হয়ে গেছে বুঝলে, তার গাড়ির নম্বরটাও দেখছি এখন আর মনে নেই।

প্যাটমেয়ার আবার চুপচাপ; তারপর বলল, লোকটার চোখ কীরকম?

—চোখ।

—হ্যাঁরে বাবা চোখ। চোখ দুটো কেমন?

—চোখ তো দেখা হয়নি। চেঞ্জার টাইপের স্মোকি গ্লাস ঢাকা ছিল। কিন্তু চোখের কথা আসছে কেন।

—চোখই তো আসল। চেহারা নয়, কথা নয়, ব্যবহার নয়, পোশাক নয়। চোখই মানুষের ভেতরকার আসল ফোকাস, সেই চোখটাই তুমি দেখলে না, কী বলব। ইন্ডার তুমি তো এত অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড নও, হিপনটাইজড হয়ে যাওনি তো?

—কী বলছ।

—তোমাতে ঘাটতি নয়, ভয়ানক সত্যের মুখোমুখি পড়লে যে-কোনো মানুষই হতে পারে। হয়ও। সাময়িক বিস্মরণ বলা যেতে পারে একে। ভ্যাকিউয়িটি অব ব্রেন।

এবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো ইন্দ্রনাথ।

ও-প্রান্তে প্যাটমেয়ারও বাক্যহীন।

তারপর ইন্দ্রনাথ বলল, ভাল কথা, জানো, ফার্নিচার-গুলোর মধ্যে দেখলাম লোকটার বেশি নজর জগদ্দল চেয়ারটার দিকে।

কথার মাঝপথেই প্যাটমেয়ার চাপা স্বগতোক্তি করল—পয়েন্ট টার্গেট...অপ্ট লজিস্ট—তারপর বলল, চেয়ারটার দিকেই যে তার বেশি নজর দেওয়ার রয়েছে, নাহলে যে অঙ্ক মেলে না ভাই।

—কী বলছ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—পারবে। আমি এতদূরে বসে বুঝতে পারছি, আর তুমি ওখানে থেকে বুঝতে পারবে না, হয় নাকি। তোমার ঘরের চেয়ারটাকে তুমি কোনোদিন ভাল করে দেখেছ?

—ভাল করে বলতে?

—জিনিসটার মালিক কে ছিল, কবে বানানো হয়েছিল, এইসব আর কী। আগেকার দিনে, বিশেষত ফার্নিচারের ক্ষেত্রে, এসব খোদাই করা থাকতো। পরে হাতবদল হলেও খোদাই থেকে যেতো। তোমাদেরটাতেও থেকে গেছে।

—আমি তো দেখিনি।

—দেখার চেষ্টা করোনি; এবার দেখে নিও।

—কী আছে বলোতো?

প্যাটমেয়ার হাসল, একটা নাম আর সময়।

—কোথায় আছে?

—ব্যাকরেস্টের পিছন দিকের কাঠে। একেবারে নিচের দিকে। ধুলো থাকলে মুছে নিও। ওয়েল। নো মোর টু ডে। ভাল থেকো।

সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ঘরের আলো ফোন আসতেই জ্বেলে দেওয়া ছিল, এতবড় ঘরে এ-আলো যথেষ্ট নয়। ইন্দ্রনাথ বালিশের পাশ থেকে তিন-ব্যাটারির টর্চটা তুলে নিল।

ঘরের কোনায় গিয়ে আলো ফেললো ঢাউস চেয়ারটার ওপরে।

ক'দিনের পরিচর্চায় পালিশের রং খুলেছে। আলোর খোঁচা গায়ে গিয়ে পড়তেই কুণ্ডলিপাকানো অতিকায় সাপের মতো কালো শরীরটা চমকিয়ে উঠল। পিছন দিকে গিয়ে উবু হয়ে বসে ইন্দ্রনাথ আলো ফেললো নির্দেশিত জায়গাটায়।

কার্পেন্টারের বাঁটালির সূক্ষ্ম খোঁচায় ক্ষোদিত একটি গ্লোবের মধ্যে গর্জনরত একটি সিংহ-মুখ। সিংহের কেশরের ওপরে একটি নাম...মিঃ ডি. রবার্টসন। তলার সন ১৮৯৪।

পা-ঘষা ব্রাশ

নীহারুল ইসলাম

আমি নীলু, নীলুফার ইয়াসমিন। বয়স ছাব্বিশ বছর। গৃহবধূ। আট বছর বিয়ে হয়েছে। ছ' বছরের এক পুত্র সন্তান আছে। স্বামী আছে। বেকার। আমরা যৌথ-পরিবারে থাকি। আমার শ্বশুরমশাইয়ের অবস্থা ভালো। যে-কারণে আমার-আমার পুত্রের-আমার স্বামীর ভাত-কাপড়ের অভাব হয় না।

আমার স্বামী ছবি আঁকে। ও নিজেকে 'চিত্রকর' বলে। ভবিষ্যতে ওর খুব নাম হবে-পয়সা হবে বলেই ওর বিশ্বাস। আট বছর আগে ও যখন আমাকে দেখতে গেছিল, ও ওর সেই বিশ্বাসের কথা আমাকে বলেছিল। এমনভাবে বলেছিল যে, আমিও বিশ্বাস করেছিলাম ওর কথা। এবং ওকে বিয়ে করেছিলাম।

যদিও বিয়ের বছরখানেক পর থেকে আমার সেই বিশ্বাস ভাঙতে শুরু করে। অদ্ভুত ব্যাপার—আমার বিশ্বাস যত ভাঙে আমার স্বামীর বিশ্বাস কিন্তু ততই দৃঢ় হয়।

স্বামী স্বামী করতে আর ভালো লাগছে না। ওকে ওর নামেই উল্লেখ করি।

ওর নাম অনল। নামেই অনল, ভিতরটা ওর খুব নোংরা কিন্তু—একেবারে কুচকুচে কালো। ঠিক ওর আঁকা ছবির মতো। কালো রঙ ছাড়া তো অন্য কোনো রঙের ব্যবহারই জানে না ও। বললে বলে, সাদা-কালোর এফেক্টই আলাদা। সেটা তুমি বুঝবে না।

সেই অনলই কিনা সেদিন ওর ৪০তম জন্মদিনে মাথার চুল রঙ করে বাড়ি ঢুকল। এতদিন ওর মাথা দেখে সাদা-কালোর এফেক্ট বুঝবার চেষ্টা করছিলাম। সেটা বন্ধ হয়ে গেল। এতে আমি যতটা অবাক না হলাম, তার চেয়ে বেশি রাগলাম ওর উপর। আর ওকে জিজ্ঞেস করলাম, চুল রঙ করলে যে। টাকা পেলে কোথায়?

আমার এমন জিজ্ঞেস করার কারণ, ক'দিন ধরে ওকে একটা ডাব সাবান কিনে আনবার কথা বলছি। ও কিনে আনছে না। ডাব সাবানের কথা তো আমি আমার শ্বশুরমশাইকে বলতে পারি না। যেমন বলতে পারি না ব্রার কথা-প্যান্টির কথা-প্যাডের কথা। এ-গুলির জন্য ওকেই বলতে হয়। কখনও এনে দেয়, কখনও দেয় না। এনে না দিলে আমার ভীষণ রাগ হয়। তখন ওকে আকথা-কুকথা শোনাই। ও কিন্তু কোনও উত্তর করে না। চুপচাপ শুনে যায়। খালি প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়। তো, টাকা পেলে কোথায় জিজ্ঞেস করতে ও বলল, একজন দিয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে সে?

ও বলল, ইলা।

এই নামটা ওর মুখে শুনলে আমার কী যে হয়ে যায়। আমি মাথা ঠিক রাখতে পারি না। চিৎকার-চেঁচামেচি করি। আমার পা-পিত্তি জ্বলে যায়। এখনও জ্বলল। কিন্তু আজ ওর জন্মদিন। যদিও জন্মদিন-টন্মদিন ও মানে না। আমি মানি। বিয়ের আগে, বাবার বাড়িতে

ঘটা করে আমার জন্মদিন পালন করা হত। এখন হয় না। তবু দিনটাকে মনে মনে উপভোগ করি। সে আমার জন্মদিন হোক, কিংবা আমার পুত্রের কিংবা আমার স্বামীর। আজকেও উপভোগ করছিলাম। ওকে গিফট্ করবো বলে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আনিয়ে রেখেছি। ভেবেছিলাম এমন উপহার পেয়ে ও খুশি হবে। অথচ সবকিছুতেই জল ঢেলে দিল ও।

সেই জলে ভাসতে ভাসতে আমি বললাম, আমার ডাব সাবান কোথায়? এনেছো?

ও বলল, ডাব সাবান। না, আমি আনিনি। বাজারে পাইনি।

কেন পাওনি?

ও বলল, কেন তুমি শোনোনি, মুম্বাই ল্যাকমে ফ্যাশান শো'তে একজন মডেলের শরীর থেকে পোশাক খসে পড়েছিল। তা নিয়ে মহারাষ্ট্র সরকার তদন্ত কমিশন বসিয়েছিল। সেই কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ—ডাব সাবান এতই পিছিল যে এই সাবান মাখার কারণেই ওই মডেলের শরীর থেকে পোশাক খসে পড়েছে। সেই জন্যই ডাব সাবান ব্যান।

টিভিতে আমিও দেখেছি র‍্যাম্পে চলমান মডেলের শরীর থেকে পোশাক খসে পড়তে। কিন্তু সেটা নিয়ে অনল এমন গল্প ফাঁদবে, বুঝতে পারিনি।

স্বীকার করতে দোষ নেই, অনলের 'সেন্স অফ হিউমার' দারুণ। শুধুমাত্র এই একটি কারণেই ওকে আমার ভালো লাগে। আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ইলার কথা ভুলে যাই।

কিন্তু আমি ভুললে কী হবে, অনল যখন-তখনই ইলাকে আমাদের মধ্যে এনে হাজির করবে।

এই তো সেদিন হঠাৎ দুপুরের একটু আগে বাড়ি এসে আমাকে বলল, জানো—ইলা না এমন একটা শাড়ি পরে আজ স্কুলে এল যে তাকে দেখে আমার তরাইয়ের কথা মনে পড়ল।

আমি তরকারি কুটছিলাম। রান্নার তাড়া ছিল। সেসময় ইলার কথা। কার মাথা ঠিক থাকে? আমি বলে উঠলাম, যাও না ইলার কাছে। ইলার কাছে গিয়ে থাকো গে। আমার কাছে আসবার দরকার নেই।

জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ও বলল, ইচ্ছে তো করেই। অদ্ভুত নির্বিকার বলার ভঙ্গি ওর। তা দেখে আমার এমন রাগ হল যে, তরকারি কাটা বঁটিটা দিয়ে ওকে কুপোব কি না ভাবলাম।

সত্যি বলছি, দিনকে দিন অনলকে আমার অসহ্য লাগছে। কোনও দায় নেই-দায়িত্ব নেই। বউ-ছেলের ভাবনা নেই। শুধু ছবি আর ছবি। ইচ্ছে করে ওর সব ছবি, রঙ-তুলি পুড়িয়ে ফেলে দিই। দিয়ে বাবার বাড়ি চলে যাই।

কিন্তু কোথায় যেন আমারও একটু লোভ আছে বোধহয়, যদি সত্যি কোনওদিন অনল প্রতিষ্ঠা পায়। অনেক শিল্পীর জীবনেই তো এমনটা ঘটেছে। মকবুল ফিদা হুসেনের জীবনে ঘটেছে। ভদ্রলোক প্রথম জীবনে সিনেমার পোস্টার আঁকতেন।

একদিকে এই লোভ, অন্যদিকে ওর মুখে ইলার কথা শুনে আমার ভয়—এই দুয়ের মাঝে আমি পিষে যাচ্ছি। তবু মুখ বুজে সহ্য করছি।

একদিন খুব করে অনলকে আদর করলাম। তারপর ওর রঙিন চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, সোনা—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? ঠিকঠাক উত্তর দেবে? ইয়ার্কি মারবে না তো?

অনল বলল, ইয়ার্কি মারবো কেন? আমি তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারি নাকি? আমাদের দাম্পত্য কি ইয়ার্কির?

আমি বললাম, আবার ইয়ার্কি মারছো কিন্তু।

অনল বলল, আচ্ছা—আর ইয়ার্কি মারবো না। এবার বলো তুমি কী জানতে চাইছো?

বলবো?

হ্যাঁ, বলতেই তো বলছি।

আমি দেখলাম, ও বিরক্ত হচ্ছে। তার আগেই বলে নেওয়া ভালো ভেবে বললাম, সত্যি করে বলো তো তুমি চুল রঙ করালে কেন?

অনল বলল, তোমার জন্য। তোমার ভালো লাগার জন্য।

ওর কথা আমার বিশ্বাস হয় না। তবু চুপ করে থাকি। মিথ্যেই সই। তবু মুখে বলল যে, আমার জন্য-আমার ভালো লাগার জন্য ও চুল রঙ করেছে।

॥ দুই॥

অনলের যুফুর মেয়ের বিয়ে। বাড়ি সুদ্ধু সবার নেমন্তন্ন। অনল রাত্রে বাড়ি ফিরতেই ওকে বললাম কথাটা।

অনল জিজ্ঞেস করল, কবে?

বললাম, আগামী সপ্তাহে। শুক্রবার। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যাবে তো?

অনল বলল, আমি কবে কোথায় যাই যে, সেখানে যাবো?

অনল যা বলল ঠিকই বলল। বিয়ে হয়ে আসা অবধি ওকে আমি কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানে যেতে দেখিনি। কোথাও যেতে বললেই বলে, আমার ওসব ভালো লাগে না। তোমরা যাও।

বাড়ির অন্যদের সঙ্গে আমি যাই ঠিকই, অনল কিন্তু যায় না।

অনল কেন যায় না? হঠাৎ আমার মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। আমি ওকে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা—তুমি উৎসব-অনুষ্ঠানে যাও না কেন?

অনল বলল, কেন যাই না, শুনবে?

আমি বললাম, হ্যাঁ-শুনতেই তো চাইছি।

অনল বলল, উৎসব-অনুষ্ঠান পয়সাওয়ালা আর ভিখারিদের জন্য। আর ওই দু'টোর একটিও নই আমি।

অনলের এমন সব কথাবার্তা শুনে ওকে আমার খুব রহস্যময় মনে হয়। কখনও কখনও সন্দেহ জাগে। বিছানায় ও আমার পাশে উলঙ্গ হয়ে শোয় ঠিকই তবু ওকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তখন আমার নিজেকে বোকা বোকা লাগে।

আমি হীনমন্যতার ভুগি। আমার মাথা গরম হয়ে যায়। আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করি।

কিন্তু আমি ঝগড়া শুরু করলে কী হবে? ও তখন একটিও কথা বলবে না। এমনিতে ও টিভি দেখে না, তখন ফুল ভল্যুমে টিভি দেখবে। আর আমার রাগ বাড়তে থাকবে। সঙ্গে প্রলাপও।

না, আজ সেসব কিছুই করবো না আমি। আজ খুব ধীরে সুস্থে ওকে পরখ করবো। আজ ওর কোনও প্ররোচনাতেই পা দেব না।

তাই ওকে প্রশ্ন করি, তুমি যাবে না বলছো। এদিকে বাড়ি সুদ্ধু সবাই যাবে। ছোট ফুফু এসে আব্বা-মাকে বার বার বলে গেছেন। সেদিন বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে না। তাহলে তুমি খাবে কোথায়?

অনল বলল, হোটেলে খেয়ে নেব।

যেন উত্তর রেডি ছিল ওর। ভাবছিলাম কোথায় বলবে, সবাই যাচ্ছে যাক—তুমি যেও না। আমরা ওই একটা দিন নিজেদের মতো করে একসঙ্গে কাটাব।

হায়রে আমার কপাল! আমি আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। ওর কথা শুনে আমার খুব রাগ হল। আর সেই রাগ মেটাতেই বুঝি আমি জেদ ধরলাম, আমার ক'টা জিনিস কিনে এনে দাও তো।

অনল জিজ্ঞেস করল, কী জিনিস?

আমি বললাম, একটা ফেয়ারওয়ান ক্রীম-একটা রেভলনের নেলপালিশ-একটা পা-ঘষা ব্রাশ।

অনল বলল, ঠিক আছে।

আমি বললাম, ঠিক আছে নয়—এ-জিনিসগুলো আমার আজকেই চাই। না হলে বুঝতে পারবে।

আমার কথার কোনও উত্তর করল না ও আর। স্টুডিওতে চলে গেল। আর আমার মনে হল আগুন ধরিয়ে ওর স্টুডিওটা আমি যদি পোড়াতে পারতাম।

॥ তিন ॥

কাল ছোটফুফুর মেয়ের বিয়ে। অনল বাদে আমরা সকলেই যাব। এদিকে অনল আমার সেই তিনটে জিনিস এখনও কিনে এনে দেয়নি। অনল ওর স্টুডিওতে আছে। ক্রীম-নেলপালিস যাক গে, পা-ঘষা ব্রাশটা কিন্তু আমার খুব জরুরি। যৌথ সংসারের ঘানি টানতে টানতে আমার গোড়ালির যা অবস্থা হয়েছে তা নিয়ে কোথাও যাওয়া যায় না। এই কথাটাই বলতে আমি অনলের স্টুডিওতে গিয়ে ঢুকলাম। আমাদের বাড়ির নীচের একটা ঘরে ওর স্টুডিও। দেখলাম নিবিষ্ট মনে ও ক্যানভাসে আঁচড় টানছে।

ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি আমি। ওর কোনও খেয়াল নেই। আমি দেখছি ওর তুলির আঁচড়ে ফুটে উঠছে একটা জঙ্গলের ভিতর এক আদিবাসী তরুণীর অবয়ব।

কী জানি কেন, আমার তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে যায় ইলার কথা। ইলা মুরমুর। আদিবাসী তরুণী। এখানকার কোনও স্কুলের শিক্ষিকা। যার কথা অনলের মুখে আমি বহুবার শুনে আসছিলাম। নিশ্চয় অনল তাহলে ক্যানভাসে সেই ইলাকেই আঁকছে।

আমার সহ্য হল না। আমি ওর ক্যানভাসটাকে টান মেরে ফেলে দিলাম এই বলতে বলতে, চরিত্রহীন কোথাকার—তুমি তোমার মনের ইচ্ছেটাকে এভাবে মেটাচ্ছো? আমিও তো বলি ক'দিন ধরে স্টুডিওতে বসে কী কর্মটাই না করছো? ওদিকে যে আমার ক'টা জিনিসের দরকার। সেকথা তোমার মনে নেই। জিনিস কী, হয়ত আমাকেই তোমার মনে নেই।

আশ্চর্য চরিত্র অনলের। ও কিন্তু আমার এই আচরণের বিরুদ্ধে একটিও কথা বলছে না। শুধু আমাকে দেখে যাচ্ছে। আমার বিষোদ্গার হজম করে যাচ্ছে। যা আমার সহ্য হচ্ছে না, আমার উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ-ই আমি বুঝতে পারি, অনল হয়ত এমনি করেই আমাকে ভেঙে দিতে চাইছে। আমাদের দাম্পত্য ভেঙে দিতে চাইছে। যাতে করে সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে ও ইলার সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারে। আমি সাবধান হয়ে যাই। তাই ওর স্টুডিওতে আর দাঁড়াই না। নিজেকে শান্ত করতে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি।

|| চার ||

সেই দুপুরেই অনল বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেছিল।

ভেবেছিলাম আমার জিনিসগুলো কিনতে গেছে। কিন্তু সন্ধে গড়িয়েও যখন বাড়ি ফিরল না, আমার খুব ভয় হল। অনেকরকমের ভয়। আমি থৈই পাচ্ছিলাম না।

এর মধ্যে বাড়িতে অনেকেই, বিশেষ করে আব্বা কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছেন ওর কথা। আমি বলছি যে, আমি কিছু জানি না।

কিন্তু সন্ধে গড়ানোর পর এখন মনে হচ্ছে, আব্বাকে বলবো নাকি—ওর বন্ধুদের কাছ ওর খোঁজ নিয়ে আসতে।

কিন্তু, সেখানেও আমার ইগো প্রবলেম।

যাইহোক, ছেলেকে পড়ানো-ছেলেকে খাওয়ানো-ছেলেকে ঘুম পাড়ানো—এইসব করতে রাত ১১টা বেজে গেল। তারপর ওর অপেক্ষা। আমি ঘুমোনোর ভান করে বিছানায় পড়ে রইলাম।

কতক্ষণ কে জানে, একসময় অনল এসে ঘরে ঢুকল। আমার দিকে তাকালই না। পকেট থেকে কী বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কালো জিনসের উপর সাদা পাঞ্জাবিটা পরে আছে। প্রচুর মদ খেয়েছে। ওর পা টলছে।

আমি বিছানায় যেমনকার তেমনি পড়ে আছি। ওকে দেখছি। শেষপর্যন্ত পাঞ্জাবির পকেট থেকে ও একটা আলতার শিশি বের করল।

কিন্তু আমি তো ওকে আলতা আনতে বলিনি। তাছাড়া আমি আলতা পরি না। তাহলে আলতা দিয়ে কী করবে ও?

কী করে, সেটাই দেখি বলে আমি ধৈর্য্য ধরি। ও কিন্তু জামা কাপড় বদলায় না। টলতে টলতে বিছানার কাছে আসে। আসে আমার কাছে। আমার পায়ের কাছে। তারপর হাত ধরা আলতার শিশিটা খোলে। আশ্চর্য ব্যাপার—অনল সেই শিশিতে তর্জনী চুবিয়ে আমার পায়ে আলতা পরাতে শুরু করল।

মাতালের মাতলামি বলেই মনে হয় আমার। তবু কিছু বলি না আমি। ওকে শুধু দেখি। ওর কীর্তিকলাপ দেখি। ঘরে তখন আলো বলতে ডিমলাইট। সেই আলোতে আমার সুবিধে হয়।

তবে কিছুক্ষণেই আমার অস্বস্তি হতে শুরু করে যখন দেখি অনল আমার বুকের কাপড় সরিয়ে ব্লাউজের বোতাম খুলছে। বোতাম খুলে কী করতে চাইছে ও? অস্বস্তির সঙ্গে আমার কৌতূহল বাড়ছে। তাও আমি চুপ করে থাকি। আর, ও আপন খেয়ালে আমার দুই স্তনে ওর আলতা চুবানো তর্জনী দিয়ে কিছু আঁকছে যেন। কী আঁকছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমার মনে হচ্ছে আমার দুই স্তনকে ও পর্বত ভাবছে। দুই স্তনের মধ্যবর্তী অংশটাকে ভাবছে উপত্যকা। স্তনের নীচের অংশটাকে ভাবছে তরাই। পেটটাকে ভাবছে সমভূমি। তাহলে কি এবার ও আমার শরীরে ইলাকেই আঁকতে চাইছে?

না, আমি আর পারি না। চিৎকার করে উঠি, কী করছো তুমি?

অনল সেই তেমনই নির্বিকার। বলল, ছবি আঁকছি।

কোথায় ছবি আঁকছো তুমি?

অনল একটুখানি হাসল। হেসে বলল, কেন—আমার নিজস্ব ক্যানভাসে।

এরপর কী বলবো ওকে? কিছু কি বলা যায় আর?

অগত্যা আমি চুপ করে যাই। আর, ও আপন খেয়াল আমার শরীরে ছবি আঁকে। ওর আলতা চুবোনো তর্জনীর স্পর্শ আমার শরীরে শিহরণ জাগায়। তবু আমি স্থির থাকি। অনেকদিন থেকেই ওকে বলছিলাম, একটা মেয়ে নেবার কথা, ও রাজি হচ্ছিল না। আজ যদি সেই ইচ্ছে পূর্ণ হয়।

কিন্তু কোথাকার কী, সম্পূর্ণ নগ্ন আমাকে রঞ্জিত করে ও আমাকে বিছানা থেকে তুলে আয়নার সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল। ঘরের টিউবলাইটটা জ্বালল। তারপর বলল, নিজেকে দ্যাখো তো একটু। খুব খারাপ আঁকিনি বোধহয়। এখন আমি যদি তোমাকে কোনও র‍্যাম্পে প্রদর্শন করি, আমার ভালোই উপার্জন হবে। তা দিয়ে তোমার ক্রীম, নেলপালিশ, পা-ঘষা ব্রাশ শুধু নয়, তোমার স্বপ্ন পূরণ হবে। কিন্তু আমি তোমাকে প্রদর্শন করবো কী করে বলো তো? ভালোবাসার কিছুকে কি প্রদর্শন করা যায়?

আমি আয়নার নিজেকে দেখতে দেখতে অনলের কথা শুনছিলাম। আর আমার মনে পড়ছিল দিল্লিতে সদ্য শেষ হওয়া ফ্যাশান শো-এর কথা। যেখানে একজন মহিলা ফ্যাশান ডিজাইনার এক নগ্ন মডেলের শরীরে নকশা এঁকে তাকে র‍্যাম্পে হাঁটাচ্ছেন....

প্রকৃতি-চোরা

বিকাশকান্তি মিদ্যা

ঠিক শুক্লপক্ষের পঞ্চমী থেকেই ব্যাপারটা শুরু হয়। চলে একাদশী পর্যন্ত। অর্থাৎ হয় মাসে ধ'রে ক'রে প্রায় সাতদিন। সম্বছরে সব মিলিয়ে মাস তিনেক কমতাটা থাকে গোকুলের মধ্যে। অনেকটা কাঠমালের বাদায় ধানগাছ থাকার মতো, তবে বোকা ধানগাছের মতো একটানা নয়, ভেঙে ভেঙে।

চাঁদ ঘড়ি মারে। কৃষ্ণপক্ষে ঘড়ি মেরে ওঠে, আর শুক্লপক্ষে ওঠে বেলা থাকতেই; কিন্তু ডোবে ঘড়ি মেরে। আর সেই ডোবার টাইমের হেরফেরেই ব্যাপারটা জাগে গোকুলের মধ্যে। এমনিতে শারীরিক বা আচার-আচরণগত কোনো পরিবর্তন তেমন ঘটে না তার, ঘটলেও সবাই ঠিক বোঝেও না। তবে অদ্ভুত একটা ঘ্রাণ ও শ্রবণক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে সে। এটাই তার বিশেষত্ব ও নিজস্ব।

হয়তো পঞ্চমী, কিংবা ষষ্ঠী, কিংবা সপ্তমী ছাড়িয়ে নবমী, দশমীরও হতে পারে—চাঁদটা তার আনটাটকা জ্যোৎস্না নিয়ে হারিয়ে গেছে অঘোর হালদারের শন্-বিজে বাগানটার ওপারে হোগলডহরীর খাল-পেরিয়ে আলে আলে বাবলা বন ঘেরা ধানের জমির সে প্রান্তে। তা চাঁদ গেছে চাঁদের মতো ডুবে, রাত অনুযায়ী পাড়া-প্রতিবেশীরাও ঘুমিয়ে কাদা কিংবা কাদার মতো নরম হতে ব্যস্ত; অমনি, ঘুমিয়ে থাকলে গোকুলের নাক, নাকের দুই ছিদ্র মুহূর্তের মধ্যে পাললাগা গাই-এর শরীরের বিশেষ ঘ্রাণ পেলে এঁড়ে গরু যেমন দূর থেকেও তার নাক দুটো যথাসম্ভব সঙ্কুচিত ক'রে বাতাস থেকে নিতে চায় কোনো এক অনাস্বাদিত কিংবা স্বাদিত, অথচ বার বার পেতে ইচ্ছা করে এই রকম একটা ঘ্রাণ; তেমনই, গোকুলের নাকটা যেন হাতড়ে বেড়ায় আবিষ্কৃত নতুন এক গন্ধকে। পারলে নাকটা দশ হাত লম্বা হলেও যেন ভালো হয় তার।

আর জেগে থাকলে, রাতকালে গোকুল চুপচাপ বসে থাকার লোক না সে। কোনো না কোনো কাজে নিজেকে লাগিয়ে দিয়ে তবে তার শান্তি। সাত ভে'য়েদের সাধু গরুটার মতো—বেচারি দিন রাত বাঁধা থাকে চালতো আমগাছটার শিকড়ে। শুকনো খড় ছাড়া, কাঁচা ঘাসে মুখ দেয় না—হয়তো প্রাণ হত্যার দায় নিতে রাজি নয়, সাধুসঙ্গে বড়ো তো, বলাই সাধুর কাছ থেকে কেনা—তাই বেচারির নামও সাধু।

তো সেই সাধু যখন দাঁড়িয়ে থাকে, ঠায় দাঁড়ায় না। দাঁড়িয়ে, চোখ-দুটো মুদে অদ্ভুত এক দক্ষতায় নিজের কাঁধ থেকে মাথা পর্যন্ত দোলায় এবং অনবরত।

গোকুল গরু নয় বা গোকুলে তার জন্ম নয়, তবু কেন যে তার মধ্যে সাধুগরুর মতো নিজেকে ব্যস্ত রাখার বৈশিষ্ট্য আসলো, তা তার বাবা হারা কাওরা, মা রুচি কাওরানীর পক্ষে হয়তো বলা সম্ভব হত; কিন্তু তা যেহেতু এখন আর সম্ভব নয়, তারা খাকুড়দহের ঘাটে চলে যাওয়ায়; তাই নিজের ছেলে-মেয়েগুলোই বড়ো বিরক্ত হয় গোকুলের আচরণে।

হয়তো তারা খেলতে গেছে পাশের বাড়িতে—কতরকমের খেলা সেখানে-বউ বসন্তি, টিপ ফোটাফুট, ছাগল চরানী, বুজিবুজি, কানামাছি—তো হঠাৎ গোকুল ডাক পাড়ে—শম্বুরে, এ-এ-এ-সা-বি, বাড়ির দিক্‌মো আর দিন।—দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, একটা ছেলে বছর পেরোয়নি। এদিক-সেদিক করে তিনটে বিয়োগ হ'য়ে হাতে আছে দুই—শম্বু আর সাবিত্রী। ইস্কুল-পাঠশাল না গিয়ে পাড়াবুলে বেড়ানোটা বিশঘরের খড়মপাড়ার ধর্ম। শম্বু-সাবিত্রী সে পাড়ার বাইরে নয়। তা সে দিন হোক, কিংবা রাত; পাড়া বেড়াতে না পারলে যেন পেটের ভাত হজম হয় না।

আর পাড়া বুলতে গিয়ে জমে যাওয়া অমন একটা ছাগল-চরানী খেলার মুখে যদি অমন বাড়ি পড়ে, কার ভালো লাগে। কিন্তু গোকুল যে ছাড়ার বান্দা নয়। হয়তো ছুঁতো পাতির একটা ব্যাঁকলা বসিয়েছে, কিংবা সুতোর একটা ঘুনি জাল। ব্যাঁকলার জন্যে পাটের দড়ির বানকাটা চাই বা জালের জন্যে সুতো। কিন্তু এ কম্মো তো আর উরুতে টাকুর ঘুরিয়ে পাটকাটা নয়, যে, একা একা সারা যাবে। তাই, শম্বু বা সাবিত্রী ছাড়া চলে না।

এমনি বান কাটতে বসে গোকুল—উবু হয়ে—বাহ্যে ফিরতে বসার মতো। টাকুর থেকে সুতো ছাড়ে তো-ছাড়ে। তিন খে' সুতো নিয়ে চলে শম্বু, পিছনে হেঁটে· হেঁটে। ঠিক মাপে গিয়ে পৌঁছুলে, সুতো ছাড়া বন্ধ। তারপর পাক্, তারপর আবার তিন খে' করে ধ'রে হাতের মুঠোয় গুটিয়ে এক একটা বান। এই রকম বারো গণ্ডা, তেরো গণ্ডা। ব্যাঁকলার আয়তন বুঝে গণ্ডার বাড়া কমা।

তো সেদিন বান কাটাকাটি চলছে বাপ-বেটার। হঠাৎ গোকুল বলে—ও বা' শম্বু, দ্যাক দেন্ দিকি, যে চাঁদটা কোট্‌কে ছেলো, ডুবে গেচে কিনা?

—ক্যানে গো বা? চাঁদ ডুব্‌লি কী হবে?

—অতো কোতায় তোর দোরকার কী? বা বোল্‌তিচি তাই শোন্।

অগত্যা শম্বু ঘরের পিছনে, যেখানটায় খিলকদম গাছটার গোড়ায় তার বাপ-মা দেহ-নিঃসৃত লবণাক্ত জলরাশি ছেড়ে ছেড়ে শ্যাওলা ফেলে দিয়েছে, সেই বাদার কানা থেকে টানা পশ্চিমে তাকিয়ে দেখে আসে চাঁদটার অবস্থা ও অবস্থানটা। মনসাতলা থেকে গোলবেড়ের পাকা রাস্তা বরাবর যে বাবলা গাছের সার, তার ঠিক মাঝখানটায়—কুমড়োফালি চাঁদটা তখন মাটি ছুঁই ছুঁই করছে।

ছুটে এসে শম্বু বাবারে রিপোর্ট করে—ও বা হাবুডুবু খাচ্ছে। এবার বুড়ে গেল বলে—

নিজেরে একবার আশ্বস্ত করে নেচে ওঠার মতো স্বগতোক্তি করে ওঠে গোকুল—না বুড়ে কি আর রুপায় আচে। তাইলি তো আমার বাপ্‌কেলে নাক-কানটা বাদ্‌দিতি হয়। আজ দেক্‌চি দাঁওটা বেশ পাকা হয়চে—নীলমণির ব্যাটাগার পাঁচায় দেকি আজও কোনো হুঁশ নি, তাদের বাদার পুকুর পাড়ে কাঁটালি কোলার ঝাড়ে এক কাঁদি কোলা পেকেচে, কোলো-বাদুড় কুস্তি দিচ্চে। আজ এর য্যাম্‌টা হিয়ে না কোল্লি নয়।

পাড়ার গোকুলের বাড়ি ঠিক যে প্রান্তে, তার বিপরীত প্রান্তে নীলমণি কাওরার বাড়ি। তার থেকে আরও বাদা ভেঙে দশ মিনিটের পথ নীলমণির বাদার পুকুর। সেখানে কাঁঠালি

কথা থাকলে খড়মপাড়ার কারুরই বোঝার উপায় থাকে না, যদি ঠিকমতো দেখা-শোনা না থাকে। তার উপর মাঠে এখন ধানগাছ, যাওয়াটা সহজ নয়, জায়গাটা আবার শাঁখামুটি কেউটের আড্ডেল। গোকুল কিন্তু পাতি কাটতে, আটোল-ঘুনি পাততে সারাদিন মাঠ-ঘাট চষে বেড়ায়। গাছ-পালা, জল-ডাঙা, কাদা-মাটি—সারাদিন যে তিড়িং-বিচুড়ি করে বেড়ায়। সেখানে কত বর্ণ, কত শব্দ, গন্ধ-ই বা কত; কত স্থাবর, জঙ্গম পরের সম্পত্তি। দেখে আর চোখ টাটায় গোকুলের। কিন্তু দিনের আলোয় সে সব শব্দ, বর্ণ, গন্ধ কেমন নিষ্প্রাণ; অথচ, রাতের চাঁদ-ডুবি অন্ধকারে গোকুল সেই প্রাকৃতিক জগৎ থেকে ছেঁকে বের করে আনে ওই শব্দ-গন্ধের স্রোত। এমন নয় যে, সে জাদু বা মন্ত্র জানে।

তবু, তবু সারাদিনে যা কিছু দেখে, শোনে, বোঝে, যা কিছুর ঘ্রাণ সে পায় কিংবা পায় না, চাঁদ ডুবে গেলে পর, তারা যেন কোনো এক অনুমান-ইথার তরঙ্গ যোগে শব্দ-গন্ধ ইত্যাদি পাঠায় তার কাছে। আর কেবল প্রাকৃতিক শব্দ-গন্ধ-ই শুধু নয়, অনেক মানবীয় বার্তাও যেন দু' একটা আন্দাজের ভিত্তিতে ভেদ করতে পারে সে। মানুষের জন্ম-মৃত্যু থেকে বিপদ-আপদ।

গোকুলের এই ক্ষমতার কথায় কেউ ঐশ্বরিক শক্তি, কেউ-বা ভৌতিক যোগ বলে বিশ্বাস করে। পাড়ার রাখালের মা ভুঁদির একটু-আধটু মন্তর-তন্তর আসে। সে বুড়ি বলে, 'ওরে, এ বাবা পঞ্চানন্দের খেলা। সক্কলে কি আর জানে। গোক্লে তকোন পেটে, ওর মা কেচির তকোন তিন মাস। হঠাস্ কোরে কেচির হোয়ে বোস্লো জলউদ্রি, হাত-পা ফুলে টাইঢোল। ঘুনো ডাক্তারের ওষুদ কাজে আস্লুনি দেকে আমি মোমরেজ গড়ের বাবা পঞ্চানন্দর কাচে ঢিল বেঁদে মুদো খোরেছেলেম শ' পাঁচানা পয়সা। সেই মুদোর ছাবাল গোক্লে, ও কি যা তা ছাবাল! হারার কোঁচড় খোসানো হোতি পারে, কিন্তুক বাবা পঞ্চানন্দর বরপুত্তুর'।— কথা কটা যখনই ভুঁদি উচ্চারণ করে, দু'টো হাত কানে আর নাকে ঠেকিয়ে খত্ দেয়। বাবার প্রতি ভক্তি আর কৃতজ্ঞতার মিশেল আর কী।

পাড়ার উপেন বুড়ো, তা বয়সে হারার চেয়ে দু' এক বছরের বেশি বৈ কম নয়। প্রতিবেশীদের ভাষায়, 'বুড়ো যেমন ঠোঁটকাটা, তেমন নিন্দুকের সিন্দুক'— কোথাও তামাক সাজা দেখলে বুড়োর হাত-কচলানো ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল। সেই উপেন বুড়ো ব'লে বেড়ায় 'গোক্লে তো ডাকিনী চালে। ওই সপ্ শব্দো-গন্দের কোতা গোক্লে ক্যানো, ওর চোদ্দ পুরুষির সাদ্দ নি। ও তো ডাকিনী বোলে দ্যায়। ওর বাড়ির পশ্চিম কোণের নিমগাচটাতে থাকে সে ডাকিনী। ওর গো-ঠাকুরদা জেবন কাওরা, সে বুড়ো তো ডাকসেটে গুনিন ছেলো। সেই বুড়ো তো মরে য্যাচে গোক্লে হোয়ে। তো ও ডাকিনী চালবেনে, তো কে চালবে?'

তবে ভুঁদি হোক বা উপেন বুড়ো; ওদের অনুমানের কথা যে মানে মানুক; খোদ গোকুল কিন্তু মানে না। মানে কী করে? মা'র মুখে সে শুনেছিল, ছোটোবেলায় বড়ো রকমের 'টাইফয়ে' পড়েছিল সে। জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পর পেট ডাগুরে গোকুল খিদেতে চিঁচি করতো, মা কখন ভাত 'ফুইটে' দেবে? কিন্তু ফোটানো বললে তো আর ফোটানো

হয় না। কাঠ-কুটো না হয় চারপাশ হাতড়ালে মেলে, চাল-ডাল তো আর বিনা পয়সায় মেলে না। ঘুর ছেড়ে ওঠা ছেলে, এটু সু-মাছের ঝোল-ভাতে পত্যি করবে, তা মড়াখেকো সংসারের কোথায় কী। মা তাই দিয়ে দিয়ে 'এই তো বাপ, এই যাই.....এই হোয়ে গেল' বলে খালি জলের হাঁড়িতে ডাল ফোটাতে থাকে টগ্‌বগ্ করে—হারা কাওরা তখন হয়তো হাটে। ধার-বাকি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওদিকে শুয়ে শুয়ে গোকুল ভাতের স্বপ্ন দেখছে। এমন লোভনীয় জিনিস ভাত। কতদিন যেন খায়নি, কত যেন সে খাবে—হাঁড়ির তলা দেখিয়ে ছাড়বে। অথচ অভাব যত প্রবল, লোভ তত প্রকট। ওই অবস্থায় কত কিছু খেতে সাধ হয় রুচি মুখে—ডাঁশা পেয়ারা, লবণ দিয়ে কাঁচা আমড়া, লঙ্কা-লবণ-তেল-লেবুপাতা মেড়ে পাকা তেঁতুল, আলু পোড়া পান্তা, কাঁচা পেঁয়াজ বেগুন পোড়া, মাছের ঝোল ভাত, নিদেন পক্ষে ধোবার অনু ময়রার দোকানের গুড়ে জিলিপি, কেঠো গজা।

কিন্তু কোথায় বা মাছের ঝোল-ভাত; আর কোথায় বা কেঠো গজা। নুন আনতে পান্তা থাকে না যে হারা কাওরার, তার ব্যাটার এত লোভ ভালো তো নয়ই, স্বাভাবিকও নয়। তবে আট বছরে জোরো-বাচ্চাটাও বা কী করে তার নোলাটাকে থামায়। জিবের এক একটা অংশে, এক এক রকম স্বাদ; কিন্তু দারিদ্র্যের স্বাদ একটাই—কষা। এতই যদি বুঝতো 'আট বছর' বয়স, তাহলে মায়ের ছলনা-ভরা জলের হাঁড়ির শূন্য টগ্‌বগানিতে ঘুর-ছাড়া গোকুল আকাঙ্ক্ষার গন্ধ আর শব্দগুলো পেত না।

কিন্তু কী আশ্চর্য, তবু সে পেয়ে গেল। স্মৃতিতে জড়িয়ে থাকা গন্ধগুলো ফোটানো জলের হাঁড়ির উঠে আসা ভাপের মধ্যে কেমন করে সে যেন পেয়ে গেল। পেট সেদিন ভরলো না, ভরলো না আরো অনেকদিনও। আর সেই উপবাস-ই গোকুলকে প্রকৃতি চেনালো, করে তুললো শব্দসন্ধানী, গন্ধসন্ধানী।

এর মধ্যে জল অনেক গড়ালো। কিন্তু গোকুল বড়োও হল। আর কুড়ি বছরেরও উপর ধ'রে গন্ধ-শব্দ কারবারটায় গোকুল বেশ রপ্ত হয়ে উঠলো।

॥ ২ ॥

তবে, কুড়ি বছরের লক্ষ্যটা আরম্ভ করার পর থেকে গোকুল মোটা-মুটি চাপাই রেখেছিল, কিন্তু বিয়ে করে বাসররাতের পরদিন থেকে, যারে বলে হাটে ঢেঁড়ি দিয়ে খবর ছড়ানোর মতো, গোকুলের কসরতটা ছড়িয়ে পড়ল পাড়ায়। দোষটা নতুন বউয়ের হলেও, গোকুল ঠিক দায় এড়াতে পারে না।

আরে বাবা এত পেট পাত্‌লা হ'লে কি চলে? এত কাছা খোলা? সব কথা তো সবাইকে বলা যায় না। বলা উচিতও নয়। হাজার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হোক।

তবু, পরদিন লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে, রেখে-ঢেকে পাড়া-প্রতিবেশীদের যতটা বলা যায়, ততটাই বলেছিল গোকুলের নতুন বউ চঞ্চলা।

পাড়াতুতো বড়োজা যখন পরদিন সকালে উঠোন ঝাঁট দেওয়া নতুন বউরে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, কীরে বউ, খবর কী? হলো?

ঘোমটার আড়ালে নতুন বউ তখন হেসে কটি কুটি। বড়ো বউ ইঙ্গিতটা অনুমান ক'রে, এবার সংখ্যাতত্ত্বে গেল—ক'বার?

—তা' কি আর গুনিচি দিদি। সারারাত চটা পাকির মতো ফুঁইলেচে। ঝ্যাকেবারে হন্‌ছন্যে কোরে দেচে।—একটু থেমে চঞ্চলা জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ গো দি, তোমার দ্যাওরের মাতায় কি এট্টু ছিট্ আচে?

—ক্যানো বল্‌দিন্?

—মা গো ফেন্নায় মোরে যাই। খেঁকাকুঁকুরির মতো আমার নোজ্জা ঘরের ঘ্যান্নে বলে কি, আস্‌চে খোরোয় আমার নাকি মেয়ে হবে। তার কান্না ও নাকি শুন্‌তি প্যায়চে। সেই আঁতুরির গন্দোও নাকি প্যায়চে।—এরে তুমি পাগল বোল্‌বেনে তো কারে বোল্‌বে দিদি?

—বোলসি কী রে।—বড়ো বউ সহাস্য বিস্ময় প্রকাশ করে—গোক্‌লের তলে তলে ঝ্যাতটা—।

—তা আর বোল্‌তিচি কী; আর তুমি শুন্‌তোচো-ই বা কী? তোমার দ্যাওর আরো কী বলে জানো দি? বলে, ও নাকি অনেক কিচু আগাম শুন্‌তি পায়, অনেক কিচুর গন্দো পায়। এমন কী, যা চোকি দেকা যায় না, ঝ্যামোন অনেক কিচুর।

এরপর আর কিছু বলতে হয় না। বড়ো বউ-ই মোটা-মুটি চাক্‌টা পিটিয়ে দেয়।

তারপর থেকে 'কদিন গোকুলের বিরক্তির একশেষ। পাড়ার ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-মদ্দ সব নানাভাবে এসে জ্বালাতন করে।

জ্বালাতন পর্ব তখনও শেষ হয়নি। দু'টো শুকনো লঙ্কা পোড়া দিয়ে গোকুল তখন সবে পান্তা খেতে বসেছে। এমন সময় উপেন বুড়ো এসে গোঁ ধরেছে, হ্যাঁ রে গোক্‌লে, ঝ্যাকোন কি গাঁজা-ভাঙ খেরিচিস্ নাকি বাবা?

উপেন বুড়োর ঠিলেসে গোকুল একটু খচেও যায়—কাউ আর পাই কই, যে খাবো?

—তবে, তুই যে বলে, কী সপ্ শুনতি পাস্, কী সপ্ গন্দোও নাকি পাস?

—সে তো ঝ্যাকোন টোকো পান্তার সঙ্গে পোড়ালোংকার গন্দো পাচ্চি; তো কী হয়চে?

—কোচ্‌কিমি করিস্‌নি বা, তোর বাপের চে' তিন বচোরের বড়ো আমি।

—সে তো বটে, জেটামোশা। জেটামোশার সঙ্গে কি কোচ্‌কিমি চলে?...তা কী কোত্তি বলো জেটা, আমারে?

—হ্যাঁ বা। কাজের কোতা বোলি। আমার বাস্তুর পুব-দোক্‌কিন্ কোণে আতাগাছটার গোড়ায় ঝ্যাট্টা টাকার মেটে আচে। গো-ঠাকুদ্দা আমলের জিনিস, দেবতা থেকে পাওয়া। সেটা ঝ্যাকোন কীর'ম আচে বল্‌দিন বাপ্। ওটা আমার ভোগে হবে তো?

—এভাবি বলে কোরে কিচু হয় না। তুমি বরন্‌চো জেটা, গৌড়ের পাড়ে বা কমলের ওরে যাও। তারা বোল্‌তি পারে।

—গৌড়ের পাড়ে বোদি যাবো, তো, তুইটা কী কোল্লি?—

—আমি?....একটু থেমে গোকুল বলে, 'ঠিক আছে, পাঁচটা টাকানে চাঁদ বুড়লি এসো, দেকি, আমি কিচু কোন্তি পারি কিনা—

কিন্তু পাঁচ টাকা তো দূরের কথা। অনিশ্চিত টাকার জন্যে চার-আনা খরচ করারও বান্দা নয় উপেন বুড়ো। তাই এ যাত্রায় চাঁদ ডুবলেও গোকুলকে আর পরীক্ষায় বসতে হয় না। তবে, সেবার একাদশীর চাঁদ ডোবার পর ঘুমন্ত গোকুল ঘুম ভেঙে ধড়ফড়িয়ে ওঠে একটা স্বপ্ন দেখে, আর সে স্বপ্নের কথা উপেন জ্যাঠাকে বলে আসার তিনদিনের মাথায়, তার জলজ্যান্ত মেজো ছেলেটা সাপের কামড়ে মারা যায়।

সেই থেকেই উপেন বুড়ো ছড়ায় গোকুলে ডাকিনী চালে, নিদেন দেয়।

আর ভালো হোক্, খারাপ হোক্—এই রকম অলৌকিক গন্ধ মাখা খবর গাঁ-গঞ্জে বাতাসের আগে ছোটে। এবং বেশ ফুলে ফেঁপে।

দেখতে হয় না, চারদিকে ছড়িয়ে যায় হারা কাওরার ব্যাটা গোকুল কাওরা দু-দু'খানা বিশাল ক্ষমতাধারী 'বেম্বদত্তি' বাড়িতে বেঁধে রেখেছে। রাতে যখন সে কোথাও যায়, 'বেম্বদত্তি' দুটোর কাঁধে চড়ে যায়। আর তাদের ক্ষমতার ওপর ভর করে গোকুল নাকি ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-মদ্দ কার কখন মরণ, তা তাদের নিঃশ্বাস শুঁকে বলে দেয়। এমনকী কার কোথায় কবে কী ভাগ্যে বড়ো দাঁও আছে, তাও নাকি বলে দেয়।

গুজবের তো মা-বাবার ঠিক থাকে না।

ফলে যা হয় আর কী। নতুন বিয়ে বাড়িতে ভিড় ঠেকাতে মাথা খারাপ। নতুন বউ ফেলে এখন সব গোকুলকে দেখে। বউয়ের জন্যে প্রথম ক'দিন যে লোক জুটেছিল। তার জন্যে এখন প্রতিদিন আরো বেশি জুটতে শুরু করলো। গোকুল যেন আকাশ থেকে নামা আজব কোনো চিড়িয়া। আর দর্শনার্থী যত, সমস্যা তার দ্বিগুণ। কার ছাবালের হাপা, মেয়ের মাসিক কিংবা বিবাহে জটিলতা; জ্বর-জাড়ি, কাশি-কামলা, বাচ্চা হওয়ার জ্বালা, না হওয়ার যন্ত্রণা; মানুষ ছেড়ে বস্তু, বস্তু ছেড়ে জীব-জন্তু—গৃহস্থ মানুষের নিত্যদিনের হাজার ঝামেলা। এর মধ্যে আবার সবাই তো বিশ্বাসে মিলায় বস্তু'র দলে নয়, 'তর্কে বহুদূর'-এর দলও আছে। পাড়ার চ্যাংড়া-ব্যাংড়া।

তো গোকুলের গুজব যখন রমরমা, পাড়ার সেই চ্যাংড়া-ব্যাংড়ার দল একদিন চতুর্থীর চাঁদ ডোবার পর হাজির গোকুলের বাড়ি। যাকে বলে চড়াও হওয়া। তেমনি ঘিরে ধ'রে প্রশ্নবাণ—আচ্চা গোকুলদা, তুমি তো নাকি সপ্ বোলতি পারো। আচ্ছা, আমাদের দুরন্ত-র বউটা যে কলকাতার কাজের নামে দুখের ভাতার, কোলের ছাবাল ফেলে চলে গেল নবগ্রামের বিধান সদ্দারের সঙ্গে, সে মাগি কি ফিরে আসবে মনে হয়?

গোকুল কী আর বলবে। ও তো আর অরুণনগরের ভর হওয়া 'কমল নস্কর' নয়, যে ঢুলু ঢুলু চোখে কানে জবাফুল গুঁজে গোবর লেপা বেলতলায় ডানহাতের চাপড় মেরে, গড় গড় করে বলে যাবে, দুনিয়ার যতো উড়ো খবর। তার যেটুকু সম্বল, সে তো প্রকৃতি থেকে নেওয়া। তাই সে চুপ্ করে থাকে। তাই দেখে ছেরাও পার্টি বলে, ওঃ। এটা জানো না। ঠিক্ আচে; ঠিক আচে।....আচ্ছা, বলো তো গেরাম থেকে যে শকুনগুলো চলে গেল, তারা কোথায় গেল? গো-পোড়োতে গরু পড়লি আসে না ক্যানো?

মনে মনে কটা খিস্তি পাড়ে গোকুল, কিন্তু মুখে কিছুই বলে না।

—ওঃ, এও জানো না!

পাশ থেকে একজন জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা গোকুলভাই, এই সন চোদ্দোশ তেরোয় তো কুকুরির গৌয়া লাগ্‌তি দ্যাক্‌লোম নে। কুকুরির বংশ কি শেষ হবে নাকি।

গোকুল এবার একটু জবাব দেয়—আমি বলে মান্‌ষির খপর আক্‌তি পারি না; কুকুরির কী খপর আক্‌বো আমি?

—ওঃ, তুমি মান্‌ষির খবর রাকো না, তার নিদেনের খবর বেশ রাকো; তাই না?—ঠিক আচে, আমাদের পোধান শালুর নিদেনটা কবে যদি বোল্‌তি পারো। আর হ্যাঁ, রাস্তা সারানোর টাকা, আই.আর. ডি.পি-র মেরে দেওয়া টাকাগুলো শালু কোন্ ব্যাঙ্কে থুয়েচে বলোদিন দিকি।

প্রশ্ন চলছিল মোটামুটি মজার মজার। উত্তর ছাড়াই। পাশ থেকে কে একজন ভুস্ করে বলে উঠলো, আচ্ছা, তোমার নিজের নিদেন নে কোনো খবর আচে?

আর যায় কোথায়? গোকুলের নতুন বউ উঠোনের উনুনে রাঁধছিল। কিছুক্ষণ আগেমাত্র বাবলার একটা কুন্দুল-চেলা-খেদো কাঠ দিয়েছিল উনুনে। আগুনটা সবেমাত্র ভালো রকমে জ্বলনের মুখটা নিয়েছে, আর সেই মুখেই ভাতারের আয়ু নিয়ে প্রশ্ন। এক ঝট্‌কায় সেই জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে, তবে রে ক্যায়পোড়ার দল, মানুষটার ক্যাম্‌তা নে অহোস্য কোত্তি এইচো তোমরা, মুক্ পুইড়ে সপ্ কটারে ভোক্‌তা কোরি দোবো। বেরো, বেরো ওলাউঠোর দল, বাড়ির থে'।

হঠকারীর চিরকাল-ই আত্মবিশ্বাসের অভাব। তাই গোকুলের বউ-এর জ্বলা কাঠ এ যাত্রায় জিতে যায়।

কিন্তু, খবরটা কানাঘুঁষো হয়ে পঞ্চায়েতে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে পুলিশ ক্যাম্প, ক্যাম্প থেকে থানা, থানা থেকে খবরের কাগজ, যুক্তিবাদী দলে, যে, গোকুল সদ্দার, বাপা মৃত হারা সদ্দার; সাকিন খড়মপাড়া—নিদেনের খবর বলে দিয়ে, মানুষের মধ্যে অহেতুক আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। মানুষ খুন করলেও আদালতই খুনীকে নিদেন দিতে পারে না; চিকিৎসা বিজ্ঞানে এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তাররাই বলতে পারেন না ঠিক মতো, যে, রোগী কখন মরবে; তা কোথাকার কোন্ গোকুল সদ্দার তার সাধ্য কী? এ সাহস সে পায় কোথা থেকে?

অতএব, অহেতুক আতঙ্ক ছড়ানোর অজুহাতে দাও পাঠিয়ে হাজতে।

ব্রণ খুঁটে ফোঁড়া, ফোঁড়া ফাটিয়ে ক্যানসার হওয়ার মতো। গুজব যখন গড্ডলিকাতে গড়ায়—একক মানুষের প্রতিরোধ সেখানে ঝড়ের মুখে খড়ের মতো।

॥ ৩ ॥

এক প্রকার বিনা প্রতিরোধে গোকুলের শাস্তি হল। শ্বশুর একবার প্রধান রেজ্জাক মোল্লাকে ধ'রেছিল; কিন্তু খড়মপাড়া বিপক্ষপার্টির 'পকেট ভোট' বলে, রেজ্জাক মোল্লা গা করেনি। চারমাসের কারাবাস গোকুলের আট্‌কানো গেল না, কিন্তু নিদেনটা আট্‌কানো গেল।

কোর্টের নির্দেশ : তোমার ক্ষমতা তোমার মধ্যে থাক্। তাকে ব্যবহার করে জনমনে আতঙ্ক ছড়ানোর অধিকার তোমার নেই। এ বিষয়ে পুনরায় অভিযোগ আস্‌লে দীর্ঘমেয়াদী কারাবাস।

চারপাশের চরাচর দিনের আলোর চষে বেড়ানো গোকুল, চাঁদ ডুবলে পর, হাতের তালুর মতো চেনা মনে হত যার। কার গাছের কলা-কচু, ডাব-নারকেল, তাল-তেঁতুল-কখন পাকে, কখন পড়ে, কখন বা পেড়ে নেওয়ার সময় হয়, এটা যার নখদর্পণে; তার উপর বা-বাতাস, পাখ-পাখালির গতিবিধি সম্পর্কে যার ধারণা পাকা-পোক্ত। জলের মাছ-চিংড়ি, তাদের ঘাই, বুট্‌কাটা, পাক্‌মারা, ভেসে ওঠা, কোন্ মাছ জলের কোন স্তরে থাকে, কোন্ পরিস্থিতিতে ভাসে, কখন বা উঠে চলে যেতে চায়—এসব যার কাছে জলভাত। সাপ-ব্যাঙ, শিয়াল-কটাস, ভাম-ভোঁদড়, নিদেনপক্ষে কুঁচে-কচ্ছপ, মায় দেখা জীব-জন্তুর গায়ের গন্ধ, চলার ধরন যার অভিজ্ঞতার পরতে পরতে, সেই প্রকৃতি শুলে খাওয়া গোকুল সরকারি সংশোধনাগারের গুহায় কেমন হাঁপিয়ে ওঠে। খড়মপাড়ার খাল পেরোলেই খোলা মাঠ, তার ওপাশে বিশাল আকাশ। আর এখানে চারহাতের চারপাশে দেয়াল। অন্য বন্দীগুলো গোকুলের অপরাধ শুনে হাসে। বোকার হদ্দ বোঝাতে, তাদের মুখে মানায় এমন সব শব্দ বলে গোকুলের পিছনে লাগে। আর তালপাতা কেটে কাঠের গুঁড়ি চাপিয়ে যেমন জাঁতে দেওয়া হয় বাঁকা পাতা সোজা করার জন্য। বন্দী-বন্ধুদের চাপে গোকুলও জাঁত হতে থাকে।

চারমাসের মাথায় ছাড়া পেয়ে বাইরে এসে গোকুল দেখে বউ আর শ্বশুর দাঁড়িয়ে। শ্বশুর সেদিন মেয়ে-জামাইয়ে চিড়িয়াখানা দেখিয়েছিল।

আর রাতে কতদিন পর বউটার কাছে শুলে, চঞ্চলা উতলা হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যাঁ গো, জেলে খুপ্ মারে? খুপ্ কষ্ট না গো?

—ধুর্। অ্যাকোন আর জেল নি—সঙ্‌শোদোনাগার।

—সেটা আবার কী?

—তালপাতা জাঁতে দেওয়া। ভুলচুক যা হয়, সপ্ বুজে সুজে বাদ দে' নতুন শিক্ষে নে বাঁচা।

চঞ্চলা কিছুই বোঝে না, শুধু কথার কথায় জিজ্ঞেস করে, তোমার নতুন শিক্‌খে হয়চে?

—হবে আর নে? মান্‌বির খাঁচায় থাক্‌লোম, খাঁচার জীব দ্যাক্‌লোম। আর কী বাকি থাকে?

গোকুলের শিক্ষা গোকুলের কাছে, আত্মগত। প্রকৃতি নিঃসৃত।

তবে জ্বলন্ত বাকলা কাঠের খেদো নিয়ে চঞ্চলাকে আর কাউকে তাড়াতে হয়নি, এই যা।

শুদ্ধ বাঁচা

উর্মিলা চট্টোপাধ্যায়

আমার ভোর আসে এক অপূর্ব মাধুরীতে,
একদিকে ঘন্টার ঢং ঢং আর রাধাকৃষ্ণ নাম
আকাশ বাতাস মাতায়।
অন্যদিকে শাঁখের কম্বুনাদ ভেসে বেড়ায়
হাওয়ায়, ইথারে—
মন উদাস ভেসে বেড়ায় দিগন্তরে উড়ে উড়ে।
আর ভেসে আসে প্রহরে প্রহরে করুণ আর্তি
কাছে দূরে—"লা ইলাহা ইল্লাল্লা—এই আকুতি—
পৌঁছয় কি খোদার দরবারে—এই প্রশ্ন নিজেকে।
এই শঙ্খ ঘন্টা আর আজান পাঠানো একই উদ্দেশে
ভিন্ন নামে, ভিন্ন শব্দে, ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন স্থানে।
মন্দির মসজিদ গির্জা সবই এক, একাকার অন্য নামে।
মনে ভাবি আমিও বাঁচি এই সর্বধর্মসমন্বয়ে সুখেই।

আমার কবিতা : ২৮

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

যে আসতে পারে
তার জন্যে আমার কোনো অপেক্ষা নেই
আকাঙ্ক্ষাও যে আছে তাও নয়
মাঝে মাঝে মনে হয় জীবন কী এতদিন
বন্দী হয়ে ছিল
গূঢ় কোনো তামাশায়
এ-সব এখন ভাবতে বসলে অন্ধকারের
স্পর্শ ছাড়া আর কিছু পাই না
আর যদি পাবোই তবে বারবার
আমার কেন ভুল হয়ে যায়
দরজা খুলে আবার অপেক্ষা করি

যেন কার ডাক শুনতে পারো
হয়তো কোনো নিশিডাক
হয়তো দমকা বাতাসের
অথবা অন্য কারও।

শালুক

শ্বেতা চক্রবর্তী

পদ্মের মতন বলে কিছু লোক পদ্ম বলে ভাবে
জলস্পর্শ করে আছি, ভাসতে পারছি না বেসামাল
চাঁদ এলে ডুবে ডুবে হাসতে পারছি না

অথচ পদ্ম দুলছে—হাওয়ায়

মৃণালবাহুও নেই, নেই রস-সরোবর
পানাফুলেদের ঈর্ষা নেই, অতল জলের ডাক নেই,
বালকটির হাত নেই, ধরতে গিয়ে সাপের ছোবল খেয়ে

ঢলে পড়া, বিষজ্বালা—শরতে পুজোর আগে
আমার প্রেমিক তার মৃত্যুমুখ দেখাতে দেখাতে
চলে গেলে কান্নায় ভেঙে পড়া নেই

তবু আমি হাওয়ায় দুলছি— দেশি—পদ্মরানি

আমার ডিমা নদীকে

শ্রাবণী ঘোষ

এই ভয়ঙ্কর নাগরিক সন্ধ্যায়,
একাকী পুড়ছি আমি, ডিমা নদী....।
একদিন প্রতিদিন, একরাত প্রতিরাত....।
মধ্যরাত্রির সৌন্দর্য নীড়ে, আলো ছায়া
জোছনায় একাকী পুড়ছি আমি,
ডিমা নদী...।

কী বিষন্ন-আঁধার ঘেরা
চিলাপাতা বনভূমি, দ্যাখো তো
চিনতে পারছো আমায়?

গোলাপি ফ্রকপরা লাজুক লাজুক
কিশোরীকে?

বহুদিন আগে, কতদিন, আজ আর
মনে পড়ে না। কালজানি নদীতীরে
ঠুং ঠাং চকমকি পাথরের গান,
নদীস্রোতে মাখামাখি, আমরা কজন।
পায়ে পায়ে ঢেউ ছুঁয়ে, কিশোরী
বেলার মৌফুল। মনে পড়ে কালজানি
নদী, মনে পড়ে কি আমায়?
রাঙামাটি পাহাড়ের উপর, বারোমাস
কুয়াশায় ঢেকে থাকা চাঁদ খুঁজে
নিতে গিয়ে, রক্তাক্ত হয়েছিল, যার ঠোঁট
মনে পড়ে তার কথা? মনে পড়ে রাঙামাটি পাহাড়?

হলুদ-জবার উপর ভ্রমরার
গুণগুণ, সবুজ ঘাসের উপর
ঝরে পড়া ম্লান শেফালিকা,
হঠাৎ পঙ্গপালে ছেয়ে যাওয়া
আকাশ, বরফের কুচি মাখা
বৈশাখি ঝড়, দ্যাখো তো
চিনতে পারো কি আমায়?
বাংলোর ধার ঘেঁষা, দুটি পাতা
একটি কুঁড়ির দেশ। আমার নাম রাধা—।

প্রতিদিন ভোরের বেলায় সাদা
পাতায় রোদ্দুর ও রোদ্দুর, তুমি কেন
লুকোচুরি খেল, আমার কবিতা খাতায়?
রাধা আমি। কৃষ্ণকে উপড়ে এনেছি
সে-ই কিশোরী বেলায়।
শিরিষের আলোছায়ায় মাখামাখি
গাঙচিল, কেন তুমি ছুঁড়ে
দিলে, আমার আগামী দিন
এই ভয়ঙ্কর নাগরিক জীবনের দিকে?

সে-ই থেকে একাকী পুড়ছি আমি
ডিমা নদী। প্রতিদিন, প্রতিরাত....।

তুমি সেই মেয়ে

আমি মহসীন

তোমাতে আমাতে দিনান্তে যত সুখ
হড়াহুড়ি আড়ি কাঁড়ি কাঁড়ি উন্মুখ
আম্মার তুমি সাতটার আমি বাসে
টোল খাওয়া গাল জানি কেউ ভালোবাসে
ভালোবাসে প্রেম সেম সেম যত কিছু
ছড়ানো ছিটানো স্মৃতিদের পিছু পিছু—

তোমাতে আমাতে থামাতে না পারে কিছু
হেঁটে চলি অলিগলিপথ উঁচুনিচু
রাতদিন তুমি সাতদিন আমি তাতে
ভেজ ননভেজ সবকিছু তার হাতে
সব কিছু তার সবটুকু যাকে নিয়ে
সেই একা তার ঠেকেছে সকল গিয়ে

সেই একা তার একতারা বাজে মনে
একটাই সুর হৃদয়ের সব কোনে
মেলোডির তুমি প্যারোডির আমি রাজা
হাসিটুকু দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছ সাজা
ম্যাজিক স্মাইল ট্র্যাজিক হিরোর সাজ
রং মেখে মুখে চং করা তার কাজ

আমিই একা নারী

চিত্রাঙ্গদা চক্রবর্তী

নিজেকে ঠিক কোন জায়গায় দাঁড় করালে
আর
চিনে নিতে অসুবিধে হবে না, কারও,
এখনও ঠিক করে উঠতে পারলাম না

ঠিক, কতখানি ডাইনে-বাঁয়ে আমায় মানায়।
উত্তর না, দক্ষিণ, কোনদিকে মুখ ফেরালে
নেপথ্য হাওয়ারা, ঠিক বলে দিতে পারে,
আমিই সেই নারী, জরায়ুর নিভৃত মাটিতে যে,
একদা গেঁথে রেখেছিল,
লক্ষ লক্ষ বলশেভিকের রক্তমাখা ভ্রূণে?
বলুন,
নিজেকে ঠিক কোন জায়গায় দাঁড় করাব্যে
আর, চিনে নিতে অসুবিধে হবে না, কারও,
আমিই সেই, প্রলেতারিয়েত কমিন ফর্মের
গণতান্ত্রিক যোগ্যতা।

চাষ

সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

গাঢ় রঙ চাষের লোভ আমাকে বার বার
টেনে এনেছে আবাদের দিকে
শস্যের ওপর ঝুঁকে পড়া হাওয়ার বৃত্তচাপ
দৃষ্টির ওপারে উসকে দিয়েছে
ঘন হয়ে জড়িয়ে থাকার উত্তেজনা
দিক পাল্টে পাল্টে
ক্রিয়াশীল সংকটে বদল হয়েছে
পারদবাতির আবছা কুয়াশা
মাটি ঘেঁষা শক্ত দেয়ালের কাঁটাগাছ—
ভেঙে বেরিয়ে আসা শ্বাসের চাপা শব্দ
শস্য-দুধে ডুবে গিয়ে নির্লিপ্ত ফসলের গায়ে
কাস্তের সীমাহীন চাপ সহ্য করে
সারির পর সারি বরাবর ফসল উঠছে
রক্তের দাগ মানে না
খুঁটি তোলা ন্যাড়া জমির দিগন্ত ছোঁয়া অলৌকিক
আবার পরবর্তী ঋতুতে
গাঢ় রঙ চাষের লোভে ইশারা দেয়

জবাফুল
রিমি দে

দুবেলা রক্তের দাগ
দুবেলা স্রোতের মুখে হাসি
কাটি দাগ কাটাকুটি খেলা
গড়িয়ে পড়েছে মৃদু মন
আষাঢ়ের এলোমেলো নদীপথ
দুবেলাতে মেঘ আর সাতরঙা চোখ
নাচেরাও গান গায়
পায়ের গভীর থেকে খসে পড়ে লাল সুর
দুবেলাতে রক্তজবার চাপে কেটে পড়ি শুধু

চির সুন্দরের বন্দনা
স্বপন রায়

কুসুম ফোটে কাননে—
তাই—সেথায় বিরাজ করে চির বসন্ত,
তাই দুঃখ সেথায় চির অস্তমিত
মানুষ তাই সেথায় মগ্ন থাকে আনন্দে।
আমার কানন আমার হৃদয়,
আমার কানন আমার মন,
আমার কানন আমার চোখ,
আমার কানন আমার চিত্ত;
তাই ফুলের সভায় আমি চিরবন্দিত।
কাননে থাকে জানা-অজানা ফুলের ভিড়
আমার হৃদয়-আকাশে থাকে জানা-অজানা
মানুষের মিছিল।
কত জন কতভাবে ধরা দেয়,
আমার চোখে, লেখা আছে তো। আমার কবিতাতে।
ঋতু বিপর্যয় আনে না আমার চোখে মরীচিকা
কারণ আমি যে বড় ঋতুর পূজারী
বিচিত্র সাজে সজ্জিত বড় ঋতু।

আমার চোখে এনে দেয় সুখের আলপনা,
তাই আমি মগ্ন সুন্দরের তপস্যাতে;
চিত্ত তাই পুলকিত গভীর আনন্দে।

জোছনায় আকাশ যেমন সুন্দর
তেমন আমার কাছে সুন্দর মানুষ
তেমন আমার কাছে সুন্দর প্রকৃতি
তেমন আমার কাছে সুন্দর অমৃত-বাণী;
তাই দিয়ে সাজাই আমি আমার সুখের তরণী।
নিদাঘের খরতপ্ত তেজে বর্ণহীন কানন,
জাগায় না রুক্ষতা আমার হৃদয়ে
কারণ জানি বর্ষণে তা সজীবতায় ভরা,
শরতে-হেমন্তে তা পূর্ণ বিকশিত।
শীতের জড়তা আমার মনে
বসন্তের আগমনে তা হবে প্রাণবন্ত
এ-জেনো-হে সুন্দরের পূজারী।

টুকরো কথা

প্রবীর দাস

বর্ণচটা আকাশের নীচে বাউণ্ডুলে শব্দ ও অক্ষরে
মেধার অন্বেষণ, একটা কিছু হয়ে ওঠার তাগিদে
অশরীরী কিংবা দিশাহীন ছায়া—
টুকিটাকি যা কিছু এই অপাংক্তেয়
ছেঁড়া মানচিত্র বা অচল মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ
শূন্য ভাঁড়ার থেকে ঝরে পড়া ধুলো—

ঐ সবকিছু রসময় মনে হয়
নতুবা ছড়িয়ে ছিটিয়ে সব চলে যাওয়া কথা
চায়ের ধূমায়িত কাপ টানটান বিছানার চাদরে
উল্টে ফেলে প্যারিস করা মোহিনী দেওয়ালে
পান খাওয়া মুখ থেকে ফ্রি-কিক্ট থুতু.....

যাক্ বেশি বলা এবং লেখা বারণ—
পুনরায় বোঝা গেল বীজও ব্যর্থ থাকে
আকাঙ্ক্ষিত মনোরম পরিবেশ না পেলে।

নির্বিরোধ রাজপথে ঘুড়ি ওড়ায় সন্টু

শৈবাল চট্টোপাধ্যায়

[মঞ্চের পর্দা উঠে যায়। সকালবেলায় সুন্দর আলো। গাঁয়ের পথ। একপাশে বড় দোলমঞ্চ একটি। শ্যাওলামাখা, পলস্তরা-খসা এখানে-ওখানে। চলাচল খুব একটা শুরু হয়নি বটে, ধীরে ধীরে গ্রাম জেগে উঠছে, বেশ বোঝা যায়। দূর থেকে ভেসে আসছে শ্যালো পাম্প্ চলবার একটানা ভট্ ভট্ শব্দ। দুটো-চারটে হাঁক-ডাক ও শিশুর কান্নার আওয়াজ-এর শব্দ— মস্ত ক্যানভাসে রঙের প্রলেপ।]

আলো   এখানেই মজা। দারুণ একটা মজা।

গতি   তুই একে মজা বলছিস কেন?

আলো   কী মুশকিল! একে মজা বলব না? ছোটোবেলা থেকেই এই দোলমঞ্চটা দেখে আসছি। কেউ জানে না, এটা কে বানিয়েছিল। কীভাবে ব্যবহার হত অথচ মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়ে—

গতি   তোদের জমিতে যখন, তোদের পূর্বপুরুষই কেউ হবে হয়ত, এটা বানিয়েছিলেন।

আলো   না-ও হতে পারে। মনে হয়, আগে কিংবা তারও আগে গাঁয়ের রাস্তা পুকুর, মন্দির এইসব যখন বানানো হত,—এসব নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামানো হত না।

গতি   দ্যাখ আলো, দোলমঞ্চের সামনে এই জায়গাটা কী সুন্দর করে নিকোনো। একটু আগেই কেউ একজন করে গেছে।

আলো   নিশ্চয়ই কারুর বাড়ির শনি-সত্যনারায়ণের পুজো আছে। তাই।

গতি   তাই বলে এত ভোরে? শীত-শীত-কোয়াশার মধ্যে?

আলো   আচ্ছা গতি, তুই যেন একটা কী! বড় জোর বছর তিনেক হয়েছে তোরা গ্রাম ছেড়েছিস। কলকাতার ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠেছিস। এরই মধ্যে সব ভুলে গিয়েছিস? এর চেয়েও অনেক বেশি সকালে আমরা দল বেঁধে এই দোলমঞ্চের সামনে জমা হতাম। কতরকম ব্রত করতাম। কীই বা বয়স ছিল আমাদের! মনে নেই সেই-সব-দিনের-কথা?

গতি   খুব ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস। সে-সব কি ভোলা যায়? আমি ছিলাম ঘুমকাতুরে। মা জোর করে ঠেলে তুলে দিতেন।

আলো   যতদূর জানি তোর মা এইসব ব্রত চালু করেছিলেন। আগে ছিল, পাশাপাশি আমাদের এই কয়বাড়ির মেয়েদের মধ্যে। শেষে গোটা গাঁয়ে কেন শুধু, এই অঞ্চলেই ছড়িয়ে পড়ে।

গতি   আমার মা ছিলেন বাঙাল দেশের মেয়ে। পদ্মা নদীর ওপারে কী একটা ছোট্ট গাঁয়ে। যেখানে প্রায় সব গ্রামে এইসব ব্রত-টত চলত। মার সব ছড়া-পাঁচালি মুখস্থ ছিল।

আলো তিনিই তো সব শিখিয়েছেন—সবাইকে ধরে ধরে শিখিয়েছেন। কত বুঝিয়েছেন, বল। ব্রত করলে শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে। মন ভালো থাকে। পড়াশুনাও ভালো হয়। খুব সহজেই মন বসে। এই সব আর কী।

গতি হ্যাঁ-হ্যাঁ সব মনে আছে।

আলো তোকে একটা কুইজ দিচ্ছি। বল তো এটা কোন ব্রত-কথার পাঁচালি? "হরি, হরি বৈশাখ মাস। কোন শাস্ত্রে পড়ল মাস?" বল পরের লাইন।

গতি [একটু ভেবে নিয়ে] নাহ্ মনে পড়ছে না। তবে খুব চেনা লাইন। খুব চেনা।

আলো দিনরাত্তির খালি কিউকিউ পড়লে কি আর—

গতি দাঁড়া-দাঁড়া। মনে পড়ছে। এটা হল, হরি-ব্রত। বল, ঠিক বলিনি? কিউকিউ ঢুকলেও মাথার এই কম্পিউটারে ব্রতও স্টোর থাকতে পারে। শোন তাহলে,—

"হরি, হরি বৈশাখ মাস। কোন শাস্ত্রে পড়ল মাস?
চন্দনে ডুবু ডুবু হরির পা, হরি বলেন—মাগো মা
আজ কেন আমার শীতল পা? কোন ভক্ত পূজে পা?
সে ভক্ত কি বর মাগে?"

আলো [হাততালি দিয়ে] বাহ্। একদম ঠিক।

[গতি আবার শুরু করে। আলো গলা মেলায়। দুজনে একসঙ্গে সুরে ও ছন্দে বলতে থাকে]

আলো ও গতি [একসঙ্গে] "গিরিরাজ বাপ চা'ন, মেনকার মত মা চা'ন; নিত্যানন্দ ভাই চা'ন;

গুণবতী বৌ চা'ন, রূপবতী ঝি চা'ন,
দাস চা'ন, দা'সী চা'ন, রূপার খাটে পা মেলতে চা'ন;

[একটু থেমে দুজনে হেসে হেসে] ঘরে ঘটিবাটি ঝকমক করে, আলনায় কাপড় দলমল করে,

গো হোলে গরু, ম'রায়ে ধান, সিঁথের সিঁদুর মুখে পান
কুলপাবন পুত্র চা'ন।

[হাসি চেপে প্রবল জোরে] হবে পুত্র মরবে না।

চক্ষের জল পড়বে না।" [দুজনে থেমে যায়]

গতি বাব্বাহ্। চাওয়ার আর বাকি রইল কী? বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সব চাওয়া শেষ।—সত্যি। বাঙালি চাইতে জানে।

আলো এতগুলো লাইন বলে মনে হচ্ছে, অনেক-অনেক কিছু চাওয়া হল।

গতি হলই তো। বেশি কথায় বল আর অল্প কথায় বল বিভিন্ন যুগে, ভিন্ন পরিস্থিতিতে এমনি করেই চাওয়া হয়েছে। আমি যদি বলি, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" সে যুগের প্রেক্ষিতে কম্পিউটারে অ্যানালাইসিস করে দ্যাখ ওই সব চাওয়া লুকিয়ে আছে এই একটি কথার মধ্যে।

আলো ঠিক। কেমন একটা মুড্ এসে গিয়েছে। সকালবেলা নির্জন ভোরের বাতাসে তোর ওই কমনরুম আর কফি হাউসের গপ্পোর চেয়ে এইসব কথাবার্তা ভালো লাগছে। তার চেয়ে আয় গান গানে পুরানো দিনগুলো ফিরিয়ে নিয়ে আসি। বেশ লাগছিল যা হোক। [হেসে হেসে গতি শুরু করবে সুন্দর সুরে গানের মতো শোনাবে। আলো গলা মেলাবে। শিহরণ জাগানো সূর্যের আলোর ব্যবহার। পাখির গান। দূরাগত মৃদু জন-কোলাহল।]

আলো ও গতি [সমবেত] "উঠ উঠ সূর্য ঝিকিমিকি দিয়া
না উঠিতে পারি আমি শিশিরের লাগিয়া
শিশিরের গঙ্গাকোটি শিয়রে থুইয়া।
উঠবেন সূর্য কোনখান দিয়া?
উঠবেন সূর্য বামুন বাড়ির ঘাট খান দিয়া
বামুনগো মেয়েরা বড় সেয়ান
পৈতা বোগায় বেহান বেহান॥
তাই দেখিয়া ম্যালানীরা খলখলাই হাসে।" [দুজনেই হঠাৎ থেমে যায়]

আলো কীরে গতি, থামলি যে বড়ো?

গতি হাটুরে লোকজনের চলাচল শুরু হয়ে গেছ, দেখেছিস? লজ্জা করছে, মাইরি। কী ভাববে বলতো?

আলো ছাড়তো, এখানে আমাদের সবাই চেনে। কী আবার, ভাববে?—কী সুন্দর ছড়া-পাঁচালি। মাঘ মাসের শীত-ভোরে, মজার ব্যাপার। শোন বাকিটা। তোর মনে নেই, বুঝতে পারছি। [সুর করে গানের ভঙ্গীতে পুনরায় শুরু করে।]

"হাসিস না লো, খুশিস না লো, তুই তো আমার সই
মাঘমণ্ডলের বর্ত করম, ঘাট পামু কৈ?
আছে, আছে লো ঘাট, বামুন বাড়ি ঘাট
রাত পোহালেই বামুনগো পৈতা বোয়ানের ঠাট।"

গতি দুর-দুর। বামুন আর পৈতা। এসবের কোনো মানে হয়, আজকাল? যত্তোসব।

আলো তুই কীরে গতি? এর মধ্যে, তুই মানে খুঁজছিস? মনে আছে, এই কদিন আগে, ব্যান্ডের গানের খুব প্রশংসা করছিলি। দিন দিন ওই সব গান কত জনপ্রিয় হচ্ছে। বল, হচ্ছে না?

গতি হচ্ছেই তো। কী সুন্দর গান, কত সহজ সরল ভঙ্গীতে—

আলো ভেবে দ্যাখ, ওই গানগুলোর সব মানে বুঝেছিস? আসলে, আমার কী মনে হয়, মাটি থেকে উঠে আসা ঘাসের গন্ধ মাখা গান। গ্রামবাংলার সরল মানুষজনের মুখের ভাষার মানেটাই সব কথা নয়। মনে রাখতে হবে, ওই বাংলা একদিন আমাদের ছিল।

গতি শুধু ছিল বলছিস কেন? আজও আছে।

আলো ঠিক বলেছিস। বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও থাকবে। কোনো দেশের সংস্কৃতি ধুয়ে-মুছে যায় না। যেতে পারে না।—চল, এবারে ফিরে যাই। তুই আজই ফিরে যাবি?

গতি কাল কলেজ আছে। যেতেই হবে। [ওরা বেরিয়ে যেতেই দুজন কৃষকের প্রবেশ। মাথায় পেল্লাই বোঝা। মুখগুলো দেখা যাচ্ছে না।]

ব্যাগ এই থাম। নামা এখানটায়। একটু জিরিয়ে নিলে হত না?

ঝুড়ি ঠিক আছে। [ক্লান্ত দুজনেই। ব্যাগ ও ঝুড়ি নামিয়ে দাঁড়ায় দুজনে]

ব্যাগ একটা সিগারেট দে।

ঝুড়ি তুই জানিস, আমি সিগারেট খাই না।

ব্যাগ ধ্যাস্। পকেট যে ফাঁকা সেটা খেয়াল নেই। ঠিক আছে রাস্তা দিয়ে কোনো একটা মক্কেল পাব না? কমপক্ষে একটা বিড়ি—

ঝুড়ি সব সময় কোনো-না-কোনো ধান্দা। সত্যি তোর—

ব্যাগ তাই বলে তোর মতো না। ছাড়তো ওসব। তোর কীর্তিকলাপ আমার সবই জানা।

ঝুড়ি হাঁ মাইরি। এবারের অনলাইনটা একদম ফাঁকা চলে গেল। পুরো ঠক খেয়ে গেলাম। কোপ বুঝে কোপ মারলাম। টাকা, যা হাতে ছিল, সব খেললাম। ধুস্। পোড়া-কপাল। সব ফক্কা। কোপটা মাইরি ফস্কে গেল। কিচ্ছু পেলাম না।

ব্যাগ কেন যে ও-সব খেলিস, মাইরি—ওসব কি আমাদের পোষায়?

ঝুড়ি অত জ্ঞান দিবি না। সকালবেলা ওসব ফটাফট বক্তিতে ভালো লাগে না। তোর ব্যাপার কী আমি জানি না, ভেবেছিস? কী খাতির তোর ওই পেন্সিলারের সঙ্গে। আহা। সেদিন দেখলাম ডবল ডিমের মামলেট সাঁটাচ্ছিস। ওসব কি অমনি খাওয়াচ্ছে? ওই শালা, ধাড়ি শকুন।

ব্যাগ [বিকৃত হাসি] হেঁ হেঁ। আমার নতুন-বিয়ে-করা সোমত্ত বউটা। কী বলব। সবই জানিস। অত বড় সংসার। সব সময় মনমরা। একটু হাসি নেই, মাইরি।

ঝুড়ি তাতে হয়েছেটা কী? সব সংসারেই অমন।

ব্যাগ নারে, জানিস, বউটার মুখে কী হাসি। বিশ্বাস কর। হাতে-পাতে যত দেনা-দায়িক ছিল সব ফিনিশ্। শালা। মনে ফূর্তি না থাকলে কি হয়?

ঝুড়ি হ্যাঁ-হ্যাঁ। সব বুঝি। বিয়ে না করলে কী হবে।—আর ওই পেনসিলারটার অত খাতির কেন, তাও বুঝি।

ব্যাগ হ্যাঁ মাইরি। আমি তো কোনোদিনই এসব লাইনের লোক না। হঠাৎ পেয়ে গেলাম। পাছে, বসে যাই। আর না খেলি। তাই অত তোষামোদ।

ঝুড়ি হ্যাঁরে, বড্ড নেশা এসব লাইনের। একবার মাথায় চেপে বসলে আর বের করা যায় না।

ব্যাগ না-না। আমাদের মতো ঘর-সংসারি মানুষের কি ওসব পোষায়? ভালো কথা। ছিন্নমস্তার মাঠে একটা বড় সরকারি ক্যাম্প বসেছে। ব্যাপার কিছু জানিস?

বুড়ি জানব না কেন? ক্যাম্পের এক বাবুর সঙ্গে আমার কথাও হয়েছে।
ব্যাগ কী বলল?
বুড়ি খবর মোটেই ভালো না। বেলা অনেক হয়ে যাচ্চে। পাইকের এসে বসে থাকবে। হেভি গালাগালি করবে। পথে যেতে যেতে সব বলব, চল।
ব্যাগ ঠিক আছে, চল। তুই একা অত বড় বোঝাটা তুলতে পারবি?
বুড়ি পারতেই হবে। এতটা পথ এলাম না?
ব্যাগ চল। বেরিয়ে যাই। আমরাও তাড়া আছে। [গানের সুরে] দুই তাড়াতেই শেষ হয়ে গেলাম। মন পাখিরে আমার। [ওরা বেরিয়ে যেতে না যেতেই কৃষক পরিবারের দুই যুবক প্রবেশ করে।]
হিমা দাঁড়া। দাঁড়া এখানটাতে। এই পথ দিয়েই আসবে। আসবার সময়ও বয়ে গিয়েছে।
বট সেই ভালো। এখান থেকে অনেক দূর দেখাও যাবে। মনে কর, খবরটা পেয়ে যাব। ঠিক কিনা।
হিমা তুই যা বলিস না কেন, বটো, তোর কালকের ব্যবহারটা আমার মোটেই ভালো লাগে নি। ভুলে যাসনে, সনাতন পাইকার তোর বাবার বয়সি।
বট কী এমন খারাপ ব্যবহার? কোনো মুখ খিস্তি করেছি?—তবে করা উচিত। ব্যাটাদের পকেট ভর্তি টাকা,—তাই ভাবে, আমরা বুঝি ওর চাকর-বাকর। যা বলবে, তাই করব। যা বোঝাবে, তাই বুঝব।
বট শত হলেও ওরা পাইকের। ব্যবসা করবি, কর। বাণিজ্য করবি, কর। তাই বলে বাড়ি-ঘরের ব্যাপারে উপদেশ ঝাড়াতে আসে কোন সাহসে? তুই ওর লম্বা-চওড়া উপদেশগুলো সব শুনেছিস, হিমা?
হিমা কী এমন খারাপ কথা বলেছে? অন্যায় কিছুও বলেনি। বোনটা বড় হয়েছে, তার বিয়েটা দিয়ে দে। তারপরে নিজেও দেখে-শুনে একটা ভালো বিয়ে কর।
বট তোর বুদ্ধিটা, বুঝলি, বটো, দিন দিন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে, আরে ব্যাটা, আমার সব টাকা রইল পড়ে, আলুর মাঠে। আর এদিকে আমি বাড়িতে বিয়ে লাগাই? ওই বুড়োটা আমাকে কী পেয়েছে? একটা বোকা-পাঁঠা?
হিমা কেন? এর মধ্যে তুই, খারাপটা দেখলি কী?
বট সত্যি, তোর মতো ভোলাই-চণ্ডী কী করে যে আমার বন্ধু হল। এ ব্যাপারটা বুঝছিস না কেন, এখন কোনো বড়-সড় রকমের টাকা খরচা করতে গেলে টাকা পাবো কোথায়? বাধ্য হয়ে ওর কাছ থেকে ধার নিতেই হবে। ব্যাস হয়ে গেল। আমি, আমার ব্যবসা, সব ওর হাতের মুঠোয়। আলু যে দাম দেবে তাই নিতে হবে চান্দমুখ করে। এইটে হচ্ছে ও ব্যাটা বুড়োর আসল মতলব। বুঝলি না, দাদন দিয়ে বটকৃষ্ণ মাইতিকে কিনে ফেলতে চাইছে। অতই সোজা?

হিমা তাহলে তুই বলতে চাস, এটা ওর একটা প্যাঁচ?

বট তাছাড়া আর কী? তুইই বল না। বন্ধু হয়ে হাত বাড়াবে। সাহায্যের নাম করে টাকাও দিয়ে যাবে। তারপর? তারপর কী হবে? বিষ্টুটা ওর পরামর্শে ওরই কাছ থেকে টাকা নিয়ে পাকা কোঠা বানাল একটা। এখন কী অবস্থা। গত তিনমাস মাঠ ভর্তি ফসল তুলেও কী লাভ পাচ্ছে। যাচ্ছে ওই বুড়োর গব্বে। হারানদার মেয়ের বিয়েতেও একই কেস হল। এখন খেতে পায় না। মাইরি। এই কদিন আগে হাটুরে মানিকের দোকানে বসে চোখের জল ফেলছিল।

হিমা তাহলে তুই কী করবি, ভেবেছিস?

বট মা-বাপকে স্পষ্ট বলে দিইছি। মাঠ থেকে আলু উঠুক। বিক্রিবাটা হোক, তারপর বোনের বিয়ে দেব। তাতে যদি এ সম্বন্ধ ভেঙে যায়, যাক। পরোয়া করি না। দেশে কি ছেলের আকাল? রেট্ দিলে অনেক চাঁদুই রেডি।

হিমা এখন রেট্ কত। জানিস?

বট যাট যাচ্ছে। শালা। তাই দেব। আলুটা উঠতে দে না একবারটি।

হিমা এরপরে তুই যদি তোর বিয়েটা লাগিয়ে দিতে পারিস তবে হয়ে গেল। শোধ-বোধ। যাট পেয়ে যাবি।

বট ব-চ এর মতো কথা বলবি না। আমি নেব? অসম্ভব। ওসব লাইনে নেই, ভাই। এই বা আছি। বেশ আছি। বউয়ের গোলামি করতে পারব না। [নেপথ্যে মাইকের ঘোষণা।]

হিমা থাম। থাম। চুপ কর। ভালো করে শুনতে দে।

বট যাক বাবা। এসে গেছে। কত কথাই শুনতে পাচ্ছি। শোনা যাক পার্টি কী বলে। [নেপথ্যে ঘোষণা—বন্ধুগণ, আজ বিকেল পাঁচ ঘটিকায় ছিন্নমস্তার মাঠে এক বিরাট জন-সভা হবে। এই সভায় বক্তব্য রাখবেন স্থানীয় এম.এল.এ শ্রী আতঙ্কভঞ্জন ভৌমিক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আলোচ্য বিষয়: আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল, বিদ্যুতের নতুন লাইন ও বিবিধ। আপনারা দলে দলে যোগদান করে এই সভাকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলবেন। ঘোষণাটি বারে বারে চলতে থাকবে। একসময় মিলিয়ে যাবে। ঘোষণা শেষ হতেই ডায়লগ শুরু হয়ে যাবে।]

হিমা ধুস্স্। এত যে কথাবার্তা শুনলাম, সে সব কোথায় গেল? কীরে বট এ ঘোড়ার ডিমের মিটিং-এ তুই যেতে হয় যা। আমি আর্সেনিকে নেই। বিদ্যুতেও নেই।

বট রাজনীতি না করলে মাথা খোলতাই হয় না। শোন হিমা, ভালো করে শুনে রাখ। পরে মিলিয়ে নিস। ওই যে শুনলি, বিবিধ। ওতেই সব আসবে। সরকারি জমি জরিপ, ক্যাম্প, জায়গা-জমি-সব আসবে।

হিমা এর মানে?

বট মানে-ফানে নিয়ে মাথা ঘামাস নি। মিটিং-এ তুই যাবি, আমিও যাব। ঠিক চারটের মধ্যে চলে আসবি। এই দোলতলাই বেস্ট। আমিও এসে যাব। গল্প করতে করতে চলে যাব। শুনে আসি, দাদারা কী বলছেন।

হিমা চারদিকে কত উলটা-পালটা সব শুনেছি। জায়গা জমি-বাড়িঘর-ক্ষেত খামার— কী যে হবে। কিছুই বুঝতে না পেরে ভয়ে বুক কাঁপছে, দিনরাত।

বট আমরা ওসব নিয়ে ভাবনা নেই। চল! সব শুনে আসি।

হিমা ঠিক আছে চল। যাব। —ওই কথাই রইল বিকেল চারটে দোলতলা।

বট ভালো কথা। পুরানো খবরের কাজ নিয়ে আসিস। তোকে বাদাম খাওয়াব। ক্ষেতের বাদাম। দেখিস—কী ফাস্ট ক্লাস। [দুজনে বেরিয়ে যায়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন প্রবেশ করে কথা বলতে বলতে।]

অনন্ত আসুন, এই দোলতলাতেই একটু দাঁড়িয়ে যাই।

উকিল হ্যাঁ, সেই ভালো। পবিত্র স্থান। আজকাল এখানে আসতে একটু সময় পাই না। ছোট বেলায় কত এসেছি, কিহে বিধান-অনন্ত, তোমাদের মনে আছে সে-সব?

বিধান কেন মনে থাকবে না? ভালোই মনে আছে। ছোটবেলা হারিয়ে যায়। ভোলা যায় না।

অনন্ত মামলার ভাগ্য ভালো। যেভাবেই হোক যাওয়ার পথে আজ দোলতলার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে গেলাম।

উকিল ভালো আর মন্দ। দ্যাখো, আজকেও আবার তারিখ পড়ে কিনা। তাহলে এই ছুটো ছুটিই সার। — তোমরা কাকে পাঠালে আমার পান আনতে?

অনন্ত কিছু ভাববেন না, অ্যাডভোকেটবাবু, ওর নাম ক্যাবলা হলে কী হবে। দারুণ দৌড়াতে পারে। এই এল বলে।

উকিল মুস্কিলটা কোথায়, জান তো বিধান, তোমাদের মামলাটা আজ প্রথম কোর্টে। নতুন এক হাকিম এসেছেন। হেভি কড়া। এক মিনিট দেরি হলেই, তারিখ ফেলে দেবেন।

বিধান কী আর করব। নসিবে যদি তাই থাকে, হবে। কম করে পাঁচ বছর তো গেল।

অনন্ত না-না পাঁচ নয় ছয়। আমার ছোট মেয়ে বেলা যে বছর জন্মেছে সেই বছর দাদার বিরুদ্ধে এই মামলা শুরু করলাম। সে মেয়ে এখন ছয় বছর, ক্লাস টুতে পড়ে।

বিধান ঠিক বলেছিস অনন্ত। তোর বৌদিও সেদিন এই নিয়ে বলাবলি করছিল। বলল, পাঁচ বছর তো হল। অনেক টাকা খুইয়েছে। উকিল আমলাবাবুদের পকেটে— [চুপ করে লজ্জায় ও ভয়ে]

উকিল ভালো কথা, বিধান, তোমাদের জমি-জমার খবর কী? সব ঠিক-ঠাক আছে?

বট সে কী! [হেসে] জমি-জমা কি বাড়ির ছেলেপুলে নাকি? একটার জ্বর আর একটার হাগা?

উকিল কী কথার কি অর্থ করলে। ঠিক-ঠাক মানে কী? তোমাদের জমি-জমা নেহাৎ কম নয়। সারা গাঁয়ে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে, এখানে দু কাঠা ওখানে পাঁচ কাঠা ছয় ছটাক, সে সবের কাগজপত্তর মানে রেজেষ্ট্রি দলিল, পরচা, খাজনা, আলাদা-

আলাদা সব দাগ নম্বর এই সব একদম ঝকঝকে তকতকে করে হাতের মুঠোয় সব আছে? না এখানেও নানা শরিকি প্যাঁচট্যাচ ঢুকে বসে আছে।

বিধান মনে হয় সব ঠিকই আছে। তবু আপনি যখন বলছেন, উকিলবাবু, আপনার কথা ফেলতে পারি না।

অনন্ত একটা কথা। আপনি হঠাৎ জমি-জমা কাগজ-পত্তর নিয়ে কথা বললেন কেন?

উকিল সেকী হে! তোমার কি কিছুই শোননি? আমাদের গোটা গাঁ, এই পাশের গাঁ, ওপাশেরটাও প্রায় অর্ধেক, ভ্যানিস হতে চলেছে। [হাসি দিয়ে বিদ্রূপ]

অনন্ত ও বিধান [একসঙ্গে] ভ্যানিশ! মানে?

উকিল শুনছি, না-না-শুধু শুনছি না, কাগজপত্তর টিভিতেও বলছে—এখানে নাকি মস্ত এক পেল্লাই কারখানা বসবে।

অনন্ত ন্যাও ঠ্যালা! কার-খানা? এঁ্যা! বলেন কী! এইসব চাষ-বাস। গোলা-পালা, গাছপালা—কিছু থাকবে না?

বিধান স্কুল—মন্দির দোলতলা-ফলা ভ্যানিস হয়ে যাবে?

উকিল সেই রকমই শুনছি।

অনন্ত নদী এত গভীরে ঘোল দিচ্ছে? আমরা এতগুলো মানুষ, পরিবারে পুষ্যি-টুষ্যি নিয়ে বিশ-বাইশ জন—সব যাবে কোথায়?

উকিল টিভিতে হ্যারি পটার দ্যাখোনি? তোমরা সবাই ঝাড়ুর বদলে টাকার বস্তায় চেপে যেখানে খুশি চলে যাবে। ভারতবর্ষ, দেশটা ছোট না।

বিধান আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। কেউ বা কেউ-কেউ আমাদের ভাগ্য নিয়ে মস্করা করছে না তো?

অনন্ত না-না। তা কেন হবে? টিভি, কাগজ সব এর মধ্যে আছে না? রেডিও আছে। সেদিন আমি নিজের কানে টুনাটুন শুনেছিলাম। খেয়াল করে ভালো করে সব শুনিনি।

বিধান হাঁ-হাঁ নিউজের টাইমে, আমিও শুনেছি। ভালো বুঝিনি। সত্যি করেই বলছি। এখানে এই অ্যাডভোকেট বাবুর মুখে শুনে—

অনন্ত ওই যে আসছে। আমাদের ক্যাবলারাম আসছে।

বিধান কীরকম ছুটছে দ্যাখ!

উকিল অত জোরে ছোটা ভালো না। তায় আবার এমনি সব রাস্তা। পড়ে না যায়।

বিধান না-না পড়বে না। গাঁয়ের ছেলে না?

উকিল [ঘড়ি দেখে] যাক ওই তো হাতে আমার পানের ডাবা। ঠিক এসেছে। একদম সঠিক সময়ে। ট্রেনটা নিশ্চয়ই পেয়ে যাবো। আর চিন্তা নাই।

অনন্ত আচ্ছা উকিলবাবু, একটা কথা ছোট করে জিজ্ঞাসা করি। ওইসব ব্যাপারে আমাদের পার্টি-ফার্টিও সবাই আছে?

উকিল [হেসে] বোকার দল। ওরা না থাকলে কি এসব হয়, না হতে পারে? এসো-এসো। আমরা বেরিয়ে পড়ি। ও ঠিক ধরে নেবে।

বিধান হ্যাঁ-হ্যাঁ সেই ভালো। ও আমাদের দেখতে পেয়েছে। হাতে নেড়ে ইশারা করছে। বলছে এগিয়ে যেতে।

অনন্ত আর দেরি নয়। চলুন এগিয়ে। [বেরিয়ে যায় তিনজনে। হঠাৎ ফিরে আসে বিধান। পিছন দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।]

বিধান ক্যাবলা, আমরা ইষ্টিশনের পথে এগুচ্ছি। তুইও আয়। কথাগুলো শুনেছিস তো? [বিধান বেরিয়ে যায়। পিছে পিছে এগিয়ে আসে ভুট্টার মা, বর্ষীয়ান মহিলা একজন। এই গাঁয়েরই। পিছন থেকে নারীকণ্ঠের ডাক। নেপথ্য ডাক—ভুট্টার মা। ও ভুট্টার মা। একুট দাঁড়িয়ে যাও। আমিও ঐদিকেই যাব।]

ভুট্টার মা [স্বগতোক্তি] যাচ্ছি একটা শুভ কাজে ...পিছু-ডাকা। [মুখ ঘুরিয়ে] দাঁড়াচ্ছি এখানে। পা চালিয়ে আয়। [অপেক্ষা করে। পিছন থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে মিনা, যুবতী একজন, এসে দাঁড়ায় মুখোমুখি।]

[হাসিমুখ] বাপরে! কী রকম হাঁপাচ্ছিস মিনা। আমার তাড়াহুড়ো নেই। দাঁড়াচ্ছি। [মিনা একটু শান্ত হলে কী বলছিস, বল।]

মিনা [হেসে] বলাবলির কিছু নেই। দূর থেকে তোমায় দেখলাম, ভালো লাগল, আমিও ওই দিকেই যাচ্ছি, তাই ডাকলাম। কথা বলতে বলতে যাব। [হেসে] বলি, যাচ্ছো কনে?

ভুট্টার মা [হেসে] আমার বাপের বাড়ির দেশের ভাষা বলছিস? বেশিক্ষণ চালাতে পারবি?—যাচ্ছি হারানদার ঠাঁই।

মিনা তা এই সাত-সকালে? কী ব্যাপার?

ভুট্টার মা আর বলিস না। ছোট ছেলে পল্টু ওর, মায়ের দয়া হয়েছে। এই অসময়ে। বল, কী ঝামেলা।

মিনা বসন্ত হওয়ার এখন আর সময়-অসময় নেই। দেখছি তো চারপাশ। হলেই হল। আগে দেখতাম, শীতের শেষেই শুধু হয়। সে সব দিনকাল বাঘে খেয়েছে।

ভুট্টার মা সত্যি রে। ঠিক বলেছিস। অমন দুরন্ত ছেলেটা, দিনরাত বাড়িময় দাপিয়ে বেড়ায় আর কেমন, নেতিয়ে পড়ে আছে।

মিনা বসন্ত হলে তেমনি হয়। তা হারানদার কাছে যে যাচ্ছো নিম গাছের একটা পাতায় পাতায় ঝাপানো ছোট ডাল চাই যে। সেটা কোথায়?

ভুট্টার মা এই রে। একদম ভুলে গেছি। আসবার সময়, পল্টুর বাবা গাছ থেকে ডালটা পেড়ে দিল। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসতে ভুলে ফেলে এসেছি।

মিনা নিমের ডালটা তোমার চাইই। হারানদা পাতাশুদ্ধো ওই ডালটাতেই মন্ত্র পড়ে দেন। সারা অঙ্গে ওই পাতাগুলো বুলাতে হবে। বার বার করে।

ভুট্টার মা জানি। সব জানি। এখন কী উপায় হবে?

মিনা তুমি কিচ্ছু ভেব না। পথে যেতে যেতে পেয়ে যাবে। না-পাও চিন্তা কোরো না। হারানদার বাড়ির পিছন দিকেই নিমগাছ আছে। কাউকে দিয়ে পাড়িয়ে নিলেই হল।

ভুট্টার মা [হেসে] বাঁচালি মিনা। এ না হলে, আমি খালি হাতেই ফিরে যেতাম বাধ্য হয়ে। হ্যারে। তুই যাচ্ছিস কেন ওই ঠাঁই?

মিনা বৌদির বাচ্চা হবে। এ মাসেই তাকে 'সাধ' দিতে হবে। তাই মা পাঠালেন, হারানদার কাছ থেকে তারিখটা জেনে নিয়ে যেতে।

ভুট্টার মা ভালোই হল। চল একসঙ্গে, কথা বলতে বলতে যাই।

মিনা [একপাশে নজর দিয়ে দেখে] দাঁড়াও। ভুট্টার মা তোমার সমস্যার সমাধান, বোধ হয়, হয়ে গেল। —কাবুল। এই কাবুল শোন। শোন না। একটু দাঁড়া। আমি আসছি।—তুমিও একটু দাঁড়াও, আমি আসছি। [বেরিয়ে যায়।]

ভুট্টার মা তাড়াতাড়ি আসিস। দেরি করিস না। [নেপথ্যে থেকে - না, না। এক্ষুনি আসব।]

মিনা [একটু বাদে ফিরে এসে] কাবুল। ওই মধ্য-বাড়ির ছেলে। ও উঠছিল নিমগাছে দাঁতন পাড়তে। ওকে বলে দিলাম। তোমার জন্য পাতাসমেত—

ভুট্টার মা ভালোই হল। কিন্তু এদিকে, বাড়ি একদম খালি। ছেলেটা জ্বরে কাতরাচ্ছে। সারা গায়ে ব্যথা। উনিও বাড়ি নেই। গেছে খবর আনতে।

মিনা খবর? কীসের খবর ভুট্টার মা?

ভুট্টার মা ওই যে কীসের শুনছি। ভিটে-মাটি সবই নাকি ছেড়ে যেতে হবে। এখানে চাষ উঠে যাচ্ছে। আমাদের বাসও উঠছে। কলকারখানা হবে।

মিনা আমিও শুনেছি। আজকে মাঠে মিটিং আছে। মন্ত্রী-টন্ত্রীও নাকি আসবে, আমাদের বোঝাতে।

ভুট্টার মা কী যে হবে। কিছুই বুঝতে পারছি না। কী করব? কোথায় যাব? ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। এ আবার কোন আপদ এল।

মিনা আপদ বলছ কেন? কলকারখানা হলে সে তো আমাদেরই লাভ। তাছাড়া টাকা পাবে অনেক।

ভুট্টার মা লাভ-লোকসান বুঝি নে বাপু। বাপ-পিতেমহর ভিটে ছেড়ে আমি যাব না। টাকার আমার দরকার নেই। পরিষ্কার কথা, আমার জমি ছেড়ে আমি যাব না।

মিনা [হেসে] তা হবে না। ভুট্টার মা, জেনে রাখো ভালো করে, তা তুমি পারবে না। দেশে এমন আইন আছে, এই যে তোমার বাড়ি-ঘর যা কিছু গড়েছ বছরের পর বছর ধরে সবই মুহূর্তে তোমার না হয়ে যেতে পারে। ওই কাবুল আসছে। তুমি দাঁড়াও। একি। ওর হাতখালি কেন? [বেগে বেরিয়ে যায়। ভুট্টার মা চিন্তিত। দুঃখ ভরা চোখে দোলমঞ্চটা হাত বুলোচ্ছে। মিনা প্রবেশ করে]

মিনা চলো, ভুট্টার মা। তোমার ডাল হারানদার বাড়ি পৌঁছে গেছে।

ভুট্টার মা হ্যাঁ। চল। চল। বেলা বেশ বেড়ে গেছে। [দুজনই ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যায়। মঞ্চ ফাঁকা। অনেক দূর থেকে একটা মাইকের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। একটি ঘোষণা। কাছে, আরো কাছে আসে। স্পষ্ট হয়। কিন্তু দেখা যায় না কিছুই। মৃদু জনকোলাহল। কুকুরের ডাক। চলমান ঘোষণাটি থমকে দাঁড়ায়। আনন্দ

সংবাদ। আনন্দ সংবাদ। আ-ন্দ-সং-বাদ। বন্ধুগণ, দি নিউ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল সিডি কাফে পুনরায় চালু হতে চলেছে। আজ শুভমুক্তি। আগের মতোই তিনটি শো হবে। তিন, ছয় ও নটার সময়। প্রথম মুভি—নাক কেটে যাত্রা উত্তল। দ্বিতীয় মুভি—মাতৃহারা। তৃতীয় মুভি—বীর ভোগ্যা । টিকিট আগের রেটেই থাকছে। তিন টাকা, পাঁচ টাকা, আট টাকা। আসুন। আসুন। আসুন। আপনার টিকিট সংগ্রহ করুন। ঘোষণাটি চলমান হতে থাকে। বার কয়েক কথা হয়। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। 'মঞ্চে আগমন ঘটে।']

লাশু যাক বাবা অনেকদিন পর আবার কাফে-টাফে খুলল।

ধ্যান মনে হচ্ছে, তুই যেন খুব দুর্ভাবনায় ছিলি।

লাশু অনেকটা। এসব না থাকলে অত বড় রাতটা কাটে কী করে? কাঁহাতক আর টিভির পাঁচালি ভালো লাগে?

বাঞ্ছা শুনেছি ওদের তিন নম্বর বইটাই হচ্ছে, আসল বই।

লাশু ঠিকই শুনেছিস, বাঞ্ছা। সেক্স আর ক্রাইম বোঝাই। নো মহিলা, নো শিশু—অ্যালাউড।

বাঞ্ছা ভাবতে কেমন লাগে, রাত একটা দেড়টায় কতগুলো কর্মক্লান্ত মানুষ মাতাল হয়ে গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মাথায় তাদের নানা পশু-ভাবনা।

লাশু দারুণ বলেছিস বাঞ্ছা। এইজন্যে তোকে এত ভালো লাগে। সঠিক সময়ে সঠিক শব্দগুলো চয়ন করতে পারিস। আমি, শালা, সারা জীবনেও পারলাম না।

ধ্যান হয়েছে। হয়েছে। বাঞ্ছাকে আর গ্যাস দিতে হবে না। প্রেম করে ছেলেটার বুদ্ধি খুলেছে সেটা বলছিস না।

লাশু 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' এই শব্দগুলো পর পর সাজিয়ে বলে গেলে, কেমন হয় ধ্যানবাবু?

ধ্যান [হেসে] তুই বলতে চাস অন্য কোনো....

বাঞ্ছা তাছাড়া আর কী হতে পারে? শিল্প আসছে। গাঁয়ে গাঁয়ে শিল্পের জোয়ার এসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এসব তারই প্রিয়াম্বল। "কলমীলতা, কলমীলতা, জল শুখাইলে থাকবি কোথা? থাকুম থাকুম প্যাঁকের তলে, ফাল দিয়া উঠুম বর্ষাকালে।"—এই কলমীলতারা চিরদিনের মতো বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। আগামী বর্ষায় ওদের আর দেখতে পাওয়া যাবে না। মাটির গভীরে থাকতে থাকতে এক সময় হরপ্পায় পৌঁছে যাবে। রোমান মব্ বল কিংবা যদু-বাহিনী বল ওদের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। ওদেরই দিন আগত ঐ।

লাশু [বাঞ্ছার পিঠে ক্রমাগত ঘুসি মারতে থাকে। অসাধারণ। অসাধারণ বলেছিল বাঞ্ছা। জবাব নেই।]

ধ্যান মাইরি, বাঞ্ছা। তুই এত? এত সুন্দর ভাবনা তোর?

বাঞ্ছা থামবি তোরা? খেয়াল আছে দোলতলা এসে গিয়েছে। সিদ্ধির এখনও নো-

পাব্র। তোরা চেঁচিয়ে ডাকবি সিদ্ধিকে? ওই তো ওর বাড়ি। [নেপথ্যে মেয়েলি গলা—ব্রিরত্ন এসে গিয়েছিস?]

ধ্যান ওই তো শ্রীমতি সিদ্ধিরাণী।

সিদ্ধি আমি কখন থেকে তোদের জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছি। এক রাউন্ড চা খাওয়াও হয়ে গেল। এদিকে বাবুদের পাত্তা নেই। খালি বাক্‌তাল্লা। ছুটির দিনের আড্ডাটাই যাচ্ছে মাঠে মারা।

বাপ্পা ছাড় তো ওসব। হ্যারে সিদ্ধি, শুনলাম তোর একটা প্রোমোশন হয়েছে।

সিদ্ধি হাঁ, মাইরি। কী করে জানি হয়ে গেল।

ধ্যান 'হয় হয় জানতি পার না।' ছপ্পর ফুঁড়েই হয়।

বাপ্পা ওসব কথা বাদ দিয়ে কাজের কথায় আয়। খাওয়াচ্ছিস কবে?

সিদ্ধি জানতে পারবি। তোদেরই সব কিছু করতে হবে।

লাণ্ড মানে? আমরা চাঁদা তুলে তোকে খইয়ে ধন্য হব?

সিদ্ধি ধুস্‌স্‌। তা নয়। আসলে ঠিক হয়েছে, বাড়িতে একটা ছোট-খাটো গেট-টুগেদার করতে হবে। তোদের মতো আরো কিছু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু আছে। তাদের খাওয়াতে হবে। বাবা তাই বলেছেন।

ধ্যান বহুত খুব! এটা কোনো ব্যাপারই নয়। আগে থাকতে ডেট্‌টা বলে দিস। ব্যাস বডি ফেলে দেব।

সিদ্ধি কিন্তু তোর সর্বশিক্ষা অভিযানের কী হবে।

ধ্যান কী আর হবে? দু-তিন দিন অভিযান করব না।

বাপ্পা আমি অবশ্যি অতটা জোর দিয়ে বলতে পারছি না। সে দেখা যাক, যা হোক করব।

লাণ্ড এহ্ বাহ্য। হ্যাঁরে সিদ্ধি তুই বিয়ে করবি কবে?

সিদ্ধি হবে। হবে। অত ভাবনার কী আছে? সময়ে সব জানতে পারবি।

ধ্যান আরে। ও বাসুদা না? নিশ্চয়ই কাল রাতে ফাংশান ছিল। তাই সেরে এখন বাড়ি ফিরছে।

লাণ্ড অনেক দিন ওর গান শুনি না। দাঁড়া ডাকি। [চেঁচিয়ে] বাসুদা! এই বাসুদা! এই যে এদিকে আমরা। এসো না একবার। [দোতারা বাজাতে বাজাতে বাসুর প্রবেশ। বাউলদের পোশাক। যুবক]

বাসু কী বলছ? বলো। কাল সারারাত একটু ঘুমুতে পারিনি।

সিদ্ধি কেন বাসুদা? ফাংশান থাকলে—

বাসু আরে না-না মোটেই তা না। ওরা আমার গান ফেলেছিল শেষ রাত্তিরে তিনটেরও পরে। বলে কিনা বাসুদা, আগলা রাতে তুমি ঘুমিয়ে নাও। তোমার গানের ওই এক দোষ, আগে ফেললে আসর মাটি। তারপরে আর কোনো গানই জমবে না।

ধ্যান [হাত জোড় করে] বাসুদা; প্লিজ, তোমার গান শুনি না কতদিন।
সিদ্ধি যদি সম্ভব হয় তাহলে একটা গান গাও, প্লিজ।
বাসু আমার ক্যাসেড, সিডি সব আছে। তাই কিনে গান শোনো। তাহলেই হল।
লাও এটা কী বলছ বাসুদা? এটা কখনোই তোমার মনের কথা হতে পারে না। ভালো করেই জানো এমনি খালি গলায় গানের মেজাজেই ভিন্ন।
বাপ্পা বাসুদা, তুমি আমাদের কাছে তোমার গানের বিজ্ঞাপন করছ?
বাসু [হেসে] ঠিক আছে বাপু। একটার বেশি নয়। দমে কুলোবে না।
ধ্যান হ্যাঁ-হ্যাঁ। তাই হোক। শুরু করো বাসুদা।
বাসু [দোতারা বাজিয়ে গান শুরু করে। বাউলদের মত নাচতেও থাকে।]
[গান]— চার বাঘেতে আমার ধরেছে
শুরু, এখন উপায় কীগো, উপায় কী?
চার বাঘেতে চার দিকেতে
আটকে রেখেছে।
এখন উপায় কী করি,
বলো শুরু, উপায় কী করি?
বাসু মামার স্বরচিত চটজলদি একখানা বাউলগান শুনিয়ে দিলাম। খুশি তো?
সিদ্ধি "অল্পেতে খুশি হয়, দামোদর শেঠ কি?" ভালো করে, বেশ জমিয়ে একখানা গাইতে হবে। কি সুন্দর গাও তুমি, বাসুদা! আমরা তোমার গানের সঙ্গে নাচব। শুধু গানে আজকাল মন ভরে না। নাচ চাই।
ধ্যান শুধু কী তাই। মাইমে অভিনয় চাই। ক্যামোফ্লেজ চাই। কে আসলে গাইছে কার কাদার তা বুঝবে।
বাপ্পা আচ্ছা বাসুদা! তুমি বলছ, এটা তোমার নিজের রচনা। চার বাঘ ব্যাপারটা কী? সেটা বুঝলাম না।
লাও কী আর হবে? আধ্যাত্মিক কোনো ব্যাপার-স্যাপার।
বাসু [হেসে] বাহ্ লাও। বাঃ। বেশ বলেছ। একদম ঠিক। দেহতত্ত্বের ব্যাপার আমার মাথায়ও ভালো ঢোকে না। গাইতে হয়, গাই। ওসব হল জাত-বাউলের ধ্যান-ধারণা। যাইহোক আমি পাল্টা একটা প্রশ্ন করি। আমাদের জীবনের চারদিকে তাকিয়ে। বর্তমান হালহকিকত অবস্থা দেখে, তোমরা বলো দেখি, এই চার বাঘ কে? কে? কারা আমাদের এই সুন্দর সমাজ-সংস্কৃতি ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে?
লাও নাহ্ বাসুদা, তুমি হেভি দিচ্ছ। তাই বলে, সকালবেলার আড্ডাটা নষ্ট করে দিও না এমনি করে। ওসব হেভি চিন্তা-ফিন্তা মাথায় এখন ঠিক ঢুকবে না।
বাসু বেশ! বেশ! তোমরা ভাবো। পরে দেখা হলে, জানিয়ে দিও। [জোরে জোরে দোতারা বাজাতে শুরু করে।] নাও এবারে লালনের একখানা বিখ্যাত গান শোনো!

[গান] "সব লোকে কয় লালন কি জাত এ সংসারে।
লালন কয়, জাতের কি রূপ, দেখলাম না এনজরে।।
সুন্নত দিয়ে হয় মুসলমান,
নারীলোকের কি হয় বিধান?
বামন চিনি পৈতায় প্রমাণ,
বামনী চিনি কি ধরে?
কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়,
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কারে রে?"

সিদ্ধি — ডিভাইন। সিমপ্‌লি ডিভাইন। যেমনি গানের ভাষা, তেমনি বাসুদার গলায় অপূর্ব সুরের খেলা। অনবদ্য।

ধ্যান — এসব গান যে দেশে হয়, সে দেশেও জাতি-দাঙ্গা হয়।

সিদ্ধি — তোর কথা মানতে পারলুম না, ধ্যান। দাঙ্গা করানো হয়।

বাসু — আর গান-বাজনা। গাছ উপড়ে ফেললে সে কি আর ফুল-ফল দিতে পারে? সবই যেতে বসেছে। তোমরাও নিশ্চয়ই সব জেনেছ।

লাও — কেন জানব না। সবই জানি।

বাপ্পা — জানা-শোনা সব পাট চুকে গিয়েছে। ওসব নিয়ে ভাবি না। এখন শুধু ভাবছি "কি রবে আর কি রবে না।" অস্তিত্বের প্রশ্নও বটে।

ধ্যান — পার্টির খবর যা জেনেছি, তাতে মোদ্দা কথাটি হল, সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। ইজরাইলের জন্মের আগে ইহুদিদের যে দশা হয়েছিল—তেমনি।

বাসু — শোনো, আমার একটা কথা আছে। তোমাদের সকলের কাছে। তোমরা জানো লেখাপড়া বেশি শিখিনি। সারা জীবন গান নিয়ে থেকেছি। দুইপারের বাংলাদেশে গান গেয়ে পথে পথে ভিক্ষা করে খেয়ে থেকেছি। ওসব রাজনীতি সমাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাইনি। তোমরা আমাকে যা বলবে তাই করব। আমার সামান্য জায়গা-জমি, বউ-বাচ্চা সবই তোমাদের কাছে থাকে। আমাকে বলো, আমি কী করব?

লাও — সে সব ছাই, আমরা কিছু বুঝতে পারছি কি?

বাসু — তোমাদেরই সব বুঝতে হবে।—নাহ্! চলি গো। আর পারছি না। পা দুটো টলমল করছে। "একথা সে-কথা পরান কথা। আর কথা, আসল কথা।" সামনে আঁধার, কোথায় যাবো, কী খাবো, কে জানে? [দোতারা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে যায়]

"আমীর ফকীর হয়ে এক ঠাঁই
সবাইর পাওনা খাবে সবাই।

আশরাফ বলিয়া রেহাই
ভবে কেন্ট নাহি পাবে।"

লাশু অনেকেই এই এক কথা বলছে।

ধ্যান কোন কথা?

লাশু শুনলি না? কোথায় যাব, কী করব, কী খাবো? হতাশার সুরে বাসুদার মতো অমন হাসি-খুশি মানুষটার মুখে কী দারুণ কষ্টের কথা।

ধ্যান আমার ছোট বোন ইরা স্কুল থেকে একটা বাংলা অনুবাদ বই এনে পড়ছিল। বহু পুরানো কালের লেখা—লাস্ট ডেজ্ অফ পম্পাই। লাস্ট ডেজ্ কথাটা বড্ড ধাক্কা দিয়েছে মাইরি। বিশ্বাস কর, রাস্তা দিয়ে হাঁটি কিংবা বাড়িতে থাকি সব সময় ওই এক কথা যেন অনবরত আমার মাথায় এসে ধাক্কা দিচ্ছে।

বাপ্পা ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দ্যাখ, বোধহয় বৃহত্তর পটভূমিকায় এসে এসব দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে।

ধ্যান তুই একে দুর্বলতা বলছিস?

বাপ্পা আমরা এমন একটা পার্টির সদস্য যে পার্টি কখনও অ্যান্টি-পিপল্ হবে না।

সিদ্ধি সে বিশ্বাস আমারও। তবু কেন এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছি নে জানি না। আজ বিকেলে ছিন্নমস্তার মাঠে চল, দেখি নেতারা কী বলেন?

ধ্যান চারপাশের মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিস। এক অজানা আশঙ্কায় কেমন যেন চুপ মেরে গেছে।

লাশু আমাদের রতন মামা গরুর গাড়ি করে ধানের আঁটি বোঝাই করে বাড়ি ফিরে আসছিল। মুখোমুখি দেখা। বলে উঠল, ভাগ্নে, দ্যাখো, জীবনের শেষ ফসল কেটে বাড়ি ফিরছি। গাড়িতে ওর মাথাল ছেলেটা ছিল। বলে উঠল, ও জ্যাঠা। টাকা পাইছ, কি পাও নাই?

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। যন্ত্রসঙ্গীতের করুণ সুর বাজতে থাকে খানিকক্ষণ ধরে। পর্দা উঠে গেলে দেখা গেল দর্শকদের মুখোমুখি চেয়ারে বসে একজন। বাকি বেশ কিছু মানুষ ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে। ধরে নেওয়া যাক, ওই মানুষটি হাকিম। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি পেয়াদা। টেবিলের ওপর থেকে ছোট্ট মাইকটি তুলে নিয়ে সে নাম ডাকতে থাকে।]

পিয়াদা চিরন্তন সামন্ত। চিরন্তন সামন্ত! চিরন্তন সামন্ত হাজির?

[ভিড়ের মধ্য থেকে একজন গ্রামবাসী এগিয়ে এসে প্রণাম জানায়।]

চিরন্তন হুজুর! আমিই চিরন্তন সামন্ত।

হুজুর শুনুন, সামন্ত মশাই। আপনার জমিজমা সংক্রান্ত যা কিছু প্রমাণ সবই এখানে আমার কাস্টডিতে জমা আছে। সেগুলো আমার খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। যদি কিছু প্রশ্ন থাকত তাহলে আপনাকে পৃথকভাবে ডেকে পাঠানো হত। তা হয়নি। এবারে খোলাখুলিভাবে এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে আপনার যদি কিছু

বক্তব্য বা আপত্তি থাকে তা বলবেন। সে সব এখানে নথীভুক্ত করা হবে এবং যথা সময়ে অবিকল পেশ করা হবে বিভাগীয় মন্ত্রীর দপ্তরে। আমার অনুরোধ, সরকারের পক্ষেরই অনুরোধ, কোনো কথা লুকুবেন না। অকপটে প্রাঞ্জলভাবে সব কথা খুলে বলুন।

চিরন্তন হুজুর। আমি—

হুজুর [বাধা দিয়ে] শুনুন। আমার বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি। একটি গাছের যেমন অনেক ডালপালা, পাতা থাকতে পারে, তেমনি মানুষের বেলায়ও তাই। আপনার নির্ভরশীল অথবা একই পরিবারভুক্ত যদি কেউ থাকেন এবং কিছু বক্তব্য পেশ করতে ইচ্ছুক তাকেও সুযোগ দেয়া হবে। তাঁর বক্তব্যও লিপিবদ্ধ করা হবে। সদাশয় সরকার চান, আপনাদের সম্ভাব্য সব অসুবিধা তাঁদের কাছে প্রকাশ করবেন এবং আপনাকে সবরকম সাহায্য ও পরামর্শ দেয়া হবে এই আশ্বাস দেয়া হচ্ছে। এবারে বলুন।

[হঠাৎ দুজন বয়স্ক ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে একজন এগিয়ে গিয়ে হুজুরে নিবেদন করেন]

ভদ্রলোক এক হুজুর। মিডিয়ার তরফ থেকে আমরা দুজন এসেছি।

হুজুর ধন্যবাদ। আপনারা দয়া করে এগিয়ে যান। ওই পাশের টেবিলে, দেখুন, সুধাংশুবাবু আছেন। তাঁর কাছে পরিচয়পত্র দেখিয়ে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে আনুন।

ভদ্রলোক দুই আমরা কিছু ছবিও সংগ্রহ করব। আশা করি অনুমতি দেবেন।

হুজুর [মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়] হ্যাঁ নিশ্চয়ই।—বলুন, সামন্তবাবু।

চিরন্তন [প্রণাম জানিয়ে] আমি চিরন্তন সামন্ত। পিতা মৃত কুঞ্জবিহারী সামন্ত। বয়স ষাট। নিবাস এই হাজফিল্ গাঁয়ে। মৌজা কুবজমপুর। আমার পরিবারে ছোট-বড় মিলিয়ে আঠারোজন। আমিই কর্তা বর্তমান। আমার সমস্ত জমিজমা, বর্গা, বন্ধকি, পত্তনি ইত্যাদি যা আছে সব কিছু বিবরণ আপনার কাছে জমা দিয়েছি। এ ছাড়াও বসতবাটি, গোড়ির পুকুর ইত্যাদিও আছে। এসবয়ে খবরও পেয়েছেন আপনি। আমাকে নিয়ে পাঁচ পুরুষ এই ভিটাতে আমরা রয়েছি। গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। চাষ আমার অধিকাংশ দো-ফসলী। আবার তিনফসলীও আছে। চাষে বাস অর্থাৎ চাষ-বাস নিয়ে আমাদের জীবন কেটে যায়। ভালো-মন্দ মিশানো। সত্যি কথা বলতে কী হুজুর, চাষ ছাড়া অন্য কোনো কাজও আমরা জানিনে। আপনারা যে ক্ষতিপূরণের টাকা দেবেন তাই দিয়ে এই বয়সে নতুন করে কোথায় কীভাবে এতগুলা লোকের জীবন শুরু করব, কিছুই বুঝতে পারছি না। রাত্রে ঘুমুতে পারি না। দিনরাত ওই এক চিন্তা। মাঠের চাষ তৈরি হয়ে হঠাৎ আসে না। তৈরি করতে হয় একটু একটু করে। এই শিক্ষাই তো এতদিন পেলাম। আমার এই বয়স, হঠাৎ টাকা

পেয়ে হঠাৎ জমি কিনে সব করে ফেলব, তা কি হবে হুজুর? অথচ ভেবে দেখুন, দিন গেলে ছত্রিশটা মুখ হাঁ করে থাকে খাওয়ার জন্য। তাছাড়া আরো আরো কত কী আছে। বলুন হুজুর, ঠিক বলিনি? [চুপ করে যায়।]

হুজুর আর কিছু বলবেন?

চিরন্তন না হুজুর। বলবার আর কীই বা থাকবে? তাছাড়া, হুজুর এ সময়টা বলবার চেয়েও বুঝাবার দরকারই বেশি। সবপক্ষেরই দরদ দিয়ে সব কিছু বুঝাতে হবে। সামান্য লেখাপড়া জানি। কীইবা বুঝি। শুধু আপনাদের দেখি। আপনাদের কথা বুঝতে চাই। মেনে নিতে চাই। বিশ্বাস করুন, কোনোটাই কি পারছি? চারদিকে সব ধুলোর মাঠ তৈরি করছি এতদিনের–[আবেগে কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। চলে আসে ধীরে পায়ে।]

পিয়াদা [তালিকা দেখে।] ব্রজ দাস। ব্রজগোপাল দাস। গ্রাম হালখিল—ব্রজগোপাল দাস।

ব্রজ হুজুর। আমার নাম ভুল লেখা আছে। কেরোসিনের কার্ড, ভোটের কার্ড খুলে দেখবেন—আমি ব্রজগোপাল নই। ব্রজরাজ দাস। বাবা সীতাপতি দাস। এই চিরন্তনের ঠাকুর্দা আমার ঠাকুর্দাকে দেড় কাঠা জমি দান করেন। বাস্তু নির্মাণ করতে টাকা পয়সা দেন। সেই থেকে আমরা এখানে আছি। এদের কাপড়জামা কাচি আবার গ্রামের অন্য লোকজনদেরও। আমাদের সবাইকে উঠে যেতে হবে। কোথায় যাব? সেখানে গিয়ে কাপড় চোপড় কাচব কোথায়? অত মানুষ আমরা রাত পোহালে খাব কি? নতুন শিল্প আসছে। এখন আমরা যাই কোথায়? কী হবে, হুজুর?

হুজুর চুপ করে গেলেন কেন? আপনার আর কিছু বলবার আছে?

ব্রজ আমি যা বলেছি সব ঠিক ঠিক মতো আমাদের মন্ত্রীর কাছে বলবেন তো?

হুজুর আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার সব কথা টেপ করা হচ্ছে।

ব্রজ খুব ভালো কথা, জবাব পাব তো হুজুর?

হুজুর যেদিন টাকা দেয়া হবে সেদিন আসবেন। চেক নিয়ে যাবেন।

ব্রজ হুজুর গো, চেক কাকে বলে তাই জানি না। চেকের টাকা কোথায় রাখব? কি করব হুজুর। এ তো ভয়ানক বিপদ। সেটাকা সবাই লুটে পুটে খাবে না? কি বলেন আপনি? টাকা ছাড়া আর কোন জবাব নাই?

হুজুর শান্ত হন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আর সবাই যা করবে, আপনিও তাই করবেন। ঠিক আছে। এবারে পরের জনেক আসতে দিন। [ব্রজ বেরিয়ে যায়।]

পিয়াদা মানিক মিঞা। মানিক মিঞা সর্দার। মানিক মিঞা সর্দার হাজির?

মানিক হুজুর সালাম। আমি মানিক মিঞা সর্দার। আমার আব্বাজান প্রায় নব্বুই বছর বয়স। দশ গাঁয়ের মানুষ তাঁকে চেনে। আমার একটি আরজি আছে, হুজুর। বেশ কয়েক বছর যাবৎ তিনি ক্যানসারে ভুগছেন। জড়ি বুটি ছাড়া আর কোনো

চিকিচ্ছে করাতে পারি না এখন। নড়বার শক্তি নাই। দিনরাত খালি চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কাঁদে। আমি তাঁর বড় ছেলে। আপনার কাছে এসেছি নালিশ জানাতে। সত্যি কথা বলতে কী হুজুর আমি হাওয়া বুঝি। টাকা হাতে বাড়ি-ঘর-জোত জমি পেলে আমাদের যেতেই হবে। নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু আমার এই আধমরা আব্বাজানকে নিয়ে কোথায়ও যেতে পারব না। কাজেই যতদিন তিনি গোরে না যান আমাদের পক্ষে কোথায়ও যাওয়া হবে না। যদি তাড়াহুড়া করেন তাহলে আমার আব্বাজানকে আপনারা নিয়ে যান। যা খুশি করুন। আমি কিছু বলব না। শুধু দেখবেন, জোর করে মেরে ফেলবেন না। [কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর প্রশ্ন] কই হুজুর। আমি এতগুলো কথা বললাম আপনি, দয়া করে, কিছু জবাব দিন।

হুজুর আমি জবাব দেওয়ার কেউ নই। জবাব যারা দেবার তারাই দেবেন। আমার কাজ শুধু আপনাদের কথাগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া।

মনিক ঠিক আছে। তাই সই। তাই করেন। [বেরিয়ে যায়]

পিয়াদা হারানচন্দ্র গাঙ্গুলি। হারানচন্দ্র গাঙ্গুলি। হারানচন্দ্র—

হারান হুজুর। এই যে আমি। আমিই হারানচন্দ্র গাঙ্গুলি। পিতা শ্রীবনবিহারী গাঙ্গুলি। আমি হুজুর, এই হালকিল গাঁয়ের অধিবাসী শ্রীশরৎচন্দ্র মৃধা মহাশয়ের বাড়ির একজন ভাড়াটিয়া।....এই গ্রামের পুরোহিত। মন্দিরের দেব-সেবাও করি। আবার জ্যোতিষী বিদ্যাও শিখেছি। তাও করি। এ গ্রামের দূরস্থান আমি এ অঞ্চলেরও মানুষ নই। আমার আদি বাড়ি ছিল ঢাকা। যে বছর সারা ভারত জুড়ে আমাদের পূর্বপুরুষগণ নরমেধ যজ্ঞ করে স্বাধীনতা অর্জন করেন সেই বছর আমি সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গে আসি, প্রাণ ভয়ে নিজেদের বাঁচাবার জন্য। কিছুদিন শিয়ালদা প্লাটফরমে থাকবার পরে এ ক্যাম্প্ সে ক্যাম্প ঘুরে দণ্ডকারণ্যে প্রেরিত হই। সেইখানে পিয়া মা-বাবা, আমার এক ছেলে বিসর্জন দিয়া ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এই হালকিলে এসে থিতু হই। এক কাঠা জমি পাই।

হুজুর আপনার পূর্ব-ইতিহাস সংক্ষিপ্ত করুন।

হারান মার্জনা করুন হুজুর। আমি মূর্খ। লক্ষ লক্ষ ইট দিয়া ইমারত গড়ে। সেইখানে ইমারতের ইতিহাস হতে পারে একখানা ইটের কোনো ইতিহাস হয় না। যাই হোক আমি শুনলাম, না-না শুধু শুনলাম বলব না। আমি দেখছিও-সরকারি রাষ্ট্রযন্ত্র বুলডোজারের লাঙল আমাদের আবার বাস্তুহারা করব, ঠিক করছে। আইন-কানুন যতটা বুঝি দেশের জন্য দশের জন্য সরকার তো করতেই পারেন। নতুন ইতিহাস আমার বেলায় আর কী হইব? আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী তার ছেলে ও মেয়ে সহ আবার পথে বাহির হমু। আবার দুইটা একটা মরব। উটের ক্যারাভান বালির রাস্তা দিয়া ঠিক-ঠিকই পার হইয়া যাইবো। আমার এই খয়রাতি জমি এক কাঠার যা দাম তা ওই মানিক মিঞা সর্দাররে দিয়া দিয়েন। [চোখ মুছতে মুছতে চলে যায়।]

আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে শান্ত হয়ে বাঁধার কাব্য

অনেক দিন বাদে একখানি কবিতার বই আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে—সে হয়ে উঠেছে আমার সমস্ত নির্জন মুহূর্তের সঙ্গী। বইখানির নাম 'প্রতিমার প্রতি সনেটগুচ্ছ'—লেখক শংকর চক্রবর্তী। যথার্থ কবিতা হয়েই এগুলি প্রকৃত অর্থে সনেট। ভাবের বিস্তার ও সংহতির গূঢ় রহস্য সম্পূর্ণ অবহিত হতে গেলে কল্পনাকে কীভাবে মেলে ধরতে হয়, কীভাবে পরিশেষে তাকে ঘনত্ব দিতে হয়, শ্রীচক্রবর্তী কবিতার সেই কুহক সৃষ্টিতে নিবেদিত ব্রত এবং আমার বলতে দ্বিধা নেই তিনি তাতে সিদ্ধকাম। বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখতে গেলে প্রত্যেক সনেটই এখানে আপন আপন এককত্বে হৃদয়াভিরাম। তারপরে দ্বিতীয় পাঠে ধীরে ধীরে পৃথক একটা বোধ জায়মান হতে থাকে—আসলে সব কটি মিলে যেন একটি দীর্ঘ কবিতা। স্মৃতিতে, আবেগের সংযমে, শব্দের লক্ষ্যভেদী প্রয়োগে—বিন্যাসে ও আবেদনে অনবদ্য এই সনেটগুচ্ছ। প্রকৃতপক্ষে সনেটগুলির স্রষ্টা প্রতিমা—তিনি কবিকে যেভাবে আন্দোলিত করেছেন, স্পৃষ্ট কবি প্লাবিত হয়েছেন সেই ভাবতরঙ্গে। কিন্তু তিনি উচ্ছ্বাসকে বেঁধেছেন শান্ত লয়ে, বেদনাকে গাঢ় করেছেন সংযমে। আমি এই সনেটগুলিকে অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করেছি। কবিকে জানাচ্ছি নমস্কার, কেননা তাঁর সত্তার অবৈকল্য প্রতিটি সনেটে প্রতিফলিত।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিমার প্রতি সনেটগুচ্ছ।। শংকর চক্রবর্তী। ইন্দ্রুন। বাদামতলা রোড। কলকাতা-৫৮। ৩০ টাকা

একজন সাচ্চা মানুষের অনন্য জীবনচরিত

গত শতাব্দীতে সরকারি একটি পত্রিকা সম্পাদনার সুবাদে কয়েকজন প্রাজ্ঞ খ্যাতকীর্তি মানুষের বর্ণময় সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ ঘটেছিল। তাঁদের কাছে পত্রিকার জন্য লেখা চাইতে যেতাম। চারজন মানুষ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁদের কাছে কিছুক্ষণ থাকলেই মন ভালো হয়ে যেত। তাঁদের কথাবার্তায় এমন প্রশান্তি-স্নিগ্ধতা ছিল যা বিস্ময়কর, ব্যতিক্রমী। এঁরা হলেন চিন্মোহন সেহানবিশ, মহাদেব সাহা, গণেশ ঘোষ এবং গোপাল হালদার। আমার মতো একজন অকিঞ্চিৎকর মানুষকেও তাঁরা যে প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তা আমৃত্যু স্মরণে থাকবে।

রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে আমার অভিজ্ঞতা সুখকর নয়, শ্রদ্ধারও নয়। কিন্তু এই চারজন মানুষও তো প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে কেমন করে এমন স্পর্ধিত ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেন? এই প্রশ্ন একদিন অতি সংকোচে গোপাল হালদারকে করেছিলাম। খুব কম কথা বলতেন, হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, —আমি আপনাকে বেশি কিছু বলতে পারব না, কিই-বা জানি আমি, তবে এটুকু উপলব্ধি করেছি, মার্কসবাদী হওয়া খুব কঠিন নয়, বইপত্র পড়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনে আস্থা রেখেই তা হওয়া যায়, কিন্তু মার্কসবাদী যদি কমিউনিস্ট হওয়ার সাধনা না করেন তবে পূর্ণ মানুষ হওয়া পথে এগোতে পারবেন না। এ কথা বলেই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। এই সহজ কথার মধ্যে যে খুব সত্য লুকিয়ে রয়েছে, তা বোধহয় এইসব সাচ্চা মানুষই উচ্চারণ করতে পারেন। আজ আরও বেশি করে এই কথার তাৎপর্য অনুভব করতে পারছি।

গোপাল হালদারের মধ্যে যে প্রশান্তি-স্নিগ্ধতা দেখেছি তার উৎস কোথায় তা জানতে পারলাম এই সংকলিত গ্রন্থ থেকে। 'আমার ঈশ্বর' প্রবন্ধে উনি লিখেছেন —এই মমতা ছাড়া পৃথিবীতে কিছু সত্য নয়—মমতাই ঈশ্বর। মমতা, ভালবাসা, স্নেহ সৌন্দর্যবোধ আর সঙ্গীতের মর্মবাণী—বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্র্যময় রহস্য-অনুভূতি ছাড়া আবার ঈশ্বর কি? আমার ঈশ্বর ওইখানে।

মানসিক স্নিগ্ধতার উৎসের সন্ধান পেলাম।

সাম্প্রতিককালে সংকলিত প্রবন্ধ সংগ্রহ অনেক প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সুস্থ প্রবণতা খুবই ইতিবাচক। কিন্তু অধিকাংশ সংকলিত গ্রন্থই বড় অগোছালো, গৃহিণীপনার অভাব। সম্পাদনার কাজ খুব কঠিন। সুষ্ঠু সম্পাদনার পেছনে সৃষ্টিশীল মনন-চিন্তাভাবনা ক্রিয়াশীল থাকা জরুরি। 'প্রত্যহ নবীন' সংকলনের সম্পাদক আজহারউদ্দিন খান্ শুধু একজন প্রবীণ সংস্কৃতিসেবী নন, তিনি সম্পাদনায় অন্যতম যোগ্য ব্যক্তি। সে পরিচয় আমরা আগেও পেয়েছি। কিন্তু এই সংকলিত গ্রন্থের সম্পাদনায় যে উৎকর্ষ দেখতে পেলাম, তা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। এই মননশীল শ্রমসাধ্য সম্পাদনাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। শ্রদ্ধেয় খান্‌কে প্রণাম জানাই।

প্রয়াত গোপাল হালদার ছিলেন কর্মময় প্রতিভাবান বহুকর্মা নিরভিমান বিনম্রী সর্বজনশ্রদ্ধেয় নীরব মানুষ। তাঁর কর্মময় জীবনের সমস্ত উর্বর ক্ষেত্রকে একত্রিত করে, বহু গুণী মানুষের বিশ্লেষণে উপস্থাপিত সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় যেভাবে এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে তার পেছনে সম্পাদকের যে কী বিপুল পরিশ্রম ও মানবিক নিষ্ঠা রয়েছে তা সচেতন পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন। এমন ধরনের কাজ আরও কেন বেশি বেশি করে হচ্ছে না, এটাই আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের প্রশ্ন।

প্রয়াণের আগে গোপাল হালদার তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি রামমোহন লাইব্রেরিতে দান করেছিলেন। লোকসংস্কৃতি-বিষয়েও কিছু চিন্তাভাবনা তাঁর ছিল। সেসব পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখিয়েছিলেন অধ্যাপক সরোজমোহন মিত্র। সেগুলো প্রকাশের কোনও ব্যবস্থা করা যায় না? অপ্রাসঙ্গিক হলেও বিষয়টি জানিয়ে রাখলাম।

সম্পাদক গোপাল হালদার সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে নানা ভাগে বিন্যস্ত রেখেছেন। এটাই সুষ্ঠু সম্পাদনার পদ্ধতি। আত্মবীক্ষণ অংশে গোপাল হালদারের তিনটি লেখা, সাক্ষাৎকার এবং আজহারউদ্দিন খান, অমিয়ারাণী সিংহ, সৌরীন ভট্টাচার্যকে লিখিত কয়েকটি পত্র রয়েছে। গোপাল হালদারের 'আমার প্রসঙ্গে আমি', 'আমার ঈশ্বর' এবং 'কেন লিখি' এই ছোট তিনটি আত্মকথনে প্রাজ্ঞ মানুষটির জীবন-দর্শন, মানবতা, জীবন-বোধ ও হৃদয়ের প্রসার অনুভব করা যায়। কী আশ্চর্য স্বপ্ন ও প্রত্যয়—'জীবন চারিদিকে ছাপিয়ে উঠছে, লাফিয়ে উঠছে, গতির নেশায় পৃথিবী পাগল। আমি এই গতিছন্দ দেখতে চাই, বুঝতে চাই—আর বোঝাতেও চাই। এমন আশ্চর্য আর কিছু নেই। সংবাদ আসে আর দেখি—পৃথিবী প্রতি নিমেষে নতুন হচ্ছে, মানুষ নতুন হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। আর হচ্ছে কত সুন্দর, কত বিচিত্র, কত মহৎ। কিন্তু তাই নাকি মানুষকে হতে দেবে না থেমে-যাওয়া মানুষ, গতি-বিমুখ মানুষ, মানুষের শত্রু মানুষ। আমার সাংবাদিক মন বিদ্রোহ করে ওঠে; ঘটনাকে তুমি অস্বীকার করবে? মানুষ হতে পারবে না মানুষ? আমি যেন সংগ্রামের নিমন্ত্রণ পাই। আর আমি লিখতে বসি। কিন্তু কেন লিখি? জীবিকার দায়ে? জীবনের দায়িত্বে? মানুষের মমতায়? না, সংগ্রামের নেশায়?' (কেন লিখি)।

'ঘটনাকে তুমি অস্বীকার করবে?'—যে মহান মানুষ এই সত্য উচ্চারণ করতে পারেন তিনিই কমিউনিস্ট, তিনি মানবিক দর্শন প্রচারের যোগ্যতম প্রতিভূ। একুশ শতকের প্রথম দশকে আমাদের রাজ্যে ও ভারতে এই উচ্চারণ বড় প্রাসঙ্গিক,—আর এখানেই প্রাজ্ঞ মানুষের প্রশ্ন কালকে অতিক্রম করে চিরন্তন সত্যে উত্তীর্ণ হয়।

তারপরে গোপাল হালদারের ভাষা-বিষয়ে চিন্তাভাবনা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, মনীষী সমীক্ষা, সাহিত্য সমালোচনা, রস নিবন্ধ, কথাসাহিত্যের গল্প-উপন্যাস, ব্যক্তিত্ব, স্রষ্টা ও সৃষ্টি প্রভৃতি শিরোনামে গোপাল হালদারের একানব্বই বছরের জীবনচরিত গ্রথিত করেছেন সম্পাদক। সবশেষে এই মানবতাবাদী যুক্তিবাদী মাথা-নত-না-করা মনীষীর গ্রন্থপঞ্জি সংকলিত হয়েছে। যিনি বলতে পারেন 'আমি যা পছন্দ করি না—আমার সামনে আমার প্রশংসা' আর 'আমি বিশ্বাস করি মানবতা',—সেই মানুষটি বিশ শতকের দ্বিতীয়

বছরে ঢাকা বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করে নোয়াখালিতে বিদ্যালয়-শিক্ষা শেষে কলকাতার সারস্বত সমাজে অভিষিক্ত হয়ে যে দীর্ঘ জীবন লাভ করে অনন্য মানবিক কীর্তি রেখে গেলেন তার পূর্ণ পরিচয় পেলাম এই সংকলিত 'প্রত্যহ নবীন' গ্রন্থে। একই সঙ্গে বেদনারও সঞ্চার হয়,—আমাদের আশেপাশে তো পূজারি অনেক, কিন্তু পূজনীয় কোথায়? গোপাল হালদারের মতো সত্যিকারের পূজনীয়রা আজ বাঙালি সমাজে অন্তর্হিত। তর্ক করে কোনও লাভ নেই, এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করার তথ্যও আমাদের কারও হাতে নেই। আমাদের পরের প্রজন্ম, আমাদের ছেলেমেয়েরা বড় দুর্ভাগা। আমরা সৌভাগ্যবান, গোপাল হালদারের মতো মানুষদের সান্নিধ্যে এসেছি। এমন মানুষ ছিলেন আজকে এসব কথা কেউ বিশ্বাস করবে? তবে এই সংকলিত গ্রন্থ পড়লে তার অবশ্যই প্রত্যয় জন্মাবে।

তাঁর যে-কোনও প্রবন্ধ-গ্রন্থ-রসকথা-কথাসাহিত্য কিংবা সাংবাদিকতাধর্মী লেখা পড়লেই স্থিতধী মন ও মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—সিদ্ধিলাভের কাছাকাছি গেলে প্রেমের সহজ প্রাজ্ঞতা লাভ হয়, তখন মাত্রাবোধ আপনি ঘটে। গোপাল হালদারের এই ব্যক্তিত্বের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই সংকলিত গ্রন্থে।

'ভাষা' অংশের প্রথম প্রবন্ধটি গোপাল হালদারের—শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োগ। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞানের গভীরতা থাকলেই এমন সহজভাবে কঠিন বিষয়ের বিশ্লেষণ সম্ভব। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছেন, সাম্প্রতিক উচ্চশিক্ষায় (বি.এ) ভাষা ও সাহিত্য হিসেবে বাংলা ও ইংরেজি দুই-ই অশ্রদ্ধার বিষয়। সব মিলিয়ে বলা যায় সব ক্ষেত্রেই বাংলা থাকবে। প্রথম স্তরে বাংলার উপর নির্ভর করতে হবে। দ্বিতীয় স্তরে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি ব্যবহারিক প্রয়োজনে শিখতে হবে। আরো পরের স্তরে সংযোগকারী ভাষা ইংরেজির উপর নির্ভর করতেই হবে।

আজকের দিনে নানাবিধ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সদাব্যস্ত শিক্ষাবিদেরা কি গভীরভাবে এসব ভাবার সময় পান? পান না বলেই আমাদের ভাষাশিক্ষায় এত নৈরাজ্য।

আজহারউদ্দিন খান্ লিখেছেন 'ভাষাতাত্ত্বিক গোপাল হালদার।' পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুচিন্তিত প্রবন্ধ। গোপাল হালদারের জীবন ও সাহিত্যে মানুষ সম্পর্কে যে দার্শনিক বোধ তার পরিচয় দিয়ে লেখক ভাষাতত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। উপভাষা-আঞ্চলিক ভাষা, নোয়াখালির ভাষা, ব্যাকরণ রচনা, ভারতের ভাষা, সংস্কৃতি প্রসঙ্গে ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা প্রভৃতির বিস্তৃত তথ্য দিয়ে লেখক বলেছেন—মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদানের নীতিতে তিনি বিশ্বাসী। ইংরেজি শিক্ষা থাকবে কিন্তু তাই বলে যারা ইংরেজিতে কাঁচা তাদের শিক্ষা মাঝপথে রুদ্ধ করে দেয়া হবে—এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী নন।

বিজিতকুমার দত্তের 'ভাষার সমস্যা ও স্বরূপ', মৃণাল নাথের 'ভাষাচর্চায় গোপাল হালদার : কালের প্রেক্ষিত', এবং মণিরুজ্জমানের 'গোপাল হালদার : বাংলা উপভাষা-চর্চার অন্যতম পূর্বসূরী' প্রবন্ধ তিনটি উচ্চাঙ্গের গবেষণা-নিবন্ধ। ভাষাতত্ত্বের ছাত্ররাই এসব চিন্তার শরিক। আমার সে যোগ্যতা নেই। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এঁরা গোপাল হালদারের

ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় যে ইতিবাচক বিজ্ঞাননির্ভর মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে অনুভব করতে পারলাম গোপাল হালদার কত বড় মাপের ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন। তাঁর উপভাষা-চর্চায় হদিস পেয়ে বিস্মিত হয়েছি। কষ্ট হয়, বড় মাপের মানুষ সম্পর্কে কত কম জানি। মৃণাল নাথ কামতাপুরী উপভাষা বিষয়ে একটি রাজনৈতিক দলের মানসিকতার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা তথ্যনির্ভর ও সমাজবিজ্ঞান নির্ভর।

'সংস্কৃতি' অংশে দশজন প্রাজ্ঞ মানুষের অসাধারণ দশটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রত্যেকেই সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সুপরিচিত। এঁরা গোপাল হালদারের সংস্কৃতি-চিন্তা, তাঁর দৃষ্টিতে উনিশ শতকের নবজাগরণ, জাতীয়তাবাদের সন্ধানে, সংস্কৃতির রাজনীতি, মার্কসবাদী সংস্কৃতি বিচিন্তা, বড়ো আমির তপস্যা, তাঁর সংস্কৃতি-ভাবনা থেকে মানব-ভাবনায় উত্তরণ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অমিয় দেব, অভ্র ঘোষ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আহমেদ হুমায়ুন, তরুণ সান্যাল, জ্যোতির্ময় ঘোষ, বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, অসিত দত্ত, আবদুর রউফ, প্রভাত মিশ্র প্রমুখের বিশ্লেষণ শুধুমাত্র গোপাল হালদারের সংস্কৃতি-ভাবনা সম্পর্কেই অনন্য বিশ্লেষণ নয়, পাঠকবৃন্দ নিঃসন্দেহে মননের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ হবেন। আজকের সাংবাদিকতা-ধর্মী প্রবন্ধের সাম্রাজ্যে এই প্রবন্ধগুলো বিরল ব্যতিক্রম।

ইতিহাস-বোধ যাঁর নেই তিনি মহৎ সত্যদ্রষ্টা মানুষ হতে পারেন না। গোপাল হালদার মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হওয়ার কারণেই ছিলেন বেশি ইতিহাস সচেতন। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ইংরেজী সাহিত্যের রূপরেখা, রুশ সাহিত্যের রূপরেখা প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকেরা তাঁর ব্যাপ্ত ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। মাহমুদ শাহ কোরেশী, শঙ্করপ্রসাদ সিংহ, দুলাল আচার্য ও মীরাতুন নাহার যেভাবে তাঁর সাহিত্যের ইতিহাস-চেতনার অ্যাকাডেমিক সমৃদ্ধ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন তা গোপাল হালদারের মানবিক-সমাজতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞাননির্ভর মানসিকতায় পরিচয় জানতে সহায়ক হয়েছে।

গোপাল হালদার বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে যে স্বতন্ত্রভাবে ব্যতিক্রমী ভাবনায় উদ্দীপিত হয়েছিলেন তার পরিচয় বিধৃত রয়েছে 'মনীষী সমীক্ষা' অংশের অশোক পাল অরুণকুমার বসু ও সুদিন চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে। পশ্চিমবঙ্গ সাক্ষরতা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম রচনাবলির ভূমিকায় গোপাল হালদার এঁদের যে সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা লিখেছেন তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে রইবে। অরুণকুমার বসুর প্রবন্ধ 'গোপাল হালদারের রবীন্দ্রনাথ : সংশয় থেকে প্রত্যয়' অসাধারণ বিশ্লেষণী। মনে পড়ে শ্রীবসুর উক্তি,—রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব পালনে বামপন্থী সংস্কৃতি-কর্মীদের পক্ষে যে বিপুল সমারোহ ঘটেছিল, তার মূল চালিকাশক্তি ছিল তাঁরই হাতে। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাম উগ্রপন্থা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে নতুন প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার নেপথ্যে গোপাল হালদারের ভূমিকাকে আজ স্বীকৃতি জানাতেই হবে।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও জানাই, সোভিয়েত দেশ পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক, এককালে 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রয়াত রবীন্দ্র মজুমদারের মুখে শুনেছি, শান্ত

ভদ্র-স্বভাবের সৌজন্যবাদী যুক্তিবাদী অনন্য প্রাজ্ঞ মানুষ গোপাল হালদার কমিউনিস্ট পার্টির ভ্রমাত্মক রবীন্দ্র-বিরোধিতার সপক্ষে সেইকালেও প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন। তাঁর মতো মানুষ অনৈতিক তঞ্চকতাপূর্ণ সুবিধাবাদী তাৎক্ষণিক উত্তেজনার ব্রতী উগ্রপন্থাকে সমর্থন করবেন কেমন করে। এ কথা আমি চিন্মোহন সোহানবিশ এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মুখেও শুনেছি। তাই উগ্র বামপন্থার পাপ স্খালনের জন্য রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য গোপাল হালদার এত তৎপর হয়েছিলেন। বিপ্লবীয়ানা দেখিয়ে 'সংশোধনবাদীদের' বিচ্ছিন্ন একঘরে করার সুবিধাবাদ যে পর্যুদস্ত হয় তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সত্য- প্রকাশে ভারতীয়দের এত দ্বিধা কেন? সত্য কখনও ছাইচাপা থাকে না।

গোপাল হালদার ছিলেন নামী সাহিত্য-সমালোচক। এই অংশে আলোচনা করেছেন সরোজমোহন মিত্র ও ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধ দুটি বড়ই গতানুগতিক। বৈদগ্ধ্য-কম। অবশ্য তথ্যভিত্তিক।

যে মানুষটি 'সংস্কৃতির রূপান্তর', 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ', 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' লিখেছেন তিনিই লিখেছেন 'আড্ডা' 'বাজে লেখা', 'স্বপ্ন ও সত্য', 'বনচাঁড়ালের কড়চা'— এ কথা ভাবতে বড় বিস্ময় জাগে। মানবিক বোধ সক্রিয় ছিল বলেই, ভারতীয় স্নিগ্ধতা ও জীবনবোধ ছিল বলেই গোপাল হালদার এসব রসরচনা লিখতে পেরেছিলেন। জীবনের সহজ আনন্দবোধ থেকেই এই রসবোধের উৎসার। 'গোপাল হালদারের আড্ডা' বিষয়ে শ্রীমতী অপর্ণা ধরের প্রবন্ধটিতে তাঁর মনের স্নিগ্ধতা, আড্ডা-রসিক মানসিকতা, আড্ডার সঙ্গে ভোজনরসিকতা মিলে একটি রসঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

কথাসাহিত্য অর্থাৎ ছোটগল্প উপন্যাস অংশটি খুবই সমৃদ্ধ। লিখেছেন বাংলার অনেক গুণীজন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অরুণা হালদার গোপিকানাথ রায়চৌধুরী রামজীবন আচার্য সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় চার্বাক সেন বিষ্ণু বসু শ্রীমতী বিনতা রায়চৌধুরী প্রমুখ, যাঁরা দীর্ঘ কাল ধরে কথাসাহিত্যের চর্চা করে আসছেন। গোপাল হালদারের ছোটগল্প-উপন্যাসে বৈপ্লবিক আন্দোলন, মননপ্রধান জীবনজিজ্ঞাসা, শিল্পকলা-অন্বীক্ষা, সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনযন্ত্রণা, শিল্পীসত্তা, মন্বন্তরের ভাবনা, স্ট্রিম অব কনসাসনেস প্রভৃতি বিষয়ে মননশীল আলোচনা করেছেন। অধিকাংশই অ্যাকাডেমিক বিশ্লেষণ কিন্তু প্রকাশের ভঙ্গিতে এমন সুষমা আছে যে আমার মতো অতি-সাধারণ পাঠককেও মুগ্ধ হতে হয়, বোধগম্যতায় কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হতে হয় না। এটাই তো প্রবন্ধ-রচনার প্রসাদগুণ।

'ব্যক্তিত্ব' অংশে মানুষ, গবেষক, বহুমুখী প্রতিভাধর, জীবনদৃষ্টির শিল্পী, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে অনন্য, মুক্তচিন্তার ঐতিহ্যবাহী ধারক গোপাল হালদারের পরিচয় বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন আনিসুজ্জামান অমিয় ধর শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় অনুনয় চট্টোপাধ্যায় শান্তনু কায়সার গৌর পাল সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও মণীন্দ্র ঘটক। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'গোপাল হালদার চে গুয়েভারা ও মানুষের মুক্তি' প্রবন্ধে যেসব বিভিন্ন মানসিকতার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে তা বিস্ময়কর হলেও কিছুটা আরোপিত ভাবনা বলে মনে হয়।

এই বিভাগের সব লেখার মধ্যে গোপাল হালদারের মানবিকতাবোধ ও সাধারণ হাট-বাটের খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ সকলেই স্বীকার করেছেন। নানা দিক থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করলেও তাঁর মূল লক্ষ্য যে সাধারণ মানুষের মঙ্গলচিন্তা তা সকলেই প্রকাশ করেছেন। সিদ্ধান্ত যখন সকলের মিলে যায় সেখানে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

'স্রষ্টা ও সৃষ্টি' অংশে গোপাল হালদারের জীবনপঞ্জি, গ্রন্থপঞ্জি ও মেদিনীপুরের অভিনন্দন বিধৃত রয়েছে। জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি। আমাদের সাম্প্রতিক মানসিকতায় গোপাল হালদারের মতো প্রতিবাদী জীবনবাদী সংস্কারমুক্ত মানবপ্রেমিক প্রাজ্ঞ গবেষকের স্মৃতি ফিকে হয়ে আসছে। এসব মানুষের সচেতন সাংস্কৃতিক উপস্থিতি সাম্প্রতিক ভ্রষ্টাচারের আবহে বড় বিপজ্জনক। ইনি আমাদের চেতনার মূলে এমন করাঘাত করতে পারেন যাতে আমাদের মধ্যবিত্তসুলভ ভণ্ডকতা ও সুযোগসন্ধানী জীবনাচরণ নগ্ন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা শেষ পর্যন্ত পরাভূত হয়। জয়ী হয় মানবিক উদারতা। সেই মানবিক উদারতার পথ দেখিয়েছেন প্রয়াত গোপাল হালদার। তাঁকে ও তাঁর লেখাকে ভুললে আমরা গভীর সংকটে পড়ব। সংকটে পড়বার ইংগিত ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে।

সংকলক আজহারউদ্দিন খান সামাজিক মানুষ হিসেবে এক মহান কর্তব্য সম্পাদন করেছেন 'প্রত্যহ নবীন' সম্পাদনা করে। তাঁকে প্রণাম।

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

প্রত্যহ নবীন : গোপাল হালদার জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ
সম্পাদনা : আজহারউদ্দিন খান্। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি। কর্নেলগোলা, মেদিনীপুর শহর। দাম ২৫০ টাকা

অনিলের গল্পের ভুবন

সারা বিশ্বেই গল্প নিয়ে এই মুহূর্তে নতুন একরকম ভাবনাচিন্তা চলছে। আমরা যারা মার্কেজ ভক্ত তারাও শুনে একটু থমকে যাই যখন হালফিলের এক লাতিন আমেরিকান লেখককে এদেশে এসে বলতে শুনি, তারা এখন মার্কেজের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। ফলে গল্প-উপন্যাসের আখ্যান ও শৈলি তাঁদের বদলে যাচ্ছে। এ কেবল লাতিন আমেরিকাতেই নয়, ইউরোপ-আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশেও শোনা যাচ্ছে এমন পরিবর্তনের ইঙ্গিত। ফলে চাক্ষুষ বাস্তবতাকে কেউ কেউ ধরছেন ভিন্ন এক রীতিতে, কোনো কোনো গল্পে এসেছে শুধুই রিপোর্তাজ, কেউ বা কাহিনি ও না-কাহিনির মাঝে গিয়ে গল্পের আখ্যানে তৈরি করেছেন নিজস্ব এক মনোলাপে। এবং সেই সঙ্গে ঘুরে ফিরে থাকছে ই-মেল, ইন্টারনেট, চ্যাটিং থেকে প্রযুক্তির নানান সম্ভারসহ সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীদমন, জাতিসত্তার অবনমন থেকে বাজার অর্থনীতির নানা খুঁটিনাটি। ফলে একুশ শতকের গল্পের আখ্যানসহ তার কাঠামোটাই যাচ্ছে বদলে। আর তার ঢেউ এসে আমাদের এখানে আছড়ে পড়লেও বাংলা গল্পে এখনও তার ধাক্কাটা লাগেনি সেভাবে। এবং কতিপয় লেখক ছাড়া এ-ঢেউ অন্যান্যরা প্রত্যক্ষ করেছেন বা করছেন বলেও মনে হয় না। কিন্তু যাঁরা করছেন বা করে চলেছেন গল্পকার অনিল ঘোষ নিশ্চয়ই তাঁদেরই একজন। অন্তত দু-তিন বছরের ব্যবধানে সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর দু-দুটি গল্পগ্রন্থ 'প্রহ্লাদের উত্তরপুরুষ' এবং 'চারাগাছ ও অন্যান্য গল্প' পড়ে সেরকমই মনে হয়েছে।

অনিল ঘোষের গল্পের সঙ্গে আমার পরিচয় গত দুই দশকের সময়সীমায়। কম লেখার কারণে মাঝেমাঝে পাইনি অনিলকে কিন্তু যখন আবার পেয়েছি তখনই সে স্বমহিমায়। এভাবেই গত পনেরো-কুড়ি বছরে অনিলের অনেক গল্পই আমার পঠিত গল্পের তালিকায়। এবং এই বিস্তীর্ণ সময়কাল ধরে অনিল যে সমস্ত গল্প লিখেছেন সেগুলিতে তাঁর চেনাজগতেরই ছবি এসে পড়েছে। এই ছবি উত্তর চব্বিশ-পরগনা জেলার ইছামতী ও বিদ্যাধরী নদী উপকূলবর্তী সুবিস্তীর্ণ জনপদের মানুষজনেরই ছবি। এইসব মানুষের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান, মুখের ভাষা, স্বপ্ন ও সংগ্রামই অনিলের গল্পের আখ্যান হয়ে উঠেছে। অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার বসিরহাটে অনিলের জন্ম। ফলে এখনও সেখানে থাকার সুবাদে অনিলের লেখায় যে এ-জীবনই চলে আসবে তাতে কোনো সন্দেহই ছিল না, কিন্তু যে কথাটা বলার দুই নদীর উপকূলবর্তী মানুষজন পরিবর্তন ও সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেঁচে থাকার জন্য এইসব মানুষদের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে অনিল ধরেছেন একজন সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে।

দুটি গল্পগ্রন্থে মোট ১৮টি গল্প সংকলিত হয়েছে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ১৯৯১ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে গল্পগুলি প্রকাশিত। এবং ১৯৯১ সালে প্রকাশিত গল্পে (চারাগাছ) অনিল যে ব্যক্তিক অনুভূতির জায়গাটা আবিষ্কার করেছিলেন ২০০৫ সালে এসে সেই ব্যক্তিক অনুভূতিই একটা সমষ্টিগত চেহারা নেয়। ফলে 'পারানি' গল্পে অনিল

অনেক পরিণত। সমাজের একটা বাস্তব সমস্যা মূর্ত হয়ে ওঠে এই গল্পে। 'আয়নার কপাল জুড়ে ঘামের ফোঁটাগুলো গড়াতে শুরু করে। মাথাও ভারভার ঠেকে। এর থেকে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও বোধহয় এতটা দুশ্চিন্তা হত না। খাওয়ার জন্য জল, তারও আকাল। তারও টানাটানি। ভাতের টান, কাপড়ের টান, পয়সার টান—টানাটানির সংসারে এসব আর টান বলে মনে হয় না। কিন্তু জলের টান বললে লোকে হাসবে না। লোকের কথা বলে কী হবে? আয়নার নিজেরও তো হাসি পায়।'

আসলে এ-গল্পে আয়না যে গ্রামে থাকে সেই উলার চক গ্রামের জলে আর্সেনিক। 'ও জলে নাকি বিষ। পেটে গেলে হাতে-পায়ে ঘা হবে। মাংস খসে খসে পড়বে। ওই বিষের নাম আর্সেনিক। বৃষ্টির জলে যা চাষবাস হয়, বাকি সময় উলার চক যেন টুটাফাটা খরার মাঠ। গোটা তিন-চার ডোবা, পুকুর যা আছে ওই নামেই। বৃষ্টির সময় জল। বৃষ্টি ফুরোল, জল শুকোল।' অতঃপর জল খেতে গেলে যেতে হবে সুন্দরপুর। তাও কি কলসি পিছু পঞ্চাশ পয়সা। কেননা উলার চক ও সুন্দরপুরের মাঝে একটি নদী আছে। ডাঁসা। অতএব পারানির পয়সা লাগবে পঞ্চাশ করে। অর্থাৎ কলসিপিছু সেই পঞ্চাশ। অগত্যা আয়নাকেই যেতে হয়। আর সেই সুযোগই নেয় রসিক। ফলে আয়নাকে হতে হয় তার শিকার।

'জলযাত্রা' এ-রকমই আর একটি গল্প। সাতসাতটি নারী। সংসারে পুরুষগুলোর অত্যাচারে ঘর ছাড়তে চায় তারা চিরকালের মতো। তীব্র এক প্রতিবাদ জানিয়ে। ভেবেছিল তারা পুরুষগুলোকে শিক্ষা দেবে। তাই যে যার ঘর ছাড়ে চিরকালের মতো। কিন্তু ছেড়ে বেরিয়ে এলেও ঘরের ভাবনাকে কিছুতেই ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে না। 'টিকিয়ে টিকিয়ে এগোয়, অস্বস্তি তবু পিছু ছাড়ে না। মনটা বারবার ফিরে যেতে চায় হরিণমারি, ওদের ঘরসংসারে।'

সাতসাতটি নারী। একজন তারই মধ্যে সন্তানসম্ভবা। রাবেয়াকে তাই ছয়-নারী বারণ করে আসতে তাদের সঙ্গে। কিন্তু '...এই অবস্থায় ওর স্বামী কেরামত আলি ওর পেটে লাথি মেরেছিল। সেই নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি গেছে ক-দিন। না-হওয়া বাচ্চাটা নিয়ে রাবেরা ছটফট করে বেড়িয়েছে। যাকে পেয়েছে, তাকেই জিজ্ঞেস করেছে, দ্যাখ তো বেঁচে আছে কিনা।' অতএব প্রতিবাদী হয়ে রাবেয়াও হয়েছিল তাদের সঙ্গী। কিন্তু জলযাত্রায় নৌকায় বেশ খানিকটা পথ পাড়ি দেওয়ার পর প্রসব বেদনা ওঠে রাবেয়ার। ফলে সন্তানের জন্মের আশায় রাবেরা আকুল হয়ে আবার সংসারেই ফিরতে চায়। তখন রাবেয়ার কথা বিবেচনা করে ও অনাগত সন্তানের ভাবনায় তারা আবার জলযাত্রার দিক পরিবর্তন করে। নৌকার মুখ ঘোরায় হরিণমারির দিকে। যে যার সংসারে। কেননা মানবজনম, জন্ম নেবে সংসারেই। হোক না সেখানে অভাব-অনটন আর দারিদ্র্যের অন্ধকার। থাক না সেখানে অত্যাচার। দারিদ্র আর অত্যাচারের জবাব লড়াই করেই দেবে তারা। এবং সংসারে থেকেই। রাবেয়ার অনাগত সন্তান যেন সেই শিক্ষাই দিল তাদের। ফলে যে অত্যাচারে তারা হয়েছিল ঘরছাড়া, এখন তারা আবার ঘরেই ফিরছে তীব্র এক প্রতিবাদ

হাতে নিয়ে। কেননা গেলেই তো পালানো হল। অতএব পালানো নয়। লড়াই চলবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তার মাঝখানে শুধু একটা জন্মের অপেক্ষা। যে অপেক্ষায় 'পাটাতনে শুয়ে সাত নারী তখন ভাবছে, সামনের পথ আর কত, কত দূরে হরিণমারি?'

অসাধারণ গল্প। 'চারাগাছ ও অন্যান্য গল্প'-এর আর একটি গল্প 'দ্বৈত চরিত্র'। এ গল্পে রাজনীতির প্রেক্ষাপট একটা থাকলেও এটি একজন ব্যক্তি মানুষেরই দ্বন্দ্বের গল্প। এবং দ্বন্দ্ব থেকে উত্তরণ ঘটে তার। তবে অনিলের এখনও পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ গল্প, অন্তত আমার যা মনে হয় 'মহিষ সংক্রান্ত একটি অ-প্রাচীন গল্প'। এই গল্পে একটি মিথকে ব্যবহার করে আবার তাকেই ভাঙা হয়েছে। গল্পটা আসলে পীরু সর্দারের। খাসমহলের পীরু সর্দার। আবার তার গল্পও নয় এটি। আসলে 'সুন্দরবনের গাঁ-ঘেষা এইসব অঞ্চলের পথে ঘাটে, হাটেমাঠে, নোনা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে অজস্র গল্পকথা। গল্পগুলো স্বভাব দার্শনিক এইসব বিষ্ণুশর্মাদের মুখোমুখি ফেরে, ডালপালা মেলতে থাকে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে মাথা না ঘামালে ওদের আশ্চর্য বর্ণনার হাত ধরে পৌঁছে যাওয়া যায় বিচিত্র সব জগতে। সেখানে হয়তো দিনের বেলায় আকাশে তারা ফুটফুট করতে পারে। তালগাছ বেয়ে গরু নামতে পারে সরসর করে। মানে-টানে নিয়ে কথা বললে এমন তেড়ে উঠবে, অন্তরাত্মা চমকে উঠলেও অবাক হওয়ার নেই। হয়তো বলে বসবে, শউরের মানুষ তো, কত আর হবে!' পীরু সর্দার এদেরই একজন। ফলে মিথ তৈরি হচ্ছে বা তৈরি করছে যখন পীরু সর্দার, তখন আবার পৃথিবীতে কত ঘটনাই না ঘটে যাচ্ছে। গ্যাট চুক্তি, স্যাটেলাইট টিভি, বার্লিন প্রাচীর কিংবা রাশিয়ার পালাবদলের মতো ঘটনা। কিন্তু পীরু সর্দারদের মিথ তৈরিতে তাতে কোনো অসুবিধে নেই। ফলে পীরু দেখে বা দেখতে চায় কালের চাকার শেষ আর লেখক তাতে যোগ করেন এক নতুন ইতিহাসের মাত্রা।

'রাস্তা' গল্পটি 'প্রহ্লাদের উত্তরপুরুষ গল্প'-এর আর একটি ইঙ্গিতবহুল গল্প। যে রাস্তা আজকের নতুন একটি পথের সন্ধান দিয়ে নতুন এক দিগন্ত উন্মোচন করেছেন অনিল। একটু উল্লেখ না করে পারছি না। 'সামনে অসম্পূর্ণ রাস্তা। এই রাস্তার একটি গল্প আছে। গল্পটি লিখবে বরেন বিশ্বাস, কুমারডাঙা ব্লকের ই.ও.পি অর্থাৎ এক্সটেনশন অফিসার অব্ পঞ্চায়েত। গল্পটি ওর লেখার কথা নয়। কীভাবে লিখবে সে-ও এক গল্প।...'

এই গল্পের কথাই রাস্তা। অনিল এই রাস্তার গল্পই শুনিয়েছেন আমাদের বা বলা যায় অনিলের গল্পই যেন শোনার জন্য তৈরি হয়ে যাচ্ছে পাঠক। তবে একটাই কথা, এবার অনিলকে আবার ভাঙতে হবে, না হলে তাঁর নিজস্ব ভূমি ক্রমশ একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হতে পারে—যা একজন সম্ভাবনাময় লেখকের কাম্য নয়।

শচীন দাশ

প্রহ্লাদের উত্তরপুরুষ।। লোক। সোনারপুর। ৩০ টাকা
চারাগাছ ও অন্যান্য গল্প।। দ্বাভাষ্কর। কল-৪০। ৮০ টাকা

নতুন আঙ্গিকে মন ছোঁয়া কবিতা

বছর দুই-আগে কবি অমিতাভ চক্রবর্তী তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন 'মন্থন' প্রকাশ করে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আমাদের চমৎকৃত করেছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় কবিতা সংকলন "ভাটাশেষে জলস্রোতে" এককথায় অসাধারণ রচনা। মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজদায়বদ্ধতার এটি একটি অমূল্য দলিল। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাবে লিখিত সবার বোধগম্য ১৫টি কবিতার এই সংকলনের ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে বর্ণিত ঘটনাগুলির অধিকাংশই বাস্তব জীবনের চালচিত্র। যথেষ্ট পরিশীলিত এই সংকলনে অমিতাভ আরো অনেক পরিণত।

ঘটনাভিত্তিক নির্মাণের জন্য কবিতাগুলি বড়মাপের। দশধাপের প্রথম দীর্ঘ কবিতা "ভাটাশেষে জলস্রোত" দিয়েই সংকলনটির নামকরণ হয়েছে। দুই বিপরীতধর্মী প্রথমে কিশোর-কিশোরী পরে যুবক-যুবতী শমিত-শাকিলার প্রেম আখ্যানের যে মুন্সীয়ানায় তিনি ছবি এঁকেছেন তাতে তিনি তাঁর জাত চিনিয়েছেন। কলিমনে কবিকল্পনায় আঁকা সব প্রতিকৃতি/সুখ স্বপ্ন আশা ফুল হয়ে ফুটবার আগে/জেরবার হয়ে গেছে বিধ্বস্ত সৌধের মতো/হঠাৎ জীবনে—বিনা নোটিশেই বজ্রপাতে, যেখানে সকাল হত ঘুম চোখে আজানের ডাকে/প্রাণভরে শোনা যেত মিশেল সরস কূজন/গোবরের ছড়া দিয়ে মেয়েরা নিকোত উঠোন, জান বাজী রেখে মাথা তুলে মর্যাদায় বাঁচে/দিন আনি দিন খাই পাড়াগাঁর সরল মানুষ, বাঙালীর বারোমাস ভরা থাকে তেরো পার্বণে/নিজধর্ম পালনের সাথে যার যেইমতো লোকাচার/ধর্ম ডিঙিয়ে ওলাবিবি থানে হয়ে একাকার, তিল তিল কোরে মমত্বের 'পরে গড়া ভিত/দৃঢ় করে সমাজ বন্ধন প্রতিবেশ আগাপাস্তলা/অতীতকে পিছে ফেলে বর্তমান রিলে রেসে ছোটে/শনৈঃ শনৈঃ সময়ের সাথে কাল থেকে কালে, তারপর অনুভবে রসেবশে যেমনটা হয়/শকিলা শমিতে মন দেয়া-নেয়া তেমন কোরেই, জ্বলন্ত বয়সের স্বপ্নবিলাসী দুই যুবক-যুবতী/ছকবাঁধা ধর্মের গণ্ডী পেরিয়ে মানবধর্ম মেনে চলে, নিষেধের ঘেরাটোপে ছটফটে সুরে গাওয়া পাখি/খাঁচার বাঁধনে পড়ে জড়তার মাথা খুঁড়ে মরে, এমনি কোরেই আদিম মনের কিছু মানুষের বিষে/স্থান থেকে স্থানে কাল থেকে কালে এখানে-সেখানে /চুরমার হয়ে গেছে কত মানুষের স্বপ্নসাধ/তার সাক্ষী হয়ে আছে চাঁদ সূর্য তারা ও আকাশ, সব জাত ধর্ম আদানে-প্রদানে মিলেমিশে থাকে/সাবলীলভাবে ঈদ পুজো নানান পরবে/মানুষেরা বাঁচে মানবিকভাবে সম্প্রীতির সাথে, শাকিলা এখন স্বপ্নসাধ ঘোচা এক চলন্ত মেশিন/পরিজন সামলানো ঝলকানো মেঘে ঢাকা তারা, নিংড়ানো শ্রমে ধ্বস্ত শরীরকে টেনে চলে ঘোরে/ যেমনিভাবেই দিকে দিকে রোজগেরে মেয়েরা/ঘানি টানে নিজ সংসারের জীবিকার সাথে, ঘরের কাজের ফাঁকে পুরোদমে নিশ্বাস নিতে/বাইরে বেরিয়ে আসে সাঁঝের আকাশকে দেখে/এমন আকাশ যাকে খোলামনে প্রশ্ন করা যায়/সব সমস্যার সব সংকটের—কিছু না গোপন রেখে, কিছুকাল আগে এখানে জোয়ার এসেছিল/জাগরিত শ্রমিকের দুনিয়া কাঁপানো কলরবে/মেটিয়াবুরুজ—আরো কিছু দূরে

বজবজে/ইটভাটা তেলকল চটকল সুতাকলে, কপপ্রভা পদাতিক তৃষিত ঝড়ের এই পাখি/একদিকে—অন্যদিকে বহড়ুর ভাবের মাতাল/কিন্তু তালে ঠিক—বাংলার মানুষের অনুভবী কবি/যাকে নিয়ে অহংকারী আপামর কবিতা মহল, তবে টি ভি-র দৌলতে দ্যাখা বিশ্বায়নী ছলাকলা/ সন্ত্রাসের ধুয়ো তুলে নির্বিচারে নরমেধ/স্বঘোষিত ফতোয়ায় যেখানে-সেখানে হানাদারি/ এইসব রক্তচোষাদের ওরা দুপাভরে দ্যাখে, তাই একদিকে বহড়ুতে আকাশ সাক্ষী রেখে/ দরদী শাকিলা-মনে পোষা চাপা অভিলাষ/লায়লার মতো হৃদয় উজাড় কোরে ঈথারে ভাসায়/জানেমন মজনুর কাছে—তার শুভ চেয়ে/গোধূলিবেলায় মেটিয়াবুরুজে মাউথ অর্গানে/সুরের সিম্ফনি তুলে আনমনা আহত শমিত/স্থির চোখে নীলিমার নিচে উড়ন্ত পাখিদের দ্যাখে, জীবনের যাত্রাপথে ধেয়ে আসা আকস্মিক ঝড়ে/আলুথালু হয়ে যাওয়া যৌবনের রোমাঞ্চিত স্মৃতি/পথ খুঁজে পেতে চায় নিরালায় কাছাকাছি হতে/অঙ্গীকার মনে রেখে—নীড়বাঁধা সুখী জীবনের, বিপন্ন মানুষের জীবনের শুরু থেকে শেষ/ফুলে মোড়া নয় সংগ্রামের কঠিন বাস্তব, এভাবেই ঘাত-প্রতিঘাতে সামনে এগনো/অভাবেই উজান ঠেলিয়ে অভিমুখে চলা/জীবনের বিচিত্র বাঁকে আজানকে জেনে-নিয়ে/কাল থেকে কালে মানুষের উত্তরণে ঋদ্ধ ইতিহাস, চলে স্মৃতি রোমন্থন অফুরান ঝরনার মতো/একজন বলে অন্যজন শোনে গত পদাবলী/অক্টোপাস ভেদ কোরে আসা বেজমা-বেজমী/ঠিক করে সাত তাড়াতাড়ি ঘর বাঁধবার, মাঝেমাঝে ধর্ম শেয়ালের ডাক শোনা গেলে/কান খাড়া রাখে লাঠি হাতে শেয়াল তাড়াতে/শত উস্কানিকে পিষে তাই দেশ টিকে থাকে/কুচুটের জিঘাংসাকে ছাইচাপা দিয়ে, এবার নতুন কোরে আশার পাখায় উড়ে যাওয়া/আশপাশ বুঝে মেপে মেপে পা ফেলে চলা/পরস্পরে বিশ্বাস রেখে আগামীকে দ্যাখা/এভাবেই ছাঁচে ঢালা চিরন্তন সংসার বন্ধন, সেই পৃথিবীতে মুক্তমনের দুই প্রেমাসক্ত জন/বহড়ুতে নিজ নিজ ভিতে যোগাযোগ রেখে/ভাটাশেষে জলস্রোতে পালতুলে সাম্পান ভাসায়

এমন ধরনের শব্দচয়ন, বিন্যাস, ছন্দ ও কাব্যগুণ নির্দ্বিধায় বলা যায় যে-কোনো পাঠককে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টান টান কোরে ধরে রাখবে। দ্বিতীয় কবিতা "তিলোত্তমা নায়েগ্রা" গঠনশৈলী ও ভাষার মাধুর্যে নায়েগ্রা না দেখা পাঠককুলের সামনে তার এক জীবন্ত প্রতিরূপ উন্মোচিত করে। যদিও এখানে তার মন্তব্য "এমন কান্তি যে না দ্যাখে/ ভাষা নেই কোনো—তাকে বোঝানোর"। হৃদয় উদ্বেলিত করার মতো বর্ণন, "উন্মাদনা নিয়ে পৌঁছুই/মর্তের স্বর্গ—নায়েগ্রা ফল্‌সে/বাহারি রঙের ঝলকে খোলতাই/কালজয়ী কোনো শিল্পীর/নিপুণ তুলির আঁচড়ে/দেখি একাগ্র মননের/গর্বভরা প্রসূত নির্যাস/জীবন সার্থক যাকে দেখে/লিওনার্দোর লা-জবাব মোনালিসা", নায়েগ্রার জলে অসংখ্য কবিতা/কথা বলে—রূপকথা ভাষা খুঁজে পায়/সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীরা/মূর্ছনায় সাত সুর সেধে/জলখেলা করে অনায়াসে, এমন সম্পদ যে না দেখে/সেখানে শাসককুলে এত নরাধম?/আদিমের মতো নির্মম?/ভোগদখলের নীতি নিয়ে/ছলে বলে কৌশলে/পৃথিবীকে তাঁবে রাখে?/হানাদার সেজে/দুনিয়ার দেশে দেশে/নির্বিচারে নরমেধ করে? তৃতীয় কবিতা "খাঁটি ভগবান"-

এ অমিতাভ মোহান্ধ মানুষদের অর্ন্তদৃষ্টি উন্মোচিত করে আলোয় ফেরানোর এক নিখাদ প্রচেষ্টা। এখানে তাঁর অকপট ঘোষণা "মানুষের টান ছাড়া/মন্দির দেব-দেবী সাধু এইসবে/আমার কোনোভাবে টান নেই। সত্যদ্রষ্টা বাস্তববাদী সাধুর সার্বজনীন উক্তি "ভাগ্যফল নয় কর্মফলই সব/ভগবান থাকে মানুষেরই মাঝে/সেরা কাজ মানুষের সেবা/এর 'পরে অন্য কিছু নেই/হস্তরেখা ললাটের লেখা ভিত্তিহীন"—ঠিক যেন মহাজ্ঞানীদের চিরন্তন উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। চতুর্থ কবিতা "ফুল হয়ে ফুটবার আগে" আমাদের এক তীক্ষ্ণ আত্মদহনে বিদ্ধ করে যখন লেখা হয় "জন্মতক হেজে হেজে/জিয়ানো মরার মতো/তীথু বেঁচেছিল উপেক্ষায়/বনে-জঙ্গলে চোখের আড়ালে/ বা অন্য কোনোখানে নয়/চোখওয়ালা মানুষেরই মাঝে"। পঞ্চম কবিতা "বিশ্বায়নী গোলক-ধাঁধায়"-তে উপসংহার "অবস্থার চাপে ওরা তাই/সস্তা আনাজেতে রপ্ত হয়/ মেছুয়া চানুর ঘরে হালে/বিলকুল মাছ ঢোকে না" নির্মম সত্যকে তুলে ধরে। ষষ্ঠ কবিতা "পৃথিবী সুন্দর"-এ এক মেহনতী ট্যাক্সিচালক নিতাইয়ের সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের এক মর্মস্পর্শী কাহিনী শেষ হয় এক প্রত্যয়ী ইতিবাচক সুরে "নিতাইয়েরা আছে—তাই শত অনাচার সয়ে/কালিমাকে দুয়ো দিয়ে—পৃথিবী এখনো সুন্দর"। সপ্তম কবিতা "পুঁজির মোহতে" পুঁজিসর্বস্ব মানসিকতাকে নির্মম কশাঘাতে বিদ্ধ করে "পুঁজি স্বর্গ পুঁজি ধর্ম/এই মন্ত্রে সম্মোহিত হয়ে/ওরা মনের অসুখে কাতরায়/তবুও—পুঁজির মোহতে ডুবে থাকে। অষ্টম কবিতা "মুক্তমতি"-তে পাখিরা তাঁর মতে "আবিনের দূত ওরা/মানুষকে দুয়ো দিয়ে/আদতেই অসীম উদার/ওরা সত্যিকারের মুক্তমতি"। এই কবিতাটি মনকে দারুণভাবে নাড়া দ্যায়। নবম কবিতা "নুড়ি খুঁজে ফেরা" এক দূরদ্রষ্টা বালকের অন্তর্নিহিত উপলব্ধিকে অত্যন্ত নিপুণভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। দশম কবিতা "কালচোখের ফোকাসে"-তে হতাশার বিপ্রতীপে আশার জয় ধ্বনিত। একাদশ কবিতা "ফুটে উঠুক সৌরভে" অনাগত আগামীকে মহিমায় উজ্জ্বল কোরে তুলে ধরে এভাবে "ওরা ভেসে চলুক রূপকথার দেশে/ভালমন্দ ন্যায়-অন্যায়ের বোধে/মানুষের মঙ্গলের চিন্তক হয়ে/ওরা ফুটে উঠুক সৌরভে"। দ্বাদশ কবিতা "কুটিল দাবার ছকে" একটি ভিন্নস্বাদের মনোগ্রাহী রচনা যেখানে হৃদয় স্পর্শ করে "ছয় ঋতু কর্মময় উথালপাতাল বারোমাস/সাত সুরে বাঁধা কণ্ঠ খ্যালে মূর্ছনায়/থমকের সাথে—দেশ থেকে দেশান্তর/যেন তেপান্তর অভিযান জঠর জ্বালার যন্ত্রণায়।" ত্রয়োদশ কবিতা "শূন্য থেকে পেতে হবে" মানুষের উত্তরণের এক প্রত্যয়সিদ্ধ ঘোষণায় অভিব্যক্তি। চতুর্দশ কবিতা "অচেতনে অভিনয়"-এ পাই অত্যন্ত সহজ সরল বর্ণনে এক নির্মম আত্মদর্শনের কথা "স্টেজ কিম্বা ফিল্ম্ বাদে/জীবনের আগাপাস্তালা/প্রতিটি স্টেপেই/অচেতনে অভিনয় হয়/আমরা সবাই জীবনের ইতিবৃত্তে/নানা কিসিমের রোলে/হরদম অভিনয় করি/হিরো থেকে চাকরের। শেষ কবিতা "কবিতা অমর"-এ অমিতাভ কবিতাপ্রেমী পাঠককুলের অব্যক্ত যন্ত্রণাকে রূপ দিয়েছেন তাঁদের মর্মস্পর্শী কথায় "আমাপা কবিতা—তার কথার বহর/ শ্রোতাদের মাথার ওপর/আর দুই পাশ দিয়ে/তীরের ফলার মতো/ সোঁ সোঁ কোরে ছোটে/হৃদয়ের মাঝে বেঁধে না, কবিতার বিছানো বাগানে/কোনো ফুল ফোটে

‘পদ্মানদীর মাঝি’র অনবদ্য মঞ্চ প্রযোজনা

শুভ বসু

নাট্যদল হিসেবে সূচনার পর থেকেই ‘প্রতিকৃতি’ এতগুলি বছর ধরে যেমন নিজেদের নিবিষ্ট রেখেছেন প্রযোজনা আঙ্গিকে অর্থবান উপস্থাপনায়, তেমনি পাশাপাশি সমাজ ও শিল্পের নানা প্রসঙ্গে দায়বদ্ধ থাকার প্রয়োজনে। তাঁদের শেষতম প্রযোজনা ‘পদ্মানদীর মাঝি’ যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘প্রাক শতবর্ষ স্মরণ’ হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছে—ওপরের মন্তব্যটির চমৎকার এক সার্থক প্রমাণ।

আজ থেকে প্রায় ষাট সত্তর বছর আগে, গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে লেখা এই উপন্যাসটি ‘প্রতিকৃতি’ যে নির্বাচন করলেন তা থেকেই তাঁদের অনুসন্ধিৎসার গভীরতা খানিকটা আঁচ করা যায়। এ যাবৎ মঞ্চে ও পর্দায় এই উপন্যাসটি রূপায়ণের প্রচেষ্টা দেখার একাধিক সুযোগ হয়েছে আমাদের। দুর্ভাগ্যবশত তার অনেকগুলিই সীমাবদ্ধ থেকেছে কুবের-কপিলার কেচ্ছার রূপায়ণে। সৌভাগ্যবশত বর্তমান প্রযোজনাটিতে ‘প্রতিকৃতি’ যত্নবান থাকতে চেয়েছেন আরো গভীরতর মাত্রাটির দিকে।

উপন্যাসের মূল মর্মবস্তুর প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে গিয়ে প্রযোজনাটি গুরুত্ব দিতে চেয়েছে এই সত্যের প্রতি, যে হুসেন মিঞার মতো তেমন প্রবল কোনো স্রষ্টার স্বপ্নের সামনে বাস্তবের তথাকথিত অনিবার্যতাকেও হার মানতে হয়। এই গভীর বার্তার রূপায়ণ প্রচেষ্টা যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, তেমনি আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নটাকেও অত্যন্ত অর্থময় মাত্রায় হাজির করতে চেয়ে আমাদের তারিফ আদায় করে নেয়।

পদ্মাপারের সুন্দর এক লোকসংগীতের রোমাঞ্চে যখন ধীরে ধীরে পর্দা উঠে যায়, তখনই কল্পনাশক্তিসম্মত মঞ্চ পরিকল্পনায় এবং সমস্ত প্রেক্ষাপটে আলোর অনবদ্য মায়া মুহূর্তে দর্শককে নিয়ে যায় চিরায়ত বাংলার অন্তর্জীবনের নিবিড় সাহচর্যে। দর্শক প্রত্যক্ষ করেন পদ্মার দারিদ্র্যপীড়িত সংগ্রামী মানুষের জীবননাট্যের পরিচয়।

দর্শকের কাছে ধীরে ধীরে বাস্তব হয়ে ওঠে পুত্র কন্যার সাহচর্যে কুবেরের জীবন, সঙ্গে অনুগত বন্ধু গণেশা। সেখানে প্রতিদিন নদীর গভীর থেকে মাছ তুলতে না পারলে বিপন্ন হয়ে ওঠে অস্তিত্ব। সেই সঙ্গে তাদের সেই জলজ সংগ্রামকেও বিড়ম্বিত করে তুলে সেই অভিশপ্ত জীবনকেও আরো ভয়াবহ করে তোলে সুদখোর মহাজন, জমিদারের আশ্রয়ে লালিত কিছু ধান্দাবাজ লোক, কুবেরদের শ্রমের ফসলকে কৌশলে গ্রাস করার ভেতর যাদের অভিসন্ধির চরিতার্থতা।

এরই মধ্যে উপন্যাসের অনুসরণে নাটকে এসে যায় অন্য এক মাত্রা—হুসেন মিঞা, যার প্রবল পরাক্রান্ত স্বপ্নের টান শেষ পর্যন্ত নাটকের চরম নিয়ামক হয়ে ওঠে।

নোয়াখালির থেকে প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় কুবেরদের গ্রামে এসে নাট্যকাহিনীর নিয়ন্ত্রণে প্রধান ভূমিকাটি বেছে নেয় সে। এখানেই বর্তমান নাট্যরূপটির বিশেষ সাফল্য যে, চরিত্রটিকে তার প্রাপ্য প্রাধান্য দিতে নির্দেশক অলোক দেব ভুল করেন নি।

এর ফলে নাট্যরূপটিতে আমরা পেয়ে যাই ঔপন্যাসিক মানিক বন্দোপাধ্যায়ের শিল্প ও জীবনদৃষ্টির এক মননসমৃদ্ধ রূপায়ণ যেখানে স্রষ্টার কলমে ধরা দেয় ইতিহাসেরই এক গভীর মহান সত্যোপলব্ধির নিষ্ঠা। দর্শক যেন অনুভব করেন, ইতিহাসের নিয়মেই বড় উদ্যমশীল কোনো স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণের ভেতর দিয়ে নানা বিপ্লবে ও সমাজ পরিবর্তনে রাশিয়া, চীনে, কিউবায়, ভিয়েতনামে বা লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে ইতিহাসের যে সামান্য অভিজ্ঞতা আমাদের প্রজন্মের প্রায় সমস্ত মানুষের হয়েছে, তারই সত্যরূপ যেন এবার মঞ্চে বিশেষ মাত্রায়। সত্যি বলতে মানুষের এমন স্বপ্নদ্রষ্টা ও উদ্যমী স্বভাবের রূপায়ণ যেন এখানে অনবদ্য হয়ে ধরা দেয় হুসেন মিঞা চরিত্রের উপস্থাপনা ও পরিকল্পনায়।

কিন্তু শুধু এই কারণেই নয় অবশ্য, প্রযোজনাটি আমাদের মতো দর্শককে আকৃষ্ট করে এ কারণেও যে, এখানে সেই পদ্মানদীর মাঝিদের জীবন সংগ্রাম ও যাপনের সমগ্রতাকে প্রায় তার পুরো অনুপুঙ্খ সহ-রূপায়ণের সাহস ও সামর্থ্য রয়েছে।

ফলে, একদিকে কুবের গণশার পারস্পরিক শ্রদ্ধা স্নেহসমন্বিত মানবিক সম্পর্কগুলির রূপায়ণে, বিবাহ ও অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলির সানুপুঙ্খ রূপায়ণের সামর্থ্যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিণামে দরিদ্র মানুষগুলির অসহায়তায়, সেই অসহায়তারই ফলে একদিন ময়নাদ্বীপেরই টানে চলে গিয়ে, আবার সেই অসহায়তারই টানে ফিরে আসে নিজের জন্মের সেই গ্রাম কেতুপুরে—এ সমস্তই এখানে রূপায়িত হয় উল্লেখযোগ্য মুন্সীয়ানার সঙ্গে।

'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর'—এই যে জীবন, তারই ওপর যেহেতু দাঁড়িয়ে থাকে 'পদ্মানদীর মাঝি'র কাহিনী, অতএব নাট্যরূপকারেরও দায়িত্ব থাকে সেই জীবনে বিধৃত চিত্ররাজিকেই প্রযোজনা সামর্থ্যে বাস্তবায়িত করে তোলার। সে কাজটি শ্রীঅলোক দেব যে যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে করতে পেরেছেন, সেটি না বললে সত্য গোপনের অপরাধে অপরাধী হতে হবে।

সূত্রধারের আদলে লোকসঙ্গীতের সুর গলায় নিয়ে যিনি পদ্মানদীর মাঝিদের জীবন সংগ্রামের রূপায়ণ প্রচেষ্টার উপস্থাপনায় প্রথম উপস্থিত হন তখন তার গুণেই সম্ভবত দর্শকের মন প্রবল প্রত্যাশায় টান টান হয়ে ওঠে।

নাট্যপরিস্থিতির আরম্ভ হয় প্রথমে কুবের গণশা, মালা, গুপির জীবন সংগ্রামের স্পন্দিত নাট্যময়তার ভেতর দিয়ে। তারপরে কখনো নানা সাংসারিক অম্লমধুরে, কখনো হালকা ঠাট্টা রসিকতার, কখনো কুবের কপিলার কামনা বাসনা প্রেম অভিমানের ছোটো ছোটো নাট্যমদিরায়। এভাবে দর্শকের চেতনায় ধাপে ধাপে বাস্তব হয়ে উঠতে থাকে পদ্মানদীর মাঝিদের জীবন সংগ্রামের কাহিনী যেমন একদিকে তেমনি আবার কেতুপুরের জীবনকেন্দ্র থেকে দিগন্তগামী ময়নাদ্বীপ পর্যন্ত ব্যাপ্ত জীবনের সমগ্রতায়।

ফলে প্রযোজক পরিচালক যখন অনন্য মুন্সীয়ানায় রূপায়িত করেন ঝড়ের প্রেক্ষাপটে ধ্বস্ত জেলেপাড়ার জীবনের রূপ, বা বহুদূর থেকে ভেসে আসতে থাকা রাসুর আর্ত চিৎকার এবং কেতুপুরের ধীবর সমাজের প্রতিক্রিয়া বা যেভাবে মালার বিয়ের আসরে রূপায়িত সেই সমাজটির লোকচিত্র আমাদের সামনে, তা যে যোগ্যতায় ফুটিয়ে তুলতে পারে অনবদ্য এক মঞ্চায়িত নন্দনমায়া তাতে দর্শক হিসেবে আমাদের চরিতার্থ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

এই রূপায়ণ সম্ভব হতে পারে, বলা বাহুল্য কুশীলবদের যোগ্য অভিনয় সামর্থ্যে। বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয় শ্যামল সরকারের কুবেরের কথা। মধ্যবয়স্ক যে লোকটি জীবনের অজস্র প্রতিকূলতার ভেতরেও কপিলার সঙ্গে সম্পর্কের রচনায় ফুটিয়ে তোলে তার অনন্য জীবনতৃষ্ণার পরিচয়, তেমনি হুসেন মিঞার সান্নিধ্যে তার বিবেকের দোলাচলের ভেতরেও তার মানব সত্ত্বা গভীর এক অনন্য মাত্রায় আমাদের মনের গভীর তলদেশ পর্যন্ত ছুঁয়ে যেতে পারে।

তা ছাড়া, দর্শকের নন্দনবোধকে চরিতার্থ করে সত্যপ্রিয় সরকারের রূপায়ণে হুসেন মিঞা চরিত্রটি। একই সঙ্গে প্রবল সক্রিয়তার অধিকারী, স্বপ্নদ্রষ্টা ও সেই স্বপ্ন রূপায়ণে যোগ্য সক্ষমতার মালিক, কবি, মানবদরদী ও নানা জটিল মাত্রার সমন্বয়ে গঠিত চরিত্রটিকে শ্রী সরকার গভীর নিষ্ঠা ও অভিনয় ক্ষমতার জোরে দর্শকের মনের গভীরে স্থায়ী রেখাপাত করেছেন। মনে রাখতে হবে যে এ ক্ষেত্রে সত্যপ্রিয় সরকারকে লড়তে হয়েছে অতীতে গৌতম ঘোষের 'পদ্মানদীর মাঝি' চলচ্চিত্রটির উৎপল দত্তের মত প্রবল শিল্পীর অভিনয়ের স্মৃতির সঙ্গে।

ছন্দা চট্টোপাধ্যায় অবশ্য বেশ কিছুকাল যাবৎ বাংলা রঙ্গমঞ্চে অত্যন্ত আদৃত একটি নাম। বিশেষ করে 'টিনের তলোয়ার' বা তার পরবর্তী কালে বহু নাটক, চলচ্চিত্র ও সিরিয়াল-এ তিনি আমাদের দর্শকমনে বহুদিন যাবৎই শ্রদ্ধার আসন অলংকৃত করে রেখেছেন। কুবেরের স্ত্রী মালার চরিত্রটিতে এই পঙ্গু, কলহপরায়ণা অথচ স্নেহে প্রেমে অনন্যা রূপটি যেন সত্যি সত্যিই আমাদের লোকজীবনেরই প্রত্যয়গম্য প্রতিনিধি হয়ে ওঠে তাঁর অভিনয়ের গুণে।

অন্যদিকে তরুণী অদিতি ব্যানার্জীকে লড়তে হয়েছে কপিলা চরিত্রে চলচ্চিত্রতারকা রূপা গাঙ্গুলির ওই নির্দিষ্ট চরিত্রটিতে অভিনয়ের স্মৃতির সঙ্গে। তুলনা এ ক্ষেত্রে অর্থহীন হলেও চরিত্রটি তাঁর অভিনয়ের গুণে যথেষ্ট সজীব হয়ে উঠতে পেরেছে। তা ছাড়া জমিদাররূপী রবীন্দ্রনাথ মিত্র বা অন্য একটি বিশেষ চরিত্রে সুনীল মুখোপাধ্যায় আমাদের মতো দর্শকের সমীহ আদায় করে নিতে পারে।

প্রযোজনাটির অন্যতম সম্পদ মনু দত্তের মঞ্চ এবং জয় সেনের আলোকসম্পাত। দুজনেই কলকাতার রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সম্মানিত নাম। বিশেষত কেতুপুর গ্রাম রূপায়ণে যেভাবে একটিমাত্র পাটাতনকে ব্যবহার করে কাহিনীর জন্য উপযুক্ত প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার ওপর জয় সেন তাঁর আলোকসম্পাতের মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন তা

এতটাই সত্যিকারের বাস্তববৎ হয়ে উঠেছে যে আমাদের মন গভীর এক চরিতার্থতার বোধে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে যেন।

অবশ্য এর সঙ্গে এও উল্লেখ থাকা উচিত যে নির্মল বর্মণের নৃত্য পরিকল্পনা এবং স্বপন ব্যানার্জীর শব্দ সংযোজনা প্রযোজনাটির নেপথ্যে থেকে অনেক কাজ করে গেছে।

কিন্তু এ সমস্তকেও ছাপিয়ে গিয়ে এই প্রযোজনাটিকে বিশেষ একটি মাত্রা দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটিকে ক্রিয়াশীল করে তোলার প্রয়াস। কিছুদিন ধরে যেভাবে রাজনৈতিক অভিসন্ধি প্রণোদিত হয়ে হিন্দু মৌলবাদের একটি বিশেষ শক্তি কেবলমাত্র মুসলমানদেরই দায়ী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সুন্দর শিল্পবোধ সমন্বিত উপায়ে তার অর্থহীনতাকে স্পষ্ট করে তুলে এরা যেন এক নৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

লুঙ্গি আর ফেজ পরা হুসেন মিঞা তো মুসলমানই। তার স্বপ্নের ময়নাদ্বীপে কিন্তু মসজিদ বা তেমন কোনো ধর্মস্থানেরই জায়গা নেই। আর ময়নাদ্বীপের স্বপ্ন তো হুসেন মিঞা তথা এই নাটকটিরই প্রাণভোমরা বলা যেতে পারে।

এ কথা বলেই শেষ করা সম্ভবত যুক্তিযুক্ত যে, এমন একটি মনন প্রবণ প্রযোজনা উপহার দেবার জন্য 'প্রতিকৃতি', তথা অলোক দেব-সহ প্রযোজনাটির সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকেই আমাদের ধন্যবাদের দাবিদার। প্রযোজনাটি উত্তরোত্তর সফল হয়ে উঠুক।

বাপি

অজেয়া সরকার

বাপির কথা লিখতে গেলেই নিজের কথাও আসবে কিছু কিছু, সচেতনে এ কথা ভাবলেই সংকোচ এসে পড়ে। অথচ এ এক এমন নিরুপায়তা যাঁর কোনো বিকল্প নেই। আমার কি কোনো স্বতন্ত্র পিতৃস্মৃতি আছে যাকে আমি দূরত্বের বিশিষ্টতায় নির্মাণ করতে পারি? নেই। অন্তত আমি তেমনভাবে টের পাইনি কখনও। যা কিছু আমি শুনেছি বাপির কাছে, চোখে দেখিনি, যা কিছু আমি ভাষায় শুনিনি কখনও দেখেছি শুধু, যেটুকু বুঝেছি, যেটুকু বোঝাবুঝির বাইরে থেকে গেছে—সে সবই শুধু বাপির নয় আমারও যাপিত জীবনের অংশ।

আত্মজৈবনিক একটি স্মৃতিকথা লেখার খুব ইচ্ছে ছিল বাপির। স্বল্পকালীন রোগশয্যার জীবনের ওই শেষ কটা দিনেও বারংবার বলেছে অসম্পূর্ণ সেই পরিকল্পনার কথা। পারিবারিক কত ঘনিষ্ঠ আড্ডায়, আমার বা বন্ধুর সঙ্গে কত একান্ত আলাপচারিতায় অনর্গল বলে গেছে ছোটবেলার খেলাধুলো, ছাত্রজীবনের কথা, সে যুগের কমিউনিস্ট পার্টির গল্প, শহর কলকাতা আর দেশের বাড়ির কথা। সেইসব কথোপকথনে পরিবার-পরিজন যেমন ছিলেন তেমনই প্রবলভাবে ছিলেন বন্ধুরা, বাজারদরের ওঠানামা যেমন ছিল, যেমন জীবন্ত ছিল শহর কলকাতার সকাল-সন্ধে, তেমনই প্রাণময় ছিল তাঁর শিক্ষকদের কথা চিরদিনের এক শিক্ষকপ্রিয় ছাত্রের বয়ানে।

অর্চনা ও শ্রীপতিলাল সরকারের তিন সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বাসবলাল সরকারের জন্ম কলকাতায়, ২৫ অক্টোবর ১৯২৯। পরিবারটির আদি বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার বড়হাটি গ্রাম, পোস্টঅফিস-টেঁয়া, সাবডিভিসন-সালার। উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার স্ট্রীটের উপরে যে প্রাচীন কালীবাড়িটি আছে, তারই পাশে শ্রীপতিলাল ও তাঁর বড়দাদা কিশোরীমোহনের একটি নিজস্ব বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতেই বাসবলালের জন্ম। তিরিশের দশকে শ্যামবাজার স্ট্রীট চওড়া করার সময়ে ওই বাড়িটি ভাঙা পড়ে। শ্রীপতিলাল ও কিশোরীমোহন তখন রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের একটি ভাড়া বাড়িতে উঠে আসেন। এই বাড়িতেই শৈশবের প্রান্ত থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত কাটিয়েছেন বাসবলাল। বাড়ির সামনে লাহা কলোনির মাঠ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে তৈরি হওয়া দুটো বড় গুদামঘর ছিল সেখানে। আমিও সেগুলো দেখেছি। আশেপাশে অজেন জায়গা। ঘনবসতিপূর্ণ উত্তর কলকাতার ওই অঞ্চলে লাহা কলোনির মাঠ ছিল ফুসফুসের মতো। ওই মাঠেই ডাংগুলি খেলতে খেলতে কেশব-বাসব দুইভাই বড় হলেন।

আমার পিতামহীর (যে নামে তাঁকে ডাকতাম সেটি বলা যাবে না) কাছে শুনেছি, বাপি প্রায় তিরিশখানা প্রথম ভাগ বই ছিঁড়েছিল। সংসারের কাজ সেরে আমার ঠাকুরমা

যখন বাপিকে অ-আ শেখাতে বসত তখন ঠাকুরমার সামান্য ঢুলুনি এলেই বাপি প্রথমভাগটি ছিঁড়ে দোতলা ঘরটির জানলা দিয়ে ফেলে দিত। এভাবেই বর্ণ পরিচয়। বাড়িতে আশ্রিত এক যুবক, যাঁকে বাপি-জেঠু কাকা ডাকত, একদিন তারপর নিয়ে গিয়ে তখনকার সুপরিচিত বিদ্যায়তন সরস্বতী ইনস্টিটিউশনে (এখনকার শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়) কেশবের ভাই পরিচয় দিয়ে ভর্তি করে দেয়। জেঠু তখন ওই স্কুলেই ক্লাস ফোরে পড়ত। আমার ছোটবেলায় দেখেছি ওই স্কুলের তখন বৃদ্ধ শিক্ষকদের সঙ্গে যাঁরা বাপিকে ছোটবেলা থেকে পড়িয়েছেন কী ভীষণ স্নেহশ্রদ্ধার সম্পর্ক। চেনস্মোকার বাপি পাড়ার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকে বনবিহারীবাবুকে (যিনি শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়াতেন) আসতে দেখে সিগারেট ফেলে দিচ্ছে, এ আমার নিজের চোখে দেখা। ওই স্কুলে ঢুকেই বাসবলালের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় বিশ্বনাথ বিশ্বাসের। ক্লাস ওয়ান থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে আই এস সি পর্যন্ত দুজনে একসঙ্গে পড়েছেন। বিশ্বনাথ ডাক্তার হয়েছিলেন। বাপি মেডিক্যাল কলেজে অ্যাডমিশন নিয়েও শব ব্যবচ্ছেদ ঘরে ঢুকে সহ্য করতে না পেরে স্কটিশচার্চ কলেজে এসে আবার অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হল। জীবিকা সূত্রে ডঃ বিশ্বনাথ বিশ্বাস দিল্লিপ্রবাসী হলেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দুজনের সখ্য অটুট ছিল। ১৯৯৭-তে বিশ্বনাথ কাকুর মৃত্যুতে বাপির ভেঙে পড়া চেহারা মনে ভাসে। সত্তর দশকের প্রথম দিক থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পিস কাউন্সিল বা পার্টির কাজে বছরে একাধিক বার বাপি-কে দিল্লি যেতে হত। অজয় ভবনে কাজকর্ম সেরে দুইবন্ধু, বাসব আর বিশ্বনাথ, দিল্লির ছোট বড় নানা রেঁস্তোরায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেতেন আর আড্ডা মারতেন। বিশ্বনাথ রাজনীতির মানুষ নন, অ্যাকাডেমিক পড়াশোনাও আলাদা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অকৃতদার নিঃসঙ্গ এই ছোটবেলার বন্ধুটিকে বাপি সারাজীবনের সখ্য উপহার দিয়েছিল।

ছোটবেলায় পাড়ায় দেখেছি এক বৃদ্ধ পুরোহিত মশাইকে, বাপি তাঁকে বাদলদা বলত। তিনি বাপিকে সাঁতার কাটা শিখিয়েছিলেন, তা-ও আবার গঙ্গায়। পুজো আসার কয়েকমাস আগে থেকেই শোভাবাজার রাজবাড়িতে ঠাকুরগড়া শুরু হত। নিঝুম দুপুরগুলোতে ঠাকুমার দিবানিদ্রা একটু ঘন হয়েছে টের পেলেই বাপি নিঃশব্দে দরজা খুলে দৌড় লাগাত শোভাবাজার রাজবাড়ির দিকে। একদমে দৌড়ে রাজবাড়ির ঠাকুরগড়া কতটা এগোলো দেখে আবার বাড়ি ঢুকে পড়ত। এরকম চলতেই থাকত দিনের পর দিন পুজো আসা পর্যন্ত। আমার ঠাকুরমা টেরই পাননি কোনোদিন। বাপির কাছে শুনেছি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট থেকে বিডন স্ট্রীট পর্যন্ত পৌঁছে আবার রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে ফিরে আসার কিছু গলিপথ ছিল (আছে কি এখনও?) লুকোচুরি খেলার জন্য। যে পথে যাওয়া সে পথেই ফেরা কিন্তু নয়। তবু খেলার ছলে একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হত।

আরেকটু বড় হয়ে কিশোর বয়সে বিকেলে ফুটবল খেলত, এখন যেটা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের উপর চিলড্রেন্স পার্ক। উল্টোদিকে রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটের উপরে একটি বাড়িতে তখনকার উঠতি গুরু মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী বিকেলবেলা কীর্তন গাইতেন। সন্ধ্যারতির শেষে

সেখানে দুটি করে রাজভোগ প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হত। চিলড্রেন্স পার্কে সারা বিকেল ফুটবল খেলে রাস্তা পার হয়ে এক দৌড়ে রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটের সেই বাড়িটিতে ঢুকে রাজভোগ প্রসাদ নিয়েই আবার দৌড়ে বাড়ি। নিজেই বলেছে বাপি এসব। সারা শৈশব-কৈশোর জুড়ে এই দৌড়নোর গল্পগাথা। বলাবাহুল্য আমার ঠাকুমা বা দাদু কেউ-ই এসবের বিন্দু বিসর্গ জানত না। কারণ বাড়িতে ঢোকার আগেই রাজভোগ দুটি খাওয়া হয়ে যেত।

১৯৪১ সাল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন। কলকাতার সব স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। বাপির স্কুলও। সন্ধে পর্যন্ত বাপি বাড়ি না ফেরায় আমার দাদু থানায় গেলেন। সেখানে কোনো খবর না পেয়ে বাড়ি ফিরে যখন ভাবছেন এবার হাসপাতালগুলোতে খবর নেওয়া শুরু করবেন, রাত আটটা নাগাদ বাপি বাড়ি ফিরল। ছেঁড়া স্কুলব্যাগ নিয়ে খালি পায়ে। কবির মরদেহ নিয়ে যে শোকযাত্রা হয়েছিল, এক বারো বছরে স্কুলছাত্রও একাকী তাতে যোগ দিতে গিয়েছিল। প্রৌঢ় বয়সেও চয়নিকা'র প্রথম থেকে শেষ পংক্তি যে বাপি নিরবচ্ছিন্ন বলে যেত, সেই টানের সূত্রপাত হয়ত তখনই হয়ে গিয়েছিল। আমার দাদু রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রেই বালক বয়সেই বাসবলালের কবি সন্দর্শন ঘটেছিল শান্তিনিকেতনে। বালকবেলার সেই বিস্ময়বিমুগ্ধ স্মৃতি বাপি সারাজীবনের পাথেয় করে রেখেছিল।

আকর্ষণের আরেকটি ক্ষেত্রও ছিল। তার শুরুটা ঠিক কীভাবে আমার জানা নেই। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'ত্রিপিটক' পড়বে বলে বাপি পালি ভাষা শিখেছিল। এমনকি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তৃতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃত না নিয়ে পালি নিয়েছিল। চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ও গৌতম বুদ্ধের প্রতি বাপির টানের ধারাবাহিকতা শেষপর্যন্ত অটুট ছিল। খুব কাছের মানুষকে বুদ্ধমূর্তি উপহার দিত। বহুবার রাজগীর গেছে। রাজগীর থেকেই কেনা একটি কালো পাথরের বুদ্ধমূর্তি খুব প্রিয় ছিল। শেষ বুদ্ধমূর্তিটি কিনেছিল বছর তিনেক আগে আমাদের সঙ্গে দার্জিলিঙে গিয়ে নাতনির জন্যে। একটা নিজের জন্যেও।

১৯৪৬ সালেই বাসবলাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৪৬-এই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ, যে সদস্যপদ তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গর্বের সঙ্গে ধরে রেখেছিলেন। যদিও ১৯৪৮ সালে বছর খানেকের জন্য তিনি পার্টি থেকে সাসপেন্ড হয়েছিলেন। কারণটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রণদিভে পর্বে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' নীতি অনুযায়ী নানা ধরনের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংঘটিত হচ্ছিল। এরই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে কলকাতার রাস্তায় কয়েকটি জায়গায় ট্রামের উপরে বোমা ছোঁড়া হয়। বোমার আঘাতে এক ট্রামচালক মারা যান। বাসবলাল পার্টি নেতৃত্বের কাছে এইসব ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদ করেছিলেন। ফলত সাসপেন্ড হওয়া, যদিও বছর খানেকের মধ্যেই পার্টি তাঁর সদস্যপদ ফিরিয়ে দেয় সসম্মানে। বাপির কাছে গল্প শুনেছি, ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট প্রার্থী গণেশ ঘোষের নির্বাচনী প্রচারে

টানা বেশ কটিদিন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা কাজ করছিলেন। কিন্তু তাঁদের ন্যূনতম ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করাও সে সময় পার্টির পক্ষে কষ্টকর ছিল। অথচ বিরোধী শিবিরে খাওয়া-দাওয়ার অঢেল আয়োজন। বাপিরা সারাদিন নির্বাচনী প্রচার চালিয়ে রাত্রে নিঃশব্দে বিরোধী প্রার্থীর ভাণ্ডারায় খেয়ে আসত। এ-ও শুনেছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পড়ার সময় পার্টির কাজে বা এমনকি বাড়ি ফেরার জন্যেও পথ খরচ ফুরিয়ে গেলে বাপিরা কল্পনাদির (কমরেড কল্পনা যোশী) কাছে গিয়ে হাত পাত্‌তো। কমরেড কল্পনা যোশী তখন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের কর্মী হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজ চত্বরেই অফিস করতেন। অধিকাংশ দিনই নাকি বাপি-রা আশুতোষ বিলডিং-এ ক্লাস শেষ করে বিকেল বেলা নীচে নেমে দেখত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের এক ধারে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছেন সুকুমার সেন (বাপি বলেছিল, সুকুমারদা)। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ সুকুমারদা ধুতির উপরে গলাবন্ধ একটা কালো কোট পড়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ছাত্রকর্মীদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিতেন, কোনো নতুন ছাত্রকে সংগঠনে আনা গেল কি না জানতে চাইতেন এইসব।

১৯৭২ সালে বাসবলাল পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি পরিষদের (পিস কাউন্সিল) সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। যতদিন পিস কাউন্সিল সক্রিয় ছিল বাসবলাল তার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ছিল তাঁর গভীর আগ্রহের বিষয়। এ বিষয়ে পত্র পত্রিকায় লিখেছেনও প্রচুর। সহযোগী অনুজপ্রতিম বন্ধু ড. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ও কমল সমাজদারের সঙ্গে 'আন্তর্জাতিক' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘদিন।

যতদূর জানি, সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের সদস্য ছিলেন বাসবলাল। পার্টি শৃঙ্খলা মেনে চলতেন কঠোর ভাবেই। তবে আজ বলাই যায় কয়েকটি কথা—প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বন্ধ করে শুধু মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের যে নীতি তৎকালীন বামফ্রন্ট নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন বাসবলাল তা মানতে পারেননি। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিরোধী যে তিনি ছিলেন না, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ নিজের কন্যা ও পুত্রকে ভর্তি করেছিলেন বাংলা মাধ্যমের সরকারি স্কুলে। কিন্তু তিনি একই সঙ্গে গোড়া থেকেই ইংরেজি পড়ানোর পক্ষপাতী ছিলেন। রাজ্যপরিষদের সভায় এ বিষয়ে তিনি নিজের মতামত জোরালো ভাবে প্রকাশও করেন। কিন্তু পার্টি-নেতৃত্বের মত অন্যরকম ছিল। ভোটাভুটিও বোধহয় হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বলাবাহুল্য নেতৃত্বের মতই গ্রাহ্য হয়। সেইমতো জনসমক্ষে প্রকাশ করার দায়িত্ব কিন্তু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় দেন বাসব সরকারকেই। নিজের মত সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বাসবলাল পার্টি নেতৃত্বের আদেশ মেনেই ভাষা নীতি নিয়ে পার্টির গৃহীত সিদ্ধান্ত জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। রাজ্য পরিষদের সেই সভায় উপস্থিত সদস্যরা ছাড়া বাসব সরকারের এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণের কথা বোধকরি আর কেউ জানতেনও না। এই সময় থেকেই বোধকরি পার্টি নেতৃত্বের কাছাকাছি

থাকা বা আরেকটু বেশি সুনজর-প্রত্যাশী কিছু পার্টি সদস্য বাসবলালের নামে বিশ্বনাথদার কানভারি করতে থাকেন। সব জেনেও বাসবলাল এ ব্যাপারে ছিলেন অদ্ভুত উদাসীন। ১৯৮৪ সালের ১৭ অগাস্ট মালদা জেলার একটি পার্টিকর্মী সভায় রাজ্য পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে বাসব সরকারের যোগ দেওয়ার কথা ছিল। ১৬ অগাস্ট রাতে তাঁর দাদা কেশব সরকারের মৃত্যু হয়। ১৭ অগাস্ট ভোরে শ্মশান থেকে ফিরে বাসবলাল দেখেন মালদা যাওয়ার ট্রেনের টিকিট নিয়ে একজন অপেক্ষা করছেন। বৃদ্ধা মা-কে ফেলে সেই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে মালদা যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর সেই অপারগতার কথা বাসবলাল জানিয়ে দেন। কয়েকমাস পরেই খড়গপুরের রাজ্য সম্মেলনে নতুন রাজ্য পরিষদ গঠিত হলে বাসব সরকারের জায়গায় ড. অসিত ঘোষ রাজ্য পরিষদে জায়গা পান। তবু তাঁর পার্টি আনুগত্যে কখনও চিড় ধরেনি। কখনও দূরে সরে যাওয়ার কথা ভাবেননি। যদিও কিছু বছর পরেই বিশ্বনাথদা সম্ভবত ওই সিদ্ধান্তের অন্যায্যতা বুঝতে পেরেছিলেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির কোনো বিষয়ে পার্টির মতামত জানতে সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করলেই, তিনি বলতেন, বাসবের কাছে যাও—ও যা বলবে সেটাই পার্টির মতামত।

১৯৫২ সালে এম.এ পাস করার পর বাসবলাল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অপিনিয়ন-এ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অধীনে দেড় বছর রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে কাজ করেন। তাঁর মনোজগতে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি স্থায়ী প্রভাব ছিল। সুধীন্দ্রনাথ বাপি-কে নিজের হাতে লিখে 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থটি উপহার দিয়েছিলেন। বইয়ের সেই কপিটি আজও আমার কাছে আছে। সেই সুধীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত পরিচয় পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক হিসেবেই তাঁর বিদায়। এখানেও একটি বৃত্ত বোধ হয় সম্পূর্ণ হল।

বাসব সরকারের অধ্যাপনা জীবন শুরু হয় ১ অগাস্ট ১৯৫৫ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ট্যাংরাখালির বঙ্কিম সর্দার কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে। ক্যানিং স্টেশনে নেমে চারমাইল হেঁটে রোজ কলেজ যাওয়া আবার একই ভাবে ফেরা। পারিবারিক প্রয়োজনেই তাঁকে ওই চাকরিটি নিতে হয়েছিল। কিন্তু চোদ্দ বছর ওই শ্রম সহ্য করে বঙ্কিম সর্দার কলেজে থেকে যাওয়ার পিছনে পার্টির নির্দেশও ছিল। তাঁর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধুদের কয়েকজনকে আমি ছোটবেলায় ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখেছি এতদিন বঙ্কিম সর্দার কলেজে যাতায়াতের প্রচণ্ড পরিশ্রম সহ্য করে থেকে যাওয়ার জন্য। মে, ১৯৭২-এ বাসবলাল জয়পুরিয়া কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ যোগ দেন। ৩১ অক্টোবর ১৯৯৪-তে তিনি সেখান থেকে অবসর নেন। জয়পুরিয়া কলেজের ওই অধ্যাপক পদটিতে ইনটারভ্যু নেওয়ার দিন, আমার স্পষ্ট মনে আছে, সকাল আটটা নাগাদ বাপির সহপাঠী ডঃ মীরা গঙ্গোপাধ্যায় (যিনি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক) বাজার করতে যাওয়ার পথে থলি হাতে করেই আমাদের শ্যামপুকুর স্ট্রীটের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন শুধু এটুকু নিশ্চিত করার জন্য যে বাপি যেন ইনটারভ্যুটুকু দিতে যায়। মা'কে বলেছিলেন, ও-কে তুলে দিন এবার। বাপি তখনও ঘুমোচ্ছিল, সকাল দশটায় ইনটারভ্যু। দীর্ঘ চারদশক ব্যাপ্ত অধ্যাপক জীবনে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ও প্রবীণ-নবীন

সহকর্মী দলের যে প্রীতি ভালোবাসা বাসবলাল পেয়েছেন তা ঈর্ষণীয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন এবারের কনভোকেশনে 'এমিনেন্ট টিচার অ্যাওয়ার্ড' দিল, খুশি হয়েছিল খুব। আমাকে বলত বাপি, ছাত্রজীবন যেন অশেষ হয়। নিজেকেও প্রস্তুত রেখেছিল সেভাবেই। রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংসর্গ থাকলেও পঠনপাঠনই বাপির স্বক্ষেত্র। তবে অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ার তৈরি করার দিকে কোনো সচেতন প্রয়াস যে কোনোদিন ছিল না, তা বাপির পঠন-পাঠনের পরিধির দিকে নজর দিলেই মালুম হয়। যা পড়েছে, লিখেছে তার চেয়ে অনেক কম। বই করার কথা তেমন ভাবেই নি। ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর.এস.পি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী অধ্যাপক প্রয়াত ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দীর্ঘদিনের আন্তরিক প্রচেষ্টাও এ ব্যাপারে সফলকাম হয়নি। সি পি আই করলেও গান্ধী জীবন ও গান্ধী-নেতৃত্ব নিয়ে খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়াশোনা করেছেন। লিখেছেনও কিছু। ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-র সঙ্গে সখ্যের প্রাথমিক সূত্রটি এইখানেই। তারপর সেই সখ্য বহু পল্লবিত হয়। বিগত বছর পনেরো ধরে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ইতিহাস নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করছিল বাপি। লিখছিলও কিছু। এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চার অঙ্গ হিসেবেই কিছুকাল প্রথমে চারণ ও তারপরে চারণপর্ব নামে একটি পত্রিকা বের করত। পরিচয়ের লেখালেখিতেও এই নতুন আগ্রহের অনেক চিহ্ন আছে।

তন্নিষ্ঠ পাঠক, অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক, রাজনৈতিক কর্মী, এসব পরিচয়ের অন্তরালে ছিল আরেকটি পরিচয়—প্রবল পারিবারিক মানুষ বাসব সরকার। অতি স্বচ্ছল শৈশব-কৈশোর কাটিয়ে যৌবনের প্রারম্ভেই বাসবলালের পারিবারিক জীবনে আর্থিক সংকট প্রবেশ করে। কত সুদীর্ঘকাল ধরে কী অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে সব পারিবারিক দায়দায়িত্ব একার মাথায় নিয়ে বাসবলাল দুঃসময় কাটিয়ে উঠেছেন, সে কাহিনী সম্ভবত স্ত্রী কন্যা ছাড়া আর কেউ-ই জানে না, পুত্র তখনও খুব ছোট। কর্মজীবনের একেবারে গোড়ার দিকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ইনটারন্যাশান্যাল রিলেশানস্-এ অধ্যাপক পদে নির্বাচিত হয়েও যোগ দেননি শয্যাশায়ী বাবা, বৃদ্ধা মা এবং অনাথ এক ভাগ্নিকে ছেড়ে দিল্লিতে শুধু স্ত্রী-কে নিয়ে বসবাস করা সম্ভব নয় বলে। ফলে বঙ্কিম সর্দার কলেজেই ডেলি প্যাসেঞ্জারের জীবন। তবে তাঁর এই পরিবারবোধের একেবারে কেন্দ্রে ছিলেন তাঁর স্ত্রী, প্রতিমা সরকার, আমার মা। একেবারেই পারিবারিক সম্বন্ধ করে তাঁদের বিবাহ হয়েছিল যাতে পাত্রপাত্রীর বিশেষ ভূমিকা ছিল না। কথাবার্তাও চলেছিল বেশ ধীর লয়ে। এমন সময়ে আমার দাদামশাই নতুন সাহিত্য পত্রিকায় বাপির একটি লেখা পড়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যে এই যুবকের সঙ্গেই তিনি তাঁর বড়মেয়ের বিবাহ দেবেন। মা-কে যেদিন বাপি প্রথম দেখতে যায়, সঙ্গে ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিখিল সরকার, যিনি পরবর্তীকালে শ্রীপান্থ নামে সুপরিচিত প্রাবন্ধিক ও কলকাতা-ইতিহাসকার।

প্রেম-প্রীতি-নির্ভরতায় ভরা বাসব-প্রতিমা'র আটচল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবন শেষ হয় ২০০৪ সালের ১৪ জুলাই। বিরহকে আত্মস্থ করে দিনযাপন কাকে বলে জীবনের শেষ তিন বছরে বাপি যেন বলে দিয়ে গেল।

স্নেহ-ভালোবাসায়-শাসনে-আদরে আমরা দু-ভাই বোন বড় হয়েছি বাপি-মার কাছে। অথচ আজ বাপির কথা লিখতে বসে মনে হচ্ছে যা লিখেছি যা লিখছি তা কি শুধুই বাপির কথা? আমার বাবা তাঁর নিজের জীবনকাহিনী দিয়ে আমায় জীবনকে দেখায় প্রবৃত্ত করেছেন। কোনো দর্শন, কোনো তত্ত্বকথা, কোনো নীতিবোধ আমি স্বতন্ত্রভাবে শিখিনি। যেটুকু শিখেছি সবই বাপিকে দেখে, বাপি-মা'কে দেখে। যা শিখিনি, তা-ও বাপি-মা'র জন্যই। লিখতে লিখতে টের পাচ্ছি বাপি-মা'র শরীরী অনুপস্থিতি তাঁদের জীবনকে আমার জীবনের অংশ করে দিয়ে গেল। এই আত্মকথনের জন্য পাঠক মার্জনা করবেন।

মৃগাঙ্ক রায়

(২৭-২-১৯২৭—১৫.০১.২০০৭)

স্বপ্না রায়

নিঃশব্দে চলে যেতে চান এমন কথাই সম্ভবত বলেছিলেন বন্ধুদের কাউকে কাউকে। সাধ তাঁর অপূর্ণ থাকে নি। কবিতার ঘর গড়তে গড়তেই সে প্রত্যাশাকে ছুঁতে পারলেন তিনি। এমনটি যে হবে এ যেন তাঁর জানা ছিল। খানিক আগেই নরম গলায় বলে উঠেছিলেন—

আমাকে ডেকো না তোমরা কেউ
ডেকো না, আমার কোনো
নাম নেই আর, হারিয়ে গেছে
অস্থির ঠিকানাও (ডেকো না)

বলতে পেরেছিলেন—

সব ছেড়ে চলে যাবো
যেমন নিঃশব্দে যায়
জীবন যৌবন ধনমান (বিস্ময়)

তবে কি কালস্রোতে সবই ভেসে যাবে? ভেসে যাবে 'সমুদ্রকন্যা' ও প্রথম কাব্যগ্রন্থ তাঁর। কবিতার সঙ্গে আরো ভালোবাসা হলে 'তাসের পেখম', 'জন্মগ্রহণ মৃত্যুগ্রহণ' বা 'নির্বাচিত কবিতা'-র যে লেখাগুলো আমরা উপহার পেলাম তাদেরও কি আমরা নিঃশব্দেই সরিয়ে ফেলব একটু একটু করে? 'এ আমরা কোথায় এসেছি'? নামে যে কাব্যগ্রন্থের জন্ম হয়েছিল সেখানে কি তবে আমাদের এই নির্বিকার উদাসীনতার কথাই ধরা আছে? এতটাই শব্দহীন হয়ে রইলাম আমরা যে, তাঁকে অন্তত একবারের জন্যও তেমন ক'রে স্মরণ করলাম না। নতুন করে পড়লাম না তাঁর কবিতাগুলো, পড়লাম না তাঁর 'কবিতার কথা'র সেইসব মূল্যবান গদ্য।

এক একটা মানুষ আছে
যাদের ঘরের দরজা
আকাশের মতো খোলা থাকে ('দেবুদা')

কবি মৃগাঙ্ক রায় তেমন একজন। তিনি নিজেই বুঝি 'আকাশের মতো', বড়ো স্নেহময় ছিলেন। বুকের মাঝে আগলে রেখেছিলেন কতজনকে—যাঁরা আর্তস্বরে বলে উঠেছেন—'এবার কার কাছে যাব? আর যে কেউ রইল না।' দুঃখ কম ছিল না প্রতিদিনের জীবনেও। পরিবার-পরিজনের মাঝে থেকেও একা—

এখন আমি একা
দু'জন হয়ে খেলছি (ট্রেনে একা)

নিরন্তর ভেবে চলেছেন—

কী কী নিয়ে গেল দিনটা
একটু বেঁচে থাকা, একটু না-থাকা? (দিনটা)

এইসব নিয়েই বুঝি—'নিজের নৈঃশব্দ্যের কাছে যাওয়া'। এ কোনো হেরে যাওয়ার গল্প নয়। অকম্পিত গলায় পাশের মানুষটির নেই হয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েও। 'কী কী নিয়ে গেল দিনটা?' তারও খোঁজ নেওয়ার আকুলতা—এ বোধহয় তাঁকেই মানায়।

স্বল্প পরিচিতদের জন্যও রাখা ছিল অনেকটা জায়গা। কোথাও কোনো বেড়া ছিল না। কাঠিন্য ছিল না, অহমিকা তাঁকে ছুঁয়েও দেখে নি। পুরনো মূল্যবান বই রেখে দিয়েছেন বহু যত্নে। কোন বই কাকে দেবেন—কার কী কাজে লাগতে পারে—ভাবনার শেষ ছিল না। এমন আদর করে ক'জনই ডাকতে পারে—

বিকেলের দরজা খুলে
বসে আছি আমি—
ওরা আসবে
ওরা সবাই আসবে একে একে। (ওরা আসবে)

কবিতা আর মনের দরজায় কোনো আগল ছিল না।

কী আছে তাঁর কবিতায়? কোন শক্তি তাঁকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নিয়েছিল? শুরুতে কিন্তু ছিল দু'টি গল্প—একটি 'উত্তরা'য়, আর একটি সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর কেবলই কবিতার পথ চলা। চর্চা করেছেন একেবারে নিজের মতো করে। চল্লিশে যাঁরা কবিতাকে বন্ধু করে নিয়েছিলেন তাঁদের ভাবে ভাষায় বিষয়ে-রীতিতে জীবনানন্দকে খুঁজে পাওয়া যাবে। মৃগাঙ্ক রায় একেবারেই তার বাইরে, অন্য ধরনের কবি। যতটা স্বকীয়তা ছিল ঠিক ততটা জনপ্রিয়তা ছিল কি? সহজ করে যে কথা বললেন তাকে তত সহজে ধরতে চাইলাম না বলেই কি আড়ালের কবি হয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত।

কত কথা কবিতার স্তবকে-স্তবকে—সুখের কথা, দুঃখের কথা, বাঁশির কান্না। বড়ো বেশি বিষাদে মাখামাখি হয়ে আছে অনেকগুলো কবিতা। কেমন যেন দ্রষ্টার মতো চারপাশকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন। অভিজ্ঞতার পরিধি তা ছোটো ছিল না, আর ছিল মনের প্রসার। ছিল জীবনের প্রতি অনিঃশেষ ভালোবাসা। মৃত্যু সেই জীবনের দোসর হয়ে এসেছে। নিজেকে চিনে নিতে চেয়ে নিয়ত নিরত থাকলেন কবিতা লেখায়। যখন বলেন—

আমার ছায়ারা কেউ আর
বেঁচে কই (আমার ছায়ারা)

কেমন যেন চমকে উঠি, আবারও যখন শুনি—

তোমার দূরের দৃষ্টি
এখনো দেখছে আমাকে
আমি তার স্পর্শ পাই, স্নেহ পাই

মন্থনের অমৃত পাই
আমি তার নিবিড় ছায়ায় ঘর পাই। (দৃষ্টি)

তখন মগ্ন হয়ে যেতে ইচ্ছে করে কবিতার শব্দে, কবিতার মায়ায়। নিজে যেভাবে ডুব দিয়েছেন কবিতার অতলান্ত সমুদ্রে—পেতে চাই যদি তেমন করে নিজেরাই হয়ে উঠব ভীষণ রকমের দামি।

কবিতার বই যদি একটিও না লিখতেন—লিখতেন যদি শুধু 'কবিতার কথা' তাহলেও তাঁকে অনেকদিন পর্যন্ত মনে না রাখার কোনো কারণ নেই। এই একটিমাত্র বই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। এ বইয়ের কোনো জুড়ি হয় না। 'সত্যি কথা বলতে কী, কবিতা জিনিসটা এমন কিছু প্রয়োজনীয় নয়। এমন নয় যে না হলেই চলবে না।' এভাবে যখন শুরু করেন এবং ক্রমান্বয়ে বলে যেতে থাকেন 'কবিতার প্রয়োজন বা 'কবিতার ভালোমন্দ'র কথা তখন নতুন করে কবিতাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে আরো কবিতার জন্ম দেখতে। কবির বলা কথাগুলোকে নিজের করে নিতে ইচ্ছে করে। প্রবাদবাক্যের মতো মনে হয়—'কবিতা বহুকাল বেঁচে থাকে' কিংবা 'এ যুগ থেকে ও যুগে যাতায়াতের পথ বেঁধে দেয় কবিতা' এইসব বাক্য। দশটি অধ্যায়-এ 'কবিতার কথা' বেঁধে নিয়েছেন। কবিতার জন্ম, তন্ময় কবিতা-মন্ময় কবিতা, কবিতার আত্মা এ প্রসঙ্গ গুলি এত সহজে পাঠকের কাছে নিয়ে আসা যেতে পারে এমন কোনো ভাবনাই এর আগে ছিল না। সহৃদয় পাঠকের দাবি আছে আজও—এ গ্রন্থ সংযোজিত হোক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায়। অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ বললেও বেশি বলা হয় না। বস্তুতই 'ছন্দ' অধ্যায়টি খুব বেশি রকমের সমৃদ্ধ মনে হয়। এটি নতুন সংস্করণে যুক্ত হয়েছে। ছন্দ সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই যাঁর তাঁরও ভীতির কোনো কারণ ঘটবে না এ গ্রন্থ থেকে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্তের পাঠ নিতে। 'কবিতার আত্মা'তে রসতত্ত্বের আলোচনাটিও অনুপম।

কবিতা লেখায় কিংবা কবিতা নিয়ে কথা বলায় কোনো ক্লান্তি ছিল না। এই সেদিনও হাতে পাওয়া গেল একটি কবিতার বই, একটি গদ্যগ্রন্থ। তেরোটি কবিতা নিয়ে 'কয়েকটি কবিতা'। দ্বিতীয়টি—'আধুনিকতার চার বিদেশী কবি'। বয়সের কোনো ভার ছিল না বলেই তাঁর লেখা এখনো এত সজীব, প্রাণময়। প্রজ্ঞার সঙ্গে মাধুরী মিশিয়ে ভালোবাসার সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে লিখেছিলেন বাংলা কবিতার ইতিহাস—চর্যাপদ থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সম্পূর্ণ হয়ে পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে একা। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আর একটু পরিমার্জনা করবেন বলে আগের দিন সকালেও কথা বলেছেন কারো-কারো সঙ্গে। বলেন নি শুধু ঠিকানা বদলের কথা। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁকে দেখবার জন্য প্রায় মাসখানেক আগে বেথুন ইমেলার মাঠে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা নিশ্চয় দেখেছিলেন একাশি বছরের সৌন্দর্যে অবসানের কোনো চিহ্ন ছিল না। তখন কি তাঁর মনে হচ্ছিল— হে ঈশ্বর, আরো একবার জীবন দিও আমাকে (ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা)

PARICHAYA May–August '07 No. 13273 WB/EC—265
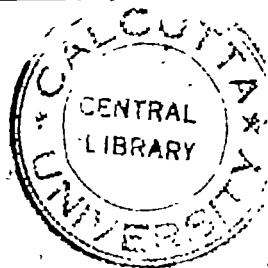
আগামী সংখ্যা

শারদীয় ১৪১৪ (২০০৭)

প্রবন্ধ গল্প ও কবিতা সংকলন
হিসাবে মহালয়ার আগেই
প্রকাশিত হবে।

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭

পরিচয়

দাম : ত্রিশ টাকা